বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চার বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১১২
রোল নম্বর: ১১২
শিক্ষাবর্ষ: ২০১২ - ২০১৩

শেখ মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান

প্রিন্টমেকিং বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

জুন ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চার বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১১২
রোল নম্বর: ১১২
শিক্ষাবর্ষ: ২০১২ - ২০১৩

শেখ মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান

প্রিন্টমেকিং বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

জুন ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ‘বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চার বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণা। এই গবেষণার কোন বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

তারিখঃ

(শেখ মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান)
পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামের ফেলো
রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ ১১২
শিক্ষাবর্ষঃ ২০১২ - ২০১৩
প্রিন্টমেকিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, প্রিন্টমেকিং বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জনের জন্য (রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১১২, রোল নম্বর: ১১২, শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩) একক গবেষণায় উপস্থাপিত 'বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চার বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় লিখিত হয়েছে।

আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। অতএব লিখন শৈলী ও সূচিপত্রের আলোকে উক্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি. ডিগ্রীতে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

তত্ত্বাবধায়ক

সৈয়দ আবুল বারক্ আল্‌ভী
অধ্যাপক
প্রিন্টমেকিং বিভাগ, চারুকলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সহ-তত্ত্বাবধায়ক

ড. এ.এইচ.এম. তাহমিদুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক
গ্রাফিক ডিজাইন, কারুশিল্প ও শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ,
চারুকলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgements)

‘বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চার বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা’ বিষয়ক গবেষণাকর্মের অভিসন্দর্ভ রচনা ও উপস্থাপনা করার ক্ষেত্রে আমি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আন্তরিকতা ও তথ্য-উপাত্তের সহযোগিতা পেয়েছি।

পিএইচ.ডি. গবেষণাপর্বের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমার সুচিন্তিত যোগাযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে লিথোগ্রাফির ওপর অধ্যয়নরত অবস্থায় প্রাত্যহিক লিথোগ্রাফি চর্চা ও কিছু ছোট ছোট মুহূর্তে নতুনত্বের আবিষ্কারে প্রাপ্ত আনন্দ থেকে। যতই এর ভেতরে ঢুকেছি ততই এর গভীরতায় মুগ্ধ হয়েছি। স্নাতকোত্তর পরীক্ষার অভিসন্দর্ভ রচনার গণ্ডির মধ্যে আমার লেখালেখি সীমাবদ্ধ ছিল। সেখান থেকে বের হয়ে এসে এভাবে কোনো দিন গবেষণাধর্মী লেখায় নিজেকে নিয়োজিত করব—এ বিষয়ে কখনো স্বপ্নও দেখিনি। তবে লিথোগ্রাফির করণ-কৌশলগত আমাদের নিজস্ব চর্চা পদ্ধতি সৃষ্টিতে যখন আনন্দ পেতাম, তখন প্রায়ই অধ্যাপক সৈয়দ আবুল বারক্ আলভী আমাকে এর উপায়গুলো লিখে রাখতে বলতেন। সেইসাথে এগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। তাই এ বিষয়ে তার দেওয়া সাহসের পরিপ্রেক্ষিতেই বিষয়গুলো নিয়ে লিখতে বসা। সে জন্য প্রথমেই আমি আমার শ্রদ্ধেয় গুরুর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেইসাথে আমার সহকর্মী সহকারি অধ্যাপক, কামরুজ্জামানের সাথে প্রতিনিয়ত এ বিষয়ে মতবিনিময় হতো, যা আমাকে অণুপ্রাণিত করেছে। আমার ছাত্র ঝোটন চন্দ্র রায় লিথোগ্রাফি বিষয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বছর উচ্চতর পর্যায়ে লেখাপড়া করে দেশে ফেরে। সেও আমাকে এ বিষয়গুলো নিয়ে লেখার ব্যাপারে উৎসাহ জুগিয়েছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর পর্যায়ে লিথোগ্রাফি বিষয়ে পড়াশোনা করা ও বাংলাদেশের প্রিন্টিং লাইনে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিল্পী অশোক বিশ্বাস এ বিষয়ে আমাকে আলোচনার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে আসতে অনুপ্রাণিত করেছেন। চারুকলা অনুষদের বর্তমান ডিন নিসার হোসেন, শান্ত মরিয়ম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন মিজানুর রহিম (লিথোগ্রাফি বিষয়ে বেলজিয়াম থেকে উচ্চতর পর্যায়ে পড়াশোনা করে আসা) ও ভারতের স্বনামধন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আধ্যাপক ড. নির্মলেন্দু দাস, সহযোগী অধ্যাপক অর্পণ মুখার্জী, সহযোগী অধ্যাপক অজিৎ সিলে এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ড. পরাগ রায়, সহকারী অধ্যাপক জয়ন্ত নস্কর, শিক্ষক স্বরূপ কুমার বসাক প্রমুখ শিল্পী শিক্ষক শুধু প্রশ্নের জবাব দিয়েই নয়, পাশাপাশি এ বিষয়ে বিভিন্ন সময় বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রিন্টমেকিং বিভাগের সকল শিক্ষক ও মানসিক সাহস জোগাতে সাহায্য করেছেন। শুধু তা-ই নয়, শিক্ষকমণ্ডলী একাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্তে পুরো বিভাগের লিথোগ্রাফি, এচিং ও উডকাট বিষয়ের সংগৃহীত নমুনাচিত্র ও তাদের ব্যক্তিগত শিল্পকর্মের চিত্রসম্ভারের তথ্যচিত্র দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

এই অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরস্থ যে সমস্ত করণ-কৌশলগত অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে, সে বিষয়গুলো গবেষণাগারে বা লিথোগ্রাফি স্টুডিওতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য একাডেমিক কমিটির অনুমতি সাপেক্ষে সুযোগ করে দিয়েছেন বর্তমান বিভাগীয় চেয়ারম্যান মো. আনিসুজ্জামান। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক পলাশ বরণ বিশ্বাসও নানাভাবে উৎসাহ জুগিয়েছেন। অভিসন্দর্ভ বিষয়ের সূচিপত্রের ধারাবাহিকতা নির্ণয়ে শিল্পকলার ইতিহাস বিষয়ের অধ্যাপক নাহীদ আক্তার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. এ. এইচ. এম তাহ্‌মিদুর রহমান (যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক) আমাকে সাহায্য করেছেন। গবেষণাটির প্রথম পর্যায়ে গবেষণা প্রস্তাব (Synopsis) তৈরিতে তিনি নানাবিধ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সাহায্য করেছেন। এরপর গবেষণার প্রারম্ভকালে কিছু বিষয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক আমাকে সাবজেক্টিভ হওয়ার প্রতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। গবেষণার পদ্ধতিগত শিক্ষা বিষয়ে ভাস্কর্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুকুল কুমার বাড়ৈ সবসময় নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে তাগাদা দিয়েছেন। ওই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নাসিমুল খবির মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রোগ্রামে রচনার ফুটনোট লেখার উপায়সহ ভাষাগত জায়গাটি পরিচালনা করতে সহায়তা করেছেন। ওনাদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক চৌধুরী মোঃ তাশরিক-ই-হাবীব আমাকে গবেষণার আংশিক ভাষাসংক্রান্ত বিষয়ে আন্তরিক সহযোগিতার কমতি দেখাননি। ভাস্কর্য বিভাগের অধ্যাপক লালা রুখ সেলিম গবেষণার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ধারণা প্রদান করেছেন। তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সেমিনার উপস্থাপনের ক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে চারুকলা অনুষদ ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ পরামর্শ প্রদান করে গবেষণার পথকে তরান্বিত করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন লিথোগ্রাফি বিষয়ে বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রবীণ শিল্পী শান্ত মরিয়ম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক মিজানুর রহীম এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. বজলুর

রশীদ খান ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (প্রিন্টমেকিং ডিসিপ্লিনের হেড ইন চার্জ) সহযোগী অধ্যাপক, ড. নিহার রঞ্জন সিংহ । সে জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

অধ্যায় পরিচিতি থেকে শুরু করে সামগ্রিক গবেষণার বিষয়বস্তু আলোচনা ও এর সিদ্ধান্ত তৈরিতে যিনি শেষের দিকে তার প্রচণ্ড ব্যস্ত সময়ের মধ্যে থেকে আমাকে সময় দিয়ে মানসিক ও সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তিনি হলেন সহযোগী অধ্যাপক ড. এস এম শামীম রেজা (গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢা.বি.)। এ বিষয়ে আন্তরিকভাবে তাদের প্রত্যেকের প্রতিই গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণাটি রূপায়ণে যাদের ভূমিকা অগ্রগণ্য তারা হলেন প্রিন্টমেকিং বিভাগের অফিস সহকারী, মো. হাবিবুর রহমান এবং দৈনিক কালের কণ্ঠের সাংবাদিক আবীর নজরুল। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যারা আমার এই গবেষণায় সাক্ষাৎকার ও বিভিন্ন ফটোগ্রাফিসহ সংশ্লিষ্ট উপাত্ত জোগাড় করতে সহযোগিতা করেছে তারা হলো মুনমুন, মোয়াজ্জেম হোসেন (জনি), ঝোটন চন্দ্র রায় প্রমুখ।

পরিশেষে যাদের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সম্পর্ক নয়, যেমনঃ আমার স্ত্রী রওশন নাজম ও কন্যা সেমন্তি। তাদের সার্বিক পরোক্ষ সহায়তা ছাড়া এ বিষয়ে মনোনিবেশ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

শেখ মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান

সারসংক্ষেপ (অ্যাবস্ট্র্যাক্ট)

মুদ্রণযন্ত্র ও শিল্পকলার ইতিহাস বিষয়ে 'লিথোগ্রাফি' একটি বিশেষ নাম। লিথোগ্রাফি আবিষ্কারের (১৭৯৮ সালে) পর সময়ের ভিন্নতায় ইউরোপ থেকে ভারতে এবং ভারত থেকে বাংলাদেশে এর চর্চা আরম্ভ হয়েছে। বাণিজ্যিক ও চারুশিল্প—এই দুটি চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে একটি সময় মাধ্যমটি ব্যবহৃত হয়েছিল প্রতিনিয়ত। বর্তমানে এটি খুব অল্পসংখ্যক দেশেই ব্যবহৃত হচ্ছে, তাও শুধু চারুশিল্প চর্চার ক্ষেত্রে।

'বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চার বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা' গবেষণার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে যে—অনেকটা পরিশীলিত বিকল্প পদ্ধতিতেই এ দেশে লিথোগ্রাফি চর্চা হয়ে এসেছে, যার বিবর্তন ইতিহাসটি লিখিত আকারে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলাফল হিসেবে প্রবীণ ও নবীন প্রজন্মের সমন্বিত প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হয়েছে এ দেশের লিথোগ্রাফিতে করণ-কৌশলগত স্বতন্ত্রতার সুস্পষ্ট ছাপ। ক্রেয়নের পরিবর্তে নানা গ্রেডের (নরম থেকে শক্ত ধরনের) গ্লাসমার্কার ব্যবহারে তা যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি তুষের ব্যবহারেও রয়েছে নিজস্বতা। তুষের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার মোহাম্মদ কিবরিয়ার দৃষ্টির সীমা খুলে দিয়েছে। তুষকে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন বিধায় সারা বিশ্বের শিল্পীদের মতো তিনিও তুষের খেলায় মত্ত হয়ে আরেক ধরনের নন-অবজেক্টিভ জগৎ উন্মোচনের দিকে ঝুঁকেছিলেন। অন্যদিকে তুষের সাবজেক্টিভ ব্যবহার সারা বিশ্বে অনেক কম হলেও এ দেশের লিথোগ্রাফিতে অবয়বধর্মী কাজে প্রথমে গ্লাসমার্কার দিয়ে কাজ করে তার ওপর তুষের ইমেজের সার্থক প্রয়োগের সফলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় । তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ প্রতিষ্ঠানের লিথো চর্চায়ই বিদ্যমান, যা লিথোগ্রাফির শিল্পভাষাগত দিকটির নিজস্বতার অন্তর্ভুক্ত।

লিথোগ্রাফি চর্চা করতে গিয়ে উদ্ভূত নানা ধরনের সমস্যা ও তার সমাধানকল্পে সৃষ্টি হয়েছে বলপয়েন্ট লিথোগ্রাফির মতো কৌশল। যেমন: ছোট লিথোচিত্রের ক্ষেত্রে ক্রেয়নের লাইন ইমেজ (রূপকল্প) হিসেবে খুব মোটা হয়ে আসে। গ্লাসমার্কারের লাইন তার থেকে একটু সরু হয়, কিন্তু চুলের মতো সরু লাইন বা বলপয়েন্ট কলমের মতো লাইন সৃষ্টি করা কঠিন বিষয়। সে ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি আবিষ্কারের ফলে সূক্ষ্ম ইমেজ তৈরির আরেকটি বিশাল সম্ভাবনার জগৎ এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আবার উডকাটের ক্ষেত্রে দেখা যায় ইমেজের লাইন ও হাইলাইট একটু হার্ড ও মোটা হয়ে প্রিন্টে আসে। সেখানে উডকাটের সঙ্গে

লিথোগ্রাফির মতো সফট ইমেজ ও লাইন সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উদ্ভব হলো এ দেশীয় নিজস্ব 'উড লিথোগ্রাফি' নামক করণ-কৌশল। তাছাড়াও ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফির সাথে ওয়াটারযুক্ত লিথোগ্রাফির সমন্বয়ে এখানে আরেকভাবে ফ্লাট ইমেজ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। ফলে ইমেজে এসেছে আরেক ধরনের পরিবর্তন। শিল্পীর গভীর আত্মমগ্নতা ও সজ্ঞানে নিরীক্ষণের ফলে লিথোগ্রাফিক তুষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে অন্য ধরনের 'ওয়াটার বেইজ অয়েলি মিডিয়াম' নামক এক নতুন পেইন্টিং মাধ্যম। এই মাধ্যমে একদিকে যেমন স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ দুটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে কাজ করা সম্ভব, অন্যদিকে এর সঙ্গে জলরং বা পোস্টার কালারের মিশ্রণ ঘটিয়েও রঙিন চিত্র রচনার সম্ভাবনাময় জগৎ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। দৃশ্যগতভাবে এটি প্রমাণিত যে, এর গুণগত মান ব্রিটিশ জলরং পদ্ধতি ও অ্যাক্রিলিক মাধ্যম থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। ভবিষ্যতে এর থেকে আরো অনেক বেশি কিছু প্রমাণ করা বাকি রয়ে গেছে। সারা বিশ্বের শিল্পীরা যেমন ইন্ডিয়ান ইঙ্ক দিয়ে চিত্র রচনা করেন, ভবিষ্যতে এটি অবশ্যই সম্ভব যে, শিল্পীরা বলবেন—এটি 'বাংলাদেশি ওয়াটার বেইজ অয়েলি মাধ্যমে' করা। এভাবে স্বতন্ত্রতা ও আধুনিকতার প্রেক্ষিতটি বিবেচনায় রেখে লক্ষ করা যায় যে—নানা মাধ্যমের সমন্বয়ে চিত্রতল হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র ও অসম্ভব সম্ভাবনাময়, আধুনিক, উত্তরাধুনিক।

লিথোগ্রাফি মাধ্যম ও মাধ্যম উদ্ভূত নানা পদ্ধতি, বিবর্তন বিশ্লেষণ ও আবিষ্কৃত নতুন নতুন পদ্ধতি বিবেচনা করে এটি স্পষ্টত দৃশ্যমান যে, লিথোগ্রাফি প্রিন্টের চিত্রতলে একটি আলাদা চরিত্র উপস্থিত হয়েছে, যা পেইন্টিং এমনকি প্রিন্টের অন্য মাধ্যম বা পদ্ধতিগুলো থেকেও ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। ফলে সহজ পরিচিতির স্বার্থে আলাদা আলাদা নামকরণ যেমন স্পেশালাইজেশনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন, তেমনি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে এগুলোকে লিথোগ্রাফির অন্তর্ভুক্ত করে একসঙ্গে 'লিথোগ্রাফিক শিল্পভাষা' হিসেবে পরিচিতি দান করা শ্রেয় হবে। তা না হলে সাধারণ মানুষ এত রকম নামের মধ্যে গুণগত পার্থক্য বুঝতে পারলেও সে বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ হারাবে। যেমন: ক্রমোলিথোগ্রাফি, ওলিওগ্রাফি ও ক্রমো সিভিলাইজেশনের কথা লেখক ও গবেষকরা ছাড়া সাধারণ মানুষ খুব কমই জানেন। আর নানা ধরনের ইজমে লিথোগ্রাফি মাধ্যমটি বিভিন্ন ধারা বা শৈলীর শিল্পকর্মে ইমেজ (রূপকল্প) সৃষ্টিতে তার সামর্থ্য ও নীরব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে টিকে থাকার অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে পেরেছে। সারা বিশ্বেই দুটি শ্রেণির শিল্পীরা প্রিন্টে কাজ করছেন। একটি শ্রেণি শুধু প্রিন্টের কৌশলগত দিক নিয়ে গবেষণা করে ইমেজ সৃষ্টি করছে। আরেকটি শ্রেণি (বিখ্যাত শিল্পীরা) মাঝেমধ্যে প্রয়োজনের তাগিদে বা পেইন্টিংয়ের পাশাপাশি নানা কারণে এর চর্চা

করছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে পিকাসোর মতো বিখ্যাত শিল্পীরা সারা জীবন লিথোগ্রাফি চর্চা করলে ভাষাগত দিক থেকে যে উৎকর্ষ সাধন হতো—সে সম্ভাবনাটি এখনো বাকি রয়ে গেছে। পৃথবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা আধুনিক বা তার ধারাবাহিকতায় লিথোগ্রাফি চর্চাতে এক্সপেনসিভ (অনেক প্লেট ব্যবহার) ও চিপ (দু-তিনটি বেসিক কালারে প্রিন্ট নেওয়া) এই দুটি উপায় ব্যবহার করে এগিয়ে যাচ্ছেন। ফলে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একদিকে যেমন টেমারিন্ডের মতো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করা উচিত, তেমনি অতীত ও বর্তমান কৌশল এবং দর্শন পর্যালোচনা করে লিথোগ্রাফিকে সার্থকভাবে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার সম্ভাবনার জন্য কাজ করে যাওয়া অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। বাংলাদেশের লিথোচিত্রে সেই সম্ভাবনাগুলোর দিকটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কারণ সারা বিশ্বেই অফসেট প্রিন্টিং আসার পর কারিগররা আবার সেদিকে ঝোঁকেন। শিল্পীরা তখনো এই লিথোগ্রাফি মাধ্যম নিয়ে কাজ করেছেন। নিত্যনতুন ডিজিটাল মাধ্যম, পলিমার লিথোগ্রাফি ইত্যাদির দিকে ঝোঁকেন। শিল্পীরাও ডিজিটাল মাধ্যম, পলিমার লিথোগ্রাফি ইত্যাদির দিকে ঝোঁকেন কিন্তু অফসেট প্রিন্টিংয়ের দিকে খুব একটা নজর দিলেন না। তবে শিল্পীরা লিথোগ্রাফি মাধ্যমটিকে নিয়ে প্রথম থেকেই কাজ করে আসছেন। পঞ্চদশ শতকের মধ্যবর্তী (১৪৫০ সাল) সময় থেকেই ইউরোপের শিল্পী ও শিক্ষক সচেতনভাবেই গ্রাফিক মিডিয়াকে [লিথোগ্রাফি (তখনো আবিষ্কৃত হয়নি), এচিং, উডকাট ইত্যাদি...] ব্যবহার করেছেন। কারিগররা যখন এটিকে ছেড়ে অফসেটের দিকে গেলেন, শিল্পীরা তখনো এটিকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এখানে কয়েকটি বিষয় ঘটেছে যেমন:

শিল্পীর সরাসরি যুক্ত থাকার মতো সুযোগ অফসেট প্রিন্টে বা ফটোগ্রাফিতে নেই। যেমন: কিছু পেইন্টিংয়ের কপি করতে গিয়ে মূল শিল্পকর্মের তুলনায় এনগ্রেভিং মাধ্যমে করা (কপি) কাজটি অধিকতর ভালো গুণাগুণসম্পন্ন চিত্রে পরিণত হয়েছে। আবার দুর্বল ড্রাফটসম্যানের অনুকরণকৃত কাজটি মূল পেইন্টিংয়ের থেকেও দুর্বল শিল্প বলে পরিগণিত হয়েছে। সেই সাথে ড্যুরারের মতো বিখ্যাত শিল্পীরা যখন সরাসরি যুক্ত থেকে প্রিন্টে কাজ করেছেন, সেগুলো আবার উচ্চগুণসম্পন্ন চারুশিল্প বলে বিবেচিত হয়েছে। সে ধরনের কাজগুলোই ইতিহাসে বিভিন্ন ইজমের নানা চরিত্র ও শৈলীর মাধ্যমে বেশি পরিমাণে পাঠকের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। এই বর্তমান সময়ে এসে এগুলো বিবেচনায় এনে হিসাব করে দেখা যায় যে—শিল্পীর শতভাগ সরাসরি সংযুক্তিতা একটা বড় বিষয়।

এরপর নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে ট্র্যাডিশনাল ও মডার্ন নন্দনতত্ত্বের আলোকে এ দেশের লিথোগ্রাফিগুলোকে শিল্প হিসেবে প্রমাণ করা হয়েছে। এগুলো যে কোনো অনুকরণ (ইমিটেশন) নয় সে বিষয়ে যৌক্তিকতা

Dhaka University Institutional Repository

তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিগুলোতে আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। অভিব্যক্তিক তত্ত্বের আলোচনায় এ দেশের লিথোগ্রাফিগুলোর সামঞ্জস্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। এ দেশের শিল্পীরা স্বীকার করেন যে, শিল্পী বাস্তবতা (রিয়ালিটি) সম্পর্কে তার মূল্যায়নকে উপস্থাপন করেন এবং সেই সূত্রে তিনি তার চিন্তা এবং অনুভূতিকে ব্যক্ত করেন।

আধুনিকতাকে একটি বৃহৎ পরিলেখ মনে করে চিন্তার ক্ষেত্রটি—চেতনাসহ বস্তুর অন্তর্নিহিত সংযোগসূত্র প্রকাশে শিল্পীর সামগ্রিকতা শুধু কোনো কল্পনাপ্রসূত বিষয় নয় এবং কোনো কল্পনা আবার সামগ্রিকতার বাইরেও নয়—এমন বক্তব্য উঠে এসেছে। তার সঙ্গে যুক্তির যৌক্তিকতা থাকছেই। শিল্পীর একটি ভুল তুলির আঁচড়ের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হতে পারে নতুন সম্ভাবনাময় শিল্প সৃষ্টির জগৎ। একজন আধুনিক শিল্পীর চিন্তা ও কাজ ভাববাদ ও বস্তুবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। পোস্টমডার্নিজম, পোস্ট-পোস্টমডার্নিজম, মেটামডার্নিজম এবং তার পরবর্তী ধারাগুলোকে মডার্নিজমের এককেটি উপধারা হিসেবে বিবেচনায় এনে বাংলাদেশের কিছু লিথোগ্রাফিকে পোস্টমডার্ন শিল্প বা এর অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিছু সিরিজ লিথোগ্রাফিকে পোস্টমডার্নিজম থেকে বের হয়ে আসা 'ট্রান্স অবজেক্টিভিটি'র আওতাভুক্ত বলে প্রমাণ করা হয়েছে, যেখানে নতুনত্ব তৈরি ও অবিদ্রুপাত্মক (non-ironic) ধরনের শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পোস্টমডার্ন শিল্প পুরো কনভেনশনালও হতে পারে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

সূচিপত্র

ঘোষণাপত্র -- I
প্রত্যয়নপত্র -- I I
কৃতজ্ঞতা স্বীকার -- I I I-V
সারসংক্ষেপ (অ্যাবস্ট্র্যাক্ট) --- VI-IX

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ গবেষণা প্রেক্ষাপট-- ১-৬
১.২ গবেষণা প্রেরণা পর্ব -- ৬-১৬
১.২.১ করণ-কৌশলগত দিক-- ৭-১০
১.২.১.১ গ্লাসমার্কার ব্যবহারে করণ-কৌশলগত দিক -- ৭-৮
১.২.১.২ তুষ (বিশেষ ধরনের তেল বা চর্বি জাতীয় ইঙ্ক) ব্যবহারে করণ-কৌশলগত দিক------------ ৮
১.২.১.৩ তৈরি ইঙ্ক ব্যবহারে করণ-কৌশলগত দিক --- ৮-৯
১.২.১.৪ ওয়াশ আউট করার জন্য লিথোটিনের বদলে বিকল্প সলিউশন ব্যবহার-------------------- ৯-১০
১.২.২ ভাষাগত ব্যাপ্তিতার দিক-- ১০-১৫
১.২.৩ নতুন মাধ্যম সৃষ্টির মাধ্যমে -- ১৫-১৬
১.২.৩.১ বলপয়েন্ট লিথোগ্রাফি -- ১৫
১.২.৩.২ উড লিথোগ্রাফি-- ১৫
১.২.৩.৩ ওয়াটার বেইজ অয়েলি মিডিয়াম -- ১৬
১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা --- ১৬-১৯
১.৪ গবেষণা প্রশ্ন বা গবেষণা বিবৃতি -- ১৯-২০
১.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য --- ২০
১.৬ গবেষণা পদ্ধতি -- ২০-২১
১.৭ তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্র -- ২১
১.৮ উৎস নির্বাচন পদ্ধতি-- ২১
১.৯ শিল্পকর্ম নির্বাচন পদ্ধতি -- ২২-২৪
১.১০ সীমাবদ্ধতা -- ২৪-২৫

দ্বিতীয় অধ্যায় ২৬-৫২

সাহিত্য পর্যালোচনা

২.১ লিথোগ্রাফির করণ-কৌশলগত সাহিত্য পর্যালোচনা----------------------- ২৬-৩৭

২.১.১ ইমেজ তৈরিতে কন্টি বা ক্রেয়নের ব্যবহার-- ২৭-৩০

২.১.২ ইমেজ তৈরিতে তুষের ব্যবহার-- ৩০-৩৩

২.১.৩ ইমেজ তৈরিতে বলপয়েন্ট কলম ব্যবহার-- ৩৩-৩৪

২.১.৪ ফ্লাট ইমেজ সৃষ্টিতে প্লেট লিথোগ্রাফি ব্যবহার-------------------------------------- ৩৪

২.১.৫ প্লেট-লিথোগ্রাফির সঙ্গে ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফির সংমিশ্রণ প্রসঙ্গ---------------------- ৩৪-৩৫

২.১.৬ ইমেজ প্রিন্ট নেওয়ার পূর্বে বাংলাদেশের পদ্ধতির সঙ্গে গ্রন্থে লিখিত পদ্ধতিগত তারতম্য - ৩৫

২.১.৭ ওয়াশ আউট দ্রবণ (সলিউশন) সৃষ্টি প্রসঙ্গ-- ৩৫-৩৭

২.২ ভাষা হিসেবে লিথোগ্রাফির সাহিত্য পর্যালোচনা-------------------------- ৩৭-৫২

২.২.১ 'প্রিন্টমেকিং টুডে' ও 'আর্ট থ্রু দি এজেস' গ্রন্থের সাহিত্য পর্যালোচনা (ভাষা সংক্রান্ত)---- ৩৭-৪৭

২.২.২ ANTIQUES ROADSHOW-এর সাহিত্য পর্যালোচনা (ভাষা সংক্রান্ত)------------ ৪৭-৪৮

২.২.৩ 'A low down on the Print Market' প্রবন্ধে লিথোগ্রাফি ভাষা সম্পর্কে সাহিত্য পর্যালোচনা-- ৪৮-৫০

২.২.৪ 'ছাপাখানার ইতিকথা' গ্রন্থের সাহিত্য পর্যালোচনা----------------------------------- ৫০-৫২

তৃতীয় অধ্যায় ৫৩-৮০

তত্ত্ব, শিল্প ধারণা ও বিভিন্ন কৌশলের আলোচনা

চতুর্থ অধ্যায় ৮১-১৪৪

লিথোগ্রাফির ইতিহাস ও বিবর্তন

৪.১ মুদ্রণযন্ত্রের ক্রমবিকাশ ও লিথোগ্রাফির পথপরিক্রমা--------------------- ৮১-৮৩

৪.২ লিথোগ্রাফি আবিষ্কারের ঘটনা ও ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতা--- ৮৩-৯৩

৪.৩ লিথোগ্রাফির সামগ্রিক উত্থান এবং পতন ------------------------------ ৯৩-১১১

৪.৩.১ ইউরোপ, ভারত ও বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চার পথপরিক্রমা--------------------- ৯৬-১১১

৪.৩.২ বাংলাদেশের ঢাকা চারুকলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লিথোগ্রাফির ইতিহাস ও চর্চা---------- ১১১-১১২

৪.৩.৩ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম আর্ট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও চর্চা --------------- ১১২-১১৩

৪.৪	**লিথোগ্রাফিতে বিভিন্ন ইজমের প্রতিফলন**-------------------------------	১১৪-১৩৩
৪.৪.১	**ভাষাগত দিক দিয়ে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি (ফিলোসফিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ)**-----------	১১৪-১৩৩
৪.৪.১.১	(ক) সংক্ষেপে দর্শন ও শিল্পের ইতিহাসের দার্শনিক উন্নতির সঙ্গে লিথোর পদচারণ ---	১১৪-১২৯
৪.৪.১.২	(খ) করণ-কৌশলগত বিবর্তন (টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট)------------------	১২৯-১৩০
৪.৪.১.৩	(গ) কনটেম্পর‍্যারি সময়ে করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত বিবর্তন -------------------	১৩০-১৩৩
৪.৫	**লিথোগ্রাফির বর্তমান অবস্থা** ---	১৩৪-১৪৪
৪.৫.১	ইউরোপ, ভারত ও বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চার বর্তমান অবস্থা--------------------	১৩৪-১৩৭
৪.৫.২	বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চার বর্তমান অবস্থা------------------------------------	১৩৭-১৪৪

পঞ্চম অধ্যায় ১৪৫-১৯৪

বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চর্চা ১৪৫-১৪৬

৫.১	**চারুশিল্পে লিথোচিত্র** --	**১৪৭-১৯৪**
৫.১.১	**পঞ্চাশের দশকে লিথোচিত্রের করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক** ----------------------	**১৪৭-**
৫.১.১.১	তুষ ও ক্রেয়ন আলাদাভাবে ব্যবহার ---	১৪৭-১৪৯
৫.১.১.২	ক্রেয়ন বা কন্টি দিয়ে অঙ্কিত লিথোচিত্র ---	১৫০
৫.১.২	**পঞ্চাশের দশকে লিথোচিত্রের ভাষাগত দিক** -------------------------------------	**১৫০-১৫৭**
৫.১.২.১	কামরুল হাসানের ‘আফটার বাথ’ (১৯৫৮) লিথোচিত্র ----------------------------	১৫১
৫.১.২.২	‘আফটার বাথ’ লিথোচিত্রের করণ-কৌশলগত দিক পর্যালোচনা (চিত্র.৫.৩) ---------	১৫১-১৫২
৫.১.২.৩	‘আফটার বাথ’ লিথোচিত্রের শৈলীগত ও ভাষাগত দিক পর্যালোচনা ----------------	১৫৩
৫.১.২.৪	‘ফুল হাতে বালক’ লিথোচিত্রের করণ-কৌশলগত, শৈলীগত ও ভাষাগত দিক পর্যালোচনা---	১৫৩-১৫৫
৫.১.২.৫	‘আত্মপ্রতিকৃতি’ লিথোচিত্রের করণ-কৌশলগত, শৈলীগত ও ভাষাগত দিক পর্যালোচনা	১৫৬-১৫৭
৫.১.৩	**ষাটের দশকে লিথোচিত্রের করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক** ------------------------	**১৫৭-১৬৪**
৫.১.৩.১	‘দুই ফুল’ লিথোচিত্রের করণ-কৌশলগত, শৈলীগত ও ভাষাগত দিক পর্যালোচনা -----	১৫৮-১৬১
৫.১.৩.২	ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠানে ক্রেয়ন বা কন্টি দিয়ে অঙ্কিত লিথোগ্রাফি ------------------	১৬১
৫.১.৩.৩	প্রাতিষ্ঠানিক চারুশিল্পে তুষ ও ক্রেয়ন বা কন্টি দিয়ে অঙ্কিত লিথোগ্রাফি -------------	১৬১-১৬২
৫.১.৩.৪	ফ্লাট কালার দিয়ে অঙ্কিত লিথোগ্রাফি ---	১৬২-১৬৪
৫.১.৪	**সত্তর থেকে নব্বইয়ের দশকে লিথোচিত্রের করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক** ----------	**১৬৫-১৭৯**

৫.১.৪.১	জয়নুলের লিথোগ্রাফির করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক (চিত্র.৫.১৬) ----------------	১৬৫-১৬৮
৫.১.৪.২	'বিন্যাস-১' লিথোগ্রাফির করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক (৫.১৮) ------------------	১৬৮-১৭০
৫.১.৪.৩	শিরোনামহীন লিথোগ্রাফিরি করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক (চিত্র.৫.২০) -----------	১৭০-১৭২
৫.১.৪.৪	'একটি দেশের কাহিনী-২' লিথোচিত্রের করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক -------------	১৭২-১৭৪
৫.১.৪.৫	'রাতের প্রতিনিধি' লিথোচিত্রের করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক --------------------	১৭৪-১৭৫
৫.১.৪.৬	'ড্রিম অব দ্যা ভিক্টোরি' লিথোচিত্রের করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক ----------------	১৭৫-১৭৬
৫.১.৪.৭	'দ্য মুন' লিথোচিত্রের করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক -----------------------------	১৭৬-১৭৭
৫.১.৪.৮	'আউল অ্যান্ড ফিলিং' চিত্রটির করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক (চিত্র. ৫.২৯) --------	১৭৭-১৭৮
৫.১.৪.৯	'আবিষ্কার' (Discover) লিথোগ্রাফির করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক (চিত্র.৫.৩০) -	১৭৯
৫.১.৫	**বর্তমান সময়ের লিথোচিত্রের করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক ----------------------**	**১৮০-১৯৪**
৫.১.৫.১	**বর্তমান প্রবীন প্রজন্মের লিথোচিত্রে করণ-কৌশলগত দিক পর্যালোচনা --------------**	**১৮০-১৮৬**
৫.১.৫.১.১	'দি ক্রো' লিথোচিত্রটির করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক (চিত্র. ৫.৩১) --------------	১৮০-১৮২
৫.১.৫.১.২	'ইটের ভাটা' বিষয়ক লিথোচিত্রটির করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক -----------------	১৮৩-১৮৫
৫.১.৫.১.৩	মোহাম্মদ ইউনুসের অঙ্কিত লিথোচিত্রের করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক (চিত্র. ৫.৩৩)	১৮৫-১৮৬
৫.১.৫.২	**বর্তমান নবীন প্রজন্মের লিথোচিত্রের করণ-কৌশলগত দিক পর্যালোচনা -------------**	**১৮৬-১৯০**
৫.১.৫.২.১	বলপয়েন্ট লিথোচিত্রের করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত দিক ------------------------	১৮৭
৫.১.৫.২.২	উড লিথোগ্রাফির করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত দিক -----------------------------	১৮৮-১৯০
৫.১.৫.৩	**বর্তমান নবীন প্রজন্মের লিথোচিত্রের ভাষাগত দিক পর্যালোচনা --------------------**	১৯০-১৯৪
৫.১.৫.৩.১	'এ জার্নি ফরম ওয়ান রিয়ালিটি টু এনাদার' চিত্রের ভাষাগত দিক পর্যালোচনা (চিত্র. ৫.৩৮) ---	১৯০
৫.১.৫.৩.২	'ডিস্ট্রয়' লিথোচিত্রটির ভাষাগত দিক পর্যালোচনা (চিত্র. ৫.৩৯) -------------------	১৯১-১৯৪

ষষ্ঠ অধ্যায় ১৯৫-২৮৬

বাংলাদেশে অনুসৃত লিথোগ্রাফি চর্চার করণ-কৌশল ও নতুনত্ব

৬.১	**প্রিন্টের বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ --**	**১৯৫-১৯৭**
৬.২	**গ্রেইন করা থেকে প্রিন্ট নেয়া পর্যন্ত পদ্ধতি (স্টোন ও প্লেট) --------------**	**১৯৭-২১৭**
৬.২.১	স্টোন গ্রেইন করার পদ্ধতি --	১৯৭-২০০
৬.২.২	গ্রেইন শেষে এর সঠিক পরীক্ষণ পদ্ধতি --	২০০
৬.২.৩	প্লেট গ্রেইন করার পদ্ধতি --	২০১-২০২
৬.২.৪	স্টোন ও প্লেটে ইমেজ সৃষ্টি করার পদ্ধতি --	২০২-২০৭

৬.২.৫	প্লেটে ইমেজ তৈরির পর সংশোধন (erase) করার উপায় ---------------------------	২০৭
৬.২.৬	স্টোন ও প্লেট লিথোতে গাম করার পদ্ধতি --	২০৭
৬.২.৭	গাম সংরক্ষণ করার পদ্ধতি --	২০৮
৬.২.৮	এরাবিক গাম ব্যবহার করার প্রক্রিয়া --	২০৮-২০৯
৬.২.৯	স্টোন ও প্লেট লিথোতে বাংলাদেশে এচিং থেকে শুরু করে প্রিন্ট নেওয়া পর্যন্ত অনুসৃত ও পরিশীলিত পদ্ধতি--	২০৯-২১৭
৬.২.৯.১	স্টোন লিথোগ্রাফিতে এচিং থেকে শুরু করে প্রিন্ট বের করে নেওয়া পর্যন্ত নির্মাণ পদ্ধতি --	২০৯-২১৩
৬.২.৯.১	অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে— এচিং থেকে শুরু করে প্রিন্ট বের করে নেওয়া পর্যন্ত নির্মাণ পদ্ধতি	২১৪-২১৭
৬.৩	**স্টোন ও প্লেট লিথোতে ব্ল্যাক-রোলিং করার জন্য ইঙ্ক বা কালি তৈরি করার পদ্ধতি ---**	**২১৭-২২১**
৬.৩.১	স্টোনে ব্ল্যাক রোলিং করার ক্ষেত্রে ইঙ্ক তৈরির পদ্ধতি --------------------------------	২১৭-২১৮
৬.৩.২	অ্যালুমিনিয়াম প্লেটের প্রিন্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্ল্যাক-রোলিং করার জন্য ইঙ্ক তৈরির পদ্ধতি -	২১৮-২১৯
৬.৩.৩	স্টোন বা প্লেট-লিথোর প্রিন্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্ল্যাক-রোলিং করার জন্য ইমেজের পরিপ্রেক্ষিতে ইঙ্ক তৈরির পদ্ধতি ---	২১৯-২২১
৬.৪	**প্রিন্ট নেওয়ার জন্য পেপার সাইজিং করা বা সরাসরি প্রিন্ট নেওয়ার পদ্ধতি --**	**২২১-২২২**
৬.৫	**স্টোন লিথোগ্রাফির প্রিন্ট নেওয়ার পর স্টোনকে সংরক্ষণ করার পদ্ধতি -----**	**২২২**
৬.৫.১	স্টোন থেকে একদিন পর আবার প্রিন্ট নেওয়ার পদ্ধতি ------------------------------	২২২
৬.৫.২	স্টোন থেকে এক সপ্তাহ বা মাসখানেক পর প্রিন্ট নেওয়ার পদ্ধতি ---------------------	২২২
৬.৬	**অ্যালুমিনিয়াম প্লেট থেকে প্রিন্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে প্লেট সংরক্ষণ করার পদ্ধতি -**	**২২৪-২২৫**
৬.৬.১	**প্রথম পদ্ধতি: অজিৎ সিল (ভারতীয় শিল্পী) অনুসরিত পদ্ধতি -------------------------**	২২৪-২২৫
৬.৬.২	**দ্বিতীয় পদ্ধতি: এই অভিসন্দর্ভের লেখক অনুসরিত পদ্ধতি ---------------------------**	২২৫
৬.৭	**লিথোগ্রাফি স্টোনের বৈচিত্র্যময়তা বা স্টোন নির্বাচন ----------------------**	**২২৫-২২৮**
৬.৮	**স্টোনে এচিংয়ের রাসায়নিক বিক্রিয়া -------------------------------------**	**২২৮**
৬.৯	**মেটাল প্লেটের চরিত্র ও রসায়ন ---------------------------------------**	**২২৯-২৩২**
৬.১০	**বাংলাদেশ, ভারত ও জাপানে অনুসরিত অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে এচিং পদ্ধতি --**	**২৩৩-২৩৭**
৬.১১	**ইমেজ সংশোধন করার জন্য কাউন্টার এচিং (counter etching) পদ্ধতি**	**২৩৭-২৩৯**
৬.১১.১	**বাংলাদেশ ও ভারতে অনুসরিত কাউন্টার এচিং করার পদ্ধতিটি -----------------------**	২৩৮-২৩৯
৬.১২	**প্রিন্টকে সংরক্ষণ করে স্টোরে রাখা -------------------------------------**	**২৩৯-২৪০**

৬.১৩	**স্টোন বা প্লেট লিথোগ্রাফিতে ফ্লাট কালারের প্রিন্ট নেওয়ার পদ্ধতি ---------**	**২৪০-২৪৪**
৬.১৪	**বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চর্চাতে নতুনত্ব ---------------------------------**	**২৪৪-২৫৭**
৬.১৪.১	(ক) ২০০৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি প্রিন্ট নেওয়ার পদ্ধতি -----------------	২৪৫-২৪৭
৬.১৪.১	(খ) উড লিথোগ্রাফিতে— ইমেজ তৈরি থেকে প্রিন্ট নেওয়া পর্যন্ত পদ্ধতি -------------	২৪৭-২৫০
৬.১৪.৩	(গ) বলপয়েন্ট স্টোন লিথোগ্রাফি ---	২৫০-২৫২
৬.১৪.৪	(ঘ) প্লেট লিথোগ্রাফিতে নতুন ধরনের ফ্লাট ইমেজ সৃষ্টি ------------------------------	২৫২-২৫৩
৬.১৪.৫	(ঙ) প্লেট লিথোগ্রাফির সঙ্গে ওয়াটারলেস প্লেট লিথোগ্রাফির সংমিশ্রণ -----------------	২৫৩
৬.১৪.৬	(চ) অ্যালুমিনিয়াম প্লেট লিথোগ্রাফিতে ‘ইরেজ করে ইমেজ সৃষ্টি’ পদ্ধতিতে ইমেজ সৃষ্টি -	২৫৪-২৫৫
৬.১৪.৭	(ছ) ওয়াশ-আউট দ্রবণ (সলিউশন) সৃষ্টি ও এর ব্যবহার ----------------------------	২৫৫-২৫৬
৬.১৪.৮	(জ) স্টোন লিথোগ্রাফিতে ইন্টাগলিও মেথডের মাধ্যমে ইমেজ তৈরি করার পদ্ধতি ------	২৫৬-২৫৭
৬.১৫	**লিথোগ্রাফি মাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য মাধ্যম ও কৌশল -----------**	**২৫৮-২৬৮**
৬.১৫.১	(ক) ওয়াটারলেস অ্যালুগ্রাফি বা ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি ----------------------------	২৫৮-২৬০
৬.১৫.২	(খ)স্টোন লিথোগ্রাফিতে রিভার্স ও রি-রিভার্স পদ্ধতি --------------------------------	২৬০-২৬৪
৬.১৫.৩	(গ) স্টোন লিথোগ্রাফিতে রি-রিভার্স পদ্ধতি --	২৬৩-২৬৪
৬.১৫.৪	(ঘ) ফটো লিথোগ্রাফি --	২৬৪-২৬৮
৬.১৬	**লিথোগ্রাফি থেকে উদ্ভূত বিশেষ ধরনের মাধ্যম --------------------------**	**২৬৮-২৭৬**
৬.১৬.১	(ক) গাম প্রিন্ট --	২৬৮-২৭০
৬.১৬.২	(খ) ওয়াটার বেইজ অয়েলি মিডিয়াম --	২৭০-২৭৫
৬.১৬.৩	(গ) সায়ানোটাইপ (Cyanotype) --	২৭৫-২৭৬
৬.১৭	**লিথোগ্রাফির কিছু উপকরণ, করণ-কৌশল ও সমস্যা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা**	**২৭৬-২৮৬**

সপ্তম অধ্যায়

২৮৭-৩২৪

লিথোর বর্তমান অবস্থা, সম্ভাব্যতা ও নান্দনিকতার ছাপ নিয়ে আলোচনা

৭.১	**বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির নন্দনতাত্ত্বিক দিক -----------------------------**	**২৮৭-৩১৬**
৭.১.১	**ট্র্যাডিশনাল নন্দনতত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি ---------------**	**২৮৮-২৯১**
৭.১.১.১	বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিতে ইমিটেশন ও ফর্মের ভূমিকা: -----------------------------	২৮৮-২৮৯
৭.১.১.২	কবিতা, নাটক ও সংগীতের ক্ষেত্রে অনুকরণের (ইমিটেশনের) ভূমিকা এবং শিল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা খোঁজা --	২৯০-২৯১

৭.২	**আধুনিক নন্দনতত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি -------------------**	**২৯১-৩০৫**
৭.২.১	আধুনিক নন্দনতত্ত্বের গভীরে গিয়ে শিল্পী ও দার্শনিকদের চিন্তার ক্ষেত্রটি খুঁজে বের করার চেষ্টা ---	২৯৫-২৯৭
৭.২.১.১	আধুনিক দর্শনের ব্যাপকতা ও চারুশিল্পে আধুনিকতা --------------------------------	২৯৭-২৯৯
৭.২.১.২	শিল্পীদের চিন্তাগত প্রকৃতি ---	২৯৯-৩০৫
৭.৩	**বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিগুলোকে পোস্টমডার্ন শিল্প বা এর অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিতকরণ---**	**৩০৫-৩১৬**
৭.৪	**বাংলাদেশের শিল্পে সম্ভাবনামূলক দিকনির্দেশনা ---------------------------**	**৩১৭-৩২২**
৭.৪	**বাংলাদেশের বর্তমান লিথোগ্রাফির সঙ্গে টেমারিন্ড লিথোগ্রাফিগুলোর চর্চাগত দিক আলোচনা ---**	**৩২২-৩২৪**
	উপসংহার ---	**৩২৫-৩৩৯**
	গ্রন্থপঞ্জি --- -------	৩৪০-৩৪৭
	চিত্রসূচি ---	৩৪৮-৩৬২

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

১. প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ গবেষণা প্রেক্ষাপট

১৭৯৮ সালে জার্মানিতে লিথোগ্রাফির যাত্রা শুরু হয়। বাণিজ্যিকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লিথোগ্রাফি চর্চা আরম্ভ হলেও, চারুশিল্পের ক্ষেত্রে ইউরোপে প্রায় প্রথম থেকেই এ মাধ্যমটি ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ রোমান্টিসিজমের লিথোগ্রাফিগুলোর কথা ভাবা যেতে পারে। ভারতে বাণিজ্যিকভাবে লিথোগ্রাফি চর্চা শুরু হয়েছে ১৮২৪ সালে। সেখানে চারুশিল্পের ক্ষেত্রে ১৯১৭ সালকে এর চর্চার প্রারম্ভকাল ধরা হয়। বাংলাদেশে ১৮৭০ সালে লিথোগ্রাফি মেশিন এলেও প্রথম বাণিজ্যিক লিথোগ্রাফি চর্চার নিদর্শন পাওয়া যায় ১৮৭৮ সালে। আর চারুশিল্পের ক্ষেত্রে ‘গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ আর্টস’ (বর্তমান চারুকলা অনুষদ) সেগুনবাগিচায় স্থানান্তরের পর প্রিন্টমেকিং বিভাগে এর চর্চা শুরু। অর্থাৎ ইউরোপে যেমন প্রথম থেকেই চারুশিল্পে এর চর্চা চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়, ভারতে কিন্তু আবির্ভাবের ৯৩ বছর (১৮২৮–১৯১৭) পর এবং বাংলাদেশে প্রায় ৮২ বছর (১৮৭০–১৯৫২) পর এর যাত্রা শুরু বলা চলে।

Plate: 1.1, বাণিজ্যিক লিথোগ্রাফি, Prang Co. Boston, chromo litho, Sea Lion, 1885, 5x8 inch.

Plate: 1.2, চারুশিল্পে লিথোগ্রাফি, Theodore Gericault, 'Mameluke defending a wounded trumpeter', chalk lithograph, 1818.

ইউরোপে লিথোগ্রাফি মাধ্যমে প্রথম যখন প্রিন্ট নেওয়া হয়েছিল সেটি খুব ভালো মানসম্পন্ন ছিল না। ১৮০৪ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত নেপলিয়নের রাজত্বকালে লিথোগ্রাফির সাদা-কালো ভালো প্রিন্ট নেওয়া সম্ভবপর হয়েছে। এরই মধ্যে ১৮১০ সালে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আবিষ্কারক আলইস সেনেফেলডার লিথোগ্রাফির করণ-কৌশলগত বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেন। এর পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে এর চর্চা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের রাসায়নিক কেমিক্যালের গুণগত তারতম্যের কারণে সেখানে করণ-কৌশলগত নানা পরিশীলন ঘটেছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। 'বংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চা, বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা' বিষয়টিকে দুটি দিক থেকে দেখা যেতে পারে, এক. করণ-কৌশলগত দিক, দুই. ভাষাগত দিক। এখানেও পূর্বোল্লিখিত দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লিথোগ্রাফি চর্চা হয়েছে। একটি হলো বাণিজ্যিক কারণ, যা আশির দশকের শেষ দিকে (১৯৮৯–৯০ সালের দিকে) পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীটি হলো চারুশিল্পের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার। এই চারুশিল্পে এর চর্চা করতে গিয়ে আরো একটি বিষয় অনুভূত হয়েছে যে, মাধ্যম ও ভাষা একই বিষয়। সে বিষয়টিও এই গবেষণার আরেকটি আলোচ্য বিষয়।

এত বছর পর এই গবেষণাটি করার প্রয়োজনীতা বোধ করা হয়েছে শুধু বাণিজ্যিক ও চারুশিল্পের লিথোগ্রাফিকে নথিভুক্ত করার জন্য নয় বরং অতীত পর্যালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে লিথোগ্রাফিকে (ক্রমোলিথোগ্রাফির এক্সপেনসিভ ও চিপ মেথডে তৈরি লিথোগ্রাফি) নিরীক্ষণ করে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করাও এর আরেকটি উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের শিল্পীদের সেখান থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে। করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত এই উভয় দিক থেকে পুনরায় পর্যালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ বাণিজ্যিক ক্রমোলিথোগ্রাফির এক্সপেনসিভ ও চিপ মেথডে তৈরি লিথোগ্রাফির এই দুটি পদ্ধতি আবার চারুশিল্পের প্রয়োজনে করা লিথোগ্রাফি অনুশীলনেও অর্থবহ ভূমিকা রেখেছে। চরিত্রগত অভিব্যক্তিতে বা ভঙ্গিতে ভিন্নতা থাকলেও এদেরকে প্রায়ই আলাদা করে ব্যাখ্যা করা কঠিন। বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চর্চার গতিপথে অলংকরণের জন্য করা লিথোগ্রাফির ছায়া সামান্য পড়লেও ওলিওগ্রাফির প্রভাব পড়েনি বললেই চলে। বাংলাদেশের চারুশিল্পে লিথোগ্রাফি চর্চার মূল কেন্দ্র বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৩ সালে শুরু) এবং চট্টগ্রাম আর্ট কলেজেও (১৯৯৬ সাল থেকে) সীমিত আকারে এর চর্চা হয়েছে। বর্তমান সময়ে এসেও সেখানে

লিথোগ্রাফি বিষয়ে ঢাকার মতো স্পেশালাইজেশন কোর্স চালু করা সম্ভপর হয়ে ওঠেনি। লিথোগ্রাফি সংগ্রহেরও কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

সমস্যা সমাধানমূলক এই গবেষণাপত্রে যে সমস্যাটিকে কেন্দ্র করে মূল আলোচনা তা হলো— বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চা যেভাবে হওয়া দরকার, সেভাবে হচ্ছে না। তার সমাধানকল্পে দুটি দিক— একটি হলো এর কারিগরি সীমাবদ্ধতাগুলোকে চিহ্নিত করে এর সমাধান বের করার চেষ্টা করা। অপরটি হলো— এই সময়ে বিশ্ব শিল্পকলার চর্চাঙ্গনে মাধ্যমটির ব্যবহার উপযোগিতা খুঁজে বের করে ভাষা হিসেবে এর কার্যকরী ভূমিকা ও যৌক্তিকতা প্রমাণ করা। নানারূপ সীমাবদ্ধতাকে মাথায় রেখে ব্যক্তিগত ও ঢাকা চারুকলার সংগৃহীত লিথোগ্রাফিগুলোর ওপর নির্ভর করে সামগ্রিক গবেষণার অধ্যায়গুলোতে এর ‘করণ-কৌশলগত পরিবর্তন’ ও ‘ভাষা হিসেবে এর গ্রহণযোগ্যতা’র বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। গবেষণাটি করতে গিয়ে করণ-কৌশলগত কিছু পরিবর্তন ও লিথোগ্রাফি থেকে নতুন মাধ্যমের উদ্ভবও চিহ্নিত করা হয়েছে।

এ দেশের প্রবীন শিল্পীরা কেউ কেউ কলকাতা আর্ট কলেজ থেকে লিথোগ্রাফি শিক্ষার হাতেখড়ি পেয়েছিলেন। দেশভাগের পর তাদের সঙ্গে তৎবর্তমান নবীন প্রজন্মের শিল্পীরা এই ঢাকাস্থ প্রতিষ্ঠানেই (প্রথমে সেগুনবাগিচা এবং পরে শাহবাগস্থ প্রতিষ্ঠানে) সীমিত আকারে লিথোগ্রাফি চর্চা করেছেন। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে কাজ পাঠানোর উদ্দেশ্যে যখন তাদেরই কেউ প্রিন্ট করেছেন, তখন তার দেখাদেখি অন্যরাও দু-একটি লিথোগ্রাফি চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। এই সব চিত্রের মধ্যে শুরু থেকে এই পর্যন্ত প্রবীণদের কাজে পাওয়া যাচ্ছে শৈলীগত পরিপক্বতার ছাপ। আর নবীনদের কাজে রয়েছে নিরীক্ষণের প্রবল আগ্রহ ও শৈলীগত অনুসন্ধিৎসুসুলভ মনোনিবেশ। ফলে সৃষ্টি হয়েছে নতুন মাধ্যম ও কলাকৌশল। বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির বর্তমান অবস্থাটি বোঝার জন্য বিশ্ব শিল্পকলায় এর করণ-কৌশল ও ভাষাগত বিবর্তনের ইতিহাসটির সঙ্গে তুলনা করে দেখলে এ দেশের লিথোগ্রাফি চর্চার বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে ধারণা পাওয়া যাবে। সেইসঙ্গে ট্যামারিন্ড ইনস্টিটিউট অফ লিথোগ্রাফির চর্চার সঙ্গে তুলনা করে দেখা প্রয়োজন। কারণ বিশ্বের অন্যতম এই প্রতিষ্ঠানটি লিথোগ্রাফি চর্চাতে যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে, বাংলাদেশের ভূমিকা সেখানে প্রশ্নের সম্মুখীন। এ সময়ে এসে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করার প্রয়োজন বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়েছে—

Plate: 1.3, Honore Daumier, Litho-Rue Transnonain, April 15, 1834, L' association Mensuelle, 1834.

Plate: 1.4, Ernst Ludwig Kirchner, Lithograph, Women Wearing a Hat with Feathers, litho, 17x15 inch, 1910.

এক. বিশ্বশিল্পের ইতিহাসে লিথোগ্রাফি ইজমগুলোর চাহিদা মেটাবার জন্য কয়েকটি ইজম, যেমন: রিয়েলিজম বা এক্সপ্রেশনিজম ছাড়া অন্য কোনো ইজমে খুব একটা মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। কনস্ট্রাকটিভিজমের পর থেকে শিল্পীরা পেইন্টিং, ভাস্কর্য ইত্যাদি সকল মাধ্যমের সমন্বয়ে জীবনের সত্যিকার গতিকে প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন। তখন পেইন্টিংকে একটি 'ইল্যুশন' বা 'মিথ্যা' বলে অবহিত করা হলো তার স্ট্যাটিক মোশন বা স্থির গতির কারণে।[১] বলা হচ্ছিল পেইন্টিং মৃত। আসলেই কি পেইন্টিং মৃত? উত্তর হলো— না। কাইনেটিক শিল্পের মাধ্যমে স্থির গতি ও কাইনেটিক গতির সমন্বয়ে যে সত্যিকার গতিকে প্রকাশের কথা বলা হয়েছে— বাস্তবতার আবিষ্কারে সেটাই তো সব নয়। আর পেইন্টিংও মৃত হয়ে যায়নি। গতির ক্ষেত্রে কাইনেটিক আর্টের মতো লিথোগ্রাফির ভূমিকার প্রশ্নে অধ্যাপক নিসার হোসেন বলেন: প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবজেক্ট নিয়ে শিল্পীরা কাজ করেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে সম্ভাবনাকে খুঁজেছেন। যেমন: দাদাইস্টদের ক্যানগুলোর কথা বলা যেতে পারে। ফেলে দেওয়া ক্যানগুলো ব্যবহার করে যে ভাষা তারা সৃষ্টি করেছেন, সেই সম্ভাবনাটিকেই খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। সে সময় সম্ভাবনাটিকে তারা এভাবে দেখেছেন যে— আর কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, কীভাবে চমক দেখানো যেতে পারে। চমক দেখানো তো শিল্পের একটা বিরাট ব্যাপার। শিল্পীরা এসে সেটিকে নাড়িয়ে দিলেন এবং চমক দেখালেন। কাইনেটিক আর্টের জায়গাটিও কিন্তু ওরকমই ছিল। যেমন: ফিউচারিস্টরাও কিন্তু মোশন নিয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু সেটা ছিল স্ট্যাটিক মোশন। মার্সেল দুসঁপ নির্মিত হুইলের ফর্মটি নিজে একটি স্ট্যাটিক ফর্ম, যদিও সেটিকে ঘোরালে ঘোরে। তত্ত্বগত জায়গায়

[1] Nicos Stangos, *Concepts of modern art,* Kinetic art, New York, 3d edition, 2001, P. 214

ঠিক সেটি আছে; কিন্তু মূল ফর্মটি কিন্তু স্ট্যাটিক। ফলে এ সময়টিতে এসে শিল্পীরা এই স্ট্যাটিক ফর্মের সঙ্গে কাইনেটিক ফর্মের একটা সমন্বয়ের মাধ্যমে পুরাতন জায়গাটিতে একটু নাড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু কাইনেটিক আর্ট তো শিল্পের একটা বিশেষ ধরন মাত্র। এই নয় যে এটা সর্বজনীন (ইউনিভার্সেল)। আর এটা যে শিল্পীদের খুব একটা আলোড়িত করেছিল, তা নয়। এর যেমন সম্ভাবনা আছে, তেমনি সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। যেমন শিল্পী আলেকজান্ডার ক্যাল্ডারের সেই ভাস্কর্যের জন্য রুমের ভেতর বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এটাই একটি সীমাবদ্ধতা। ইতিহাসে এটি একটি আন্দোলন (মুভমেন্ট) মাত্র। আন্দোলন হিসেবে এর যতটা গুরুত্ব, শিল্পীদের মধ্যে মনে হয় না ততটা নাড়া দিতে পেরেছে, তিনি খুব একটা দেখেননি।[২] এই আলোচনার আলোকে প্রিন্টমেকিংয়ের লিথোগ্রাফি মাধ্যমের অবস্থানও তাই। প্রিন্টমেকিংয়ের যেকোনো একটি মাধ্যম নিয়ে সারা জীবন কাজ করে কেউ বলতে পারেননি যে, সেই মাধ্যমে আর কিছু করার নেই। তাই লিথোগ্রাফিতেও যদি সারা জীবন কাজ করে শেষ করা না যায়, তাহলে এর মধ্য দিয়েই বাস্তবতার আবিষ্কার করতে গিয়ে তার নিজস্ব ভাষা সৃষ্টির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে শিল্পীর শতভাগ আত্মনিয়োগের বিষয়টি।

দুই. ট্যামারিন্ড ইনস্টিটিউট অফ লিথোগ্রাফিতে শিল্পীরা যেভাবে এর চর্চা অব্যাহত রেখেছেন তার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে বাংলাদেশের শিল্পীরাও দৃশ্যগতভাবে অনেকটাই বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়েই এগিয়ে যাচ্ছেন। ট্যামারিন্ড ইনস্টিটিউটের মতো কারিগরি ও করণ-কৌশলগত সুবিধা হয়তো এখানে পাওয়া যাবে না, কিন্তু ওয়ার্কশপ করে প্রতিদিন চর্চা অব্যাহত রাখতে পারলে বাংলাদেশের শিল্পীদের লিথোগ্রাফির একটি ভিন্ন চরিত্র উদ্ভাসিত করা সম্ভব। যেমনঃ ধরা যাক, নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় এ দেশের শিল্পীদের নাড়ির সঙ্গে একটি সম্পর্ক তাদের অঙ্কিত জলরঙে দৃশ্যমান। যেমনঃ ভারতীয় শিল্পী চিন্তামণি কর একবার সৈয়দ আবুল বারক্ আলভীকে বলেছিলেন, ‘তোমাদের ওখান থেকে ভারতে পড়তে আসা মোটামুটি সব ছাত্রেরই জলরঙের হাত খুব ভালো।’ অর্থাৎ জলরঙে কমবেশি কাজ করেননি এমন বাংলাদেশি শিল্পী বোধ হয় খুঁজে বের করা কঠিন হবে। এখানে তেমনই একটি সুপ্ত চরিত্র লিথোগ্রাফি মাধ্যম থেকে বের হয়ে আসার কথা বলা হচ্ছে। লিথোগ্রাফির চরিত্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে শুধু তুষ ওয়াশসম্পন্ন চিত্রগুলোই সকল শিল্পীর মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যেটা কন্টি বা গ্লাস মার্কারে অঙ্কিত লিথোগ্রাফি পারেনি। এর মূল কারণ খুঁজলে দেখতে পাওয়া যাবে, জলরং চর্চার সুপ্ত

---

[2] নিসার হোসেন, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ১৮ জুন, ২০১৬

বোধের কারণেই তারা তুষের ওয়াশকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন। আর লিথোগ্রাফিতে যেহেতু ট্রান্সপারেন্ট (স্বচ্ছ) ও ট্রান্সলুসেন্ট (অস্বচ্ছ) এ দুটি উপায়েই কাজ করা সম্ভব, তাই প্রিন্টের অন্য মাধ্যমগুলোর চেয়ে শিল্পী তার সরাসরি অভিব্যক্তি দিতে পারেন। সেইসঙ্গে অন্য আরো অধিকতর কিছু পাওয়া সম্ভব।

তিন. বাংলাদেশে চর্চিত লিথোগ্রাফির করণ-কৌশলগত নিত্যনতুন পরিবর্তন এর চর্চার পথকে তরান্বিত করতে পারবে বলে লিখিত আকারে সেগুলো লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। তবেই পরবর্তী অনুশীলকরা অনেক সহজেই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারবে।

চার. নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশে সৃষ্ট এই লিথোগ্রাফিগুলোর শিল্পগুণ বিষয়ে ধারণা তৈরি করা। এই তিনটি বিষয় নিয়ে কাজ করতে গিয়ে কতগুলো প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে কয়েকটি উদ্দেশ্যে কাজ করতে হয়েছে। সে বিষয়গুলো নিয়ে এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

১.২ গবেষণা প্রেরণা পর্ব

লিথোগ্রাফির টেকনিক আসলে একটাই, তাহলো গামিং করা, এচিং করা এবং প্রিন্টিং প্রসেসের ওয়াশ আউট করে প্রিন্ট নেওয়া। সমস্ত দেশেই একই পদ্ধতি বিদ্যমান। পশ্চিমা দেশে এর উদ্ভব বলে একে পশ্চিমা লিথোগ্রাফি পদ্ধতি বলা যায়। তবে পরিশীলনের তারতম্যের কারণে বিভিন্ন দেশে এর মধ্যবর্তী প্রক্রিয়াগুলো সে দেশের আবহাওয়া ও রাসায়নিক উপাদানের ভিন্নতার ভিত্তিতে একটু পরিবর্তন হয়েছে। ফলে তাদের উপকরণ ও আবহাওয়া অনুযায়ী আরেক ধরনের চর্চা পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। করণ-কৌশলগত দিক দিয়ে বাংলাদেশের চারুশিল্পে লিথোগ্রাফির যাত্রা শুরু হয় শিল্পগুরু সফিউদ্দীনের হাত ধরেই। সফিউদ্দীন আহমেদ কলকাতা আর্ট কলেজের লিথোগ্রাফি বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন বিধায় এখানে অনুসরিত পরিশীলিত পশ্চিমা লিথোগ্রাফি চর্চাই অনুসরিত হয়। পরে ১৯৬২ সালে মোহাম্মদ কিবরিয়া জাপান থেকে উচ্চতর পর্যায়ে লিথোগ্রাফি বিষয়ে গবেষণা করে দেশে ফেরেন এবং তার সঙ্গে বিভাগে এর চর্চার পথ তরান্বিত করার জন্য হাত বাড়ান। মোহাম্মদ কিবরিয়ার সময় থেকে বাংলাদেশেও বিশ্বের অন্য দেশগুলোর মতো অলিখিতভাবে নিরীক্ষার যাত্রা শুরু হয় নিজস্ব শিল্প উপকরণ ও করণ-কৌশল তৈরি করার প্রস্তুতি হিসেবে।

১.২.১ করণ-কৌশলগত দিক

১.২.১.১ গ্লাস মার্কার ব্যবহারে করণ-কৌশলগত দিক

আশির দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত 'কন্টি'র (ক্রেয়ন) ব্যবহার বাংলাদেশের চারুশিল্পের লিথোগ্রাফি চিত্রগুলোতে বিদ্যমান ছিল। কন্টির বদলে গ্লাস মার্কার ব্যবহারের চর্চা শুরু হয় কিবরিয়ার সময় থেকে। এই আশির দশক থেকে গ্লাস মার্কার ধীরে ধীরে লিথোগ্রাফি চর্চাতে অঙ্কন উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা আরম্ভ হয়েছে। বর্তমানে লিথোগ্রাফির কন্টি নামক উপকরণের বদলে এসেছে নানা ধরনের গ্লাস মার্কার পেনসিল। এ সময়ের শিক্ষার্থীরা 'কন্টি'-র নাম শুনলে অবাক হয়ে বলে, এটা আবার কী? মূলত লিথোগ্রাফির মূল উপাদান ছিল 'কন্টি'। কন্টি ও গ্লাস মার্কারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যারা এটি ব্যবহার করেছেন, তারা এ দুটির অভিব্যক্তিক চরিত্র আলাদা করতে পারেন সহজেই। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে কন্টি বিদেশ থেকে আসে না, বিধায়ই ১৯৮৩ সালের দিক থেকেই বিকল্প হিসেবে গ্লাস মার্কারের ব্যবহার এ দেশে চালু হয়। তবে এর পূর্বেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লিথোগ্রাফি চর্চায় এটির ব্যবহার অনুপ্রবেশ করেছে। তবে এর চরিত্রও দাঁড়িয়েছে ভিন্নরূপ ও বিকল্প। এ ধরনের উপকরণ ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে আমদানিগত সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে। গ্লাসের ওপর লেখা থেকে আরম্ভ করে গার্মেন্টের কাপড়ের ওপর লেখার জন্য এই গ্লাস মার্কার জার্মানি, চীন, কোরিয়া ইত্যাদি দেশ থেকে আমদানি হচ্ছে। প্রথম যখন বাংলাদেশে লিথোগ্রাফিতে কন্টির বদলে গ্লাস মার্কার ব্যবহার আরম্ভ হলো, তখন সফিউদ্দীন আহমেদের এতে ঘোর আপত্তি ছিল। কারণ কন্টির মতো নরম, শক্ত ও মধ্যম ধরনের গ্লাস মার্কার আমদানি হতো না। কন্টি যখন দেশের বাইরে থেকে আসা বন্ধ হয়ে গেল, তখন তিনি এটির ব্যবহার মেনে নিলেন। ধীরে ধীরে নানা কাজে এই গ্লাস মার্কারগুলো আমদানি হওয়া আরম্ভ হলে নরম, মধ্যম ও শক্ত ধরনের গ্লাস মার্কার সহজলভ্য হওয়ায় এর গুণগত দিক বিচার করে কন্টির বিকল্প হিসেবে মেনে নিতে তার আর কোনোই আপত্তি থাকল না। তবে এটি সবসময় মনে রাখতে হবে, কন্টি আর গ্লাস মার্কারের অঙ্কিত ফলাফলের ভিন্নতা রয়েছে। এত সব ভিন্ন ধরনের গ্লাস মার্কার জাপানেও একসঙ্গে পাওয়া যায় না। ভারতেও এই গ্লাস মার্কার পাওয়া যায় না। সেখানে একধরনের মোমের পেনসিল পাওয়া যায়। তাই দিয়ে ভারতীয় শিল্পীরা লিথোগ্রাফি চিত্র অঙ্কন করেন। সঙ্গে রয়েছে মাধ্যমের আরো অন্যান্য উপকরণ। ফলে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিতে গ্লাস মার্কারের চরিত্র বিশ্বের যেকোনো দেশ থেকে ভিন্ন হওয়ার কথা। বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির সম্ভাবনা ও ফলাফল বিশ্বের অন্য দেশগুলোর তুলনায় ভিন্নরূপ

দাঁড়াবেই। কাজের চিত্রের কনসেপ্ট যদি বাদও দেওয়া হয়, শুধু বিভিন্ন ধরনের গ্লাস মার্কার ব্যবহারের কারণেই এ দেশের লিথোচিত্রের বৈশিষ্ট্য দাঁড়িয়েছে ভিন্নরূপ। তা কেউ খেয়াল করুক আর নাই করুক।

১.২.১.২ তুষ (বিশেষ ধরনের তেল বা চর্বি জাতীয় ইঙ্ক) ব্যবহারে করণ-কৌশলগত দিক

এবার আসা যাক লিথোগ্রাফিতে তুষের ব্যবহার প্রসঙ্গে। লিথোগ্রাফির বইগুলোতে লেখা আছে তুষ পানির সঙ্গে গুলিয়ে স্টোন বা প্লেটে ওয়াশ দিতে হয়। কিন্তু কীভাবে ওয়াশ দিতে হয় সেটা লিখিত আকারে নেই। প্রত্যেক দেশের শিল্পীরা ব্যক্তিগতভাবে তার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে নিজস্ব করণ-কৌশল আবিষ্কার করে নেন, যেটি কোনো বইয়ে লেখা নেই। প্রত্যেকেরই কাজে চরিত্রগত কিছু মিল থাকলেও প্রত্যেকেরই রয়েছে আলাদা রূপবৈশিষ্ট্য ও করণ-কৌশলগত প্রয়োগ পদ্ধতির ভিন্নতা। বর্তমান গবেষক তার নিজস্ব পদ্ধতিটি এই গবেষণায় লিপিবদ্ধ করে এর চরিত্র ও সাবধানতার কথাগুলো লিখিত আকারে বিস্তারিত পরবর্তী সময়ে লেখার প্রয়াস পেয়েছেন। সেইসঙ্গে পূর্ব থেকেই এ দেশের শিল্পীদের মধ্যে মোহাম্মদ কিবরিয়া লিথোগ্রাফিতে তুষ ব্যবহারে দক্ষ ছিলেন। দেশে ফিরে তিনি লিথোগ্রাফি এবং এচিং মাধ্যমে তুষ নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষ শুরু করেন। তার চরিত্রও দাঁড়িয়েছে ভিন্নরূপ। ফলে ভবিষ্যতে তুষ দিয়ে অঙ্কিত বাংলাদেশ ও অন্য দেশগুলোর লিথোগ্রাফি চিত্রগুলো একসঙ্গে প্রদর্শিত হলে, এই গবেষণায় উপস্থাপিত তুষের ব্যবহার, প্রয়োগ পদ্ধতি ও এর অভিব্যক্তির ভিন্নতা বিষয়টির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া অবশ্যই সম্ভব।

১.২.১.৩ তৈরি ইঙ্ক ব্যবহারে করণ-কৌশলগত দিক

লিথোগ্রাফি প্রিন্টিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ইঙ্ক প্রসঙ্গে বলা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ লিথোগ্রাফির জন্য ভিন্ন রকমের ইঙ্ক প্রস্তুত করে ব্যবহার করেন। যেমন: সেনেফেলডার কম্পানির লিথোগ্রাফিক ইঙ্ক, চার্বোনেল কম্পানির লিথোগ্রাফিক ইঙ্ক ইত্যাদি। সেগুলোর মধ্যে আবার রয়েছে শক্ত, মাঝারি ও নরম ধরনের ইঙ্ক। ভারতে এই ইঙ্কের বিকল্প অনুসারে তাদের দেশে প্রাপ্ত প্রেস ইঙ্কগুলোকে 'জবিং ইঙ্ক' নামক একধরনের ইঙ্ক হিসেবে তৈরি করে ব্যবহার করছে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রাপ্ত হুগলি ইঙ্কের সঙ্গে সফিউদ্দীন আহমেদ কারখানা থেকে উৎপন্ন চিমনির কালি (ভুসা কালি) মিশিয়ে একধরনের এচিং কালি তৈরি করেন। তার কথামতো লিথোগ্রফিতেও এই হুগলি ইঙ্ক ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া গেছে। তিনি শ্রেণিকক্ষে দেশীয় উপকরণ ব্যবহার করে প্রিন্ট করার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। বলতেন, বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি প্রিন্টের জন্য হুগলি কম্পানির ইঙ্ক সবচেয়ে ভালো। পরবর্তী সময়ে এই কম্পানির তৈরি ইঙ্কে বেশি তেল থাকায়

প্রিন্ট জড়িয়ে যাচ্ছিল এবং কাগজের উল্টো দিক ও পার্শ্বদিক লালচে হয়ে যাচ্ছিল। ২০০৪ সালের পর থেকে গবেষক (শেখ মেহাম্মদ রোকনুজ্জামান) এর সঙ্গে ট্যালকম পাউডার বা ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট মিশিয়ে স্টোন লিথোগ্রাফিতে ভালো ফল পেয়েছেন। বাজারে প্রাপ্ত টোকা কম্পানির ইঙ্কটি পাতলা ও আঠালো হওয়ায় স্টোন লিথোগ্রাফিতে ইমেজ জড়িয়ে যায় বলে 'টোকা' ইঙ্কের বদলে এখানে বর্তমান পর্যন্ত 'হুগলি' ইঙ্ক ব্যবহারেই উৎসাহ প্রদান করা হয়। ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেখানে লিথোগ্রাফিক ইঙ্ক তৈরির জন্য ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট ব্যবহৃত হয়, বাংলাদেশে সেখানে ইমেজ অনুসারে লিথোগ্রাফিতে ২০০৪ সালের পর থেকে পরিমাণমতো ট্যালকম পাউডার (গায়ে ব্যবহার) ব্যবহার করে এর অনুশীলন অব্যাহত রাখা হয়েছে। মোহাম্মদ কিবরিয়াকে দেখা যেত পুরনো ইঙ্কগুলো একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে (ডেবারিং) কালো রং বানাতেন। কারণ সব রং একসঙ্গে মেশালে কালারের তত্ত্ব অনুযায়ী কালো রং উৎপন্ন হবে। আবার অ্যালুমিনিয়াম প্লেট লিথোগ্রাফিতে প্রথম দিকে এই ট্যালকম পাউডার ব্যবহার করা হলেও ধীরে ধীরে পরিশীলনের মাধ্যমে এমন সিদ্ধান্তেও আসা গেছে যে, বর্তমানে প্লেট লিথোগ্রাফিতে এর ব্যবহারের পরিমাণ দরকার নেই বললেও চলে। এমনকি ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেটেরও প্রয়োজন নেই। তাই বর্তমান প্লেট লিথোগ্রাফি চালুর পরবর্তী সময়ের বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই সাধারণভাবে জানেন না যে, এ দুটি কেমিক্যাল কী কাজে ব্যবহার্য। তবে প্লেট লিথোগ্রাফি চর্চাতে বাংলাদেশের বাজারে প্রাপ্ত প্রেসের টোকা ইঙ্কটি তেমন কোনো সমস্যা সৃষ্টি করছে না।

১.২.১.৪ ওয়াশ আউট করার জন্য লিথোটিনের বদলে বিকল্প সলিউশন ব্যবহার

ইউরোপে লিথোগ্রাফির ওয়াশ আউট করার জন্য লিথোটিন ব্যবহৃত হচ্ছে। তার বিকল্প হিসেবে তারপিনটাইন ব্যবহার করা যায়। ২০০৪ সালের পর থেকে দেখা গেল, বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চর্চায় তারপিনটাইন ব্যবহারে ইমেজ জড়িয়ে যাচ্ছে। কারণ বাজারের তারপিনটাইনে কেরোসিন বা অন্য তৈলাক্ত বস্তু বেশি পরিমাণে মেশানোই ছিল এর মূল কারণ। তখন কয়েক ধরনের উপকরণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেল, বার্জার কম্পানির 'থিনার টি-৬' ওয়াশ আউট দ্রবণ হিসেবে ভালো কাজ করছে। তখন থেকে স্টোন লিথোগ্রাফি ও প্লেট লিথোগ্রাফিতে বার্জার থিনারই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের চারুশিল্প চর্চায় প্রথম প্রজন্মের বা মূলধারার শিল্পীদের কাজে পরিপক্ব শিল্পশৈলীর ছাপ থাকলেও করণ-কৌশলগত সীমাবদ্ধতা ছিল। নবীনদের কাজে রয়েছে শিল্পশৈলী সৃষ্টি ও করণ-কৌশলগত নিরীক্ষণের প্রবল আগ্রহ। যেমন: ঢাকা চারুকলায় **১৯৫২–১৯৬০** সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত লিথোগ্রাফিগুলো মূলত

ক্রোকিল নিভ ও ক্রেয়ন মাধ্যমে করা। এরপর বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ লিথোগ্রাফি চর্চায় নানা ধরনের গ্লাস মার্কার ব্যবহারের উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, যা জাপানেও দেখা যায় না। জাপান ও ভারতে যেখানে তারপিনটাইন ব্যবহার করা হচ্ছে, বাংলাদেশে সেখানে ২০০৪ সাল পর্যন্ত তারপিনটাইন দিয়ে এবং এর পর থেকে লিথোগ্রাফিতে 'বার্জার থিনার টি-৬' দিয়ে ওয়াশ আউট করে প্রিন্ট নেওয়া হচ্ছে। ওয়াশ আউট সলিউশন তৈরিতেও এটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

১.২.২ ভাষাগত ব্যাপ্তিতার দিক

'শিল্প' একটি সার্বিক ভাষা হলেও এর অনেকগুলো শাখা আছে। যেমনঃ সাহিত্য, দৃশ্যশিল্প, সাউন্ড, নাটক, সিনেমা ইত্যাদি। দৃশ্যশিল্পে প্রিন্টমেকিং বিভাগের চারটি প্রধান মাধ্যম হলো রিলিফ প্রসেস, ইন্টাগলিয়ো প্রসেস, প্লেনোগ্রাফিক প্রসেস ও স্টেনসিল প্রসেস। লিথোগ্রাফি হচ্ছে প্লেনোগ্রফিক পদ্ধতির বেশ কয়েকটির মধ্যে একটি। এই প্লেনোগ্রাফিক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত আরো কয়েকটি মাধ্যমের নামের সঙ্গে 'লিথোগ্রাফি' শব্দটি যোগ হয়ে পরিচিতি লাভ করেছে। যেমনঃ প্লেট লিথো, উড লিথো, কিচেন লিথো বা গ্লাস লিথো ইত্যাদি। লিথো মানে হচ্ছে স্টোন। আর এই গ্লাস বা প্লেটের সঙ্গে স্টোনের কোনো সম্পর্ক নেই। তবু সাধারণ মানুষ ও শিল্পীরা এটিকে গ্রহণ করছেন। শিল্পী বা সাধারণ মানুষের কাছে 'লিথোগ্রাফি'র মূল নাম 'কেমিক্যাল প্রিন্টিং' গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। তার মূল কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে— সাধারণ মানুষ এত ভিন্ন ভিন্ন নামে শিল্পকলা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী নয়। তাই এই গবেষণায় একদিকে যেমন বিষয়ের গভীরে যাওয়ার জন্য আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার প্রয়োজনে ও আলোচনার সুবিধার্থে এ সমস্ত মাধ্যমকে লিথোগ্রাফির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্লেট লিথোগ্রাফি ও এর উন্নতির ধারাবাহিকতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রিন্টমেকিংসহ অন্যান্য ছবি আকার মাধ্যমকে বর্তমানে কেউ কেউ মাধ্যম হিসেবে দেখেন, কেউ আবার গভীরতায় গিয়ে ভাষা হিসেবে দেখেন। এই শিল্পভাষা বা মাধ্যমগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম মাধ্যম হলো প্লেনোগ্রাফিক প্রসেস, যার আবার রয়েছে অনেকগুলো শাখা-প্রশাখা। চিরকালই ভাষা ব্যাকরণকে অনুসরণ করেনি, ব্যাকরণই ভাষাকে অনুসরণ করে এসেছে। সে জন্য ভাষার স্বতঃস্ফূর্ততার প্রয়োজনেই এই শিল্পমাধ্যমগুলো তার শাখা-প্রশাখা সমুদ্র থেকে নদী, নদী থেকে খাল-বিলের মতোই ছড়িয়ে নিয়েছে মনের অভিব্যক্তি প্রকাশের অলিখিত অঙ্গীকারবদ্ধতার অপরিহার্যতা থেকে। প্লেনোগ্রাফি মাধ্যম নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা তাদের প্রয়োজন অনুসারে নানা ছোটখাটো করণ-কৌশল আবিষ্কার করেছেন। এই

শিল্পভাষা বা মাধ্যম বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনেও পরিচিতি লাভ করেছে পঞ্চাশের দশক থেকে। তৈলচিত্র মাধ্যম বা অন্যান্য মাধ্যমের মতো এ দেশের শিল্পকলায় লিথোগ্রাফির চর্চা অব্যাহত থাকা প্রয়োজন। এখানেও কিছু পরিশীলনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে চর্চা হয়ে থাকে। তাই লিথোগ্রাফিকে ভাষা হিসেবে চিন্তা করার আরো কয়েকটি যৌক্তিকতা হলো—

Plate: 1.5, Louis Prang co., chromolitho, Paradise Flycatchers, 1885, 5x8 inch.

Plate: 1.6, Whisler, litho, The Thames at Battersea, 1878, 6.75x10.75 inch

Plate: 1.7 Henri de Toulouse Lautrec, Lithography,

Plate: 1.8 Rauschenberg, Lithography,

(ক) একটি সময় লিথোগ্রাফি ব্যবহারিক ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো। এরপর ১৮০০ সালের পর পেইন্টাররাও এটিকে 'খারাপ শিল্প' বলে উল্লেখ করেন। কারণ একজন সত্যিকার শিল্পীর পক্ষে এত সব জটিল প্রক্রিয়া আয়ত্ত করে শিল্প রচনা করা সম্ভব নয়। তার পরও লুইস প্রাং এর চর্চা করে গেছেন। ১৮৪০ সালের পর ফটোগ্রাফি আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে— শুধু লিথোগ্রাফি কেন, 'ছবি' আর অঙ্কন করারই প্রয়োজন নেই, সমাজে শিল্পীর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তখনো শিল্পীরা কঠোর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ফটোক্রোম লিথোগ্রাফির মাধ্যমে সমাজের বাণিজ্যিক চহিদা মিটিয়ে লিথোগ্রাফিকে পরোক্ষভাবে টিকিয়ে রেখেছেন। পরবর্তী সময়ে পেইন্টার-প্রিন্টমেকার অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে হুইসলারের মতো শিল্পীরা বলেন, এখন থেকে গ্রাফিক আর্টকে চরুশিল্পের জন্য ব্যবহার করা হবে। তখন থেকে লিথোগ্রাফি একটু ভিন্ন ভাষায় উপস্থিত হয়েছে। এরপর লুত্রেকের মতো কিছু শিল্পীর সস্তা ধরনের লিথোগ্রাফি পোস্টার চিত্র (দুই বা তিন কালারের মধ্যে অঙ্কিত চিত্র) দেখে পরবর্তী সময়ে শিল্পীরা এই মাধ্যম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। ১৯৫০ সালের দিকে পপশিল্পী জেসপার জন্‌স, রজেনবার্গ প্রমুখ শিল্পী এটিকে নিয়ে আবার শিল্প রচনা করেছেন। অর্থাৎ লিথোগ্রাফিকে শিল্পীরা তাদের বিভিন্ন ইজমে শিল্প অভিব্যক্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বর্তমান লিথোগ্রাফি ও প্লেট লিথোগ্রাফি একই ধরণের গুণসম্পন্ন ও সহজ

কলাকৌশল নিয়ে আবির্ভাবের পরও ভাষাসংক্রান্ত উপরোক্ত প্রশ্নগুলো পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। অর্থাৎ শিল্পকলার নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশেও এর চর্চার ঢেউ এসে অব্যাহত রয়েছে।

(খ) মূলত গুহাচিত্রের সময়ে স্টেনসিল প্রসেসের চিত্রগুলো থেকেই ছবি মানুষের অভিব্যক্তি প্রকাশের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়ে এই ছাপচিত্রে লিথোগ্রাফি আবিষ্কারের পর থেকে এটি প্রথমে বাণিজ্যিক কারণে এবং পরে গণমুখী চরিত্র প্রকাশের একটি মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এ কথাগুলোর মধ্য দিয়ে যেমন লিথোগ্রাফিকে শিল্পের মাধ্যম বা চরিত্র হিসেবে মেনে নিতে কারোরই আপত্তি নেই, তেমনি ভাষা হিসেবে মেনে নিতে অনেকেরই বর্তমানেও আপত্তি আছে। তারা বলে থাকেন, এটি ভাষাকে প্রকাশ করার মাধ্যম বা চরিত্র মাত্র। তাদের কাছে প্রিন্টমেকিংটিও একটি মাধ্যম, অয়েল পেইন্টিংও তাই। ভাষা হলো 'শিল্প' আর বাকিরা এর মাধ্যম। এবার ধরা যাক বাংলা একটি ভাষা, এর অক্ষরগুলো হলো অ, আ, ক, খ ইত্যাদি। ছবি একটি ভাষা— এর অক্ষরগুলো হলো লাইন, কালার ও ফর্ম। এখানে ছবি একটি সামগ্রিক নামমাত্র বা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট বিষয়। শিল্প যদি ভাষা হয়, তাহলে মূলত মাধ্যমই ভাষা।

ঢাকার মানুষজন নোয়াখালী বা সিলেটের মানুষের মতো করে বাংলা ভাষায় কথা বলে, কিন্তু এর উচ্চারণ রীতি ভিন্ন, অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের শব্দের মাধ্যমে একই অর্থকে প্রকাশ করে থাকেন। তবে তাদের অক্ষর পরিবর্তন হয়ে যায় না, বাংলাই রয়ে যায়। যেমন তারা পানিকে 'হানি' বলে থাকেন। এ দুটোই বাংলা ভাষার বিভিন্ন শব্দ হলেও এর অর্থ এক। লিখতে গেলে বাংলা হরফেই লেখেন। আবার, সাধু ভাষাই যদি সব হতো, তাহলে পৃথিবীতে একটিমাত্র ভাষা থেকে যেত। প্রত্যেকটি ভাষায় আবার কিছু শব্দ আছে, যেগুলোকে সঠিক অর্থ প্রকাশক শব্দ বলা হয়। কিছু শব্দ আছে যার অর্থ হয়তো বাংলায় বা অন্য ভাষায় সঠিক অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে না, কেবল হিন্দি ভাষায় হচ্ছে। যেমন: বাংলায় 'অনুভব' শব্দটির চেয়ে হিন্দিতে 'মেহ্‌সুস' শব্দটি অধিকতর অনুভূতিশীল, শ্রুতিমধুর, রোজ ব্যবহার উপযোগী ও অভিব্যক্তিময় । হিন্দি ভাষা যারা ভালো বোঝেন তারা এটি অন্তত স্বীকার করবেন। মানুষের মনের অভিব্যক্তায়নে তাই পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষার হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। তখন, কখনো কখনো সৃষ্টি হয়েছে ভাষার নতুন ফর্ম। যেমন: জাপানে লেখার ও বলার জন্য ভাষার তিনটি ফর্ম তৈরি হয়েছে। একটি হিরাগানা, কাথাকানা ও কাঞ্জি। হিরাগানায় মানুষ যেভাবে কথা বলে সেভাবে লেখার জন্য একধরনের অক্ষর সৃষ্টি করেছেন। কাথাকানায় বিদেশি শব্দগুলো লেখার জন্য আরেক ধরনের অক্ষর সৃষ্টি হয়েছে।

আবার সাহিত্যে বা পত্রিকা, পুস্তকে লেখার জন্য ছবি আকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য আরেক ধরনের অক্ষর, শব্দ ও শব্দসমষ্টির সৃষ্টি হয়েছে। ফলে লেখ্য ভাষার সঙ্গে দৃশ্যশিল্পের ভাষার সমন্বয় ঘটে একধরনের অক্ষরে পরিণত হয়েছে। ঠিক বর্তমানে তেমনি বলা হয়ে থাকে ভাস্কর্যিক ভাষা (স্কাপচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ) ও লিথোগ্রাফিক ভাষার ক্ষেত্রেও শিল্পভাষা একটি নাম মাত্র। সেইসঙ্গে লিথোগ্রাফি মাধ্যমেও লাইন, কালার, ফর্ম দিয়েই ছবি আঁকা হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই তার নিজস্ব গুণের কারণে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। তাই লিথোগ্রাফিকে বর্তমানে অনেক শিল্পীই ভাষা হিসেবে অকপটে মেনে নিচ্ছেন। যারা মেনে নিতে অপারগ, তারা বিষয়ের গভীরে গিয়ে দেখলেই ঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন। এভাবে গণমুখী চরিত্র প্রকাশের পর ট্র্যাডিশনাল বা কনসেপচুয়াল শিল্পের সঙ্গে এর কোনো বিরোধিতা নেই। তবে নানাবিধ পথপরিক্রমা পেরিয়ে লিথোগ্রাফি আজ পর্যন্ত চর্চার মধ্য দিয়ে চলে এসে শুধু নিজস্ব চরিত্রই নয়, ভাষা হিসেবেও প্রতিষ্ঠার দাবি রাখে। নানা বিয়েনালে (আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী) প্রিন্টের কাজ এটা অন্তত প্রমাণ করে যে, এটি পেইন্টিং নয় আবার এটি যে শুধু প্রিন্ট— এমন বক্তব্য দিয়ে একে ছোট করা যায় না। এর মধ্যে ছবির এমন সব গুণাবলি বিদ্যমান, যা বিষয়কে অসম্ভব সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যায়। প্রিন্টমেকাররা এটা যতটা অনুভব করতে পারেন, অন্যরা সে বিষয়ে কিছুটা তো সংশয় প্রকাশ করতেই পারেন। কারণ কনসেপচুয়াল শিল্পকেও প্রথমে কেউ শিল্প হিসেবে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। পরবর্তী সময়ে নন্দনতত্ত্বে এর অবস্থান নিজেই প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে চারিত্রিক ও শৈল্পিক গুণাবলি দিয়ে। শিল্পকলা যেমন নানাবিধ চড়াই-উতরাই পেরিয়ে কনসেপচুয়াল শিল্পে পদার্পণ করেছে। লিথোগ্রাফিও তেমনি নানাবিধ উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আজ এই অবস্থায় এসেছে যে, একে ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা যেতেই পারে।

(গ) অধ্যাপক নিসার হোসেনের মতে, লিথোগ্রাফি যখন এলো তখন উডকাট, উড এনগ্রেভিং বা এচিংকে কমার্শিয়াল প্রিণ্টিংয়ের বাজার তাদের পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শুধু দ্রুততার কারণে। তখন শিল্পীরা কিন্তু এই মাধ্যমগুলোকে নিয়ে আরো কী করার আছে, সে বিষয়টি নিয়ে কাজ করে গেছেন। ঠিক তেমনি অফসেট প্রেস ও ডিজিটাল প্রিন্ট বা সি প্রিন্ট আসার পরও শিল্পীরা অফসেট প্রিন্টকে গ্রহণ করেননি, কিন্তু লিথো বা ডিজিটাল প্রিন্টকে নিয়ে কাজ করছেন। এর মূল কারণটি হলো— যেহেতু অফসেট লিথো ব অফসেট প্রিন্টটি পুরোপুরি ফটোগ্রাফির আউটপুটের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সেখানে শিল্পীর কিছুই করার থাকে না, তাই তারা অফসেটকে না নিয়ে লিথোগ্রাফিসহ অন্যান্য যেসব মাধ্যমে শিল্পী

সরাসরি যুক্ত থেকে কাজ করতে পারবেন, সে মাধ্যমগুলো নিয়ে আজও কাজ করে যাচ্ছেন। একটা সময় শিল্পীরা শুধু পেইন্টিংকে ফাইন আর্ট বা চারুশিল্প মনে করতেন, প্রিন্টমেকিং বা স্কাপচারকে নয়। তখন শিল্প সম্পর্কে শিল্পীদের ধারণা এবং বর্তমান সময়ে শিল্পের সংজ্ঞা পরিবর্ধিত হতে হতে একটি ভিন্ন তাৎপর্যময় অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। যখন শিল্পীরা প্রিন্টমেকিং বা স্কাপচারকে শিল্প মনে করতেন না, তখন তাদের পেইন্টিংটি হয়তো কপি করার জন্য অন্য একজন প্রিন্টমেকার বা ড্রাফটসম্যানকে দিয়ে করানো হতো। আবার শিল্পী ডুরার, র‍্যাম ব্র্যান্ড বা অন্য শিল্পীরা যখন তাদের নিজেদের প্রিন্টের মূল কাজটি নিজেরা করেছেন তখন তাদের ফলাফল ওই ড্রাফটসম্যানদের ফলাফলের থেকে ভিন্ন মাত্রা পেল। ফলে শিল্পীদের নিজেদের নিযুক্ততার কারণে ছবিটিতে একধরনের ভাষা সৃষ্টি হচ্ছে। সেই ভাষাটি একটি ইফেক্ট তৈরি করছে। আসলে এই ইফেক্ট শিল্পীর নিজস্ব শিল্পভাষার পরিচয় বহন করে এবং প্রত্যেক মাধ্যমেরই বিশেষ ইফেক্ট রয়েছে।[৩] সেই ইফেক্টকেই ভাষা বলা যেতে পারে। সে বিষয়টি যেমন লিথোগ্রাফি মাধ্যমে প্রযোজ্য তেমনি অয়েল পেইন্টিং বা ভাস্কর্য মাধ্যমেও লক্ষণীয়। তাই হয়তো বলা হয় স্কাপচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ, প্রিন্টমেকিং ল্যাঙ্গুয়েজ, লিথোগ্রাফিক ল্যাঙ্গুয়েজ। এ দেশের শিল্পকলায় লিথোগ্রাফির চর্চা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও এর ব্যাপকতা আমাদের শিল্পসমাজে ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, যতটা না অন্য মাধ্যমগুলো: যেমন তৈলচিত্র মাধ্যম পেরেছে। অনেক চর্চার মধ্য দিয়ে এর ভাষাগত দিকটি প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে লিথোগ্রাফি মাধ্যমের চর্চা করতে গিয়ে বর্তমান গবেষক, তার সহকর্মী এবং ছাত্রসমাজ সবাই এই শিল্পভাষার অপার সম্ভাবনাময় দিকের ইঙ্গিত পেয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে এটিও উঠে এসেছে— এই ভাষার বা মাধ্যমের ব্যাপকতা নিয়ে এ দেশের তথা সারা বিশ্বের শিল্পীদের ভাবার এবং করার অনেক কিছু রয়ে গেছে। এক দিক থেকে বিয়েনাল প্রদর্শনীগুলো একটি বিষয়কে নির্দিষ্টতা দান করতে সক্ষম হয়েছে যে, প্রিন্টমেকিং মাধ্যমটি পেইন্টিং বা ছবি আঁকার অন্য মাধ্যমগুলো থেকে আলাদা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রবাহিত হচ্ছে। এখন শুধু লেখ্য ভাষায় এটিকে নিজস্ব শিল্পভাষায় প্রতিষ্ঠিত করা বাকি। সেইসঙ্গে বিশ্বের মহান শিল্পীরা এই মাধ্যমে কাজ করেছেন বটে, তবে বেশির ভাগেরই এটি প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠেনি। তাই লিথোগ্রাফি ও ভাষার কাতারে আসতে সময় লেগেছে। ফলে এসব দিক পর্যালোচনা করে প্রথমেই যদি ভাষার বা মাধ্যমটির করণ-কৌশলগত দিক এবং এর থেকে বের হয়ে আসা বিভিন্ন মাধ্যম বা দিকের মাত্রা নিয়ে একটি গবেষণাপত্র রচনা করা হয়,

---

[3] নিসার হোসেন, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ১৮ জুন, ২০১৬

তবে শিল্পকলার অভিব্যক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে নব দ্বার উন্মোচন করা সম্ভব (বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশে উন্মুক্ত হবে বলে বিশ্বাস করা যেতে পারে)। সেইসঙ্গে এই মাধ্যমের চর্চার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে কিছু নতুন মাধ্যম। আর সেগুলো হচ্ছে:

১.২.৩ নতুন মাধ্যম সৃষ্টির মাধ্যমে

বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চায় বের হয়ে এসেছে নতুন নতুন করণ-কৌশল ও মাধ্যম। এদেশের রাসায়নিক উপাদান অন্যান্য দেশের তুলনায় একটু ভিন্ন। তাই এখানকার চর্চাপথ মধ্যস্থিত কিছু উপায়ের পরিবর্তন ও পরিশীলন প্রয়োজন হয়েছে চর্চার প্রয়োজনেই। চর্চার মধ্য দিয়ে তা বেরও হয়ে এসেছে। যেমন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লিথোগ্রাফি চর্চার ক্ষেত্রে কন্টি বা ক্রেয়ন ব্যবহৃত হয়। অনেক ধরনের গ্লাস মার্কার পেনসিল সে দেশে উৎপন্ন হলেও এ ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না। বাংলাদেশেও প্রথমে কন্টি ব্যবহার হতো। কিন্তু বর্তমানে এ দেশে নানা ধরনের গ্লাস মার্কারের ব্যবহার লিথোগ্রাফিকে একটি ভিন্ন চরিত্রময়তা দান করেছে। বলপয়েন্ট লিথোগ্রাফি পদ্ধতি, উড লিথোগ্রাফি ও অন্যান্য কিছু নতুন মাধ্যমের ব্যবহারে বর্তমান শিল্পীদের কাজে এসেছে ভিন্ন মাত্রাগুণ।

১.২.৩.১ বলপয়েন্ট লিথোগ্রাফি

বাংলাদেশের চারুশিল্প চর্চায় লিথোগ্রাফি চর্চা করতে গিয়ে বাংলাদেশের শিল্পে 'বলপয়েন্ট লিথোগ্রাফি'র একটি নতুন সহজ-সরল প্রক্রিয়া বের হয়ে এসেছে, যা তুষ পদ্ধতিতে অঙ্কিত পদ্ধতির চেয়ে অনেক সহজ। এর গ্রেইন করা থেকে ওয়াশ আউট করা পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি অন্যান্য প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন ও সহজ। কিন্তু এর অভিব্যক্তিময় ক্ষমতা পেন স্কেচ বা ড্রাইপয়েন্টের থেকে ভিন্ন মাত্রাগুণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবিষ্ট হয়েছে। এর করণ-কৌশলগত এবং ভাষাগত দিকটিও পাঠকের দৃষ্টির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

১.২.৩.২ উড লিথোগ্রাফি

কাঠের প্লাইবোর্ডের ওপর প্লেনোগ্রাফিক পদ্ধতিতে নতুন বিকল্প উপায় সৃষ্টির মাধ্যমে 'উড লিথোগ্রাফি' নামে প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমটির করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত দিকটিও বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির বিশেষ চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে গুরুত্ব সহকারে পাঠক ও অনুশীলকদের নজরে নিয়ে আসা প্রয়োজন হয়েছে।

১.২.৩.৩ ওয়াটার বেইজ অয়েলি মিডিয়াম

লিথোগ্রাফির তুষ দিয়ে সবসময় স্টোন বা প্লেটে চিত্রাঙ্কন করা হতো। কিন্তু এটিকে পানির সঙ্গে মিশিয়ে আয়ত্তে এনে পাথরে কাজ করাটিই শিল্পীর জন্য খুব কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আবার শিল্পীরা এটি দিয়ে সরাসরি কাগজে কাজ করতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেয়েছেন বা চেষ্টা করেননি। অথবা নন-অবজেক্টিভ চিত্র নির্মাণেই বেশি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই মাধ্যমটিকে 'মাদার মিডিয়াম' বানাতে হলে সেই মাধ্যমটিতে বাস্তবধর্মী ও সব ধরনের কনভেনশনাল উপায়ে কাজ করার পদ্ধতি সৃষ্টি করতে হবে। সেই কাজটি বর্তমান গবেষক নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এর সাদা-কালো এবং রঙিন চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, যা এই গবেষণায় সংযুক্ত করেছেন। এটিকে তিনি 'ওয়াটার বেইজ অয়েলি মিডিয়াম' নামকরণ করেন। এই মাধ্যমে একসঙ্গে ট্রান্সপারেন্ট (স্বচ্ছ) ও ট্রান্সলুসেন্ট (অস্বচ্ছ) পদ্ধতিতেও চিত্র রচনা করে অ্যাকোয়াটিন্টের ভেলভেটি ইফেক্ট আনা সম্ভব। যে অ্যাকোয়াটিন্টের ভেলভেটি ইফেক্ট থেকে পিকাসো ফ্লাট সারফেসে যাওয়ার উৎসাহ পেয়েছিলেন, তেমনি একটি শক্তিশালী ফ্লাট সারফেসে যাওয়ার একটি অন্যতম উপায় হিসেবে এটি গ্রহণ করা যেতে পারে। এটি জলরং ও অ্যাক্রিলিক মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্রিটিশ জলরং (ওয়াটার কালার) মাধ্যমের চেয়ে শক্তিশালী মাধ্যমে পরিণত হতে পারে।

এই গবেষণা চলাকালে তত্ত্বগত পর্যালোচনার পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে স্টুডিওতে ব্যবহারিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। ব্যবহারিক দিকটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এই মাধ্যম ও তার প্রসেস মধ্যবর্তী পর্যায়ের বিভিন্ন সহজ পদ্ধতি বের হয়ে এসেছে। সেইসঙ্গে নতুন কিছু কৌশল ও মাধ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে, যা পরবর্তী সময়ে একটি আলাদা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যেমনঃ উড লিথোগ্রাফি, বলপয়েন্ট লিথোগ্রাফি ও ওয়াটার বেইজ অয়েলি মাধ্যম প্রভৃতি।

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা

(ক) যেকোনো একটি মাধ্যম বা ভাষা চর্চার ফলে ভাষাটি যখন চূড়ার দিকে যেতে থাকে তখন এর নানা গতিপথ সৃষ্টি হয়। ফলে মাধ্যমটি পরিণত অবস্থায় গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। এই ভাষার চরম অবস্থা থেকে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন মাধ্যম। এই মাধ্যম আবার একসময় ভাষায় পরিণত হয়। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। সৃষ্টি হয়েছে বলপয়েন্ট দিয়ে অঙ্কন করা লিথোগ্রাফি পদ্ধতি, উড লিথোগ্রাফি পদ্ধতি, ওয়াটার বেইজ অয়েলি মাধ্যম। সেইসঙ্গে চর্চা হচ্ছে এই মাধ্যম থেকে বের হওয়া

নতুন মাধ্যম গাম-প্রিন্ট, সাইনোটাইপ ইত্যাদি। ফলে ভাষার সহায়ক হিসেবে নতুন নতুন মাধ্যমের আবির্ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণাটি করার প্রেক্ষাপটটি যুক্তিযুক্ত।

(খ) দার্শনিক সময়কালের হিসাবে রেনেসাঁসকে (১৪০০ সাল) যদি আধুনিক দর্শনের শুরু ধরা হয় তবে লিথোগ্রাফির জন্মও আধুনিককালে। রোমান্টিসিজমের সমসাময়িক সময়ে জন্মের কারণে এর পূর্ববর্তী সময়ের অর্থাৎ প্রি-হিস্টোরিক প্রিয়ড থেকে এ পর্যন্ত সকল শিল্পীর কাজ লিথোগ্রাফি মাধ্যমে আশা করা অর্বাচীন। আর রোমান্টিসিজম থেকে এখানে বর্ণিত আধুনিককালের ইতিহাসের মধ্যে লিথোগ্রাফি শিল্পমাধ্যমটি এভাবেই শিল্পকলার দর্শনের সঙ্গে পদচারণে ব্যস্ত ছিল। এর পর থেকে শিল্পীরা তাদের নিজ উদ্যোগেই হোক আর মাধ্যমের মোহে পড়েই হোক— এর চর্চা অব্যাহত রেখেছেন পৃথিবীর আনাচকানাচে। তা না হলে এই শিল্পভাষাটির মৃত্যু ঘটার কথা ছিল। তবে শিল্পীরা কেন এর চর্চা করছেন, এর ভেতর কী আছে যে শিল্পী সমসাময়িক অনেক দর্শনের তোয়াক্কা না করেও এর চর্চায় মগ্ন থাকতে পারেন? কারণ পরবর্তী সময়ে কনস্ট্রাকটিভিজ্‌ম বা কাইনেটিক আর্টের দর্শনে দু-একটি ছাড়া লিথোগ্রাফি মাধ্যমে তেমন কোনো কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। কাইনেটিক শিল্পে স্থির গতি (স্ট্যাটিক মোশন) ও কাইনেটিক (সত্যিকারের) গতির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রিয়েল গতিকে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে জীবন নামক গতিশীল মানব বস্তুর বাস্তবতাকে (রিয়েলিটিকে) গতির মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত করে প্রকাশ করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে লিথোগ্রাফি মাধ্যমে তা অসম্ভব। তাহলে কি লিথোগ্রাফি মাধ্যমে এই মডার্ন ও পোস্টমডার্ন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মতো মাধ্যম নয়? নাকী এর অন্য কোনো মডার্ন, পোস্টমডার্ন গুরুত্ব রয়েছে? এ প্রশ্নের জবাব পরে কন্‌টেম্পর‍্যারি কিছু লিথোগ্রাফি সম্পর্কে আলোচনা ও এই গবেষণার মূল আলোচনার শেষে সম্মিলিত অনুভূত ফলাফলের মাধ্যমে পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করা যায়।

(গ) লিথোগ্রাফি নিয়ে গবেষণার মূল কারণ হলো: এ সময়ে লিথোগ্রাফি অনুশীলন হচ্ছে না। এর একটি সমস্যা হলো করণ-কৌশলগত দিক। সেটি বাংলাদেশের শিল্পীরা বিকল্পভাবে সমস্তটাই এখন সমাধান করতে পেরেছেন। কিন্তু আধুনিক ও উত্তরাধুনিক সময়ে এসে শিল্পীরা এর দর্শনগত দিক সম্পর্কে একধরনের অস্বচ্ছতার কারণে এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণার অভাবে এই ট্র্যাডিশনাল মাধ্যমগুলো নিয়ে এই সময়ে কীভাবে কাজ করা যায় বা ব্যবহার করবে, সে বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব দেখা যায়। এ বিষয়ে গবেষণা হলে সকলেই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে শিল্প রচনার ক্ষেত্রে শুধু লিথোগ্রাফিই নয়, সমস্ত মাধ্যমের উপযোগিতা এবং এর ভাষাসংক্রান্ত সমস্যার সমাধানও কিছুটা করতে পারবে।

(ঘ) এ ছাড়া লিথোগ্রাফিসংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান আলোচনা করা হয়েছে। কিছু কিছু বিষয় আছে যা অনেক সময় লিখেও প্রকাশ করা হয়নি। বর্তমানে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো এমনভাবে লেখার চেষ্টা করা হবে, যেন মনে হয় ব্যবহারিকভাবে কাজ করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শনী করে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির বিবর্তন, করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক নিয়ে সেমিনারে আলোচনা করা হয়েছে। পিএইচ.ডির গবেষণাপত্র সবসময় শুধু লিখিত ভাষার ওপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে গবেষক তার গবেষণাপত্রের সঙ্গে পাশাপাশি সিডি, ভিডিওগ্রাফি, কর্মশালা ও প্রদর্শনীর ফলাফল লিপিবদ্ধ করে এর উদ্দেশ্য সফল করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

(ঙ) গবেষণাটির অধীত বিষয় থেকে বাংলাদেশের প্রিন্টমেকিং লিথোগ্রাফির চর্চা ক্ষেত্রে করণ-কৌশলগত দিকটি সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। অনেক সূক্ষ্ম বিষয় আছে, যেগুলো সাধারণত বইয়ে লিখিত আকারে থাকে না, সেগুলোও প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বলপয়েন্ট লিথোগ্রাফি, উড লিথোগ্রাফি এবং নতুন মাধ্যম হিসেবে ওয়াটার বেইজ মিডিয়ামের মতো নতুন কিছু মাধ্যম ও এর করণ-কৌশল।

(চ) একদিকে যেমন এই কৌশলগুলো নিয়ে বিষদ আলোচনা করা উচিত, অন্যদিকে লিথোগ্রাফির এই টেকনিকগুলো সম্পর্কে স্বভাবতই নানা ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। যেমন শিল্পীরা কেন লিথোগ্রাফি চিত্র অঙ্কন করেন? এসব চিত্র কি শুধু গৃহসজ্জা, কমার্শিয়াল প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য? নাকী এতে যোগ হয়েছে নান্দনিকতা? এর কি কোন শিল্পমূল্য রয়েছে? ইতিহাস কী বলে? চোঁখে দেখা বাস্তবতার চিত্র অঙ্কন থেকে শুরু করে বর্তমান পোস্টমডার্ন সময়ে এর ফলাফলের ধন্যাত্মক মান কতটুকু? এই চিত্রকলা চর্চার ওপর পশ্চিমা চিত্রকলা চর্চার করণ-কৌশলগত প্রভাব কতটুকু? সেটা কি বাংলাদেশের জন্য ধন্যাত্মক শিল্প পথপরিক্রমারই ইঙ্গিত বহন করে? নাকী বাংলাদেশ ঋণাত্মক বা নিচের দিকে চলা শুরু করেছে? এই করণ-কৌশলের সঙ্গে পশ্চিমা দেশগুলোর করণ-কৌশলের মিল-অমিল কোথায়? তা কতটা স্পষ্ট? করণ-কৌশলগত কারণে এই ভাষার চিত্রকর্মে যে অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়, তা কি নান্দনিকতাকে ক্ষুণ্ন করে? না অন্য আরেক ধরনের শক্তিশালী নান্দনিকতার ছাপ বহন করে? আর এই নতুন পথ অনুসরণ করে চলাটা উচিত নয় কি? প্রস্তাবিত গবেষণায় এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

(ছ) ভাষাগত জটিলতা বলতে প্রত্যেক পেশায় (প্রফেশনের, যেমনঃ ডাক্তারি) কিছু ভাষাগত টার্মস বা পরিলেখ ব্যবহৃত হয়। তার সঠিক ব্যাখ্যা পাঠককে অনুধাবন করাতেও ব্যর্থতার ছাপ থেকে যায়। জাপানিরা তাদের বেশির ভাগ গবেষণাপত্র জাপানি ভাষায় লিপিবদ্ধ করায় তাদের জাতীয়তা বিশ্বের কাছে

ক্ষুণ্ন হওয়ার বদলে উঁচু হয়েছে। তাই সমগ্র বাঙালি জাতির সহজ-সরল ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে এই গবেষণাপত্র বাংলায় রচনা করে এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

(জ) বিভিন্ন দেশে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে এটিও অনুধাবন করা হয়েছে যে, প্রত্যেক দেশের শিল্পীরা তাদের দেশের কেমিক্যাল ও অন্য সবকিছু নিয়ে গবেষণা করে সে দেশের জন্য একটা সহজ, বোধগম্য ও গুণগত মানসম্পন্ন প্রিন্ট পদ্ধতি আবিষ্কার করে শিক্ষার্থীদের শেখানোর ব্যবস্থা করেন, যা পরবর্তী সময়ে পরম্পরা হয়ে যায়। পরবর্তী প্রজন্মআবার সেটিকে পরিশীলিত করে। উল্লেখ্য, এসব কারণে বইয়ের সার্বজনীন ইউনিভার্সাল টেকনিক পদ্ধতির সব দেশের টেকনিকের সঙ্গে সরাসরি মিল পাওয়া যায় না। বর্তমান এই গবেষণাপত্রটিতে অভিজ্ঞতা ও এর ব্যবহার পদ্ধতি সরলীকরণের মাধ্যমে এ ধরনের সীমাবদ্ধতাগুলোকে অতিক্রম করে শিল্পকলার পথ সহজসাধ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে।

(ঝ) সারা বিশ্বে প্রিন্টমেকিংয়ের বেশির ভাগ বইয়ে করণ-কৌশলগত দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শিল্পকলার ইতিহাস বইগুলোর বেশির ভাগ রেফারেন্সই ভাস্কর্য ও পেইন্টিংয়ের বিষয়বস্তু ও চিত্রনির্ভর। ফলে প্রিন্টমেকিংয়ের শিক্ষার্থী ও অনুশীলকদের শিল্পকলার ইতিহাস পঠন ও প্রিন্টমেকিং মাধ্যম ব্যবহারের উপযোগিতার প্রশ্নে একে ব্যবহারের প্রতি একধরনের অনীহা সৃষ্টি হয়েছে। আবার প্রিন্টের চিত্র ধরে ধরে নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়নি। শিল্পীরা যখন তার পঠিত ও গবেষণাগত বিষয়গুলো লিখিত আকারে প্রকাশ করতে চেষ্টা করবেন, তখন তার ভাষার সারল্যতা অনুশীলকদের সে বিষয়ে সত্যিকারভাবে গভীরে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

স্টুডিওতে নিরীক্ষা করার পূর্বে এ সমস্ত বিষয় নিয়ে ধারণাগত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে মাধ্যমগত কৌশল আবিষ্কার এবং তার প্রয়োগের জন্য এই গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। একই সঙ্গে গবেষণা ফলাফল প্রয়োগের জন্য তত্ত্বগত গবেষণার পাশাপাশি স্টুডিওভিত্তিক নিরীক্ষার যৌক্তিকতা রয়েছে।

১.৪ গবেষণা প্রশ্ন বা গবেষণা বিবৃতি

উপরোক্ত লিথোগ্রাফিভিত্তিক প্রেক্ষাপটটি আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন জেগেছে। তা হলো:

(ক) বাংলাদেশে অনুসৃত লিথোগ্রাফির করণ-কৌশলগত দিকগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী?

(খ) বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির করণ-কৌশলগত দিক অন্যান্য দেশের থেকে কতটুকু আলাদা?

(গ) বর্তমানে এসেও লিথোগ্রাফি কি মাধ্যম হিসেবেই বিবেচিত হবে, নাকি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে?

(ঘ) লিথোগ্রাফি মাধ্যম থেকে নতুন কোনো কৌশল বা মাধ্যম আবিষ্কার হয়েছে কি?

(ঙ) বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিগুলো বিশ্ব শিল্পকলার পরিপ্রেক্ষিতে কোন জায়গাটিতে অবস্থান করছে?

(চ) বাংলাদেশে লিথোগ্রাফির বিবর্তনটি কীভাবে হয়েছে?

১.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার প্রেক্ষাপট এবং প্রশ্নগুলো বিবেচনায় রেখে এই গবেষণার উদ্দেশ্যগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১ লিথোগ্রাফির করণ-কৌশল অনুসরণ করে তার স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ।

২ লিথোগ্রাফির করণ-কৌশল বিবর্তন বিশ্লেষণ।

৩ স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে লিথোগ্রাফির উপযোগিতা ও কার্যকারিতা/সম্ভাবনা বিশ্লেষণ/চিহ্নিত করা।

৪ লিথোগ্রাফি মাধ্যম-উদ্ভূত নতুন কৌশল (টেকনিক) আবিষ্কার এবং তা প্রয়োগের প্রচেষ্টা।

১.৬ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণার বিষয়টি একই সঙ্গে যেমন ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন হচ্ছে ইতিহাসে পূর্বে কারা কীভাবে প্রিন্ট পদ্ধতি অনুসরণ করত, সেটি জানা। গবেষকের পদ্ধতির সঙ্গে ভিন্নতা কতটুকু? পূর্বের যেকোনো পদ্ধতি তুলে ধরে তার সঙ্গে বাংলাদেশে অনুসৃত পদ্ধতির ভিন্নতা ও মৌলিকতা প্রমাণ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণ কৌশল হিসেবে দক্ষ লিথোগ্রাফারদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, প্রশ্নপত্র পূরণ, গ্রুপ ডিসকাশন ইত্যাদি কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে। পাশাপাশি গবেষণাটিতে কর্মশালা ও এর কাজগুলো নিয়ে প্রদর্শনীর উপাত্তগুলো সরবরাহ করা হয়েছে, এর ফলে প্রস্তাবিত গবেষণার প্রাথমিক উপকরণের মধ্যে থাকছে— মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন ধরনের তথ্য, মুদ্রিত-অমুদ্রিত সরকারি-বেসরকারি দলিলপত্রাদি, অডিও, ভিডিও ডকুমেন্টারি ইত্যাদি। আবার সহায়ক উপকরণের মধ্যে রয়েছে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে মুদ্রিত হওয়া গ্রন্থ, প্রবন্ধ, অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ ইত্যাদি। উপকরণ সংগ্রহের লক্ষ্যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনিকগুলো নির্বাচন করেও সংগ্রহ করা হয়েছে, যাতে এই গবেষণার টেকনিকের গুরুত্ব ও মৌলিকত্ব সহজেই অনুধাবনযোগ্য হয়ে ওঠে। এ ছাড়া এই টেকনিকগুলো

নিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে বা কর্মশালার মাধ্যমে ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখানো ও করানো দরকার হয়েছে। গবেষকের নিজস্ব কাজগুলো দিয়ে কয়েকটি সেমিনার ও প্রদর্শনী করা হয়েছে বলে তত্ত্বাবধায়ক, দর্শক এর সঠিক মূল্যায়ন করতে পেরেছেন।

১.৭ তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্র

গবেষক নিজে লিথোগ্রাফি বিষয়ের একজন দক্ষ অনুশীলক হিসেবে বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে কাজ করে যাচ্ছেন। ফলে বিভিন্ন ক্যাটালগ, ব্রোশিয়ার, ফটোগ্রাফি থেকে বেছে বেছে উপাত্ত গ্রহণ করেছেন। বিশ্ব শিল্পকলার ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করেই বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিগুলোর তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করে এর করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত দিকটি নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। সেইসাথে পরীক্ষাগার থেকে নিরীক্ষনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল সংযোজন করা হয়েছে।

১.৮ উৎস নির্বাচন পদ্ধতি

বাংলাদেশে চর্চিত লিথোগ্রাফির ব্যবহারিক দিকের করণ-কৌশলগত বিষয়টি গবেষক গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই প্রাপ্ত ফলাফল লেখ্য ভাষায় উপস্থাপন করেছেন প্রাথমিক উৎস হিসেবে। সঙ্গে ফটোগ্রাফি সংযুক্ত করেছেন। ভারতের লিথোগ্রাফির তীর্থস্থান বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের (শান্তিনিকেতন) নন্দন আর্কাইভ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্র ভারতী (ভারত) বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে এ বিষয়ে অনুশীলকদের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশ্নোত্তর থেকে উৎস সংগ্রহ করা হয়েছে।

তা ছাড়া লিথোগ্রাফিসংক্রান্ত ও শিল্পকলার ইতিহাসবিষয়ক বইগুলো থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্ধৃতি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বই, পত্রপত্রিকা, বিশ্বকোষ, এনসাইক্লোপিডিয়া, উইকিপিডিয়া, আর্টিকেল থেকে প্রাপ্ত তথ্য, উৎস ও ফটোগ্রাফ দ্বিতীয় উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সেইসঙ্গে একাধিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য নির্দেশক ফুটনোটও গবেষণায় সংযুক্ত করা হয়েছে। তথ্য ও উপাত্তগুলো সংগ্রহের বিষয়ে জগমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত ‘গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা’ গ্রন্থটির নিয়মাবলি অনুসরণ করা হয়েছে।

১.৯ শিল্পকর্ম নির্বাচন পদ্ধতি

বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চার ক্ষেত্রে যেসব শিল্পকর্ম করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক দিয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে, কেবল সেই সময়ের সেই শিল্পকর্মগুলোকে ধরেই আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণাটি সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালনা করার জন্য কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপটটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। প্রেক্ষাপটটি থেকে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির সঙ্গে অন্যান্য দেশের লিথোগ্রাফির তুলনা করতে গিয়ে বের হয়ে এসেছে, বাংলাদেশে লিথোগ্রাফির চর্চা সেভাবে হচ্ছে না। সেইসঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছে বেশ কিছু প্রশ্ন। বাংলাদেশে যে লিথোচর্চা হচ্ছে তা আসলে কী ধরনের? করণ-কৌশল ও গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, একধরনের বিকল্প চর্চার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এ দেশের লিথোগ্রাফি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব শিল্পকলার অঙ্গনে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা ও প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। সেই সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্য গবেষণাটির কয়েকটি উদ্দেশ্য নির্ণয় করা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্য ও প্রশ্নগুলো মাথায় রেখে গবেষণাটি পরিচালনা করতে গিয়ে পাওয়া গেল বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির করণ-কৌশলগত নিজস্বতা, ভাষা হিসেবে লিথোগ্রাফির গ্রহণযোগ্যতা এবং সৃষ্টি হচ্ছে নতুন কলাকৌশল ও মাধ্যম। তাই প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও প্রেরণা পর্ব আলোচিত হয়েছে। এই প্রেরণা পর্বে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে এ দেশের লিথোগ্রাফির করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত দিকের বৈশিষ্ট্য এবং এর নতুনত্ব (নতুন কৌশল ও মাধ্যম আবিষ্কার)। গবেষণাটির যৌক্তিকতা, প্রশ্ন বা বিবৃতি, গবেষণাটির উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, সীমাবদ্ধতা ও ফলাফল নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই গবেষণার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত দিক থেকে পূর্বে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও পেপার-পত্রিকা ও বিভিন্ন উৎসের সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষণালব্ধ প্রাপ্ত ফলাফলগুলোর ধন্যাত্মক যৌক্তিকতাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে লিথোগ্রাফির অত্যন্ত সুপাঠ্য গ্রন্থ 'প্রিন্টমেকিং টুডে', টেমারিন্ড লিথোগ্রাফির ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত বিশ্বাসনির্ভর তথ্যকে সাহিত্য পর্যালোচনার আওতায় নিয়ে এসে এই গবেষণার যৌক্তিকতাটি সাম্প্রতিক ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে লিথোগ্রাফির বিভিন্ন তত্ত্ব, শিল্প ধারণা ও পরিভাষা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে শিল্পে ব্যবহৃত দর্শনের কয়েকটি পরিভাষা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করে পাঠকের বোধগম্যতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফলে অতি সহজে পাঠক গবেষণাটি পঠনে আগ্রহী হয়ে উঠবেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে লিথোগ্রাফির ইতিহাস ও বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শিল্পকলার ইতিহাসবিষয়ক এই আলোচনার মধ্য দিয়ে মুদ্রণযন্ত্রের ক্রমবিকাশ, লিথোগ্রাফির বিবর্তন ও বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চার ইতিহাস নিয়ে আলোকপাত গবেষণার উদ্দেশ্যকে সাফল্যমন্ডিত করবে। সেইসঙ্গে বিভিন্ন ইজমে লিথোগ্রাফির ভূমিকার প্রাসঙ্গিকতা নিয়েও ধারণা প্রদান করা যথেষ্ঠ যুক্তিযুক্ত।

পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশে লিথোগ্রাফির চর্চা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণাটির উদ্দেশ্য ও প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে এদেশের চারুশিল্প চর্চায় লিথোগ্রাফির করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত দিকটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে ক্রেয়ন, কন্টির ও গ্লাস মার্কার ব্যবহারের সময়কাল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। তুষের ব্যবহারে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিতে বৈশিষ্ট্যময়তার ছাপ লক্ষণীয়। ভাষাগত দিক থেকে নবীন ও প্রবীণ প্রজেন্মর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি আজকে তার লক্ষ্য স্থির করতে পারছে— এমন ধারণাটি পাওয়া খুব কঠিন কিছু হবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশে চর্চিত লিথোগ্রাফির বিবর্তনে যে ধরনের পরিবর্তন এসেছে এবং বর্তমানে চর্চা অব্যাহত রেখেছে, সে পদ্ধতিগুলো বিস্তারিতভাবে লিখিত আকারে উপস্থিত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে এই পদ্ধতিগুলোর সুবিধা-অসুবিধার খুঁটিনাটি বিষয় গবেষক নিজে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের পরবর্তী অনুশীলকদের জন্য লিখিত আকারে উপস্থাপন করেছেন। বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চার ফলে যে নতুন ধরনের কলাকৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে সেটিও বিস্তারিত লিখিত হয়েছে। সৃষ্ট নতুন মাধ্যম ব্যবহারে বিশ্ব শিল্পকলায় নিজেদের অবস্থান সমুজ্জ্বল রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। লিথোগ্রাফিসংক্রান্ত কিছু সমস্যার সমাধানও সেখানে তুলে ধরা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিগুলোর নন্দনতাত্ত্বিক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে সৃষ্ট এসব লিথোগ্রাফির শিল্পগুণ বিচার বিশ্লেষণ করার প্রয়াশ লক্ষনীয়। মডার্ন, পোস্টমডার্ন, পোস্ট-পোস্টমডার্ন শিল্পচর্চার এই সময়ের তত্ত্বগুলোর আলোকে লিথোগ্রাফিগুলোর অবস্থান নির্ণয় করার চেষ্টা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। সেখানে একজন বৈশ্বিক শিল্পীর কার্যপ্রণালি ও চিন্তার ধরনের সঙ্গে দার্শনিকদের চিন্তার মিল ও অমিল চিহ্নিত করে শিল্পীর চিন্তাশীল প্রক্রিয়ার গতিকে তরান্বিত করার জন্য একটি সম্ভাব্য উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এ দেশের লিথোগ্রাফির সম্ভাবনাকল্পে টেমারিন্ড লিথোগ্রাফি ইনস্টিটিউটের লিথোগ্রাফি চর্চার সঙ্গে তুলনা করে দেখানো হয়েছে যে, বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির চর্চা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে।

উপসংহারে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চায় করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত দিক থেকে কোনো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও নতুনত্ব আছে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১.১০ সীমাবদ্ধতা

প্রত্যেক গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। এই গবেষণাটিরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) পিএইচ.ডি গবেষণার একটি সময়সীমা রয়েছে। গবেষণা করতে গেলে কিছু দীর্ঘমেয়াদি ও কিছু স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন পড়ে। কিছু বিষয়ের ফলাফলের জন্য সারা জীবন ধরে গবেষণা করে যেতে হবে। ফলে এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত নিতেই হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশে লিথোগ্রাফির উপকরণগত সীমাবদ্ধতা পূর্ব থেকেই ছিল। বর্তমানেও অনেকটা বিকল্প উপায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কাজ চালিয়ে নিতে হচ্ছে। আজকে যে উপকরণ পাওয়া যাচ্ছে কালকে হয়তো সেই উপকরণের গুণগত মান পরিবর্তন (ভেজাল মিশ্রণ) হয়ে যেতেও পারে। কাজেই যেকোনো বিষয়ে লেখার পূর্বে অনেকবার গবেষণা করে পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছে।

(গ) বাংলাদেশে বাণিজ্যিক লিথোগ্রাফির চর্চা হলেও এর সংরক্ষণ একেবারেই হয়নি বললেই চলে। অন্যদিকে চারুশিল্পের চর্চায় লিথোগ্রাফিগুলোও সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়নি। তবু যতটুকু পাওয়া গেছে তা নিয়েই কাজ করা হয়েছে। ঢাকা চারুকলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রিন্টমেকিং বিভাগ ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে অল্প কিছু সংগ্রহের ওপর নির্ভর করেই গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

(ঘ) ভাষা হিসেবে যেখানে পেইন্টিংই মানুষ সংগ্রহ করতে চায় না, সেখানে প্রিন্ট সংরক্ষণের অভ্যাস বাংলাদেশে এখনো সৃষ্টি হয়নি। ফলে শিল্পী নিজেও অনেক সময় এর সংরক্ষণে সচেতন ছিলেন না। একটি ছবির অনেকগুলো এডিশন হয় বলে সংগ্রাহক ও শিল্পী উভয়ের উদাসীনতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(ঙ) প্রিন্টের কোনো আর্কাইভ গড়ে ওঠেনি। আর্ট গ্যালারিও গড়ে ওঠেনি, যেখান থেকে লিথোগ্রাফির বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যেতে পারে।

(চ) সারা পৃথিবীতেই লিথোগ্রাফির ওপর বইয়ের সংখ্যা কম। প্রতিটি যুগে তার প্রয়োজনমতো বিভিন্ন দেশের করণ-কৌশলগত পরিবর্তন নিয়ে সবসময় যে লেখা হয়েছে এমনটি নয়। বাংলাদেশেও অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত করণ-কৌশলের কোনো ধারাবাহিক পরিশীলনের ওপর কোনো গবেষণা হয়নি, এমনকি কোনো বইও রচিত হয়নি।

(ছ) বাংলাদেশ তথা সারা পৃথিবীতেই লিথোগ্রাফির ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র খুব কমই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। টেমারিন্ড ইনস্টিটিউট অফ লিথোগ্রাফির মতো প্রতিষ্ঠান সব দেশে একটি করে থাকলে অন্তত এর ভাষাগত দিক নিয়ে এই গবেষণাপত্রে জোর দেওয়ার প্রয়োজন পড়ত না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ ব্যতীত বেঙ্গল সবেমাত্র লিথোগ্রাফি প্রেস বানিয়েছে, চর্চা এখনো শুরু করতে পারেনি। সেইসঙ্গে ভারতের ললিতকলার মতো এদেশের শিল্পকলা একাডেমি সেই ভূমিকাটি রাখতে পারেনি। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও এর চর্চা আদৌ বাংলাদেশে আরম্ভ হয়নি। কেবল কামরুজ্জামান শুরু করেছেন।

(জ) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নেওয়ার ক্ষেত্রে লিথোগ্রাফি সম্পর্কে ধারণার অভাবে সঠিক উপায়ে গবেষণা করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

(ঝ) শিল্পী ও প্রশ্নোত্তর সরবরাহকারীদের মডার্নিজ্‌ম, পোস্টমডার্নিজ্‌ম, পোস্ট-পোস্টমডার্নিজ্‌ম, পোস্ট-মিলিনিয়ালিজ্‌ম সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণা গবেষণাটির এবং পরবর্তী অনুসারীদের জন্য একটি বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(ঞ) বেশির ভাগ লিথোগ্রাফির বইগুলো শুধু করণ-কৌশল ও এর ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে লেখা। কিন্তু বইগুলো অধ্যয়ন করে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী যে প্রশ্নগুলো মনে তৈরি হয়, তার সদুত্তর সেই বইগুলোতে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়নি বিধায় অ্যান্টিক রোড শ্যাডোর মতো লিখিত অনলাইন লেখার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে।

(ট) বইয়ের অপ্রতুলতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে।

এই অধ্যায়ের প্রেক্ষাপটে লিথোগ্রাফি বিষয়ের কয়েকটি ঘাটতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে লিথোগ্রাফিতে করণ-কৌশলগত দিক দিয়ে কিছু পরিশীলনের কথা বলতে গিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, গ্লাস মার্কার ও কন্টির ব্যবহারের তারতম্য রয়েছে। বাংলাদেশে গ্লাস মার্কারের ব্যবহার বৈশিষ্ট্য লিখিত থাকা প্রয়োজন। সেইসঙ্গে তুষের ব্যবহারে তারতম্যগত বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে কিছু নতুন মাধ্যম, যেগুলো আজ পর্যন্ত লিখিত আকারে অনুশীলকদের সামনে উপস্থিত হয়নি। আরেকটি বিষয় হলো শিল্পকলার গতিবিধি সম্পর্কে ধারণার অভাবে লিথোগ্রাফির প্রয়োগ সম্পর্কে নতুন করে অনুসন্ধানের প্রয়োজন পড়েছে। ফলে এর ভাষাগত দিকটি নিয়েও পর্যাপ্ত সিদ্ধান্তহীনতার অবস্থানটি একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২. দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চা করতে গিয়ে কিছু প্রশ্ন ও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে আরো কিছু নতুন প্রশ্ন। প্রশ্ন গুলো সমাধানকল্পে বিভিন্ন গ্রন্থের পাঠ্য অনুসরণ করতে গিয়ে দেখা যায়— সেখানে এর স্পষ্ট কোনো সমাধান নেই। ফলে এ বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে নতুন কিছু মাধ্যমেরও উপস্থিতি অনুভব করা যাচ্ছে। করণ-কৌশলগত দিক থেকে এ দেশের চর্চাতে এসেছে পরিবর্তন ও গুণগত তারতম্য। অনেক ক্ষেত্রেই অনুসৃত হয়েছে বিকল্প পদ্ধতি। ভাষাগত দিক থেকে শক্তিশালী স্বতন্ত্র ভাষার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, যা পূর্বে কোনো গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। অথবা এ বিষয়ে আলাদাভাবে ভাবাই হয়নি। তা ছাড়া এ দেশে লিথোগ্রাফি চর্চাতে প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের সমন্বিত অনিচ্ছাকৃত প্রয়াসে সৃষ্টি হয়েছে নিজস্ব শৈলীগত রূপ-বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্র। সৃষ্টি হয়েছে এর মধ্যস্থিত বিকল্প পদ্ধতি ও নতুন কৌশল এবং মাধ্যম। তাই বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চর্চা, বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা বিষয়ক গবেষণার প্রেক্ষাপট, প্রশ্ন ও গবেষণার উদ্দেশ্য বিবেচনায় রেখে করণ-কৌশল, ভাষাগত দিক ও উদ্ভূত নতুন মাধ্যম ও কৌশল সম্পর্কে সাহিত্য পর্যালোচনাটি নিম্নরূপভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.১ লিথোগ্রাফির করণ-কৌশলগত সাহিত্য পর্যালোচনা

প্রিন্টমেকিংয়ে বিভিন্ন দেশে করণ-কৌশলগত এর মধ্যস্থিত পর্যায়গুলোতে সে দেশগুলোর আবহাওয়া ও রাসায়নিক বস্তুর তারতম্যের কারণে কিছু পরিশীলন ঘটেছে। সেই পরিশীলত রূপগুলো প্রত্যেক শিল্পীর সঙ্গে অন্য শিল্পীরও তারতম্য ঘটে থাকে। তাই বলা হয়, প্রত্যেক শিল্পীর আবার নিজস্ব কিছু পদ্ধতি আছে, যেগুলো খুব কমই লিখিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। তবে ‘প্রিন্টমেকিং টুডে’ ও টেমারিন্ডের লিথোগ্রাফি গ্রন্থে এর কিছু উদাহরণ দেখতে পাওয়া যাবে। সে জন্য ‘বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চা, বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা’ বিষয়ে লিথোগ্রাফির আলোচনা প্রসঙ্গে এর করণ-কৌশলগত দিক পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

২.১.১ ইমেজ তৈরিতে কন্টি বা ক্রেয়নের ব্যবহার

'প্রিন্টমেকিং টুডে' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা. ১৮) লিথোগ্রাফির প্রাথমিক কিছু উপকরণ নিয়ে বিবৃত হয়েছে। সে বিষয়গুলোর মূলভাবটি হলো: ১৭৯৮ সালে জার্মানিতে লিথোগ্রাফির আবিষ্কার হলেও এর উৎকর্ষ সাধন আরম্ভ হয় ইংল্যান্ডে। আবিষ্কারক সেনেফেলডার (Senefelder) ১৮০০–১৮০১ সালে লন্ডনে গিয়ে ফিলিপ এন্ডারকে (Philipp Andre) লিথোগ্রাফি প্রেস স্থাপন এবং এর পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেন। ফলে একটি ফোলিও ছাপার মধ্য দিয়ে ১৮০৩ সালে লিথোগ্রাফি শিল্পের মাধ্যম হিসেবে প্রাথমিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১২টি ইমেজ নিয়ে Specimen of Poly autography[4] নামকরণে ফোলিওটি ফিলিপ এন্ডার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এ কাজগুলোর সবই পেন এবং তুষ মাধ্যমে (মিডিয়ায়) করা। এরই মধ্যে লিথোগ্রাফিতে ক্রেয়ন পেনসিলের সাহায্যে অঙ্কিত লিথোগ্রাফি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। এদিকে ফ্রান্সের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম শিল্পী এইচ.বি স্যালন ১৮০৪ সালে লিথো চিত্রে টোনের মাধ্যমে আলোছায়াকে উদ্ভাসিত করেন।[5] আবার Garo Z. Antreasian-এর 'The Tamaind Books of Lithography: Art & Techniques' ও অন্যান্য লিথোগ্রাফি গ্রন্থ যেমন: 'প্রিন্টমেকিং টেকনিকস', 'দ্য কমপ্লিট প্রিন্টমেকার' ও 'দ্য লিথো গ্রাফারস মেনুয়াল' ইত্যাদি গ্রন্থেও এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট দ্বিমত নেই।

গবেষক এখানে বলতে চেয়েছেন, উপরোক্ত অনুচ্ছেদে তুষ ও ক্রোকিল নিবের ব্যবহার এবং ক্রেয়ন ও ক্রেয়ন-পেনসিল ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়েছে। সেইসঙ্গে ক্রেয়নের মাধ্যমে টোনের প্রথম দিককার ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু এই 'প্রিন্টমেকিং টুডে' ও অন্য গ্রন্থগুলোতে যে বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট আলোচনা হয়নি, তা হলো গ্লাস মার্কার পেনসিলের ব্যবহার ও এর ইফেক্ট। কারণ গ্লাস মার্কার ও ক্রেয়নের ইফেক্টের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। (চিত্র.২.১-২.৪) সে বিষয়টি দৃশ্যত ফটোগ্রাফি করে এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করে দেখানো হয়েছে। এই গ্লাস মার্কারের ইফেক্ট নিয়ে আলাদাভাবে সম্ভবত আজ পর্যন্ত কোনো গবেষণাপত্র লিখিত আকারে প্রকাশিত হয়নি। গ্লাস মার্কারের ইফেক্ট নিয়ে এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আলোকপাতের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ গ্লাস মার্কারের সূক্ষ্ম টোন অনেকটা রাবিং ইঙ্কের ইফেক্টের মতো মনে হলেও বাস্তবিক তা ভিন্ন। তা ছাড়া দর্শক থেকে শুরু করে অনেক প্রিন্টমেকারই একে

---

[4] Jules Heller, *Printmaking Today*, 2nd edition, NewYork, p.18
Specimen of Poly autography : 'Specimen of Poly autography' অর্থ হচ্ছে হাতের লেখা বা আঁকা অরিজিনাল বা মূল কপিটির অনেকগুলো কপি করা।

[5] Jules Heller, *Ibid.*

পেনসিল স্কেচ মনে করে ভুল ধারণা পোষণ করেন। তাই গবেষক গবেষণাটি করতে গিয়ে এ বিষয়টি সাহিত্য পর্যালোচনার আওতায় নিয়ে এসেছেন।

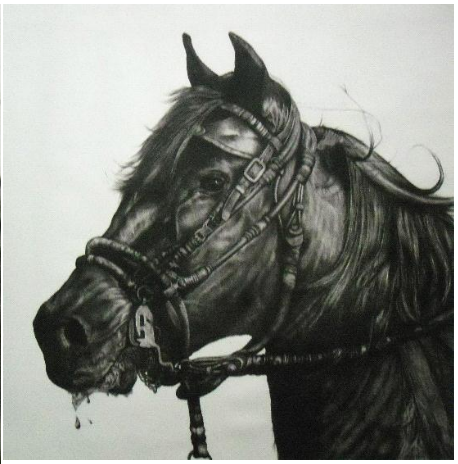

Plate: 2.2, Zainul Abedin (Jony), Lithography, 2014, 24x24, inch.

Plate: 2.1, Partly detailed photograph

Plate: 2.3, Partly detailed Photograph of Honoré Daumier`s Lithography

Plate: 2.4, The War Council, 10x8 inch, 1872 (part of the picture)

'প্রিন্টমেকিং টুডে' গ্রন্থের ১৯৭৯ সালের দ্বিতীয় সংস্করণে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্টোন লিথোগ্রাফির সঙ্গে মেটাল প্লেট লিথোগ্রাফির পার্থক্য হলো (১) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্লেটে ড্রইংয়ের পূর্বে

কাউন্টার এচিং করে নিতে হবে। (২) এচিং করার পদ্ধতি স্টোন লিথোগ্রাফি থেকে ভিন্ন পদ্ধতি। (৩) ডিপ স্ক্র্যাচিং পদ্ধতি উপদেশমূলক নয়। (পৃ.৭৯)

অর্থাৎ স্ক্র্যাচ পদ্ধতি এখানে সম্ভব নয়। তাহলে প্লেট লিথোতে কখনো যদি ইমেজ স্ক্র্যাচ করে প্রিন্ট নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তা কীভাবে সম্ভব? গবেষক তখন নানাভাবে চেষ্টা করে অন্য ধরনের এক পদ্ধতি বের করেন, যেটিতে খুব অল্প সময়ে ইমেজ তৈরি করে তার মধ্য থেকে কিছু অংশ মুছে নতুন ফর্ম সৃষ্টি করা যায়। তবে অল্প সময় মানে খুবই অল্প সময়ে তা করে ফেলতে হবে। এখানে সময় বিষয়ক পরিসীমাটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সময়ের হেরফের ঘটলে ইমেজটি সৃষ্টি করা যাবে না। অনেকটা সিরামিকের 'চাইনিজ বোন-ক্লে' মাধ্যমে যেমন খুব অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে কাজটি না করে ফেললে, পরবর্তী সময়ে ফাইনাল ফলাফলে ফাটল বা অন্য সমস্যা সৃষ্টি করে, সেই ধরনের। এখানেও সে রকমভাবে সময়টি একটি গুরুত্বপূর্ বিষয়। এমনই অল্প সময় ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ইমেজটি সৃষ্টি করতে হবে। আর তা হলো— প্লেট লিথোগ্রাফিতে গ্লাস মার্কার দিয়ে দ্রুত ফ্লাট ইমেজের কাছাকাছি গিয়ে তার ওপর গ্লাস মার্কার দিয়ে শীঘ্রই প্রেশার দিয়ে ইমেজকে মুছে পাখির মতো কিছু ইমেজ সৃষ্টি করা যায়, যা কখনো অঙ্কন করে আঁকা কঠিন বিষয় এবং অঙ্কিত ইমেজের অভিব্যক্তি, এই সৃষ্টি করা ইমেজের অভিব্যক্তির অনুরূপ হবে না। সেইসঙ্গে বা স্টোনের স্ক্র্যাচিং পদ্ধতি থেকে বাড়তি পাওনা হলো— প্লেটের সেই পাখির ইমেজ থেকে উঠে যাওয়া মোমের জায়গাটিতে প্রিন্টিংয়ের সময় ইমেজ জড়িয়ে যাবে না এবং স্ক্র্যাচিং থেকে ভিন্ন চরিত্রের হয়ে উদ্ভাসিত হবে। অথচ অন্য যেকোনো সাধারণ ইমেজ তৈরির সময় একবার ইমেজ তৈরি করলে সেটিকে মোছা বা ইরেজ করা সম্ভব নয়, অন্তত প্লেট লিথোগ্রাফির ক্ষেত্রে। স্টোন লিথোতে এটি 'গাম রেজিস্ট' পদ্ধতিতে বা স্ক্র্যাচ করে সহজ উপায়ে করা যায় এবং পরে স্ট্রং এচিং করার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু প্লেট লিথোর বেলায় সাধারণ এচিং করেই প্রিন্ট নেওয়া সম্ভব— এ বিষয়টি কোনো গ্রন্থে উঠে আসেনি। তাই এ আবিষ্কারটিকে আরেকটি নামকরণও করা যায়। তা হলো 'ইরেজ করে ইমেজ সৃষ্টি' বা 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা পদ্ধতি'ও বলা যায়। তুষ বা অন্য কোনো ইঙ্ক মাধ্যমে এটি সম্ভব কি না সে বিষয়টি ভবিষ্যৎ গবেষণার বিষয়। এ পর্যন্ত গবেষণায় এ বিষয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়নি। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাওয়া যাবে, শিল্পে কোলাজ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ধীরে ধীরে পেইন্টিং নিজে একটি ভাস্কর্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ঠিক তেমনটি আরেক ধরনের যৌক্তিকতায় উল্লেখিত পদ্ধতিটির আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এটিও বলা যেতে পারে যে, প্রিন্টমেকিংয়ের লিথোগ্রাফি মাধ্যম শুধু অঙ্কন করেই সৃষ্টি করার মাধ্যমই নয়, ইমেজ তৈরি করার মাধ্যম হিসেবেও পরিগণিত হতে

পারে। ফলে এখানেও প্রিন্টমেকিং নামকরণের সার্থকতাটি যথাযথভাবে নিহিত রয়েছে, যা বাংলাদেশের শিল্পী স্পষ্টতই প্রমাণ করলেন। তাই পদ্ধতিটির ইমেজও নিম্নে প্রদত্ত হলো।

Plate: 2.5, Rokonuzzaman, plate-lithography, 2011, 18x6 cm, (অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে দ্রুত ইমেজ অঙ্কন করে গ্লাস মার্কার দিয়ে প্রেশারের মাধ্যমে পাখির ইমেজ সৃষ্টি— 'ইরেজ করে ইমেজ সৃষ্টি')

২.১.২ ইমেজ তৈরিতে তুষের ব্যবহার

হেলারের 'প্রিন্টমেকিং টুডে' গ্রন্থে বলা হয়— দুই ধরনের লিথো তুষ পাওয়া যায়। (১) Stick tusche (২) Liquid tusche। এ দুই ধরনের তুষই ব্যবহারের পূর্বে ঝাঁকিয়ে নিতে হয়। তুষকে লিথোটিন,

গ্যাসোলিন অথবা পানির সঙ্গে মিশিয়েও কাজ করা যায়। 'গ্রাফিক আর্টস টেকনিক্যাল ফাউন্ডেশন'[6] তারপিনটাইনের বদলে লিথোটিন তৈরি করেন, যা (তারপিনটাইন) মানুষের স্কিনে একধরনের জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করত। (পৃ. ৫১)

Plate: 2.6, Rokonuzzaman, Lithography, Tusch Wash, 2010, 15x16cm.

---

[6] "Graphic Arts Technical Foundation", 'Wikipedia, the free encyclopedia' , 10 October 2016, at 13:30, https://en.wikipedia.org/wiki/Graphic_Arts_Technical_Foundation

Graphic Arts Technical Foundation: 'গ্রাফিক আর্টস টেকনিক্যাল ফাউন্ডেশন' হচ্ছে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, যারা সারা বিশ্বে প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রির কারিগরি সহযোগিতার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও শিক্ষামূলক সহযোগিতা করে থাকে। ফাউন্ডেশনটি তাদের বিশেষ কার্যাবলি পাঁচটি ক্ষেত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকে। আর সেগুলো হলো— গবেষণা, ট্রেনিং, উপদেশমূলক, গুণাগুণ বিচার ও প্রকাশনা।

কিন্তু এখানে গবেষক আরো স্পষ্ট করে বলতে চান যে, তুষের ব্যবহারের পূর্বে তুষটি কীভাবে গোলানো হচ্ছে এবং গোলানোর পর কীভাবে ব্যবহার করা যায়, সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া নেই। শুধু বলা আছে কী কী রাসায়নিক বস্তুর সঙ্গে মিশিয়ে কাজ করা বা অঙ্কন করা যাবে। কিন্তু বাংলাদেশের শিল্পীরা অল্প একটু ফুটন্ত গরম পানির সঙ্গে স্টিক তুষকে মিশিয়ে গলিয়ে নিয়ে কুসুম গরম অবস্থায় পরিষ্কার পানির সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়ে ভালো ফল পেয়েছেন। আবার স্টিক তুষ সরাসরি আঙুল দিয়ে পরিষ্কার পানির সাহায্যে ডলে ডলে গলিয়ে নিয়ে তুলির সাহায্যে ওয়াশ দিয়ে খুব ভালো ফল পাচ্ছেন।

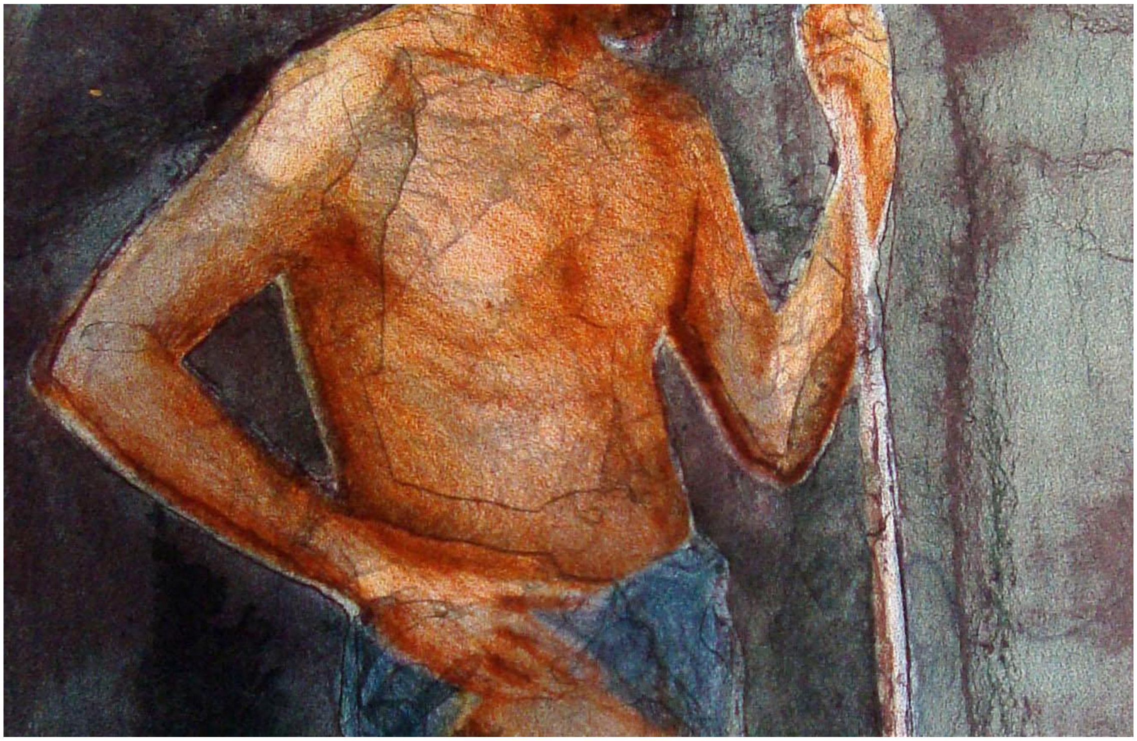

Plate: 2.7, Rafiqul islam, Plate-Lithography, (partly close up photo of an image) Tusch Wash, 6.5x 7.5 inch, 2013.

এই তুষ ব্যবহারে বাংলাদেশের শিল্পীরা প্রথমে স্টোনে তুলি দিয়ে পানি দেন। এরপর তুলিতে গোলানো তুষ নিয়ে আলতোভাবে পানির ওপর ছেড়ে দেন। তখন তুষ এদিক-সেদিক ছুটতে থাকে। এ অবস্থায় তুষের ফ্যাটগুলো সমস্ত পানির অংশ জুড়ে ভাসতে থাকে। ধীরে ধীরে তুষের ফ্যাটযুক্ত উপাদানটি স্টোনের ওপর বসতে থাকে। পানিকে স্টোন ধীরে ধীরে শুষে নেয় এবং কিছুটা পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায় বা শুকিয়ে যায়। বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের ব্যবহারের তারতম্যের জন্য এর চরিত্রে একধরনের মিল যেমন থাকে, তেমনি অন্য আরেক ধরনের অমিলের কারণে শিল্পীর কাজে তুষের ব্যবহারের একটি নিজস্ব চরিত্র দাঁড়ায়। মোহাম্মদ কিবরিয়ার কম্পোজিশনের সঙ্গে কাজু ওয়াকিতার (Kazu Wakita, 1908-2005)

লিথোগ্রাফির তুষের ব্যবহারে যেমন একটি মিল রয়েছে তেমনি একটি অমিলও রয়েছে। এ বিষয়টি গবেষকের তুষ লিথোগ্রাফি চিত্রেও বর্তমান।

বর্তমান শিক্ষার্থীদের কিছু কিছু লিথোচিত্রের মধ্য দিয়ে ভিন্ন প্রসঙ্গে তুষকে গ্লাসমার্কার উপকরণ দিয়ে তৈরি ইমেজের উপর এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যেটি বিশ্ব শিল্পকলার চর্চাঙ্গনে খুব কমই দেখা গিয়েছে। যেমনঃ তুষ যেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিরীক্ষাধর্মী বা নন-অবজেকটিভ কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে রফিকুল ইসলামের একটি অবয়ব ধর্মী কাজে প্রথমে গ্লাস মার্কারে কাজ করেছেন। তার উপর আরো বেশ কয়েকটি ইম্প্রেশনের মাধ্যমে সাবজেক্টিভ শিল্পকর্ম রচনা করেন। ফলে ভাষাগত দিক দিয়ে লিথোগ্রাফির তুষ মাধ্যমটি বা কৌশলটিকে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চর্চার অনন্যগুণ বর্ধন করে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

Plate: 2.8, Rokonuzzaman, Lithography, Ball Point pen, Tusch, Glass marker, 2008, 30x26 cm.

২.১.৩ ইমেজ তৈরিতে বলপয়েন্ট কলম ব্যবহার

উল্লিখিত গ্রন্থগুলোতে বলপয়েন্ট কলম বা মার্কার দিয়ে ইমেজ সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বলপয়েন্ট দিয়ে অঙ্কিত লিথোগ্রাফির গ্রেইন কেমন হবে, এর এচিং পদ্ধতি ও কালি তৈরি কেমন হবে—

সে বিষয়ে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। বর্তমান গবেষক সে বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট উপায়ের কথা ব্যক্ত করেছেন।

লিথো স্টোনের গ্রেইনটি হবে পলিশের কাছাকাছি গ্রেইন। তা না হলে বড় গ্রেইনের ক্ষেত্রে বলপয়েন্টের বলটি বারবার আটকে যাবে। ইমেজ সৃষ্টি করা কঠিন হয়ে যাবে। এবার গামিং দ্রুত করে সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাক-রোলিং করা দরকার। তার পরপরই এচিং করে সরাসরি প্রেস ইঙ্কের হুগলি কালি দিয়ে প্রিন্ট নেওয়া সম্ভব। এই পদ্ধতির আরেকটি সুবিধা হলো সময় কম লাগে। (চিত্র.২.৮)

২.১.৪ ফ্লাট ইমেজ সৃষ্টিতে প্লেট লিথোগ্রাফি ব্যবহার

জুলিয়াস হেলারের 'প্রিন্টমেকিং টুডে' ও Garo Z. Antreasian এর `The Tamaind Book of Lithography: Art & Techniques গ্রন্থে ফ্লাট ইমেজ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন ধরনের ফ্লাট ইমেজ সবচেয়ে সহজ ও সুন্দর সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া নেই। গবেষক বাংলাদেশের জন্য কিছু পদ্ধতির মাধ্যমে নানা ধরনের ফ্লাট ইমেজ সৃষ্টির উপায় বর্ণনা করেছেন তার করণ-কৌশল বিষয়ক অধ্যায়ে। তার অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে স্পষ্টতই তিনি বলতে চেয়েছেন— প্লেনোগ্রাফি মাধ্যমের মধ্যে সবচেয়ে সহজ ও সুন্দর ফ্লাট ইমেজ আসে অ্যালুমিনিয়াম প্লেট-লিথোগ্রাফি বা অ্যালুগ্রাফির মাধ্যমে, যা স্টোন লিথোগ্রাফিতে কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আর লিথোগ্রাফিতে অসংখ্য ছোট ছোট ফর্ম থাকে বলে রোলিংয়ের সময় সেই দুর্বলতাটি ধরা পড়ে না। তিনি আরো বলতে চান, ফ্লাট ইমেজ নেওয়ার ক্ষমতা যার সুস্পষ্ট তিনি সবচেয়ে ভালো প্রিন্ট নিতে পারেন, কারণ সেখানে রোলিংয়ের দুর্বলতাগুলো সবচেয়ে ভালোভাবে ধরা পড়ে।

২.১.৫ প্লেট-লিথোগ্রাফির সঙ্গে ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফির সংমিশ্রণ প্রসঙ্গ

এমনিতে তো যেকোনো মাধ্যমের সঙ্গে অন্য মাধ্যমের সংমিশ্রণে ইমেজ তৈরি করা যেতেই পারে। কিন্তু প্লেট-লিথোগ্রাফির কৌশলের সঙ্গে 'ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি'-র কৌশলের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়ে কোনো ইমেজ সৃষ্টি সম্ভব কি না— সে বিষয়ে কোনো উদাহরণ 'প্রিন্টমেকিং টুডে', 'টেমারিন্ড বুক অফ লিথোগ্রাফি: আর্ট অ্যান্ড টেকনিকস', 'প্রিন্টমেকিং টেকনিকস', 'দ্য লিথোগ্রাফারস মেনুয়াল', 'দ্য কমপ্লিট প্রিন্টমেকার' নামক গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ নেই। সেই সম্ভাবনাটিই বর্তমান গবেষক ২০১৬ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে অনুষ্ঠিত ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি কর্মশালায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে

সফল হন। সেখানে তিনি প্লেট-লিথোগ্রাফির একটি ইমেজকে সেই প্লেটেই ফ্লাট ইমেজে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছেন দুটি ভিন্ন মাধ্যমের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে।

২.১.৬ ইমেজ প্রিন্ট নেওয়ার পূর্বে বাংলাদেশের পদ্ধতির সঙ্গে গ্রন্থে লিখিত পদ্ধতিগত তারতম্য

'প্রিন্টমেকিং টুডে' গ্রন্থের ৫৪ নম্বর পৃষ্ঠায় স্পষ্ট বলা হয়েছে— লিথোগ্রাফিতে এচিং করার এমন কোনো 'সঠিক' পদ্ধতি বা ফেনোমেনন নেই। তাই গবেষক বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির উপকরণ ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে এ দেশের জন্য কয়েকটি এচিং পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যার সঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থের মিল থাকলেও এগুলো সম্পূর্ণই তার স্বতঃ উৎসারিত অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে লিখিত রূপ নিয়ে বের হয়ে এসেছে। কারণ তিনি এখানে স্পষ্টতই বলতে চেয়েছেন, লিথোগ্রাফিতে, বিশেষ করে স্টোন লিথোগ্রাফিতে সবচেয়ে হালকা ও সবচেয়ে ডার্ক টোন আনতে পারলে মিডিল টোনগুলো (মধ্যম টোন) এমনিতেই চলে আসবে। কিন্তু এচিংয়ের সময় দেখা যায় যে, 'ওভার এচিং' করার ফলে প্রিন্ট নেওয়ার সময় হালকা ইমেজ আর আসে না। অথবা এমন কিছু হালকা ইমেজ আছে, যেগুলোকে এচিং করা উচিত নয়। আবার কিছু ইমেজ ওভার এচিং করে প্রিন্টে যাওয়া দরকার। তাহলে ৮-১০ টি প্রিন্টের পর সে জায়গাটি কালি বা ইঙ্ক ধারণ করে সঠিকভাবে ইমেজ আসে। এতে সুবিধা হলো ডার্ক ইমেজ ভরে গিয়ে ফ্লাট হবার সম্ভাবনা থাকে না। সে ক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষ রাখতে হয় তা করণ-কৌশল বিষয়ক অধ্যায়ে বিস্তারিত লেখা হয়েছে। আবার আন্ডার এচ বা অল্প এচিং করার ফলে মিডিল টোন এবং হাই ডার্কের টোন একই রকম কালো হয়ে জড়িয়ে যাবে। তাই বাংলাদেশের রাসায়নিক উপকরণের জন্য অলাদা এচিং পদ্ধতি অনুসরণ করা ভালো।

২.১.৭ ওয়াশ আউট দ্রবণ (সলিউশন) সৃষ্টি প্রসঙ্গ

'দ্য টেমারিন্ড বুক অফ লিথোগ্রাফি' গ্রন্থে লিখিত রয়েছে যে— দ্য গ্রাফিক আর্টস টেকনিক্যাল ফাউন্ডেশন ১৯৩৩ সালে তারপিনটাইনের বদলে ব্যবহারের জন্য বিকল্প হিসেবে 'লিথোটিন' তৈরি করে, কারণ তারপিনটাইন স্কিনে একধরনের অস্বস্তিতা (ইরিটেশন) সৃষ্টি করে এবং শুষ্ক ফাটল (ক্র্যাক) সৃষ্টি করে। পাইন তেলের সঙ্গে অল্প পরিমাণ তিসির তেল (ক্যাস্টোর তেল, castor oil) এবং তার সঙ্গে অনেক পরিমাণ ডিস্টিল পেট্রোলিয়াম (যেমনঃ বেনজিন বা মিনারেল স্পিরিট) দ্রবণের সঙ্গে এস্টার (জৈব লবন) গাম (ester gum) মিশ্রিত দ্রবণই লিথোটিন নামে পরিচিত। পাইন তেল ও ডিস্টিল পেট্রোলিয়ামের তারপিনটাইনের মতো দ্রবীভূত করার ক্ষমতা রয়েছে এবং তিসির তেল ও এস্টার গাম আঠালো অবস্থায় অনুদ্বায়ী বস্তু হয়ে পড়ে থাকে, যখন দ্রবণটি উড়ে যেতে থাকে। এই পড়ে থাকা অবশিষ্টাংশটি পানিকে

প্রতিহত করে বা পরিত্যাগ করে এবং তেলকে গ্রহণ করে এবং সেইসঙ্গে শুকিয়ে যায় না। সর্বোপরি লিথোটিনের সুপারিয়র ক্ষমতার জন্য সকল লিথোগ্রাফি প্রক্রিয়াতে লিথোটিন ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে।[7]

তবে গবেষক এখানে নির্দিষ্ট করে বলতে চান যে, বাংলাদেশে শুরু থেকেই লিথোটিনের বিকল্প হিসেবে তারপিনটাইন ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে (১৯৯৬-২০০৪ সাল পর্যন্ত) এই তারপিনটাইনের সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণ কেরোসিন জাতীয় ভেজাল তেল মেশানোর ফলে ইমেজ প্রিন্টিংয়ের সময় জড়িয়ে যেতে থাকল ১৯৯৬–২০০৪ সাল পর্যন্ত খুব বেশি পরিমাণে। এতে বেশ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। আর লিথোটিনের বদলে ওয়াশ আউট করার বিকল্প উপাদান হিসেবে বাংলাদেশের ঢাকা চারুকলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রথম থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তারপিনটাইন ব্যবহার করা হতো। ইতিমধ্যে ভারত থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরে (২০০৪) বর্তমান গবেষক বাজারে প্রাপ্ত অন্য অনেকগুলো তৈল জাতীয় পদার্থকে পরীক্ষা করে দেখেন এবং শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে 'বার্জার রবিয়াল্যাক থিনার টি-৬'-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন ২০০৬–২০০৭ সালের দিকে। ধীরে ধীরে তারপিনটাইন ব্যবহার কমতে থাকে এবং ২০০৮ সালের দিক থেকে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

'বার্জার রবিয়াল্যাক থিনার টি-৬' অর্গানিক দ্রবণের একটি মিশ্রণ, যা রবিয়াল্যাক সিনথেটিক এনামেল, ঝিলিক সিনথেটিক এনামেল, JIE, BIE, সিবোর্ন এনামেল, মেরিন এনামেল, সাধারণ প্রাইমারসহ সকল অ্যালকিড রেজিনে তৈরি যেকোনো রং পাতলা করার কাজে ব্যবহার করা হয়। এই 'থিনার টি-৬' সঠিকভাবে ব্যবহার করলে রং প্রয়োগে ভালো ফলাফল এবং দীর্ঘস্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়। সব ধরনের ব্যবহার্য যন্ত্রাংশ পরিষ্কার করতে এই থিনার টি-৬ অনন্য।[8] নিরীক্ষণে দেখা যায়, ২০০৪ সাল থেকে বর্তমান ২০১৭ সাল পর্যন্ত বার্জার থিনার সাফল্যজনক ফলাফল দিয়ে আসছে।

কিন্তু ২০০৪ সালের পর থেকে 'বার্জার রবিয়াল্যাক থিনার টি-৬'-এর সঙ্গে বিটুমিন মিশিয়ে ওয়াশ আউট দ্রবণ (সলিউশন) তৈরি করে ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধু থিনার দিয়ে ওয়াশ আউট করার পর এই দ্রবণটি লাগিয়ে ঝুট কাপড় দিয়ে ভালো করে পাতলা আবরণের মতো লাগালে রোলিংয়ের সময় খুব তাড়াতাড়ি ইমেজ ইঙ্ককে ধারণ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু কালার লিথোগ্রাফির সময় এই দ্রবণটিকে ব্যবহার না করাই ভালো। কারণ তা না হলে বিটুমিনের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কালারের ইমেজ সামান্য পরিবর্তন হয়ে যাবে ।

---

[7] Garo Z. Antreasian and Clinton Adams, *The Tamarind Book of Lithography: Art & Techniques*, Los Angeles, June 8, 1970 p. 288

[8] বার্জার থিনারের বোতলের গায়ে লিখিত অংশ থেকে উপস্থাপিত।

এই দ্রবণটি দিয়েও আলাদাভাবে ইমেজ সৃষ্টি বা অঙ্কন করা যেতে পারে। এই বিকল্প বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি।

২.২ ভাষা হিসেবে লিথোগ্রাফির সাহিত্য পর্যালোচনা

প্রিন্টমেকিং প্রথমে ব্যবহারিক প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী সময়ে এটি শিল্পকলার মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তবে লিথোগ্রাফির জন্ম হয় মডার্নিজমের সময়। লিথোগ্রাফিতে ড্রাফটসম্যানের হাতের খুব কাছাকাছি অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করার সুযোগ রয়েছে। তাই রোমান্টিসিজমের শিল্পীরা শিল্প মাধ্যম হিসেবে একে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। শিল্পকলার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বিভিন্ন সময়ের শিল্পীদের শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে লিথোগ্রাফি সম্পর্কিত অনুভূতিগুলো নিম্নলিখিতভাবে কখনো একটি গ্রন্থ আবার কখনো একাধিক গ্রন্থের সম্মিলিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। সেই আলোচনার মধ্য দিয়ে লিথোগ্রাফি হিসেবে মাধ্যমটির ভাষাগত গুরুত্বের বিষয়টি আলোচনা করা হবে।

২.২.১ 'প্রিন্টমেকিং টুডে' ও 'আর্ট থ্রু দি এজেস' গ্রন্থের সাহিত্য পর্যালোচনা (ভাষা সংক্রান্ত)

জুলিয়াস হেলারের 'প্রিন্টমেকিং টুডে' গ্রন্থে বলা হয় লিথোগ্রাফি রোমান্টিসিজমের সমসাময়িক সময়ে জন্ম হয়। সেখানে তিনি স্পষ্টই বলেন যে, লিথোগ্রাফি উডকাট, উড এনগ্রেভিং ও এচিংয়ের থেকে অধিকতর স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত। লিথোগ্রাফিতে ড্রাফটসম্যানের হাতের কাছাকাছি অভিব্যক্তি ব্যক্ত করা যায় বলে সে সময়ের শিল্পীরা এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এরপর রিয়ালিজ্‌মের সময়ে আইকনোগ্রাফিক্যাল (সামাজিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত) ও টেকনোলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ (অনেকগুলো টোন ব্যবহার করে)-এর সমন্বয়ে দ্যমিয়েরের (Honore Daumier, ১৮০৮ – ১৮৭৯) লা কেরিকেচার লিথোগ্রাফি চিত্র অঙ্কন করেছেন।[9] (চিত্র. ২.৯)

---

[9] Helen Gardner, *Art through the Ages*. 8th edition, United States of America-1976, p.836; 'Honoré Daumier', 'Wikipedia, the free encyclopedia' https://en.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_Daumier, 24 February 2017, at 18:40.

রিয়ালিজ্‌মের সময়ে আইকনোগ্রাফিক্যাল (সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত) সোসিও পলিটিক্যাল কনটেক্সট) ও টেকনোলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখলে যে সমস্ত লিথোগ্রাফির কথা বলতে হয়, তাদের মধ্যে দ্যমিয়েরের লা কেরিকেচার ও লি চেরিভরিতে অঙ্কিত লিথোগ্রাফি চিত্র অন্যতম। তার অন্য একটি সিরিজ L`histoire ancienne-এ তিনি সিউডো ক্লাসিসিজম বা দুঃখবাদকে সে সময়ের শিল্পে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন, যেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত।

উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশের দিকে শিল্পীরা নতুন নতুন দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হন এবং আধুনিক শিল্পকলা ও এর প্রাথমিক দিক সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। তখন থেকে নানা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিল্পীরা লিথোগ্রাফিতেও কাজ করেছেন। যেমন ইম্প্রেশ্নিজ্মের সময় তাৎক্ষণিক ইম্প্রেশন নিয়ে লিথোগ্রাফি হয়েছে। এর পরপরই পোস্ট ইম্প্রেশ্নিজ্মের শিল্পী পল সেজা (Paul Cezanne, ১৮৩৯ – ১৯০৬) চোখে দেখা ফর্মহীন এবং ভাসমান রংবিশিষ্ট দৃশ্যের মধ্যে ফর্মের অস্তিত্বশীল কাঠামোকে (লাস্টিং স্ট্রাকচারকে) খোঁজার চেষ্টা করেছেন। সেজান নতুন পদ্ধতি খুঁজে বের করে শিল্পীদেরকে সিলিন্ডার, কোণ ও স্ফিয়ার দিয়ে ছবি অঙ্কন করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। (চিত্র.২.১০)

Plate: 2.9, Honore Daumier. Litho-Rue Transnonain, April 15, 1834, L' association Mensuell, 12 x 17 inch.

Plate: 2.10, Paul Cézanne, litho, Large Bathers, 16x20 inch, 1896-1898

Plate: 2.11, Paul Signac, litho, Buoy (Saint Tropez Harbor), 1894

১৮৮৪ সালেন ইম্প্রেশ্নিজম থেকে বের হয়ে আসে 'নিয়োইম্প্রেশ্নিস্ট' নামে একটি গ্রুপ, যাকে 'ডিভিশনিজ্ম' Divisionism বা 'পয়েন্টালিজ্ম' (Pointillism) বলা হয়। এই গ্রুপের দর্শনটি অনেকটা এ রকম যে— যেখানে ইম্প্রেশ্নিস্ট শিল্পীরা 'instinctive and instantinious' সেখানে এই নিয়োইম্প্রেশ্নিস্ট শিল্পীরা হচ্ছেন 'deliberate and constant'। দ্য বিয়ো The Buoy (Saint Tropez Harbor) নামক লিথো চিত্রটি এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। (চিত্র.২.১১)

জুলিয়াস হিলারের মতে, দেগাসের মতো আরেক ব্যক্তিক শিল্পী (ইন্ডিভিজুয়াল আর্টিস্ট) হচ্ছেন ওডিলন রেডন (Odilon Redon, ১৮৪০- ১৯১৬)। ইম্প্রেশ্নিজ্মের সমসাময়িক সময়ে কদাচিৎ তাদের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি সিম্বলিজ্মের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। না উল্লেখ করলেই নয়, এমন সিম্বলিস্ট ফরাসি কবি স্টিফেন মাল্লারামের (Stephane Mallarame) সঙ্গেও তার

ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই সময়ে এসে শিল্পীরা তাদের আশ্চর্যজনক ও খুঁজে বেড়ানো নিজস্ব জগতে প্রবেশ করলেন, যা শিল্পের নিজস্ব যুক্তি দ্বারা প্রবাহিত। যিনি লিথোগ্রাফি চিত্রেও মানব অবয়বের ফর্মকে ফেন্টাসম্যাগোরিক্যাল মেটামরফসিসের (স্বপ্নে দেখার মতো করে রূপান্তরিত করা) মতো করে উপস্থাপন করেন। রেডন কিছু ক্ষেত্রে ব্রেসডিনের (Rodolphe Breesdine, 1822-85) দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ব্রেসডিন চারা গাছ, জন্তু জানোয়ার ও মানব অবয়বের ফর্ম ইত্যাদিকে উপস্থাপন করে (phantasmagorial metamorphosis of plant, animal and human forms) লিথোগ্রাফির পথপরিক্রমাকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। ফরাসী আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে রেডনও ১৯১৩ সালে নিউ ইয়র্কে বিখ্যাত আর্মোরি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই প্রদর্শনীটি থেকে দর্শকরা মর্মাহত হয়েছিল এবং আমেরিকান আর্টের প্রভাবশালী ধরনকে (টেন্ডেন্সিকে) পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়। ভিশন এবং দক্ষতার দিক থেকে তার প্রিন্ট ছিল উচ্চমানসম্পন্ন। কাজের গভীরতার দিক থেকে তিনি অন্তর্জগতের স্বপ্নের কথা বলেন (চিত্র. ২.১২)।

Plate: 2.12, Odilon Redon, Yeux Clos, 1890, Transfer lithograph. (22×16) inch

Plate: 2.13, Rodolphe Breesdine, The Good Samaritan, 1861, lithograph, 29.8×23.7 inch

তিনি বলেন, ‘লিথোগ্রাফির চরিত্র অনুযায়ী সে আমাকে যা দেয়, আমি আমার কল্পনাকে সেভাবেই স্বাধীন করে দিয়েছি। আমার প্রত্যেকটি প্লেটই সেই ফলাফলকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে টেনে বের করে আনে, যা সম্মিলিতভাবে ক্রেয়ন, পেপার ও স্টোন ব্যবহারের ফসল।’[10] তার বেশির ভাগ প্রতিস্থাপন (ট্রান্সফার)

[10] Jules Heller, *Printmaking Today*, 2nd edition, New York, p. 34, অনুবাদটি বর্তমান গবেষকের

করা লিথো স্টোনে প্রতিস্থাপন করার পর আবার কাজ করেছে, ফলে ছবিতে উপস্থিত হয়েছে নতুন ধরনের গুণ।

এই আলোচনাটুকু বিশ্লেষণ করে বর্তমান গবেষক বোঝাতে চাচ্ছেন যে— লিথোগ্রাফির একটি চরিত্র আছে। সেই চরিত্র অনুযায়ী শিল্পী নিজেকে নিয়োজিত করে শিল্প রচনা করেছেন। ফলাফলে তার মন এবং লিথোগ্রাফির সমন্বয়ের কথা শিল্পী নিজে বলেছেন। সেইসঙ্গে শিল্পী মাধ্যম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। শিল্পীর মনের অভিব্যক্তির প্রয়োজনে মাধ্যমের ব্যবহারের বিষয়টি এবং মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের অপারগতায় মাধ্যমের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সমন্বিত ফলাফলকে শিল্পীর বাড়তি পাওনা বলতে চেয়েছেন। এতে শিল্পীর মনের অভিব্যক্তি পূর্ণতা পায়নি। কিন্তু কোনো কিছু ঘটলে সেটিকে গ্রহণ করার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশিত হয়েছে। ফলে নিজস্ব শিল্পভাষা হিসেবে লিথোগ্রাফির অগ্রযাত্রাকে কিছুটা হলেও প্রমাণ করতে পেরেছেন বটে, কিন্তু মাধ্যমকে ভাষায় পরিণত করার বিষয়টি পূর্ণতা পায়নি।

Plate: 2.14, Edouard Vuillard, lithography, La Cuisiniere, 12x10 inch, 1950

Plate: 2.15, Pierre Bonnard, litho woman with a parasol, Style – Japonism.

ইম্প্রেশ্‌নিজ্‌মের পর লেস নবিস শিল্পী জে. এডুয়ার্ড ভুইলার্ড (J. Edouard Vuillard, ১৮৬৮–১৯৪০) এবং পিয়েরে বোনার্ড (Pierre Bonnard, ১৮৬৭–১৯৪৭) দৃশ্যজগতের (visual world) সাবজেক্টিভ ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির (সাইকোলজিক্যাল ভিউয়ের) কারণে ইম্প্রেশ্‌নিজ্‌মের বাস্তবতার তাৎক্ষণিক দৃশ্যগত উপস্থাপনকে (রিয়েলিটির ইমিডিয়েট অপটিক্যাল রিপ্রেসেন্টেশনকে) অস্বীকার করেছেন, যদিও দেগাস ও অন্য কিছু শিল্পীর দেখানো পথ এবং কিছু ক্ষেত্রে ইম্প্রেশনিস্ট কালার ও চিন্তা বা বিষয়বস্তুকে

(থিমকে) তারা এড়াতে পারেননি। এভাবে তারা কালার ক্রমানুক্রমিকের চেয়ে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিল্পের পোস্ট ইম্প্রেশ্নিজ্মের গোলকের মধ্যে পড়ে যান।

এরপর, মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টের (MoMa) একটি পোর্টফোলিওতে ‘Small Worlds V (Kleine Welten VI) from Small Worlds (Kleine Welten)’ নামক ছোট্ট লেখায় এক্সপ্রেশ্নিজ্মের ব্লু রাইডার দলের অন্যতম শিল্পী ক্যান্ডিন্স্কি ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে লিথোগ্রাফির কৌশল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তার নিজস্ব শিল্পভাবনা এইভাবে ব্যক্ত করে বলেন, ‘লিথোগ্রাফিতে অনেক রং ব্যবহারের ফলে লিথোগ্রাফি পেইন্টিংয়ের কাছাকাছি পর্যায়ে চলে আসে এবং অনেক ক্ষেত্রে পেইন্টিংয়ের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।’[11] বলা যেতে পারে গণতান্ত্রিকতাই লিথোগ্রাফির স্বভাবগত রূপ।

Plate: 2.16, Kandinsky, Lithography, Orange, 1923, 15x15 inch

Plate: 2.17, Kandinsky, Lithography , Small Worlds III, 1922, 10x 9 inch

গবেষক এখানে বিষয়টি নির্দিষ্ট করার জন্য বলতে চেয়েছেন যে, ক্যান্ডিন্স্কি (Wassily Kandinsky, জ. ও ১৬ ডিসেম্বর–১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৪) লিথোগ্রাফিকে পেইন্টিংয়ের কাছাকাছি এবং কখনো কখনো পরিপূরক বলেছেন। আবার ‘আর্ট থ্রু দি এজেস’ গ্রন্থে লেখক রিচার্ড জি. ট্যান্সি বলেন, ক্যান্ডিন্স্কি ১৯১৪ সালে তার কাজকে দুটি গ্রুপে বিভক্ত করেছেন। আর সেটা হলো (১) কম্পোজিশন (Composition) (২) ইম্প্রোভাইজেশন (Improvisation)। প্রথম গ্রুপে জ্যামিতিক আকৃতিগুলো চেতন মনে ছক করে (সচেতনভাবে পরিকল্পনা করে) এবং জ্ঞানীয় ইচ্ছার (intellectual order) মাধ্যমে আঁকা। অন্যদিকে

[11] “Small Worlds V (Kleine Welten VI) from Small Worlds (Kleine Welten)”, '2016 The Museum of Modern Art', অনুবাদটি বর্তমান গবেষকের, https://www.moma.org/collection/works/68435?locale=en (No Date)

দ্বিতীয় গ্রুপে তিনি কোনো রকম পূর্ব ধারণা বা পূর্বে চিন্তিত থিম ছাড়া ক্যানভাসে কালার ঢেলে দিতেন বা কালারগুলো যেভাবে ক্যানভাসে আসতে চাইত সেভাবে আসতে দিতেন। কিন্তু চেতন-অচেতনের মধ্যবর্তী অবচেতন (সাবকনশাসলি) অবস্থায় থেকে সেই কাজটি করতেন। এই কাজে উজ্জ্বল (ব্রিলিয়ান্ট) কালারগুলো ক্যানভাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং চেতন অবস্থায় শিল্পী সেটিকে খুব অল্পই কন্ট্রোল করার চেষ্টা করেন।[12]

গবেষকের মতে, এ বিষয়টিও লিথোগ্রাফি মাধ্যমে সার্থকভাবে কাজ করবে বলে ধারণা করা যেতে পারে। কারণ লিথোগ্রাফি এমনই একটি মাধ্যমে। ১৯১২ সালে পাবলিকের সামনে ক্যান্ডিন্স্কি তার 'Concerning the Spiritual in art 1912' 'কনসার্নিং দ্য স্পিরিচুয়াল ইন আর্ট ১৯১২'-এ তার শিল্পের গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যায় মেথড ও দর্শন সম্পর্কে বলেন: কালারের রয়েছে স্বাধীনতা ও এর ভেতরেই রয়েছে আধ্যাত্মিক গুণ (স্পিরিচুয়াল ভ্যালুর) (in which he proclaims the independence of color and the spiritual value inherent in it)। অর্থাৎ মানুষের ইমোশন প্রকাশ করার জন্য রংই যথেষ্ট।

ক্যান্ডিন্স্কির দৃষ্টিতে কালারের আছে নিজস্ব গভীরতা (deep-seated), আছে মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক (psychic correlations) এবং শিল্পীর রয়েছে সাময়িক (আপৎকালীন) ও পুরোপুরি অনভ্যাসগত (utterly uninhibited) কালারকে অভিব্যক্ত করার ক্ষমতা।[13] 'যৌক্তিক' বিশ্ব একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি দিচ্ছে। আর তা হলো প্রতারণামূলক এবং বিভ্রান্তিমূলক নিরাশা (hopelessly deceptive) ও মানুষের সাধারণ চোখে দেখার 'দেখা' (seeing) থেকে অলাদা করে। অর্থাৎ মানুষের মনের গভীরের বাস্তবতা বা অবচেতন মনের (অবচেতন অবস্থার বা সাবকনশাস) জ্ঞানীয় বিশ্বের (instinctual world) মধ্যে অবস্থান করা বাস্তবতাকে বুঝতে সাহায্য করছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি ফ্রয়েডের অবচেতন উপসংহার ও আর্থার রিমবাউদের (Arthur Rimbaud) বক্তব্যের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে 'true artist is visionary' (ঊর্ধ্বকমা বর্তমান লেখকের)।[14]

গবেষক বলতে চাচ্ছেন, ক্যান্ডিন্স্কির কথামতো কালারই যদি ইমোশন প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে তবে লিথোগ্রাফিক ইঙ্ক বা প্রেস ইঙ্কের ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য হওয়ার কথা অথবা সে বিষয়ে শিল্পীদের ভাবতে হবে। লিথোগ্রাফিক ইঙ্ক ও প্রেস ইঙ্কের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশে চর্চিত বিকল্প পদ্ধতিতে প্রেস ইঙ্ক দিয়ে প্রিন্ট নেয়া হয় বলে, ভবিষ্যতে যদি এটি প্রমাণিত হয় যে,

---

[12] Helen Gardner, *Art through the Ages*, The twentieth century, 8th edition, New York-1976, p. 898
[13] Helen Gardner, *bid.*
[14]Helen Gardner, *Art through the Ages. 8th edition,New York*-1976, p. 898

লিথোগ্রাফিক ইঙ্ক শিল্পীর ইমোশন প্রকাশের জন্য যথেষ্ঠ। তখন প্রেস ইঙ্কের বিষয়টিও প্রমাণ করা অনেক সহজ হবে।

আবার 'ইম্প্রোভাইজেশন সিরিজ' থেকে শিল্পকলা ধীরে ধীরে নন-অবজেক্টিভ আর্টের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু পেইন্টিংয়ের কালারকে ছাড়িয়ে লিথোগ্রাফির প্রেস ইঙ্কের নিজস্ব শিল্পভাষা হিসেবে নন-অবজেক্টিভ দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে থাকলেও স্বতন্ত্র শিল্পভাষার কথা স্পষ্ট করে কেউ বলতে পারেননি। যেমন বিভিন্ন ইজমে লিথোগ্রাফি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে সে ধরনের শৈলীগত দিকনির্দেশনা দিতে সক্ষমতার প্রমাণ দিতে পেরেছে। রিয়ালিজ্‌ম বা এক্সপ্রেশ্‌নিজ্‌ম ছাড়া সমস্ত ইজমে লিথোগ্রাফি মুখ্য ভূমিকা পালন করেনি। এ কথাটি যেমন ঠিক, তেমনি কিন্তু কনস্ট্রাকটিভিজ্‌মের পর বলা হলো যে, পেইন্টিংয়ে আর বেশি কিছু করার নেই। পেইন্টিং হলো একটি মিথ্যা (illusion)। অর্থাৎ দৃশ্যশিল্পের সকল মাধ্যমই মিথ্যা। কাইনেটিক শিল্পের ফলে সত্যিকার গতি ও স্থির গতির (static rthym) সমন্বয়ে জীবনের গতিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে, যা ফিউচারিজ্‌মে বিফল হয়েছিল। কিন্তু লিথোগ্রাফি মাধ্যম কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। সে কেবল মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে একসময় বাণিজ্যিক চাহিদা মিটিয়েছে, আরেক সময় পেইন্টিংয়ের কপি করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, আরেক সময় শিল্পভাষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র। যখন সে পেইন্টিংয়ের পরিপূরক মাধ্যম হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে সক্ষম হলো, ঠিক এমন সময়ই এসে ধাক্কা লাগে কনস্ট্রাকটিভিজ্‌মের। যেখানে বলা হচ্ছে, সমস্ত ছবি আঁকার মাধ্যম হলো মিথ্যা, আর তারই সূত্র ধরে কাইনেটিক শিল্প বলছে দৃশ্যকলার সমস্ত মাধ্যমই শুধু স্থির গতিকে প্রকাশ করে, জীবনের সত্যিকার গতিকে নয়। লিথোগ্রাফির আর শেষ সীমানায় পৌঁছানো হলো না। শুধু লিথোগ্রাফি কেন, সমস্ত প্রিন্ট মাধ্যমেরই একই অবস্থা। সে বিভিন্ন ধারার শৈলীগত রূপ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্য যে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম, সেই নির্দেশনাটুকু কেবল দিতে পেরেছে। কিন্তু গবেষক বলতে চেয়েছেন, জীবনকে আসলে ছবি আঁকার মাধ্যম, সাহিত্যের মাধ্যম, ভিডিওগ্রাফি মাধ্যমের সমন্বয়ে কতটুকু সফলতার সঙ্গে প্রকাশ করা সম্ভব— তা প্রশ্নের সম্মুখীন। লিথোগ্রাফি মাধ্যমে আরো কী করা যায় বা লিথোগ্রাফি মাধ্যম তার সফলতার দিকে এগিয়ে গিয়ে আজকে নিজস্ব ভাষায় পরিণত হয়েছে বলে বর্তমান প্রিন্টমেকাররা মৌখিকভাবে যে স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য দিচ্ছেন, সে বিষয়টি সম্পর্কে এখনো সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারেননি।

জুলিয়াস হেলারের 'প্রিন্টমেকিং টুডে' গ্রন্থে আরো বলা হয়ঃ এক্সপ্রেশনিজমের অভিব্যক্তির বিরোধিতা করে তীক্ষ্ণ (শার্প) ও মূল কেন্দ্রীয় বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খ (ডিটেইল) করে অঙ্কন করে বাস্তবতাকে প্রকাশ

করেছেন জর্জ গ্রস ও ম্যাক্স বেকম্যান নামক দুই শিল্পী। ম্যাক্স প্যাকস্টেইন (Max Pechstein, ১৮৮১–১৯৫৫) একই ধরনের ধারণা পোষণ করে বলেছেন:

> ‘লিথোগ্রাফির বিচিত্রগামিতা (Versatility) বোঝা যাবে, যখন আপনি একটি স্টোনকে নিজে তৈরি করার পর এচিং করে নিজে প্রিন্ট নেবেন। যেকোনো উপায়ে নিজে নিজে প্রিন্ট নেওয়াই একমাত্র উপায়! স্মুথ ও পাতলা রং ব্যবহার করে, পেপার ভেজানো অথবা শুকনো করা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু একটি নতুন আকর্ষণ ও উদ্দীপনা বয়ে আনে। কাজটি নিজে একটি প্রাপ্তি। যখন স্টোনে ছবিটি অঙ্কন করা হয় (পেইন্টিংয়ের কাজটি করা হয়), তার থেকে অধিকতর দ্রুতবেগ সম্পন্ন (রেপিড) এবং সরাসরি ফলাফল পাওয়া যায় এবং আপনি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার সামনে একটি প্রিন্ট বের হয়ে আসবে।’[15] (চিত্র.২.১৮)

এরই পরিপ্রেক্ষিতে গবেষক বলতে চেয়েছেন, এখানেও লিথোগ্রাফির বিচিত্রগামী ক্ষমতার কথা বলা এবং শিল্পীর অনুভূতি লিথোগ্রাফির চরিত্র থেকে অতিরিক্ত কিছু পাওয়া এবং সেটা বোঝার জন্য নিজে নিজে প্রিন্ট নেওয়ার প্রতি শিল্পী গুরুত্বারোপ করেছেন। সেইসঙ্গে ফলাফলটি একটি বাড়তি পাওনা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কাজটি করা থেকে শুরু করে প্রিন্ট বের না হওয়া পর্যন্ত যে প্রতীক্ষা (exiteness) কাজ করে এবং অঙ্কিত ছবিটি যে গতিকে প্রকাশ করছে, প্রিন্টে ছবিটি তার চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে আবির্ভূত হবে— সে বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। লিথোগ্রাফিতে এই বাড়তি পাওনাটি অন্যান্য মাধ্যম থেকে কতটুকু স্বতন্ত্র এবং অভিব্যক্তি প্রকাশে কতটুকু সার্থক ভূমিকা পালন করছে সে বিষয়টি নির্দিষ্টতা পায়নি।

[15] Jules Heller, *PrintmakingToday*, Second edition, New York, 1972, p.38

Plate: 2.18, Max Pechstein, litho, Compositio, 15x13cm. 1908

Plate: 2.19, Jack Beal, Doyle's Glove, five-color lithograph on Rives BFK paper, 1969, 12x13 inch.

Plate: 2.20, Richard Diebenkorn, Untitled Ocean Park Series, lithography, Untitled 1969, 24x18 inch.

Plate: 2.21, Kamruzzaman, Lithoraphy, Miniature, 4x4 cm, 2014.

কৌশলগত জটিলতা এড়িয়ে ১৯৬৯ সালে ডলিস গ্লোভ (Doly`s Glove) চিত্র অঙ্কন করেন কন্টেম্পরার‍্যারি (অর্থাৎ সাম্প্রতিক কাল বলতে ১৯৭০ সালের পর থেকে ধরা হয়েছে) শিল্পী জ্যাক বিয়েল (Jack Beal)। তিনি বলেন, লিথোগ্রাফি পেইন্টিংয়ের খুব কাছাকাছি মাধ্যম। লিথো স্টোনে ক্রেয়ন ও তুষের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রটি পেস্টেল রং দিয়ে অঙ্কিত মাস্টার স্কেচের থেকে ট্রেসিং করে নিয়ে পাঁচটি কালারে প্রিন্ট নেওয়া একটি সাধারণ সাবজেক্টের অ্যাবস্ট্র্যাক্ট শৈলীতে অঙ্কিত চিত্র।

এখানেও গবেষক বলতে চান যে, ১৯৬৯ সালেও যখন একজন শিল্পী লিথোগ্রাফিকে পেইন্টিংয়ের খুব কাছাকাছি বলছেন, ঠিক একই সালে আরেকজন শিল্পীর সম্পর্কে প্রিন্টমেকিং টুডে গ্রন্থটিতেই লেখা রয়েছেঃ ১৯৬৯ সালে রিচার্ড ডাইবেনকর্ন (Richard Diebencorn, ১৯২২-১৯৯৩) এর 'আনটাইটেল' (চিত্র. ২.২০) কালার লিথোগ্রাফি করার ধরণটি (অ্যাপ্রোচটি) এমনই ছিল যেন তিনি পেইন্টিং করছেন। স্টোনে বা প্লেটে বারবার এঁকেছেন, প্রিন্ট নিয়েছেন এবং পছন্দসই প্রিন্ট না আসা পর্যন্ত বারবার রিসেনসিটাইজ করে প্রিন্ট নিয়ে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন। এখানে না উল্লেখ করলেই নয় যে বাংলাদেশের শিল্পী অশোক বিশ্বাস এ পদ্ধতিতে কাজ করতেন। অপেক্ষাকৃত নবীন শিল্পী কামরুজ্জামানও উক্ত প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছেন স্টোন ও প্লেট লিথোগ্রাফির ক্ষেত্রে। (চিত্র.২.২১) তবে গবেষক এখানেও বলতে চান যে, এই গ্রন্থটিতে এখনো স্পষ্টত লিথোগ্রাফিকে ভাষা হিসেবে না বলতে পারলেও কামরুজ্জামানের সাথে বিস্তারিত আলাপচারিতায় তিনি এবং অশোক বিশ্বাস লিথোগ্রাফিকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবেই মতামত প্রকাশ করেছেন।

Plate: 2.22, Henry Pearson (1914-2006), Blue on Yellow, stone lithograph, 1964, 30 x22 inches

Henry Pearson-এর ফরম্ হোরাইজন সিরিজ (a series of Horizons, চিত্র. ২.২২)- এর প্রিন্টগুলোর মাধ্যমে একটি পথকে বর্ণনা করতে চেয়েছেন, যার মধ্য দিয়ে লিথোগ্রাফিক ড্রইং কৌশলটি অতি সতর্কভাবে অপটিক্যাল আর্টের (Op Art) ইচ্ছাটিকে পূরণ করতে পারে। তিনি বলেছেন, পানির কারণে এবং পানিতে তেলের কারণে শিশুর মতো কম অভিজ্ঞতা এবং মানচিত্রকর, মহাসমুদ্রবিদ ও পরিকল্পনাকারীর মতো বেশি অভিজ্ঞতা নিয়ে লিথোগ্রাফি করেছেন।

গবেষক এখানেও বলতে চেয়েছেন, এত সরলতা ও অধিক অভিজ্ঞতা নিয়ে কাজ করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হলেও শিল্পী এই মাধ্যমটিকে ভাষা বলার স্পষ্ট প্রয়াস পাননি।

পেইন্টিং হলো সরাসরি মাধ্যম আর প্রিন্টমেকিং হলো পরোক্ষ (ইনডিরেক্ট) মাধ্যম। তবে মনের অভিব্যক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে দুটোই পরোক্ষ মাধ্যম। পরোক্ষ মাধ্যম হলেও দুটোর আলাদা চরিত্র রয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে পেইন্টারলি ল্যাঙ্গুয়েজ, স্কপচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ, প্রিন্টমেকিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইত্যাদি। তাই ভাষাগত স্বতন্ত্র ভূমিকার কথা এখানেও উহ্যই থেকে গেছে। অর্থাৎ এখন আর 'চরিত্র'র কথা না বলে যে 'ভাষা' শব্দটি ব্যবহার করলে বোধগত দিক থেকে কোনো অসুবিধা নেই, সে বিষয়টি এ গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়নি।

২.২.২ ANTIQUES ROADSHOW-এর সাহিত্য পর্যালোচনা (ভাষা সংক্রান্ত)

Antiques Roadshow-এর একটি গ্রুপকে নিয়ে ডান ইলিয়াস (Dan Elias) যখন নিউ মেক্সিকোর এলবুকুয়েরকিউ[16] নামক অধিকতর জনবহুল এলাকায় যান, তখন টেমারিন্ড ইনস্টিটিউশনের ম্যানেজার বিল লাগাত্যুতার (Bill Lagattuta) সঙ্গে লিথোগ্রাফি সম্পর্কে কথোপকথন হয়। ডেনিস গাফনে (Denis Gaffney)[17] বিষয়টিকে লিখতে গিয়ে 'Tips of the Trade Lithography101', শিরোনামে ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে অনলাইনে প্রকাশ করেন। সেখানে বিল বলেন, এচিং এবং উডকাট অধিকতর শক্ত ও স্থির গতিসম্পন্ন। এটি শুনে ডান ইলিয়াস (Dan Elias) বলেন, 'লিথোগ্রাফির স্বতঃস্ফূর্ত ও তরল গুণের জন্যই পদ্ধতিটি পেইন্টারদের জন্য ব্যবহার উপযোগী।'[18] তারই পরিপ্রেক্ষিতে লেখক ডেনিস গাফনে বলেন, লিথোগ্রাফি পেইন্টিংয়ের মতো অভিব্যক্তি (ফলাফল) প্রকাশ করে থাকে। ফলে ডান বলেন, 'যদি আপনি একটি তুলিতে ইঙ্ক নিয়ে স্টোনে ছড়িয়ে দেন, তাই প্রিন্ট হিসেবে পাবেন।'[19]

পরবর্তী সময়ে ডেনিস গাফনে তার এই লেখায় আরো বলেন, বিংশ শতকের শুরুতে শিল্পীরা এই মাধ্যমের ব্যবহার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন বাণিজ্যিক সিনেমার পোস্টার, খেলনা ছবি ও অন্যান্য ধরনের কাজে এটিকে ব্যবহারের কারণে। ১৯৬০ সালের পর থেকে জেসপার জন্স (Jasper Johns, জ. ১৫ মে ১৯৩০), রবার্ট রজেনবার্গ (Robert Raushenberg, ১৯২৫–২০০৮) প্রমুখ শিল্পী এই মাধ্যমটিকে আবার চারুশিল্পের একটি অত্যাবশ্যকীয় ফর্ম হিসেবে পুনরুত্থিত করেন। তাই এখানেও গবেষক বোঝাতে চাচ্ছেন যে, লিথোগ্রাফিকে স্বল্প পরিসরে একটি ভাষা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুপ্ত আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

---

16 Albuquerque: ইউনাইটেড স্টেটের নিউ মেক্সিকোর একটি জনবহুল শহর

17 Dennis Gaffney is a freelance writer in Albany, New York. He has been a regular contributor to ANTIQUES ROADSHOW Online since 1998

18 Dennis Gaffney, "Tips of the Trade: Lithography 101", 9.10.2001, http://www.pbs.org/wgbh/roadshow/tips/lithography.html, অনুবাদটি বর্তমান গবেষকের।

19 Dennis Gaffney, *ibid*, অনুবাদটি বর্তমান গবেষকের।

ডান ইলিয়াস বলেন, মূল ছবির অনুরূপ বহুসংখ্যক কপি প্রস্তুত করার সবচেয়ে ভালো উপায়ই ছিল লিথোগ্রাফি। সে কারণেই এটি আজকের মেকানিক্যাল অফসেট প্রিন্টিংয়ে ব্যববহৃত হয়েছে। নিউজপেপার পড়তে, ক্যাটালগ ছাপতে ও দ্রুততার সঙ্গে অন্যত্র পাঠিয়ে দিতে অফসেট লিথোগ্রাফি ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এই বক্তব্যগুলোতে ভাষা হিসেবে লিথোগ্রাফির যৌক্তিকতা থেকে মাধ্যম হিসেবে এর অবদানের কথাই বেশি ব্যক্ত হয়েছে। ভাষা হিসেবে লিথোগ্রাফির আবির্ভাবের যৌক্তিকতাটি অনেকটা উহ্যই রয়ে গেছে।

২.২.৩ 'A low down on the Print Market' প্রবন্ধে লিথোগ্রাফি ভাষা সম্পর্কে সাহিত্য পর্যালোচনা

শিল্প ও সংস্কৃতিকে তরান্বিত করার জন্য ২০১১ সালে প্রকাশিত ভারতীয় স্বনামধন্য বেশ কয়েকজন শিল্পসমালোচকের কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় art etc নামক মাসিক পত্রিকায়। সেখানে 'A low down on the Print Market' প্রবন্ধে Sarmistha Maiti বলেন, খুব সাম্প্রতিক সময়ে প্রিন্টমেকিংয়ের মার্কেট সৃষ্টি হয়েছে এবং কিছু প্রিন্টের গুণাগুণ মূল্য মূল শিল্পকর্মেও সমমানের দাড়িয়েছে ['সেই মূল শিল্পকর্মটি যেটি থেকে কপি করা হয়েছে সেই শিল্পকর্মটির (অরিজিনাল কাজটির) সমমানের অবস্থানে পৌঁছেছে, যেটিকে অনুকরণ (কপি) করা হয়েছে।']। আরো বলা হয়, মকবুল ফিদা (এম.এফ) হুসেইনের শিল্পপ্রেমীরা যখন শোনেন যে, হুসেইনের গ্রাফিক প্রিন্ট পাওয়া যাচ্ছে তখন তারা আকৃষ্ট হন। তারা ভাবেন, হুসেইন নিজে প্রিন্ট নিয়েছেন। অথচ বাস্তবতা হলো, হুসেইন কখনো তার নিজের প্রিন্ট নিজে নেননি। কিন্তু তিনি পেইন্টিং এবং প্রিন্টে নিজে অরিজিনাল স্বাক্ষর করে থাকেন। হুসেইন বলেন:

> 'সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্ট এমন এটি রাস্তা তৈরি করে— যেটা সাধারণ মানুষের চাহিদা মেটাতে পারে। একটি মূল (অরিজিনাল) পেইন্টিংয়ের পক্ষে সেই সাধারণ কমন স্পেসে আসা কখনো সম্ভব নয়। সেখানে বলা হয়, একটি বস্তুর সৌন্দর্য হচ্ছে সব সময়ের জন্য আনন্দজনক এবং মিউজিয়াম বা জাদুঘর হলো সেই কমন স্থান, যেখানে মানুষ সেগুলোকে উপভোগ করতে পারে। দ্য ভিঞ্চির মোনালিসা ব্যক্তিগত কোনো বাড়িতে রাখা যায় না। এতদনুসারে গ্রাফিক হচ্ছে সোশ্যাল আর্ট ফর্ম...'[20]

---

[20] Sarmistha Maiti, "A Lowdown on the Print Market", 'art etc', 11August 2011, http://www.artnewsnviews.com/view-article.php?article=a-lowdown-on-the-print-market&iid=23&articleid=608&artorder=29#sthash. LHRmARjt.dpuf, অনুবাদটি বর্তমান লেখকের।

art etc. news & views is a monthly magazine published from India in order to promote art and culture. It intends to raise awareness about art all around India and the world. The magazine covers art exhibitions,

এ সমস্ত আলোচনা সামাজিক দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে প্রশংসনীয় এবং হুসেইনের পেইন্টিং থেকে প্রিন্ট করা অবস্থাটি (ফর্মটি) সেই অভিজ্ঞতার দাবিদার। কিন্তু প্রশ্ন হলো, হুসেইনের পেইন্টিং এবং প্রিন্টের মূল্য কি সমান হবে? অবশ্যই সমান হওয়া উচিত নয়। এই আলোচনায় প্রিন্টের মূল্য আসল (অরিজিনাল) পেইন্টিংয়ের মূল্য থেকে কম হওয়া উচিত বলে মনে করা হয়েছে।

কিন্তু গবেষক এখানে বলতে চেয়েছেন, হুসেইন যদি কোনো পেইন্টিংয়ের অনুকরণ না করে সরাসরি প্রিন্টকে ভাষা হিসেবে মনে করে শিল্পকর্ম রচনা করতেন, তাহলে এর মূল্য পেইন্টিংয়ের সমমানের বা তার থেকে বেশি হতো কি না— সে বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ভাষাগত ও অর্থনীতিগত এই উভয় দিকটির একটি ফাঁক সব সময়ে লেখকদের লেখায় অনুপস্থিত রয়ে গেছে।

আবার এ লেখাটিতেই উল্লেখ করা হয় যে, রাধিকা ধুমাল (Radhika Dhumal) বলেন, 'প্রিন্ট শুধু যান্ত্রিক রিপ্রডাকশন নয়, শিল্পীদের সরাসরি প্রিন্টে কাজ করার বিষয়টি অভিব্যক্তিক দিক দিয়ে পেইন্টিং বা ভাস্কর্যের মতোই গ্রহণযোগ্য। ছাপচিত্রকররা একটি কথা বলতে চেয়েছেন, তা হলো— আগ্রহী প্রিন্ট খরিদদার ও প্রিন্ট সংগ্রাহকদের প্রিন্ট সম্পর্কে জানতে ও পড়তে হবে।'[21] মূল (অরিজিনাল) প্রিন্ট আসলে কী? আবার যখন শিল্পী নিজে প্রিন্ট করেন না, কিন্তু গ্রাফিক আর্ট মার্কেটে যতটা মূল্য হওয়া উচিত তার চেয়েও বেশি মূল্যে বিক্রি করেন, শুধু অটোগ্রাফের মতো তার অরিজিনাল স্বাক্ষর করার কারণে। এটি কতটা স্থায়ী ও নীতিগত, সে বিষয়েও সাবধান থাকা দরকার বলে ইঙ্গিত করেছেন।[22]

এখানে গবেষক বলতে চেয়েছেন— ভাষাগত বিষয়টির উপস্থিতি সামান্য থাকলেও এর অর্থনীতি ও প্রতারণার বিষয়টিই বেশি প্রতিফলিত হয়েছে। কাজেই বলা যায়, ১৭৯৮ সালের পর থেকে থেকে ২১৩ বছর পরেও মানুষ যেখানে মূল (অরিজিনাল) প্রিন্টই চিহ্নিত করতে পারছে না, সেখানে স্বতন্ত্র ভাষা নিয়ে আলোচনা অনেক দূরের কথা। কাকে অরিজিনাল প্রিন্ট বলা হবে— সে বিষয়টিরই এখনো সিদ্ধান্ত শিল্পীরা নিতে পারেননি।

---

auction highlights, market trends, art happenings besides Antique, Collectibles, Fashion, Jewellery, Vintage, Furniture, Film, Music and Culture.

[21] Sarmistha Maiti, "A Lowdown on the Print Market", 'art etc' 11August 2011, http://www.artnewsnviews.com/view-article.php?article=a-lowdown-on-the-print-market&iid=23&articleid=608&artorder=29#sthash.LHRmARjt.dpuf,
[22] Sarmistha Maiti, *ibid.*

'A low down on the Print Market' প্রবন্ধে বর্ণিত অনুপম সৌদ (Anupam Sood)-এর বক্তব্য হলো— 'সকল এডিশন প্রিন্টের মূল্য সমান।' মাইতি বলেন, আজকাল অনেক দক্ষ প্রিন্ট খরিদদার প্রিন্টমেকিংকে অধিকতর নিরাপদ বিনিয়োগ বলে মত প্রকাশ করেন। আর্ট ব্লগ মার্কেটে প্রচুর লেখালেখি করেন, এমন একজন হলেন নিকোলাস ফরেস্ট (Nicholas Forrest), যিনি বলেন, প্রিন্টমেকিংকে অনেক সময় শিল্পের 'lesser form of art' (ঊর্ধ্বকমা বর্তমান লেখকের) হিসেবে দেখা হয়, কারণ বেশির ভাগ শিল্পী প্রিন্টমেকিংকে প্রধান বিষয় হিসেবে না নিয়ে অর্থ উপার্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এখনো প্রচুর শিল্পী আছেন যারা প্রাথমিকভাবে প্রিন্টমেকিংয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। সেই শিল্পীদের কাজ ক্রয় করলে শুধু ভালো বিনিয়োগই করা হয় না, অল্প মূল্যে অধিক মূল্যবান ও গুণসম্পন্ন শিল্পকর্ম কিনতে সমর্থ হন বলে যে বক্তব্য লেখাটিতে উঠে এসেছে, সে বিষয়ে গবেষক একমত হয়েছেন। ছবির মূল্যবৃদ্ধিতে এর অবস্থান বেড়েছে, প্রিন্ট শিল্প হিসেবে মূল (অরিজিনাল) পেইন্টিংয়ের কাছাকাছি মূল্য পাচ্ছে, সে বিষয়েও দ্বিমত নেই। আবার অনুপম সৌদের বক্তব্য অনুসারে 'প্রিন্টমেকিংকে এখন অরিজিনাল শিল্প এবং বলা যায়— যদি কেউ ৪০টি এডিশন নিয়ে থাকে, তখন সেটিও অরিজিনাল শিল্পের মতো শিল্প বলে বিবেচিত হতে পারে।'[23] সে বিষয়টিতেও একমত।

তবে এই আলোচনায়ও প্রিন্টমেকিংকে তার অর্থমূল্যে, এডিশন সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে পরিশ্রমসাধ্য বলে পেইন্টিংয়ের সঙ্গে তুলনা করেই একটি সমমানের শিল্প মানে উন্নীত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু স্বতন্ত্র ভাষার বিষয়টি এখানেও নজর এড়িয়ে গেছে।

২.২.৪ 'ছাপাখানার ইতিকথা' গ্রন্থের সাহিত্য পর্যালোচনা

ফজলে রাব্বির 'ছাপাখানার ইতিকথা' গ্রন্থের পৃষ্ঠা নম্বর ৬৬-তে 'আমাদের পূর্বাঞ্চলের ছাপাখানা' নামক অধ্যায়ে বলা হয়:

'আমাদের দেশে ও ভারতের ছাপাখানার প্রসারের কথা বর্ণনা করার পূর্বে আমাদের আশপাশের দেশগুলোর ছাপাখানার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। প্রকৃতপক্ষে এখানে কোনো ইতিহাস বর্ণনা করা হচ্ছে না। যা হচ্ছে সেটি কবে কোথায় ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল তার বর্ণনা।'

---

[23] Sarmistha Maiti, "A Lowdown on the Print Market", 'art etc' 11August 2011, http://www.artnewsnviews.com/view-article.php?article=a-lowdown-on-the-print-market&iid=23&articleid=608&artorder=29#sthash.LHRmARjt.dpuf,

এই বলে তিনি বার্মা (মিয়ানমার), রেঙ্গুন, শ্রীলঙ্কা, কোরিয়া, ভারত ইত্যাদি কয়েকটি দেশের মুদ্রণযন্ত্রের আবির্ভাব নিয়ে কথা বলেছেন। অথচ পূর্বাঞ্চলের মুদ্রণযন্ত্র নিয়ে সংক্ষেপেও লেখেননি, তবে বাংলা মুদ্রণ নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে লিখেছেন। আর লিথোগ্রাফি প্রসঙ্গ তো অনেক দূরের কথা। তিনি দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছিলেন: যে বছর গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ (১৯৬৯) প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রায় দশ বছর আগে এটি রচিত হয়েছিল। অর্থাৎ মোটামুটি ১৯৫৯-এর দিকের কথা বলা হচ্ছে। অথচ বাংলাদেশে ১৯৫৯, ১৯৬৯ এমনকি ১৯৯০ সাল পর্যন্ত লিথোগ্রাফির বাণিজ্যিক চর্চা অব্যাহত ছিল। তখন তিনি চাইলেই এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারতেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে একটি প্রেসও চালু নেই । এর চর্চিত নমুনাও সংরক্ষণ করা হয়নি। তিনি চাইলে তার প্রথম সংস্করণের পরও লিথোগ্রাফি সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করতে পারতেন। ২০০০ সালের জুলাই মাসে যখন দ্বিতীয় সংস্করণের উদ্দেশ্যে লিথোগ্রাফি সম্পর্কে ‘বর্তমান কাল’ বিষয়ক অধ্যায় এবং ‘লিথোপ্রিন্ট ও অফসেট’ নিয়ে লেখার প্রয়াস পেয়েছিলেন, তৎমধ্যবর্তী (১৯৮৮–১৯৯০) সময়েও বাংলাদেশে এর চর্চাচিহ্ন ছিল। কাজেই ওই সময়ের লেখকদের এ বিষয়ে দূরদৃষ্টির অভাবেই বিষয়গুলো ঘটেছে।

কাজেই যে গ্রন্থটিকে বাংলাদেশের মুদ্রণযন্ত্রের ইতিহাস সম্পর্কিত পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে পড়ানো হয় বা রেফার করা হয়, সে গ্রন্থটিতে লিথোগ্রাফি মুদ্রণশিল্পের অপ্রতুল সংগ্রহটি সবার দৃষ্টির আওতায় আসা প্রয়োজন। ফলে এ ধরনের আরো বেশ কয়েকটি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে, যেগুলোতে লিথোগ্রাফির ওপর আলাদাভাবে গবেষণামূলক কোনো তথ্য উল্লেখ নেই। আর লিথোগ্রাফি পদ্ধতির বৈচিত্র্য সম্পর্কে লেখকরা অবহিত ছিলেন না। কারণ তারা কখনো লিথোগ্রাফি বোঝার চেষ্টা করেননি। তাই লিথোগ্রাফির করণ-কৌশলগত বৈশিষ্ট্য তথা বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসূচক আলোচনা তারা করতে পারেননি। লিথোগ্রাফিকে মাধ্যম হিসেবে না দেখে মুদ্রণযন্ত্র হিসেবে দেখেছেন। তাই মাধ্যমকে ছাপিয়ে লিথোগ্রাফি যখন নানা পথপরিক্রমা পেরিয়ে ভাষার দাবি নিয়ে এসেছে, সে বিষয়টিই তারা আঁচ করতে পারেননি। অর্থাৎ আলোচনার ক্ষেত্রটিই তারা প্রস্তুত করতে পারেননি।

উপরোক্ত সাহিত্য পর্যালোচনার আলোকে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চর্চা বিষয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসা যায়। করণ-কৌশলগত দিক থেকে এ দেশের প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের সমন্বিত অনিচ্ছাকৃত প্রয়াসে এসেছে কিছু পরিবর্তন ও গুণগত তারতম্য। ফলে বলা যেতে পারে— অনেক ক্ষেত্রেই এখানে অনুসৃত হয়েছে বিকল্প পদ্ধতি। সাহিত্য পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে কন্টি ও গ্লাসমার্কারের চারিত্রিক তারতম্যের মাধ্যমে সে বিষয়টি প্রমাণ করা হয়েছে। এ সমস্ত করণ-কৌশল ও নতুন মাধ্যম ব্যবহারের ফলে ভাষাগত

দিক থেকে শক্তিশালী স্বতন্ত্র ভাষার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, যা পূর্বে কোনো গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তাই এর করণ-কৌশল বিবর্তন বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। যা পরে পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হবে। আর লিথোগ্রাফির ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে— মডার্ন সময়ে এসেও শিল্পীরা স্পষ্টত একে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে বলতে পারেননি। এই স্বতন্ত্র ভাষার কথাটিও এই গবেষণার পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করা হবে।

তবে এর স্বরূপটি অন্য অধ্যায়গুলোর সমন্বিত ফলাফলের মাধ্যমে ধীরে ধীরে গবেষণাটির শেষ অধ্যায়ে সিদ্ধান্তে আসা যাবে। আর লিথোচর্চার মধ্য দিয়ে এ দেশের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জনের লক্ষ্যে কিছু নতুন নতুন কৌশল এবং মাধ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে, যা সাহিত্য পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং যাকে বিকল্প পদ্ধতি বলা হচ্ছে। যেমন করণ-কৌশলের মধ্যে রয়েছে: (ক) ইমেজ তৈরিতে কন্টি বা ক্রেয়নের ব্যবহার, (খ) ইরেজ করে ইমেজ সৃষ্টি পদ্ধতি, (গ) ইমেজ তৈরিতে বলপয়েন্ট কলম ব্যবহার, (ঘ) ফ্লাট ইমেজ সৃষ্টিতে প্লেট লিথোগ্রাফি ব্যবহার, (ঙ) ওয়াশ আউট দ্রবণ (সলিউশন) সৃষ্টি, (চ) ইন্টাগলিও পদ্ধতি, (ছ) প্লেট লিথোগ্রাফির সঙ্গে ওয়াটারলেস লিথোর সংমিশ্রণ পদ্ধতি প্রভৃতি। মাধ্যম হিসেবে যে নতুন মাধ্যম পাওয়া গেল সেগুলো হলো: (ক) উড লিথোগ্রাফি পদ্ধতি (Planography on Wood surface), (খ) ওয়াটার বেইজ অয়েলি মিডিয়াম (Water base Oily Medium), (গ) প্লেট লিথোগ্রাফির সঙ্গে ওয়াটারলেস লিথোর সংমিশ্রণ পদ্ধতি প্রভৃতি। গবেষণাটিতে আলোচ্য বিষয়গুলোতে বেশ কিছু তত্ত্ব ও পরিলেখ ব্যবহৃত হয়েছে। এই পরিলেখ, তত্ত্ব ও পরিভাষাগুলো না বুঝলে এর গভীরতা অনুধাবনযোগ্য নয় বলে পরবর্তী অধ্যায়ে সংক্ষেপে এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. তৃতীয় অধ্যায়

তত্ত্ব, শিল্প ধারণা ও কৌশলের আলোচনা

“বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চার বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা” নামক অভিসন্দর্ভটি রচনা করতে গিয়ে বেশ কিছু তত্ত্ব, শিল্প ধারণা ও কৌশলের নাম বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লেখ করতে হয়েছে। সেখানে উল্লেখ্য বিষয়গুলো পাদটিকায় (ফুটনোটে) বর্ণনা করা সম্ভব হয়নি। বিষয়, ভাব ও প্রাসঙ্গিতার প্রয়োজনে এই তত্ত্ব, শিল্প ধারণা ও কৌশলগুলোকে মূল আলোচনার পূর্বে পৃথক অধ্যায়ে রাখা বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়েছে। কাজেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে সাধারণ ধারণা নিয়ে পরবর্তী আলোচনায় গেলে পাঠকসহ সকলেরই গবেষণাটির উদ্দেশ্য ও সমস্যা সমাধানমূলক উপায়গুলোর নিজস্বতা সহজে অনুধাবনযোগ্য ও যৌক্তিক বলে মনে হবে।

অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism) ও বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদ

সহজ কথায় বলতে গেলে, মানুষ গড়ের কাছ থেকে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে তার মাধ্যমে বস্তু বা কোনো কিছু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাকে ভাববাদী অভিজ্ঞতাবাদ বলে। আর মন যেহেতু সব কিছুকে ভেঙেচুরে অন্যভাবে ভাবতে পারে, তাই মনের এ ক্ষমতাকে গ্রহণ করে এ দুটির সমন্বয়ে বস্তু বা অবস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাকে বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদ বলা হয়। তা না হলে জগতের জ্ঞানমণ্ডল ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তূপে পরিণত হতো।

অস্তিত্ববাদ (Existentialism)

রেনেসাঁস যেমন একধরনের অস্তিত্ববাদের প্রশ্নে জড়িত, ঠিক তেমনি আধুনিক পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা, পুঁজিবাদের চরম উন্নতি ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। তার বিকাশের সমস্ত সম্ভাবনা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে নিঃশেষিত হয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই শুরু হয় তার তীব্র ক্ষয়ের যুগ। যে মানুষ এই আশ্চর্য মানবসভ্যতা সৃষ্টি করেছে সেই মানুষের হাতে তার নিশ্চিহ্ন বিলোপের সম্ভাবনার এক অযৌক্তিক, অসংগত এবং ভীতিজনক অবস্থা। এরই প্রকাশ হিসেবে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। মানুষের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, ন্যায়-নীতি, শৃঙ্খলা ভেঙে গেছে। এই বিপর্যস্ত অবস্থায় যে বুদ্ধিজীবী মানুষের জন্য মুক্তির এবং অগ্রসরের

আর কোনো পথ আবিষ্কার করতে অক্ষম তার পক্ষে নৈরাজ্যিক মনোভাব নিয়ে চরম ব্যক্তিবাদী হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না।

কিয়েৰ্কেগার্ড দর্শনের ক্ষেত্রে চরম ভাববাদ কিংবা ধর্মের ক্ষেত্রে খ্রিষ্টীয় যাজকদের ব্যাখ্যা কোনোটাকেই স্বীকার করতে পারেননি। নিজের জীবনে কিয়েৰ্কেগার্ড ছিলেন অস্বাভাবিকরূপে আত্মকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিবাদী। তার মতে, জগতে ব্যক্তির অস্তিত্বই হচ্ছে কেন্দ্রকথা। জীবন তার কাছে 'হয়/নয়' রূপ সংকটরূপে প্রতিভাসিত। অধ্যাপক ইমেরিটাস, মোহাম্মদ কিবরিয়াও অধ্যাপক মাহ্মুদুল হককে প্রায়ই বলতেন, 'কাজ করলে হয় ভালো হবে না হয় খারাপ হবে। আর কাজ না করলে তুমি ভালো থাকবে।' সর্বক্ষণ সে সংকটের মুখোমুখি। হয় তাকে এ পথ গ্রহণ করতে হয়, নয় ও পথ; হয় তাকে এটা করতে হবে, নয় ওটা। কিয়েৰ্কেগার্ডের মতে, সামগ্রিকভাবে দেখলে মানুষের জীবনে দুটি সংকট প্রধান। হয় সে পরিবেশকে গ্রহণ করে নিজের অস্তিত্বকে লুপ্ত করে দেবে, জীবনের ভোগে-দুর্ভোগে, আনন্দ-কষ্টে নিমজ্জিত হবে; নয়তো সে পরিবেশকে উপেক্ষা করে বিধাতার নিকট আত্মসমর্পণ করে সেই উপেক্ষার শক্তিতে আর আত্মসমর্পণের স্বাধীনতায় নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করবে।

বিষয় এবং বিষয়ী, জ্ঞান এবং জ্ঞাতার অবিচ্ছেদ্য সত্তাই হচ্ছে অস্তিত্ব।

অস্তিত্ববাদের প্রাথমিক প্রবক্তা কিয়েৰ্কেগার্ডের সিদ্ধান্তে ধর্মীয় ভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু সাম্প্রতিক অস্তিত্ববাদীগণ ধর্মের প্রচলিত অর্থে ধার্মিক নন। সার্ত্রে, কাম্যু প্রমুখ অস্তিত্ববাদীকে সাধারণত নাস্তিক বলে মনে করা হয়। এদের ভাবধারার মধ্যে নিটশের দর্শনের প্রভাব দেখা যায়। নিটশে 'ঈশ্বর'কে মৃত বলে ঘোষণা করেছিলেন। সার্ত্রের বক্তব্য হচ্ছে ঈশ্বরকে অস্বীকার করেই ব্যক্তিকে বাঁচতে হবে। আর ঈশ্বরই হচ্ছে ব্যক্তির জীবনে সমস্ত বন্ধনের মূল। সেই ঈশ্বরই যখন অস্বীকৃত, ব্যক্তি তখন অবাধ-স্বাধীন। তার নিজের কাছে ছাড়া অপর কারো কাছে তার কোনো জবাবদিহি করার নেই। অপর কারো কাছে দায়িত্ব বা কর্তব্যে সে দায়ী নয়। সবার বিরুদ্ধে তা বিদ্রোহ। সব কিছুকে, সব আইন-কানুন, ভালো-মন্দ, নিয়ম-নীতি, প্রেম-ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, দান-গ্রহণ সব কিছুকে অস্বীকার করার চেষ্টায় এবং সে চেষ্টার সফলতার মধ্যে ব্যক্তির অস্তিত্ব নিহিত। সেই চেষ্টাতেই ব্যক্তির অস্তিত্বের উপলব্ধি।

Appropriation (আমানত)

শিল্পে Appropriation হলো pre-existing objects অথবা images-এর ব্যবহার, যেখানে সামান্য অথবা কোনো রকম ট্রান্সফরমেশন ছাড়া (তাদেরকে) অ্যাপ্লাই করে (তাদেরকে) ব্যবহার করা হয়। appropriation-এর ব্যবহার history of the arts (literary, visual, musical and performing arts)-এ সিগনিফিকেন্ট ভূমিকা পালন করছে। visual arts-এ appropriate অর্থ বা বলতে বোঝায় মানুষের তৈরি visual culture, যেখানে (properly) সঠিকভাবে অ্যাডপ (adopt) করা গ্রহণ করা, (borrow) ধারণ করা, recycle or sample aspects (or the entire form) of human-made visual culture তৈরি করা হয়। এই রেসপেক্টে Readymades of Marcel Duchamp-এর কথা না উল্লেখ করলেই নয়।

Appropriation-এর সঙ্গে সংযুক্তিকতা এভাবে খুঁজে পাওয়া সম্ভব যে: সাবজেক্টিভিটি, নন-অবজেক্টিভিটি এবং অ্যাপ্রোপিয়েশনের সংজ্ঞা মতে, কোনো সাবজেক্ট দেখে অঙ্কন করলে তাকে সাবজেক্টিভ কাজ বলা হয়। কোনো বিষয়ে পূর্ব ধারণা না নিয়ে ক্যানভাসে অঙ্কন শুরু করে অবচেতন মন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করলে ছবিটি নিজে যা প্রকাশ করবে, সে ধরনের শিল্পকে নন-অবজেক্টিভ শিল্প বলা হয়ে থাকে। আর পোস্ট-মর্ডান সময়ে অ্যাপ্রোপিয়েশনকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে শিল্পকর্মটি 'একটি রিয়েল অবজেক্টের অথবা একটি একজিসটেন্ট ওয়ার্ক অফ আর্ট-এর ওপরও (একটি ওয়ার্ক অব আর্টকে ছাড়িয়ে) একটি স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম' হিসেবে পরিগণিত হয় 'the taking over, into a work of art, of a real object or even an existing work of art.' টেট গ্যালারি এই চর্চাকে চিহ্নিত করেছিল কিউবিজম ও দাদাইজমে ফেরত গিয়ে, চালু রেখেছিল ১৯৪০-এর দশকের সুরিয়েলিজম এবং ১৯৫০-এর দশকের পপ আর্ট পর্যন্ত। এটা আবার গুরুত্বসহকারে ফেরত এসেছিল ১৯৮০-র দশকের Neo-Geo[24] শিল্পীদের মধ্য দিয়ে।[২৫]

---

[24] Neo-Geo: Neo-minimalism হচ্ছে বিংশ শতাব্দী এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রাথম দিককার একটি অনিয়তাকার বা নির্দিষ্ট আকারশূন্য শিল্পান্দোলন। এটাকে অল্টার্নেটিভভাবে "neo-geometric" or "neo-geo" art বলা হয়। এর সাথে সংযুক্ত অন্যন্য টার্মগুলো হচ্ছে : Neo-Conceptualism, Neo-Futurism, Neo-Op, Neo-Pop, New Abstraction, Poptometry, Post-Abstractionism, Simulationism, and Smart Art. ইত্যাদি।

"Postmodern art" এর ক্ষেত্রগুলো বর্ণিত বা বিবৃত হয়েছে neo-minimalism (and related terms) হিসেবে যা সাধারণভাবে "reevaluation of earlier art forms."[2] এর সাথে ইনভল্ভ বা নিযুক্ত। এর বিভিন্ন রকম টাইটেল দিক নির্দেশনা দেয় যে,

আইকনোগ্রাফিক্যাল ও টেকনোলজিক্যাল

আইকনোগ্রাফিক্যাল

সামাজিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বা সামাজিক রাজনৈতিক কনটেক্সক্ট থেকে রিয়েলিজমের শিল্পীরা আইকনোগ্রাফিক্যাল (সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত) ও টেকনলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ছবি আঁকার মাধ্যমে বাস্তবতাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

টেকনোলজিক্যাল

অনেকগুলো টোন ব্যবহারকে ইঙ্গিৎ করে। সে ক্ষেত্রে পেনসিল, কলম, ভিডিওগ্রাফি, সাউন্ড মাধ্যম, সাহিত্য (লেখালিখির মাধ্যমে) প্রভৃতি মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে। রিয়ালিজমের শিল্পীরা আইকনোগ্রাফিক্যাল (সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত) ও টেকনলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ছবি আঁকার মাধ্যমে বাস্তবতাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

Illustrative and nonillustrative purposses

আলংকারিক (illustrative purposses) এবং অনালংকারিক প্রয়োজন অর্থাৎ চারুশিল্প (nonillustrative purposses, ক্রিয়েটিভ লিথোগ্রাফি চর্চা) বা মৌলিক সৃজনশীল।

ইসি-ফাউন্ট (EC-Fount)

অফসেট মেশিনে প্রিন্টিংয়ের সময় স্কাম ধরে গেলে এই ইসি-ফাউন্ট প্রিন্ট ক্লিনার হিসেবে বা আর্দ্রতা তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়। অফসেট মেশিনে ২-৩% ফিল্টার পানির সঙ্গে

মুভমেন্টটি বিংশ শতাব্দীর মধ্য এবং শেষ দিক থেকে শুরু হয়ে Minimalist art, Abstract Expressionism and its offshoots, plus Pop Art, Op Art এবং শিল্পন্নোয়নের অন্যান্য threads গুলো পর্যন্ত বিস্তৃত।

Contemporary যেসব শিল্পীদের এই টার্মের সাথে সম্পর্ক রয়েছে, আথবা যাদের কাজ এগুলোর সাথে সঙযুক্ত তারা হলেন Peter Halley সহ Philip Taafe, Lorenzo Belenguer, Ashley Bickerton, Jerry Brown, David Burdeny, Catharine Burgess, Marjan Eggermont, Paul Kuhn, Eve Leader, Daniel Ong, Tanya Rusnak, Peter Schuyff, Laurel Smith, Christopher Willard and Tim Zuck । Richard Serra এর steel sculptures গুলি "austere neo-Minimalism...." হিসেবে বিবৃত।

[25] Wikipedia, the free encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Appropriation_%28art%29, 10 march,2016

মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক লিথোগ্রাফি চর্চায় বাংলাদেশে প্লেটলিথোগ্রাফির স্কাম বা ময়লা সরানোর জন্য পানির সঙ্গে মিশিয়ে তুলির সাহায্যে প্লেটে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বিশেষ করে নন ইমেজ অংশে। এরপর পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। তা না হলে ওভার এচিং হয়ে প্লেট আবার রিসেনসিটিভ হয়ে উঠবে এবং পিট ‘টাইপ করশন’ (আরেক ধরনের স্কাম বা ডটসযুক্ত) প্রিন্টে চলে আসবে। তাই পরিমাণের অতিরিক্ত ব্যবহার প্লেটের জন্য ক্ষতিকারক।

স্টিপলিং প্রসেস (stippling) এবং ইন্টারমিংলিং (intermingling)

প্রথম দিকের ক্রমোলিথোগ্রাফি ছিল কালারের নির্দিষ্টসংখ্যক ডটস (distinctive deposits of colour/random dots/If the patterns are random, it was most likely printed by the chromolithography process & If the patterns are regular, it was most likely printed by offset printing process-Article 13) যাকে বলা হয় ‘সাইড-বাই-সাইড’ ছাপ ('side-by-side' printing)।[২৬] পরবর্তী সময়ে প্রিন্টাররা অনেক কালারে প্রিন্ট নেওয়ার জন্য কালারের পর কালার প্লেট বাড়িয়ে ছাপ নেওয়া শুরু করে। ফলে কালারের স্টিপলিং এবং ইন্টারমিংলিং ডটসের ফলাফল অনেকটা পয়েন্টালিস্টদের অনুরূপ দাঁড়ায়, যা অপটিক্যাল কালার মিক্সিংয়ের তৃতীয় অবস্থানকে নির্দেশ করে।[২৭]

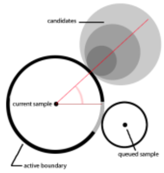

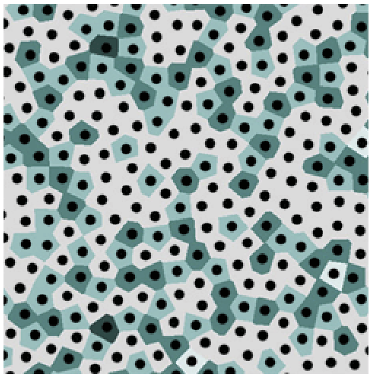

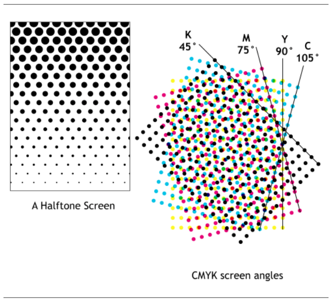

---

[26] 'Chromolithography: Origins', Wikipedia, the free encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography, 3 June 2014, at 08:30

[27] 'Chromolithography: Lithography', *Ibid.*,

Uncle Sam Supplying the World with Berry Brothers Hard Oil Finish, 1880, This cheaply produced chromolithographic advertisement employs a technique called stippling, with heavy reliance on the initial black line

স্ক্র্যাপিং প্রসেস

ইন্টাগলিও প্রসেসে মেশিনের রোলারটি গিয়ে প্লেট থেকে কাগজের ওপর চাপ সৃষ্টি করে লাইনের গভীর থেকে ইঙ্ককে কাগজে প্রতিস্থাপন বা ট্রান্সফার করে। আর লিথোগ্রাফি মাধ্যমে মেশিনের ওপর থেকে একটি স্ক্র্যাপার টিমপ্যানের ওপর পরে চাপ দিয়ে কাঁচিয়ে নিয়ে পেপারে ইঙ্ককে প্রতিস্থাপন করে। এই প্রক্রিয়াকে স্ক্যাপিং প্রসেস বলা হয়।

এস্টার গাম

এস্টার গাম হলো একটি জৈব লবন। এরাবিক গামও একধরণের জৈব লবন যা আঠালো।

এন্টিটিন্ট সলিউশন

গোলানো অ্যারাবিক গামের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ ফসফোরিক এসিড মিশ্রিত দ্রবণকে এন্টিটিন্ট সলিউশন বলা হয়। এটি খুব মৃদু এচিং হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে নন ইমেজ অংশকে আরেকটু এচিংয়ের মাধ্যমে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। মৃদুভাবে এচিং করার সময় এই দ্রবণটি ইমেজের কোনো ক্ষতি করে না।[২৮]

skeptical interpretation

অগবেষণামূলক বিষয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করার মতো প্রবণতাকে অন্তর্ভুক্ত করে জ্ঞান অন্বেষণ করাকে skeptical interpretation বলা যেতে পারে।

---

[28]GaroZ. Antreasian and Clinton Adams, *The Tamaind Book of Lithography: Art & Techniques*, New York, June 8, 1970, p. 275

Expensive litho process/ Expensive method

লিথোগ্রাফিতে অনেকগুলো স্টোনে কাজ করে একর পর এক ইম্প্রেশন নিয়ে প্রিন্ট নিতে গেলে অনেক সময় প্রয়োজন হয়। তখন এই পদ্ধতিকে Expensive litho process বলা হয়।

এসেটিক এসিড (গ্লাসিয়াল)

বাতাসের উপস্থিতিতে কাঠকে হিট করে চোলাই করা (ডিস্টিল) একধরনের গ্যাসই হলো এসেটিক এসিড। এই নির্জল (এনহাইড্রাস) এসেটিক এসিড ১১৮.১ ডিগ্রিতে সিদ্ধ হয়ে ফুটন্ত তরলে পরিণত হয়। ১৬.৬ ডিগ্রিতে এটি বরফে পরিণত হয়। এ জন্য এই পিওর এসেটিক এসিডকে সাধারণত গ্লাসিয়াল এসেটিক এসিড বলা হয়। পানি মিশ্রিত এসেটিক এসিড দ্রবণকে কাউন্টার এচিং বলা হয়। স্টোন ও প্লেট লিথোগ্রাফিতে পরিতলকে পুনরায় সেনসিটিভ (রি-সেনসিটিভ) করে তুলার জন্য ব্যহৃত হয়ে থাকে।[২৯]

এলাম ওয়াটার

পটাশ এলাম বা ফিটকিরির সঙ্গে পানি মিশিয়ে কয়েক ঘণ্টা রেখে দিয়ে ঝাঁকিয়ে যে দ্রবণ তৈরি করা হয় তাকে এলাম ওয়াটার বলা হয়। স্টোনে অ্যারাবিক গাম দেওয়ার পর স্টোন ডি সেনসিটাইজ হয়ে যায়। অর্থাৎ স্টোনে আর ইমেজ সৃষ্টি করা যাবে না। এমন সময় ইমেজকে সংশোধন করার প্রয়োজন হলে স্টোনকে আবার সেনসিটিভ করতে হয়। তখন স্টোনের ওপর এই এলাম ওয়াটার কিছুক্ষণ রেখে দিলে সাদা ধরনের বুদ্‌বুদ বুদ উঠতে থাকে এবং একটু পিচ্ছিল ভাব সৃষ্টি হয়। আরো কিছুক্ষণ রেখে দিলে আঙুল দিয়ে দেখলে খসখসে ভাব অনুভূত হবে। বুঝতে হবে এলাম ওয়াটার অ্যারাবিক গামকে পুরোপুরি অপসারণ করতে পেরেছে। এখন পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে নিলে স্টোনটি সেনসিটিভ হয়ে গেল। এবার আবার নতুনকওে ইমেজ সংযুক্ত করা যাবে। এটিই হলো এলাম ওয়াটারের কাজ।

এইচ বা এচিং (Etching)

এরাবিক গাম ও এসিডের দ্রবণকে একসঙ্গে এইচ বা এচিং বলা হয়ে থাকে।

---

[29] GaroZ. Antreasian and Clinton Adams, *ibid.*, p. 283

ওয়াশ-আউট (Wash out)

লিথোগ্রাফি মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রটি প্রিন্ট নেওয়ার পূর্বে তারপিনটাইন, লিথোটিন বা ওয়াশ-আউট দ্রবণ দিয়ে ইমেজকে তুলে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে রোলিং করতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে ওয়াশ-আউট বলা হয়ে থাকে।

কাউন্টার এচিং (Counter etching)

এই দ্রবণটি প্লেট-লিথোগ্রাফি প্রক্রিয়াতে বেশি ব্যবহৃত হয়। এক বালতি পানিতে দুই থেকে আট-দশ ফোঁটা ফসফরিক এসিড দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে প্লেটটিকে সেই পানি দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধুয়ে দিতে হবে। এ সময় খেয়াল রাখতে হবে, প্লেটে এই মিশ্রিত দ্রবণ এক মিনিটের থেকেও কম সময় রাখতে হবে। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় ‘কাউন্টার এচিং’। প্লেটে কাজ করার পূর্বে এই ‘কাউন্টার এচিং’ অবশ্যই করতে হবে (স্টোনে কাজ করার পূর্বে ‘কাউন্টার এচিং’ করার প্রয়োজন নেই)। এখন যত দ্রুত সম্ভব পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে শুকানোর জন্য একটি টেবিলে রাখতে হবে এবং কাজ করার উপযুক্ত হবে।

ক্রমো সিভিলাইজেশন (Chromo civilization)

একটি পেইন্টিংয়ের দামের তুলনায় যদিও একটি ক্রমোলিথোগ্রাফি সস্তা, তবু এখনো পর্যন্ত এটি ছাপচিত্রের অন্য মেথডগুলোর থেকে এক্সপেনসিভ।[৩০] উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য তারা সস্তা প্রক্রিয়া অর্থাৎ কালো রং দিয়ে একটা ইমপ্রেশন নিয়ে তার ওপর হয়তো লিথোগ্রাফি মাধ্যমে দুটি বা তিনটি ইমপ্রেশন দিয়ে রূপকল্প তৈরি করতেন। ব্যয় যখন কম হয়ে এসেছিল, তখন ক্রমোলিথোগ্রাফির এই মিথ্যা কাহিনি বা নির্মাণকরণ বা জাল দলিলগুলো শিল্প সৃষ্টির তুলনায় বাণিজ্যিক দিকে ব্যবহারের প্রক্রিয়াতে পরিণত হয়।[৩১] অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করার ফলে আমেরিকার একটি নির্দিষ্ট দশককে 'chromo

---

[30] Michael Clapper. 'I Was Once a Barefoot Boy! : Cultural Tensions in a Popular Chromo.' *American Art* 16(2002): 16–39; https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography, 3 June 2014, at 08:30

[31] 'Chromolithography: Opposition to chromolithography' https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography, 3 June 2014, at 08:30

civilization' নামেও অবহিত করা হয়।৩২ ক্রমোলিথোগ্রাফি কালার লিথোগ্রাফির প্রথম দিককার ফম বা প্রক্রিয়া। পরের দিককার কালার লিথোগ্রাফির মেথডে স্ক্রিন ডট প্লেট ব্যবহার করা হয়েছে (prepared from photo negatived) যেটা আমাদের আধুনিক অফসেট ছাপাইয়ের অনুরূপ।৩৩ অনেক মধ্যবিত্তের ঘরে 'art' সাজাবার জন্য কম দামে জলরঙের কপি করা ক্রমোলিথোগ্রাফ ছাপা হতো। একই সময় অনেকে মূল জলরং বা পেইন্টিং এঁকে যা আয় করতেন তার থেকে বেশি আয়ের আশায় ছাপ নিয়ে থাকতেন।৩৪

ক্রিটিক্যাল থিওরি (Critical theory)

Critical theory হচ্ছে একটি স্কুলের চিন্তাধারার ধরন– যার চাপের (ফলাফলের) মধ্য দিয়ে মূল্যায়ন প্রকাশিত হয় (বা রিফ্লেক্টেড হয়)। সামাজিক বিজ্ঞান (সোশ্যাল সায়েন্স) ও মানবিকতার বা মানবিক বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে (by applying knowledge from the social sciences and the humanities) সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রিটিসিজম করা হয় (critique of society and culture। টার্ম হিসেবে এর রয়েছে দু ধরনের ভিন্ন মূল (অরিজিন) এবং ইতিহাস: প্রথমটি সংঘটিত হয় sociology থেকে এবং দ্বিতীয়টি সংঘটিত হয় literary criticism-এর মাধ্যমে, এ দুটি বিষয়ের সমন্বয়ে এটি একটি umbrella term টার্ম হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যার ফলে বলা যায় যে, একটি থিওরি পাওয়া গেল যার critique-এর মাধ্যমে কোনো কিছুকে ব্যাখ্যা করা যায়; তখন তত্ত্ববিদ একটি ক্রিটিক্যাল থিওরি বর্ণনা করেন, যার মাধ্যমে যতটা সম্ভব খুঁজে বের করা যায়, যেমন এটা খোঁজে 'পরিবেশ থেকে মানবতার স্বাধীনতাকে, যেটা তাদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল।'

ক্রেয়ন-পেনসিল (Crayon pencil)

ক্রেয়ন দিয়ে তৈরি পেনসিলকে একসঙ্গে ক্রেয়ন-পেনসিল বলা হয়।

---

[32] Dawn Glanz, 'The Democratic Art: Pictures for a Nineteenth-Century America, Chromolithography 1840–1900 (Review).' Winterthur Portfolio 16(1981), pp. 96–97; 'Chromolithography: ~ Arrival in America' https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography, 3 June 2014, at 08:30

[33] 'Chromolithography Prints-Why they are considered 'originals', *Free Clip Art,The Stoke Solution and Stock Photos*, http://www.tssphoto.com/index.php?p=693, Saturday, December 26, 2009

[34] Chris Lane, 'Chromolithography' *Antique Prints Blog*, http://antiqueprintsblog.blogspot.com/2009/06/chromolithography.html, Friday, June 12, 2009.

ক্রেয়ন (Crayon)

ক্রেয়ন তৈরির সাধারণ সূত্র হচ্ছে:[৩৫]

(১) ৪ ভাগ মোম + ৬ ভাগ সাবান + ২ ভাগ ল্যাম্পব্লাক (চিমনির কালি)

(২) ৪ ভাগ মোম + ৫ ভাগ সাবান + ৩ ভাগ ল্যাম্পব্লাক (চিমনির কালি) + ২ ভাগ ট্যালো + ৪ ভাগ গালা (shellac)-এ

ক্রেয়ন

Grand narrative (বৃহৎ বর্ণনামূলক আখ্যান)

লিয়োটার্ড (Lyotard) উত্থাপন করেছিলেন যে, মেটানেরেটিভের *petits*(ক্ষুদ্র,তীক্ষ্ণ) *récits* এর পথ করে দেওয়া উচিত (অধিবিদ্যা), অথবা বর্ণনাকে অধিকতর বিনয় এবং সীমাবদ্ধ করে দেওয়া ('সীমাবদ্ধ করে দেওয়া', 'localized'), যেটা একটি নির্দিষ্ট ঘটনার প্রতি ফোকাস করার মাধ্যমে তার বৃহৎ বর্ণনামূলক আখ্যানকে (grand narrative) বিমুক্ত করতে পারে ('throw off')। ভিটগেনস্টাইনের কাজ এবং তার 'models of discourse' তত্ত্ব থেকে ধার নিয়ে লিয়েটার্ড গঠন করেন প্রগ্রেসিভ পলেটিকস (progressive politics)। বিভিন্ন দিকে যাওয়া ভিন্ন মত্রার সকল ধরনের এবং সব সময় স্থানীয়ের সঙ্গে মিলিয়ে একটি language-games কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে। পোস্টমডার্নিস্টরা মেটানেরেটিভকে প্রতিস্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন মানুষের বিভিন্ন মাত্রিক অভিজ্ঞতার মাধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট বা বিশেষভাবে স্থানীয় অনুষঙ্গ বা স্থানীয় কথা প্রসঙ্গ বা স্থানীয় সূত্রকে ফোকাস করার মাধ্যমে। তারা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন

[35] Jules Heler, *Printmaking Today*, 2nd edition, NewYork, p. 51

'তাত্ত্বিক নির্দিষ্ট দৃষ্টি কোণের সংখ্যাধিক্যতা'কে ('multiplicity of theoretical standpoints').

জ্ঞানালোক যুগ (Enlightment period)

জ্ঞানালোক যুগঃ সেই ভাবধারাকে সুস্পষ্টরূপ দান করে যাকে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ কর্তৃক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই যুগে বিভিন্ন ভাবধারা সংবলিত দার্শনিকবৃন্দের দ্বারা এই আন্দোলন প্রতিফলিত হয় এবং তারা সাধারণ শিক্ষা, অধিক জনপ্রিয় দর্শন, অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞান, পবিত্র গ্রন্থের সমালোচনা, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় অনুপ্রেরণা দান করেন। দার্শনিক লক, বার্কলে এবং হিউম এই যুগের দার্শনিক।

জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology)

আধুনিক সময়ে জ্ঞান অর্জনের দুটি উপায়ের বা অ্যাপিস্টোমলজিক্যাল তত্ত্বের (জ্ঞানতত্ত্ব) প্রয়োগ মডার্ন পিরিয়ডকে প্রভাবিত করেছে। একটি হলো অভিজ্ঞতাবাদ (মানুষের ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস) এবং অপরটি (দ্বিতীয় অ্যাপিস্টোমলজিক্যাল তত্ত্ব) হচ্ছে লজিক (reason or logic)। যেখানে বিজ্ঞান ও যুক্তি কখনো কখনো (কোলাবোরেটলি বা কখনো) একসঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কাজ করে। অর্থাৎ দুটি উপায়ের সমন্বয়ে এ সময় জ্ঞান অর্জন করা হচ্ছেঃ ফিলিং (পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে) এবং অপরটি হলো যুক্তির (reason) সমন্বয়ের মাধ্যমে।

অভিজ্ঞতাবাদ দুই রকমের হতে পারেঃ ভাববাদী অভিজ্ঞতাবাদ এবং বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদ। একটি হলো সাধারণ অভিজ্ঞতাবাদ এবং অপরটি হলো বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদ। সাধারণ অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, মানুষের মনে জন্মগতভাবেই কতগুলো মৌলিক ভাব থাকে। মানুষ এই মৌলিক ভাবগুলো বিধাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ভাববাদী অভিজ্ঞতাবাদে বস্তু সম্পর্কে মনের পূর্বাভিজ্ঞতা বা জন্মের সময় বিধাতা যে অভিজ্ঞতা দিয়ে দিয়েছিলেন সেটাই বস্তুর রিয়েলিটি বা বস্তুর অস্তিত বা বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান বলে ধরে নেওয়া হয়। আর মানুষের মন যেহেতু ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাকে ভেঙেচুরে তার জটিল যোগ-বিয়োগের মাধ্যমে বস্তু জগতের সম্পর্কে জ্ঞান তৈরি করতে পারে, সেহেতু মনের এই ক্ষমতাকেও স্বীকার করতে হয়, না হলে জ্ঞান কেবল ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তূপে পর্যবসিত হয়। তখন এ ধরনের অভিজ্ঞতাবাদকে বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদ বলা হয়।

বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদ অনুযায়ী আমাদের চক্ষু ,কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক– অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ হচ্ছে ভাবের বাহক এবং বস্তুজগৎ হচ্ছে ভাবের উৎসকেন্দ্র। অর্থাৎ শিল্পী শুধু সাধারণ অভিজ্ঞতাবাদী হলে তার ছবি বিধাতা প্রদত্ত ভাবের (ইন্দ্রিয়ানুভূতির) স্তূপে পরিণত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যায় (আর মনের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিল্পী এগিয়ে যান বলেই তার ছবিতে বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদ পরিদৃষ্ট হয়)।

অর্থাৎ, অভিজ্ঞতাবাদ (ভাববাদী আভিজ্ঞতাবাদ+বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদ) ক্রমান্বয়ে বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতাবাদে (সায়েন্টিফিক ইম্প্রেসিসিজমে) অভিব্যক্ত হয়ে মডার্নিস্ট মেথোডোলজিতে পরিণত হয়েছে বলা যায়।

গ্রাফিক গুণাগুণ (Graphic Quality)

সাদা-কালো উডকাট প্রিন্ট দিয়ে উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। একটি উডকাট প্রিন্টের খসড়া তৈরির সময় বলা হয় পোস্টার কালারের ব্লাক বা কালো রং নিতে হবে। এখন এই কালো রংটি দিয়ে কাগজে খসড়া তৈরি করা আরম্ভ হলো। যেকোনো ছবিতে রয়েছে হাইলাইট, মিডিল টোন ও হাই ডার্ক টোন। কিন্তু এই সলিড কালো রং দিয়ে শিল্পী কীভাবে মিডিল টোন তৈরি করবে? তখন ছবি আঁকার সময় কিছু মিডিল টোন সাদা টোনে এবং কিছু মিডিল টোন হাই ডার্ক টোনে (কালো টোনে) পরিণত হয়, কিন্তু তার পরও ছবিতে হাইলাইট ও মিডিল টোন একটু দূর থেকে ভালোভাবেই উপলব্ধি করা যায়। এই সমস্ত মিডিল টোন না একেও যখন ছবিতে সমস্ত টোনাল গুণকে বোঝানো সম্ভব হয় এবং ছবির স্পেস বিভাজন ঠিকমতো করা সম্ভব হয়, তখন প্রিন্টের এ ধরনের গুণাগুণকে গ্রাফিক কোয়ালিটি বলা হয়।

গ্লাসমার্কার (Glass marking pencil)

ডায়মন্ডের চায়না মার্কার ‘গ্রিজ পেনসিল’ হিসেবে পরিচিত। পোরাস (porous) তল (যেমন: স্টোন), কাঠ কাপড়ের মতো সকল ধরনের পিচ্ছিল পরিতল যেমন: গ্লেজ পটারি, গ্লাস, পলিশ স্টোন, প্লাস্টিক, মেটাল, রাবার ইত্যাদিতে অস্বচ্ছ (opaque) ভাবে বিভিন্ন রঙের এই পেনসিল দিয়ে অঙ্কন করা যায়, যা পানি প্রতিরোধ্য (ওয়াটার রেজিস্ট) এবং পিচ্ছিল বা অকোষী তল থেকে (non-porous finishes) তাড়াতাড়ি মুছে ফেলা যায়।

পেনসিলটি নন-টক্সিক (non-toxic) মোম দিয়ে তৈরি ক্রেয়নের মতো কিন্তু তার চেয়ে শক্ত।

গ্লাস মার্কার

Cheaper litho process/Cheap method

লিথোগ্রাফিতে অল্প কয়েকটি স্টোনে কাজ করে একর পর এক ইম্প্রেশন নিয়ে প্রিন্ট নিতে গেলে অনেক সময় বেসিক কালার দিয়ে প্রিন্ট নেওয়া প্রয়োজন হয়। তখন এই পদ্ধতিকে Cheaper litho process বলা হয়। যেমন লুত্রেকের লিথোগ্রাফি প্রাইমারি কালার দিয়ে কয়েকটি ইম্প্রেশনে প্রিন্ট নেওয়া হয়েছে বলে এগুলোকে চিপ মেথডে তৈরি লিথোগ্রাফি বলা হয়।

টিন্ট কালার (Tintin colour)

প্রেস ইঙ্কের মধ্যে একধরনের ‘টিন্টিন কালার’ নামে একধরনের কালার বাজারে পাওয়া যায়। এই কালার সরাসরি বা অন্য কালারের সঙ্গে মিশিয়ে সেই কালারেরর অস্বচ্ছতাকে কমিয়ে প্রয়োজন অনুপাতে স্বচ্ছ কালার তৈরি করা যেতে পারে।

DIY

do-it-yourself projects.

Double-mindedness (ছায়ার ছায়া)

ধরা যাক, একজন শিল্পী নেচারককে দেখার পরতার মনে একটি ছবি তৈরি হয়েছে। এই যে ছবিটি তৈরি হলো সেটিকে নেচার নামক একটি ছবির ছায়া বলা হয়ে থাকে। এরপর

শিল্পী যখন তার মনের ছবিটিকে ক্যানভাসে প্রতিস্থাপন বা ট্রান্সফার করেন, তখন সেই ছবিটিকে তার মনের ছবির ছায়া বলা হয়। ফলশ্রুতিতে ক্যানভাসের ছবিটি নেচার নামক ছবিটির ছায়ার ছায়াতে পরিণত হলো। তাই প্লেটো বলতেন: শিল্পীরা ছায়ার ছায়াকে অঙ্কন করে থাকেন। মডার্নিজমের সম্পর্ক যে ডাবল মাইন্ডনেসের (ছায়ার ছায়া) ভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত– সে বিষয়টি সুস্পষ্ট।(পরবর্তী পোস্টমডার্নিজমে এই ডাবল মাইন্ডনেস থেকে সরে এসেছে বা রিজেক্ট করেছে)। কারণ প্লেটোর মতে শিল্পী যে বস্তুকে ক্যানভাসে আঁকতে চাইছেন, তার অস্তিত্ব (বস্তুও অস্তিত্ব) এবং মনের ছবির অস্তিত্বেও মধ্যে একটি ফারাক রয়েছে। আবার মনের ছবির অস্তিত্ব ও ক্যানভাসের মধ্যে আঁকা ছবির অস্তিত্বেও মধ্যে আরেকটি ফারাক রয়েছে। এ দুটি ব্যবধান ঘোচানোর জন্য পৃথিবীতে নানান ভাষার জন্ম হয়েছে। শিল্প একটি ভাষা হওয়ার কারণে শিল্পীরা যেমন প্রথম থেকেই ছায়ারা ছায়াকে বা ডাবল মাইন্ডনেসকে অনুসরণ করে ছবি এঁকেছেন, তেমনি একই সঙ্গে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে মডার্ন সময়ে এসে মনের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে যুক্তির সঙ্গে বিবেচনা করে আঁকার বা কিছু করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

ডেবারিং

বিশেষ করে এচিং মাধ্যমে ইঙ্ক প্রস্তুতের সময় বিশেষ প্রক্রিয়াতে অলিভ-অয়েল তৈলের সঙ্গে ফ্যাক্টরির চিমনিতে জমে থাকা কালো কালি বা ডাস্ট মেশাতে হয়। মেশানোর জন্য স্প্যাচুলা বা ড্যাবার ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে স্প্যাচুলার থেকে ড্যাবার ব্যবহার সুবিধাজনক। এই ড্যাবার দিয়ে যখন মেশানোর প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে থাকে, তখন তাকে ড্যাবারিং করা বলা হচ্ছে।

ডেবার

ইনটালিয়ো মেথডের এচিংয়ের প্লেটে ইঙ্ক লাগিয়ে মশারির কাপড়, পলেস্টার বা ঝুট কাপড় ভাঁজ করে মোছা হয়। প্লেট মোছার সময় কাপড় বা ঝুটগুলো যেভাবে ভাঁজ করে তৈরি করা করা হয়, সে ধরনের ভাঁজ করে করা কাপড়কে ড্যাবার বলা হয়।

তাপেম

এচিং সলিউশন (তাপেম): টেনিক এসিড+অ্যারাবিক গাম দ্রবণ+ফসফোরিক এসিড

তুষ (Tusch)

লিথোগ্রাফিক তুষ ক্রেয়নের মতো একধরনের উপাদান বা উপকরণ, যা গ্রিজকে ধারণ করে। কিন্তু এটিকে ব্রাশ বা কলমের মতো করে সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। ইন্ডিয়ান ইঙ্ক বা অন্য ওয়াশ পদ্ধতির মতো তুষ দিয়ে ফ্লাট, গাঢ় (রিচ) কালো লাইন সৃষ্টি করার যায়। এটিকে তরল (liquid tusch) ও নরম চকলেটের (stick tusch) আকারে পাওয়া যায়। তুষ ওয়াশের ড্রাই ব্রাশ ইফেক্টও সফলভাবে প্রিন্টে চলে আসে। কিছু শিল্পী এই তুষের ইফেক্টের জন্য স্টোনে মিহি গ্রেইন করে থাকেন। এই তরল তুষটি ব্যবহারের পূর্বে ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিতে হয়। পাতলা লিথোটিন, গ্যাসোলিন অথবা ডিস্টিল্ড পানির সঙ্গে তুষের মিশ্রণ ঘটিয়েও ইমেজ তৈরি করা সম্ভব। তুষের সঙ্গে নানা উপাদানের মিশ্রণে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ফল পাওয়া যায়। পাতলা না করে ঘন তরল তুষ সরাসরি ব্যবহার করে সলিড ব্লাক সৃষ্টি করা যায়। আবার বিটুমিন ও তারপিনটাইনের দ্রবণের সঙ্গে একে মিশিয়েও রিচ ব্লাক প্রিন্টে আনা সম্ভব। ক্রেয়ন এবং তুষ একসঙ্গে ব্যবহার করেও ইমেজ তৈরি করা যায়।

নরম চকলেটের (কেক) আকৃতির তুষ

Plate , Rokonuzzaman, Stone lithography, Lithographic tusch wash, 2009, 25x23 cm.

Neo-Geo

Neo-minimalism হচ্ছে বিংশ শতাব্দী এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রাথম দিককার একটি অনিয়তাকার বা নির্দিষ্ট আকারশূন্য শিল্পান্দোলন। এটাকে অল্টারনেটিভভাবে 'neo-

geometric' or 'neo-geo' art বলা হয়। এর সঙ্গে সংযুক্ত অন্য টার্মগুলো হচ্ছেঃ Neo-Conceptualism, Neo-Futurism, Neo-Op, Neo-Pop, New Abstraction, Poptometry, Post-Abstractionism, Simulationism, and Smart Art. ইত্যাদি।

'postmodern art'-এর ক্ষেত্রগুলো বর্ণিত বা বিবৃত হয়েছে neo-minimalism (and related terms) হিসেবে, যা সাধারণভাবে 'reevaluation of earlier art forms.'[2]-এর সঙ্গে ইনভল্‌ভ বা নিযুক্ত। এর বিভিন্ন রকম টাইটেল দিকনির্দেশনা দেয় যে, মুভমেন্টটি বিংশ শতাব্দীর মধ্য থেকে শেষ দিক থেকে শুরু হয়ে Minimalist art, Abstract Expressionism and its offshoots, plus Pop Art, Op Art এবং শিল্পন্নোয়নের অন্য threadsগুলো পর্যন্ত বিস্তৃত।

Contemporary যেসব শিল্পীর এই টার্মের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে আথবা যাদের কাজ এগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত তারা হলেন Peter Halleyসহ Philip Taafe, Lorenzo Belenguer, Ashley Bickerton, Jerry Brown, David Burdeny, Catharine Burgess, Marjan Eggermont, Paul Kuhn, Eve Leader, Daniel Ong, Tanya Rusnak, Peter Schuyff, Laurel Smith, Christopher Willard and Tim Zuck। Richard Serra-এর steel sculpturesগুলো 'austere neo-Minimalism...' হিসেবে বিবৃত।

play

play: যখন একটি শিশু আরেকটি শিশুর সঙ্গে কথা বলে, তারা কোন ভাষায় কথা বলে তা আমাদের জানা নেই। অথচ তারা একে অপরকে এমনভাবে ডাকছে যে তারা নিজেরা কমিউনিকেট করতে পারে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না। এখন এই ধরনের খেলাকে আমরা সেল্ফ ডিসেপশন (self-deception) বলতে পারি। আর যদি কোনো খেলোয়াড় খেলতে নামে, সে তার ইডের জায়গা থেকে হিংসাত্মক গুণ নিয়ে ইমাজিনেশনের মাধ্যমে কল্পনা করে যে, সে কীভাবে খেলবে। এমন ইমাজিনেশনে অন্যের ক্ষতি করা (যেমন ফাউল করতে পারবে না) চলে না। কাজেই কনশাসলি সে ইমাজিনেশনের মাধ্যমে কল্পনা করবে– যা সে বাস্তবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে কিন্তু পূর্ণতা আনতে পারবে না। এমন খেলাকে আমরা কন্ডিশন অফ দ্য কনশাস সেল্ফ– ডিসেপশন বলতে পারি। অর্থাৎ শিল্প এমন

ধরনেরই খেলা যেটা conscious self-deception-এর এমন অবস্থার কন্ডিশনের ওপর নির্ভর করে, যার একটি ভেল্যু অর্থাৎ sence of values ; the morality=refining situation of beauty, truth and goddness.

Pluralism (বহুত্ববাদ)

একটি কমন সিভিলাইজেশনের মধ্যবর্তী সমাজের একটি অবস্থা বা ক্ষেত্র– যার ভেতরকার বিভিন্ন যেমনঃ নৃতাত্ত্বিক, জাতিসংক্রান্ত (সম্প্রদায়), ধর্মীয় অথবা সোশ্যাল গ্রুপের সদস্যরা একটি স্বায়ত্তশাসন (অটোনোমাস/স্বায়ত্তশাসিত-autonomous) অংশগ্রহণ মেইনটেইন করে এবং তাদের সাংস্কৃতিক ও বিশেষ চাহিদার উন্নতির ক্ষেত্রে সেটা মেইনটেইন করেন।

পিকটোরিয়াল ডকুমেন্টেশন (Pictorial documentation)

ভূদৃশ্য বা যেকোনো কিছুকে তার সময় অনুযায়ী ধরে রাখার জন্য কম্পানি আমলে ছবি অঙ্কন করে রাখা হতো তখন এ ধরনের চিত্র গুণাগুণকে পিকটোরিয়াল ডকুমেন্টেশন বলা হয়ে থাকে।

পেপার প্যোকিং

লিথোগ্রাফিতে প্রিন্ট নেয়ার সময় প্লেটের উপর কমূল কাগজটি রাখা হয়। তার উপর দুটি কার্টিজ পেপার ও আট-দশটি নিউজপ্রিন্ট কাগজ দিয়ে তার উপর টিমপ্যান দিতে হয়। এই কার্টিজ ও নিউজপ্রিন্ট কাগজগুলোকে একসঙ্গে পেপার পেপার প্যোকিং বলা হয়ে থাকে।

পিট-টাইপ করোশন

অ্যালুমিনিয়াম প্লেট-লিথোগ্রাফিতে কয়েকটি কারণে পিট-টাইপ করোশন (অসংখ্য বিন্দু ধরনের ডটস স্কাম বা ময়লা) প্রিন্টের সময় চলে আসে। স্টোন লিথোগ্রাফিতে এচিং বেশি করলে ইমেজ উধাও হয়ে যায়, কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে বেশি পরিমাণ এচিং করতে গেলে আবার রিসেনসিটাইজ হয়ে যায়। মূলত সে কারণেই এরূপ ঘটে থাকে। সেই কারণগুলো হলোঃ

(১) বেশি পরিমাণে এসি ফাউন্ট ব্যবহার করলে এ ধরনের পিট-টাইপ করোশন সৃষ্টি হতে পারে।

(২) বেশি পরিমাণে তাপেম দিয়ে এচিং করে স্কাম ছোটানোর চেষ্টা করলে এ ধরনের পিট-টাইপ করোশন সৃষ্টি হতে পারে।

Plate: Rokonuzzaman, Plate Lithography, 12 x 11inch, 2012

Example of Pit type of colour dot (close Photography)

পিএইচ (pH)

পিএইচ (pH) হচ্ছে এসিড ও ক্ষার পরিমাপের একক। এটি ল্যাটিন পটেনশিয়া পলি হাইড্রিন (Potentia Hydrogenii) থেকে এসছে এবং হাইড্রোজেন আয়নের লগারিদমকে বর্ণনা করে উপস্থাপন করে। অন্যভাবে বলতে হলে পিএইচ ব্যালান্স হচ্ছে একটি পরিমাপক, যা দিয়ে অ্যাকোয়া (পানি) দ্রবণে এসিড ও ক্ষারীয় উপাদানের পরিমাণকে জানা যায়। দ্রবণটি অল্প পিইচ সম্পন্ন হলে তাকে এসিডিক দ্রবণ বলা হয়। আর উচ্চ মাত্রাসম্পন্ন দ্রবণকে ক্ষারীয় দ্রবণ বলে। ০-১৪-এর মধ্যে পিইচ স্কেল ৭ হলে সেই দ্রবণকে নিউট্রাল বা নিরপেক্ষ দ্রবণ বলা হয়ে থাকে। পানির অল্প পিএইচ (এসিডিক) অবস্থা পানির ক্ষয়কারক গুণের জন্য দায়ী।

ফ্যাট

যেটি সাধারণ তাপমাত্রায় তরল থাকে তাকে থের বলা হয়। আর যেটি সাধাণ তাপমাত্রায় কঠিন হয়ে যায় ব জম যায় তাকে চর্বি বলা হয়ে থাকে।

ফেন্টাসম্যাগোরিক্যাল মেটামরফসিস (phantasmagorial metamorphosis)

ফেন্টাসম্যাগোরিক্যাল মেটামরফসিসের (স্বপ্নে দেখার মতো করে রূপান্তরিত করা) মাধ্যমে উপস্থাপন করে (phantasmagorial metamorphosis of plant,animal and human forms) চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। অডিলন রেডনের কাজে এ বিষয়টি লক্ষণীয়। রেডন কিছু কিছু ক্ষেত্রে রডলফ ব্রেসডিনের (১৮২২–৮৫) (Rodolphe Breesdin) থেকে প্রভাবিত (ইনফ্লুয়েন্স) হয়েছিলেন। নেদারল্যান্ডিশ পেইন্টারদের মধ্যে হিয়েরোনিমাস বস্ক (Hieronymus Bosch)-এর ট্র্যাডিশনের পর এবং ১৫ শতকের শেষের দিকের ও ষোড়শ শতাব্দীর শুরুর দিকে পিটার ব্রুগেলের মতো যে ট্র্যাডিশন চলছিল তার পররবর্তী সময়ে ব্রেসডিন (ভ্রমণকারী, সন্ন্যাসী) বাস্তবতাকে অবাস্তবভাবে এতে পুলকিত হয়েছেন।

Plate: Hieronymus Bosch, Last judgement

শিল্পী ব্রেসডিন গাছ ও জীবজন্তুর পরিবেশ দ্বারা আবিষ্ট ছিলেন এবং তার লিথো এবং এচিং ইমাজিনেশন থেকে তৈরি। মানুষ এবং বর্ণনাধর্মী উপাদান প্রায়ই মিনিয়েচার প্রপরশনে ছোট হয়ে এসেছে, যার চতুর্দিকটা সচেতন এবং অদ্ভুত ডিটেইল করে আঁকা (the human, narrative element is often reduced to miniature proportions and surrounded with infinite macabre and grotesque detail).

ফটোক্রম পদ্ধতি (photochrom)

ফটোক্রম পদ্ধতিটিকে ক্রমোলিথোগ্রাফির রঙিন লিথোচিত্র অঙ্কনের একটি পদ্ধতি বলা যায়। এটি একটি রঙিন ফটোগ্রাফির সাদা-কালো নেগেটিভ থেকে স্টোনে ইমেজ ট্রান্সফার করা হয়। ধরা হলো সেটি থেকে হলুদ রঙের প্রিন্ট নেওয়া হবে। এবার আরেকটি প্লেটে আবার সাদা-কালো নেগেটিভ থেকে স্টোনে ট্রান্সফার করে সেখান থেকে হঞ্চ চক (ছোট স্লেক স্টোন বা চিকন স্টোন দিয়ে) হলুদ অংশের জায়গাটি ঘষে নিয়ে নীল রঙের ইম্প্রেশনে প্রিন্ট নেওয়া হলো। এভাবে কয়েকটি স্টোনের মাধ্যমে যখন একটি রঙিন লিথোচিত্রের ছাপ নেওয়া হয় সে প্রক্রিয়াটিকে ফটোক্রম লিথোগ্রাফি পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে। হ্যান্স জ্যাকোব স্মিথ (Hans Jakob Schmid, ১৮৫৬–১৯২৪) ১৮৮০ সালে পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন।[৩৬]

ফটোক্রম (লিথোগ্রাফি) পদ্ধতিতে নিউ ইয়র্ক শহরের Mulberry Street-র দৃশ্য, ১৯০০

ফেনোমেনন (Phenomenon)

ফেনোমেনন (Phenomenon) অর্থ বিশেষ ধরনের খেলা, যা শিল্পের নন্দনতত্ত্বেও আলোচনায় ব্যবহৃত হয়।

---

[36] 'Photochrom', 'Wikipedia, the free encyclopedia', 26 December 2016, at 19:52, https://en.wikipedia.org/wiki/Photochrom,

বিশ্লেষণী দর্শন

বিশ্লেষণী দর্শন প্রয়োগবাদেরই (শব্দের ব্যবহার তার ব্যবহারিক প্রয়োগের ওপর নির্ভও করবে।) পরবর্তী আরো একটি বিশ্লেষণী উন্নতির ধারা এবং একধরনের লিটারারি মুভমেন্ট বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই সময় ম্যুর ঘটনার অনুভূতিকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে প্রচলিত ভাষার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি দর্শনে বিশ্লেষণী পদ্ধতির অনুসরণ করেন। তার মতে, ব্যবহৃত শব্দ সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার ও অর্থ স্পষ্টীকরণের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আর রাসেল (১৮৭২–১৯৭০ খ্রি.) কথার বা বচনের সংগঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[১] ম্যুরকে অনুসরণ করে রাসেলও ভাববাদবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। মূলত ভাববাদবিরোধী আন্দোলনে রাসেল ছিলেন ম্যুরের চেয়েও বেশি সোচ্চার। ভাববাদীদের চরম একত্ববাদের বিরোধিতা করে দর্শনে তিনি প্রবর্তন করলেন যৌক্তিক পরমাণুবাদ (Logical Atomism) নামক এক বহুত্ববাদী মতবাদ। এ মতবাদ অনুযায়ী, অসংখ্য যৌক্তিক পরমাণু সমন্বয়ে গঠিত এ জগৎ এবং যৌক্তিক পরমাণুসমূহের মন-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতে পারে। রাসেলের মতে, এই অসংখ্য পরমাণু সমন্বয়ে গঠিত জগৎকে ভাষা বা বচনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ফলে দেখা গেল, এই প্রথম প্রাক-সফিস্ট যুগের সেই মৌলিক বস্তু অর্থাৎ একত্ববাদ থেকে বহুত্ববাদে পৌঁছিল যৌক্তিক পরমাণুবাদ দ্বারা এবং এই প্রথম বলা হলো যে, ভাষার মাধ্যমে এই অসংখ্য পরমাণু সমন্বয়ে গঠিত জগৎ বা বস্তুকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব– অর্থাৎ এ সময়ে (১৯৭০-এর মধ্যেই) এসে বস্তুর বা সত্তার স্বরূপ মানুষ ভাষার কাঠামো দিয়ে প্রকাশ করতে পারবেন– এমন সম্ভাবনার কথা বলেন। ফলে এটিও অনুমেয় যে, রাসেলের এ তত্ত্বের সময়টি মূলত ভাষা দর্শনের বিশ্লেষণের যুগ। সত্তার স্বরূপ তাই ভাষার কাঠামোতে প্রতীয়মান হয়।[৩৭]

বার্নিশার বা স্ক্যাপার

এচিং অ্যাকোয়াটিন্টে কোনো লাইন বা অতিরিক্ত কালো টোনকে ঘষে যে স্টিলের পাত দিয়ে হালকা টোনে পরিণত করা হয় তাকে বার্নিশার বলা হয়। আর এচিং অ্যাকোয়াটিন্টে কোনো লাইন বা অতিরিক্ত কালো টোনকে না ঘষে ব্লেডের ন্যায় ধারালো টুলস দিয়ে প্লেটটিকে চেঁছে ফেলে হালকা টোনে পরিণত করাকে বার্নিশার বলা হয়।

---

[37] মোহাম্মদ আব্দুল হালিম, 'দার্শনিক প্রবন্ধাবলি', প্রথম সং, মে ২০০৩, বাংলা একাডেমী, পৃ.১০

বিটুমিন

বাংলায় বিটুমিনকে আলকাতরা বলা হচ্ছে।

বার্জার রবিয়াল্যাক থিনার-৬ (Berger Robbialac, Thinner T-6)

'বার্জার রবিয়াল্যাক থিনার টি-৬' অর্গানিক দ্রবণের একটি মিশ্রণ, যা রবিয়াল্যাক সিনথেটিক এনামেল, ঝিলিক সিনথেটিক এনামেল, JIE, BIE, সিবোর্ন এনামেল, মেরিন এনামেল, সাধারণ প্রাইমারসহ সকল অ্যালকিড রেজিনে তৈরি যেকোনো রং পাতলা করার কাজে ব্যবহার করা হয়। এই থিনার টি-৬ সঠিকভাবে ব্যবহার করলে রং প্রয়োগে ভালো ফল এবং দীর্ঘস্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়। সব ধরনের ব্যবহার্য যন্ত্রাংশ পরিষ্কার করতে এই থিনার টি-৬ অনন্য।[৩৮]

মেকানিক্যাল রিপ্রডাকশন (mechanical reproductions)

একটি প্রিন্টের বা ছাপচিত্রের ফটোগ্রাফ করে তাকে যদি অফসেট প্রিন্টিং মেশিন দিয়ে ক্যাটালগের মতো করে হাজার হাজার প্রিন্ট নেওয়া হয়, তখন সে ধরনের প্রিন্টকে রিপ্রডাকশন প্রিন্ট বলা হয় (reproductions print)। আর প্রিন্টমেকিংয়ের এডিশনের একেকটি প্রিন্ট একেকটি অরিজিনাল ও স্বতন্ত্র প্রিন্ট হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

Mystrious

'রহস্যপূর্ণ' শব্দটির বেলায় আইনস্টাইন বলেন, 'রহস্যপূর্ণ' হচ্ছে রহস্যপূর্ণ। এটি সকল সত্যিকার শিল্প ও বিজ্ঞানের উৎস। যার নিকট এই আবেগ এক আগন্তুক, যিনি বিস্ময়বোধে থমকে দাঁড়ান না এবং যিনি ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধায় আবিষ্ট হন না, তিনি মৃতবৎ, তার চক্ষু মুদ্রিত... সচেতন জীবনের রহস্য অনুধ্যান করা আমার জন্য যথেষ্ট, যা অনন্তকালব্যাপী নিজেকে চিরস্থায়ী করে যাচ্ছে, জগৎ গঠনের (structructure of the universe) রহস্য সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করাও আমার জন্য যথেষ্ট, যা আমরা অস্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারি এবং প্রয়াস চালাই বিনীতভাবে প্রকৃতিতে প্রকাশিত বুদ্ধির (intelligence) ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকে উপলব্ধি করতে।[৩৯]

---

[38] বার্জার থিনারের বোতলের গায়ে লিখিত অংশ থেকে উপস্থাপিত

[39] মোহাম্মদ আব্দুল হালিম, 'দার্শনিক প্রবন্ধাবলী', প্রথম সং, মে ২০০৩, বাংলা একাডেমী, পৃ.৩৮

Maurice Estève

মাউরিস স্টিভ (Maurice Estève) ফ্রান্সের কুলান শহরে জন্ম নিয়েছিলেন ২ মে ১৯০৪ সালে। ১৯১৩ সালে তিনি পিতা-মাতার সঙ্গে প্যারিসে স্থানান্তরিত হন। আর এখানেই তিনি তার শিল্পশিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন। ১৯২৩ সালে একটি টেক্সটাইল ফ্যাক্টরিতে এক বছরের জন্য নকশাবিদ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯২০ সালে লুভর মিউজিয়াম ভ্রমণ করতে গিয়ে তিনি জিন ফকেট (Jean Fouquet) এবং পাওলো উসেলো (Paolo Uccello) নামক পেইন্টারের কাজ দেখে বিস্মিত হয়েছেন। আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে পল সেঁজার শিল্পকর্ম তার ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। ১৯২৪ সালে তিনি একাডেমি কোলারোসি নামক ফ্রি স্টুডিওতে কাজ করে স্বশিক্ষিত শিল্পী হয়ে উঠেছেন। এখানেই তিনি তার মোটিফগুলো ব্রাক ও ফার্নান্দ লেজারের মতো প্রয়োগ করেছিলেন। ফলে তখন তিনি কিউবিস্ট ফভইজম ধরনের শিল্প সৃষ্টি করেন।

১৯২৮ সালে তিনি (মাউরিস স্টিভ) রিয়েলিজম থেকে সরে আসতে শুরু করেছিলেন এবং লেজার, মাতিস ও বোনর্ডের শিল্পকর্ম দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৯৩০ সালে প্যারিসে তার প্রথম একক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল গ্যালারি ভ্যানগটে (Galerie Yvangot)। Robert Delaunay-এর ১৯৩৭ সালের Paris International Exhibition-এর বিশাল ডেকোরেটিভ প্যানেলগুলোর জন্য তিনি সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৪০ সালের দিকে শৈলীগত দিক থেকে তার অবয়বধর্মী, জড় জীবন এবং ল্যান্ডস্কেপ কম্পোজিশন ও শক্তিশালী কালারগুলো ক্রমান্বয়ে অ্যাবস্ট্র্যাক্টশনে পরিণত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে শেপগুলোর মধ্যবর্তী রিচ, বোল্ড কালারের শক্ত বুনন। কিছু সংখ্যক জলরং ও কোলাজ করেছিলেন এবং ১৯৫৭ সালে বার্লিন কোর্টের চার্চে গ্লাসের নকশা করেছিলেন।

স্টিভের ব্যাপক (extensive) কাজগুলোকে পেইন্টিংয়ের ঘরানার মধ্যে সীমানা টানা যায় না। তা ছাড়া তিনি কোলাজ, টেক্সটাইল ডিজাইন ও ম্যুরাল শিল্পকর্ম সৃষ্টিতেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছেন। স্টিভ এভানট-গ্রাডের বহির্মুখীনতাকে এড়িয়ে চলেছেন। কিন্তু ১৯৪৫ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এখনো পর্যন্ত যারা ইকোল ডি প্যারিস (প্যারিস স্কুল) থেকে ভেঙে বেরিয়েছে, সেই কয়েকজন অন্যতম শিল্পীর মধ্যে তিনিও একজন।

স্টিভ ১৯৫৪ সালে ভেনিস বিয়েনালে অংশগ্রহণ করেন। সহকর্মী শিল্পীদের মতো তার শিল্পসম্ভারও একটি দৃশ্যশিল্পের ভাষায় পরিণত হয়েছিল: কবিতাসুলভ প্রবণতা (poetic attitude) সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ফর্ম এবং কালারকে ব্যবহার করে (গ্রহণ করে) লিরিক্যাল অ্যাবস্ট্র্যাকশনে পরিণত হয়েছে। তার শিল্পকর্ম বিশ্বের বিভিন্ন মূল্যবান জাদুঘরে সংগৃহীত রয়েছে। কুলান শহরে ৯৭ বছর বয়সে স্টিভ ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

র‍্যাশনালিজম বা যুক্তিতত্ত্ব (Rationalism)

দেকার্তের (১৫৯৬–১৬৫০ খ্রি.) কথা বলা যেতে পারে। তিনি বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। বস্তুর গতির প্রশ্নে বলেন, ঈশ্বর গতি ও স্থিতি উভয় বস্তুর মধ্যে তৈরি করেন এবং গতি ও স্থিতি অপরিবর্তনীয়তা তিনি রক্ষা করেন। মানুষের দেহ ও মন পাইওনিয়াল গ্লান্ড নামক একটি তন্ত্রীর মাধ্যমে মিলিত হয়ে দেহ ও মন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে সম্পর্কিত। বাস্তবে পাইওনিয়াল গ্লান্ড বলে কিছু নেই। কিন্তু জ্ঞানলাভের প্রশ্নে তিনি সন্দেহবাদের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন, এমন একটি ভিত্তি থেকে শুরু করতে হবে, যা সর্বপ্রকার সন্দেহের উর্ধ্বে। তাই তিনি সন্দেহবাদ পোষণ করতে করতে 'আমার অস্তিত্ব সন্দেহের উর্ধ্বে'– এই সিদ্ধান্তে আসেন। নিজের অস্তিত্ব সন্দেহাতীত, এই সূত্রকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করে আমরা জগতের সুনিশ্চিত জ্ঞানমণ্ডল আবার তৈরি করতে পারি বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বটি সাধারণ র‍্যাশনালিজম বা যুক্তিতত্ত্ব নামে পরিচিত।

রিসেনসিটাইজিং বা কাউন্টার এচিং (resensitizing or counteretching)

স্টোনের ডি-সেনসিটিটিভিটিকে সরিয়ে (*To Reopen the Stone and Add Work*) দিয়ে সেনসিটিভি করে অবাার ইমেজ তৈরি করার প্রক্রিয়াকে রিসেনসিটাইজিং বা কাউন্টার এচিং বলা হয়। কয়েকটি উপায়ে স্টোনকে পুনরায় সেনসিটভ করে তোলা সম্ভব:

(ক) প্রথমে পুরো ইমেজ অংশকে ফ্রেঞ্চ চক ছিটিয়ে দিতে হবে। ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এবার এক (১) ভাগ গ্লাসিয়াল এসেটিক এসিড, ৬ থেকে ৩০ ভাগ পানির সঙ্গে মিশিয়ে পুরো স্টোনে এক থেকে দেড় মিনিট ছড়িয়ে দিয়ে রাখতে হবে। এখন পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে শুকাবার পর

আবার ইমেজ তৈরি করতে পারা যাবে। তবে এই দ্রবণটি ব্যহারের সময় উপরোক্ত উপায়ে দুর্বল ও শক্তিশালী– এ দুই ধরনের দ্রবণ বানিয়ে প্রয়োজনারূপভাবে স্টেনকে রিসেনসিটিভ করে তোলা যায়।

(খ) ফিটকিরি (পটাশ এলাম বা potassium aluminium alum) গুঁড়া করে একটি পরিষ্কার বোতলে পানির মধ্যে দিয়ে ঝাঁকিয়ে ঘণ্টাখানেক রেখে দিলে একটি দ্রবণ তৈরি হবে। ফ্রেঞ্চ দেওয়া ইমেজকে সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। এবার এলাম ওয়াটার পুরো পাথরে ছড়িয়ে দিয়ে রাখলে কিছুক্ষণের মধ্যে ফেনার মতো বুদ্‌বুদ উঠতে থাকবে। বোঝা যাচ্ছে যে, অ্যারাবিক গামের ডিসেনসিটাইজং উপাদানকে উঠিয়ে ফেলে সেনসিটিভ করে তুলছে। এখন আঙুল দিলে একটু পরখ করলে পিচ্ছিল মনে হবে। এটি স্টোনে পাঁচ মিনিট রেখে দিতে হবে। এবার স্টোন থেকে পানি দিয়ে ধুয়ে প্রয়োজনে আরো পাঁচ-দশ মিনিট আরেকবার এই দ্রবণ দিলে পুরো সেনসিটিভ হয়ে যাবে। এবার পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে নিয়ে পুনরায় আবার ইমেজ অঙ্কন করা সম্ভব। কাজ শেষে ফ্রেশ গামিং করে প্রয়োজনমতো এচিং করে প্রিন্টের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে এই এলাম পানি দিয়ে বেশিক্ষণ রাখলে স্টোনের অনুভূতিশীল হালকা ইমেজগুলো চলে যেতে পারে। সে দিকটি লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

লিথোটিন (Lithotine)

দ্য গ্রাফিক আর্টস টেকনিক্যাল ফাউন্ডেশন ১৯৩৩ সালে তারপিনটাইনের বদলে ব্যবহারের জন্য বিকল্প হিসেবে 'লিথোটিন' তৈরি করে। কারণ তারপিনটাইন স্কিনে একধরনের অস্বস্তিতা (ইরিটেশন) সৃষ্টি করে এবং শুষ্ক ফাটল (ক্র্যাক) সৃষ্টি করে। পাইন তেলের সঙ্গে অল্প পরিমাণ তিসির তেল (ক্যাস্টর অয়েল, castor oil) এবং তার সঙ্গে অনেক পরিমাণ ডিস্টিল পেট্রোলিয়াম (যেমনঃ বেনজিন বা মিনারেল স্পিরিট) দ্রবণের সঙ্গে এস্টার (জৈব লবন) গাম (ester gum) মিশ্রিত দ্রবণই লিথোটিন নামে পরিচিত। পাইন তেল ও ডিস্টিল পেট্রোলিয়াম তাইপিনটাইনের মতো দ্রবীভূত করার ক্ষমতা রয়েছে এবং তিসির তেল ও এস্টার গাম আঠালো অবস্থায় অনুদ্বায়ী বস্তু হয়ে পড়ে থাকে, যখন দ্রবণটি উড়ে

যেতে থাকে। এই পড়ে থাকা অবশিষ্টাংশটি পানিকে প্রতিহত করে বা পরিত্যাগ করে এবং তেলকে গ্রহণ করে এবং সেইসঙ্গে শুকিয়ে যায় না। সর্বোপরি লিথোটিনের সুপারিয়র ক্ষমতার জন্য সকল লিথোগ্রাফি প্রক্রিয়াতে লিথোটিন ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে।[৪০] শুধু লিথোটিন দিয়েও একটি পূর্ণ ইমেজ তৈরি করা যায়। তবে বাংলাদেশে শুরু থেকে তারপিনটাইন ব্যবহার করা হচ্ছে। এই তারপিনটাইনের সঙ্গে কেরোসিন তৈল মিশে থাকে বলে প্রিন্টিংয়ে বেশ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। পরে বাজারে প্রাপ্ত অনেকগুলো তৈল জাতীয় পদার্থ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। নিরীক্ষণে দেখা যায়, ২০০৪ সাল থেকে বর্তমান ২০১৬ সাল পর্যন্ত বার্জার থিনার সাফল্যজনক ফল দিয়ে আসছে।

ল্যাকার (Nova Lac)

অফসেট প্রিন্টিংয়ের ক্ষেত্রে ডিপ-এচিং প্লেট তৈরিতে এই নোভাল্যাক বা ল্যাকার ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে এটি স্টোন বা প্লেট লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতেও ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে এটি ব্যবহারের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা খুবই প্রয়োজন। ব্যবহারের সময় নিঃশ্বাস বন্ধ রাখা অপিরিহার্য বিষয়। সবচেয়ে ভালো হয় স্টোন বা প্লেটের সামনে একটি এক্সজর্স্ট ফ্যান লাগিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গন্ধটি রুমের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া। অথবা প্যান ছেড়ে কিছুক্ষণ রুমের বাইরে অবস্থান করা। আঙুলে বা হাতে লেগে গেলে এসিটন দিয়ে এটিকে অপসারণ করা যায়। এটি সম্ভবত ভারতের মুম্বাইয়ের টেক নোভা (Tech Nova) কম্পানি থেকে উৎপাদন হয়ে বাংলাদেশে আসে।

শ্যালাক (গালা)

শ্যালাক বা গালা নানা কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে। লিথোগ্রাফি প্রিন্টিংয়ের ক্ষেত্রে এটি ফ্লাট ও রিভার্স ইমেজ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিস্তারিত ষষ্ঠ অধ্যায়ে রিভার্স ইমেজ তৈরির প্রক্রিয়াটি জেনে নিলে এর কাজ সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ধারণা পাওয়া যাবে।

স্লেক স্টোন

স্টোন গ্রেইন করার সময় পূর্বের ইমেজকে ওঠাতে হলে দুটি স্টোনকে একটির ওপর আরেকটি রেখে বালু বা সিলিকন কার্বাইড বা কার্বেরেন্ডাম দিয়ে পানির সাহায্যে ঘষতে থাকলে স্টোন একসময় পলিশ হয়ে আসতে থাকবে। তখন স্টোনটিকে পূর্ণ পলিশ করার

---

[40] GaroZ. Antreasian and Clinton Adams, *'The Tamarind Book of Lithography: Art & Techniques'* New York, p. 288

জন্য প্রথমে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। এবার স্লেক স্টোন দিয়ে আড়াআড়ি এবং উলম্বভাবে স্টোনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘষতে থাকলে সাদা রঙের তরল বের হতে থাকবে এব ং স্টোন পলিশ হয়ে যাবে। এ সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনোরূপ বালুকণা ভেতওে প্রবেশ না করে। বালুকণা ঢুকে গেলে পলিশ করার সময় স্ক্যাচ পড়ে যাবে।

সাবজেক্টিভ, নন-অবজেক্টিভ ও রিপ্রেজেন্টেশনাল আর্ট

কোনো বিষয়বস্তু দেখে অঙ্কন করা বিষয়বস্তুকে সাবজেক্টিভ বিষয়বস্তু বলা হয়। এরূপ কোনো কিছুকে ছবি আঁকার মাধ্যমে উপস্থাপন করার ধরনকে রিপ্রেজেন্টেশনাল আর্ট বলা হয়। আর চিন্তার জগৎকে বলা হয় অবজেক্টিভ ওয়ার্ল্ড। এ ধরনের কোনো বিষয়বস্তুকে অঙ্কন না করে সাবকনশাস লেভেল থেকে এমন কিছু অঙ্কন করা হলো, যা নিজে কোনো বিষয়বস্তুকে নির্দিষ্টতা দান করে বা বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেয়, তাকে নন-অবজেক্টিভ চিত্র বলা হয়। যমন: পিকাসো গরুর মাথাকে কল্পনা করে সাইকেলের সিটের সঙ্গে তার হ্যান্ডেল জুড়ে দিয়ে উপস্থাপন বা রিপ্রেজেন্ট করেছেন। তাই পিকাসোর শিল্পকর্মটিকে রিপ্রেজেন্টেশনাল আর্ট বলা যেতে পারে। স্টিল লাইফ বা ল্যান্ডস্কেপকেও রিপ্রেজেন্টেশনাল আর্ট বলা যেতে পারে। কান্দেনেস্কি পূর্ব থেকে কোনো ধারণা না করে একটি ক্যানভাসে রং ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর কিছুটা কনশাসভাবে সেখানে অ্যামিবা আকৃতির কিছু ফরম সৃষ্টি করেছিলেন। ফলে ছবিটি কনশাস ও আনকনশাস এই দুটি উপায়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হলো। ছবিটি নিজে অন্য একটি বিষয়বস্তুকে নির্দেশ করে বা রিপ্রেজেন্ট করে বা উপস্থাপন করে, যা সাবকনশাস (আনকনশাস ও সামান্য কনশাস উপায়ের সমন্বয়) লেভেলে থেকে অঙ্কিত হয়েছে। যা আবার অবজেক্টিভ ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু সাবজেক্টিভ কোনো বস্তু বা অবজেক্টকে উপস্থাপন করা হয় না বলে এ ধরনের শিল্পকে নন-অবজেক্টিভ শিল্প বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়াও এই উপায়ে কিছু চিত্র এঁকেছেন।

হন্স চক (Scotch hones)

একধরনের বিশেষ লম্বা চিকন চারকোনাকৃতি স্টোন, যা দিয়ে স্টোন বা প্লেটে ইমেজকে ঘষে তুলে ফেলা যায়। বেশি শক্ত, মিডিয়াম ও নরম– এই তিন ধরনের হন্স চক বাজারে

পাওয়া যায়। দুই ধরনের কালারের হংস বাজারে পাওয়া যায়। একটি সাদা, অন্যটি অ্যাশ রঙের।

পরিভাষা

Counteretching: কাউন্টার-এচিং

Crow Quill nibs or pen: ক্রোকিল নিব

Deep-seated: নিজস্ব গভীরতা

Deeper reality: মানুষের গভীর বাস্তবতা

Transfer litho: প্রতিস্থাপন করা লিথোগ্রাফি বা প্রস্থাপিত লিথো

Plate lithography or Allugraphy: প্লেট-লিথোগ্রাফি

Psychic correlations: সাইকিক পারস্পরিক সম্পর্ক, মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক

Versatility: বিচিত্রগামীতা (ভার্সেটাইলিটি)

Material and Technique: করণ-কৌশল

Sociopolitical context: সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত

Hopelessly deceptive: প্রতারণামূলক এবং বিভ্রান্তিমূলক নিরাশা

Rational: যৌক্তিক

Utterly uninhibited: পুরোপুরি অনভ্যাসগত

৪. চতুর্থ অধ্যায়

লিথোগ্রাফির ইতিহাস ও বিবর্তন

বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চা, বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা বিষয়টি বোঝার জন্য লিথোগ্রাফির প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে কয়েকটি বিষয়ে ধারণা থাকা প্রয়োজন। তা হলো, **এক.** মুদ্রণযন্ত্রের ক্রমবিকাশ ও লিথোগ্রাফির পথপরিক্রমা। **দুই.** লিথোগ্রাফির সামগ্রিক উন্নতি বা উত্থান-পতন কীভাবে হয়েছে এবং বাংলাদেশে লিথোগ্রাফির ইতিহাস ও চর্চা নিয়ে আলোচনা। **তিন.** বিভিন্ন ইজমে লিথোগ্রাফি কীভাবে সেই ইজমের দর্শনের উদ্দেশ্য সাধন করেছে।

এক.

৪.১ মুদ্রণযন্ত্রের ক্রমবিকাশ ও লিথোগ্রাফির পথপরিক্রমা

লিথোগ্রাফি মাধ্যমটি যেহেতু মুদ্রণযন্ত্রের ক্রমবিকাশের মধ্যবর্তী একটি সময়ে আবিষ্কৃত হয়ে পরবর্তী সময়ে শিল্পমাধ্যম হিসেবে আজ অবধি চর্চা হয়ে চলছে, সেহেতু লিথোগ্রাফির পথপরিক্রমা জানার পূর্বে সংক্ষেপে মুদ্রণযন্ত্রের ক্রমবিকাশের ধারাটি আলোচনা করলে মুদ্রণশিল্প হিসেবেও লিথোগ্রাফির গুরুত্বটা অনুধাবন করা যাবে। কারণ লিথোগ্রাফি উড এনগ্রেভিং বা এচিংয়ের চেয়ে দ্রুততম মাধ্যম বলেই এটিকে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল। তাই তার পূর্বে মুদ্রণযন্ত্রে ঘণ্টায় কয়টি করে প্রিন্ট নেওয়া যেত, সে বিষয়ে ধারণা থাকা দরকার। ১০৫ খ্রিষ্টাব্দে কাগজ আবিষ্কৃত হওয়ার কিছু পূর্ব থেকে ব্লকের মাধ্যমে কাপড়ের ওপর ছাপ দেওয়ার প্রচলন ছিল। ব্লকের মাধ্যমে একরঙা ছবি ছাপা শুরু হয় চীনে তাং রাজত্বকালে [৬১৮–৯০৫}, অতঃপর ফেং তাউয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় নেগেটিভ হরফ ছাপার সূত্রপাত ঘটে। পি সেঙ নামক এক চীনা সরকার প্রতীক বা হরফের আলাদা আলাদা ব্লক বা টাইপ নির্মাণের পারদর্শিতা অর্জন করেন। ১২৯৪ খ্রিষ্টাব্দে পারস্যের রাজধানী তাবরিজ থেকে কাগজের টাকা ছাড়া হয়। আনুমানিক ৯০০ সাল থেকে ১৩৫০ সালের মধ্যে মুদ্রিত মুদ্রালিপি অস্ট্রিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত, যার মধ্যে মিশরের আল-ফাইউম এলাকায় খননকালে প্রাপ্ত কয়েক লক্ষ শিট টুকরো প্যাপিরাস, পার্চমেন্ট ও কাগজ পাওয়া যায়। এর মধ্যে অঙ্কিত ছবি, হস্তাক্ষরে আরবি ভাষায় মুদ্রিত পৃষ্ঠা এবং বেশির ভাগই ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত অথবা কোরআন শরিফের উদ্ধৃতি ছিল। চলমান টাইপের ক্ষেত্রে, ১৩৯২ খ্রিষ্টাব্দে কাঠের বদলে ধাতু দিয়ে ছাপার চেষ্টা প্রথম হয়, তারও পূর্বে কোরিয়াতেই ১৩৭৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মুদ্রিত 'পুলচো চিকচি সামচে' থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, সঞ্চালনযোগ্য হরফে ছাপা বইটি গুটেনবার্গের আবিষ্কৃত মুদ্রণ (১৪৪০ সাল) পদ্ধতির পূর্বেই ছাপা।[৪১]

---

41 ফজলে রাব্বি, 'ছাপাখানার ইতিকথা' বাংলা একাডেমি, দ্বিতীয় সং, মে ২০০২, পৃ. ৬৭

গুটেনবার্গ কোনো ছাপাখানা আবিষ্কার করেননি। তিনি আঙুরের রস নিঙড়ানো, পনির জমানো বা বই বাঁধানোর মতো যন্ত্রকে তার ছাপযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। প্রথমে এটি কাঠ দ্বারা নির্মিত হয় এবং ঘণ্টায় ৩০ তা কাগজ ছাপা হলে ছাপার কাজ ভালোভাবে এগিয়ে চলছে বলে ধরে নেওয়া হতো। এই যন্ত্রের প্রথম উন্নয়ন সাধন করা হলো চলমান বেড ব্যবহার করে। ধীরে ধীরে এর বিভিন্ন কলকব্জা লোহার মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করে ৩০ বছর পর আর্ল স্টেইন হোপের হাত দিয়েই সম্পূর্ণভাবে প্রথম লোহার মুদ্রণযন্ত্র মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে সংযুক্ত হয়। পরবর্তী সময়ে কোয়েনিগ এই যন্ত্রে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ব্যবহার করেন। যথাক্রমে ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দে যে মুদ্রণযন্ত্রটি পেটেন্ট করেন তা দিয়ে ঘণ্টায় ৪০০ শিট কাগজ ছাপা যেত, ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে যে যন্ত্রটি নির্মাণ করেন তাতে ঘণ্টায় ৮০০ শিট কাগজ ছাপতে, ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে দ্য টাইমস ম্যাগাজিনের জন্য যে যন্ত্রটি নির্মাণ করেন তাতে ঘণ্টায় ১১০০ শিটেরও বেশি কাগজ ছাপাতে পারা যেত। তিনি আরো দ্রুততম মুদ্রণযন্ত্রেরও পরিকল্পনা করেছিলেন।

একদিকে এই লেটার প্রেসের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়ে চলছে, ঠিক এরই মধ্যবর্তী সময় জার্মানিতে ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে আলইস সেনেফেলডারের হাত দিয়ে বের হয়ে আসে আরেক ধরনের মুদ্রণ পদ্ধতি, যাকে 'প্লেনোগ্রাফিক পদ্ধতি' বলা হয়। ছবি ছাপার জন্য সহজ পদ্ধতি মানুষের হাতে চলে আসতে থাকে এবং লেটার প্রেসের বইয়ের ইলাস্ট্রেশন, পোস্টার ইত্যাদিতে লিথোগ্রাফি ব্যবহৃত হতে থাকে। পরবর্তী শতবর্ষে সেনেফেলডার উদ্ভাবিত লিথোগ্রাফি মুদ্রণ পদ্ধতির যথেষ্ট পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু এমন কোনো পরিবর্তন হয়নি, যা সেনেফেলডারের কল্পনায় আসেনি। পাথরের পরিবর্তে পাতলা ধাতুপাত ব্যবহৃত হয়েছে। সরাসরি পাথর থেকে বা মুদ্রণের পাতলা পাতটির গায়ে যে ছবি বা লেখা থাকে সেটি একটি সিলিন্ডারের গায়ে জড়ানো থাকে, সেই সিলিন্ডারটিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কালি লাগানো হয় এবং সেটি পানিতে ভেজানো হয়। এই সিলিন্ডারের ছাপ একটি রাবার জড়ানো দ্বিতীয় সিলিন্ডারের ওপর পড়ে, সেখান থেকে কাগজে প্রিন্ট করা হয়। একেই বলা হয় অফসেট মুদ্রণ। আধুনিক অফসেট ছাপা যন্ত্রে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ছাপার কাজ সুচারুভাবে অবিশ্বাস্য রকম দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।[৪২] লিথো মুদ্রণের জন্য সেনফিল্ডার যে যন্ত্র তৈরি করেছিলেন তা ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল। ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে জর্জ সিঙ্গল লিথো মুদ্রণের একটি সিলিন্ডার যন্ত্র নির্মাণ করেন। এরপর ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বার্ক্লে টিনের ওপর মুদ্রণের জন্য অফসেট পদ্ধতিতে মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। অফসেট মুদ্রণ পদ্ধতি রুবেলের হাতে আধুনিক রূপ লাভ করে। রুবেল নিউ ইয়র্কে ইস্টার্ন লিথোগ্রাফি কম্পানিতে সর্বপ্রথম তার অফসেট যন্ত্র নির্মাণ করে স্থাপন করেন। এর একটি মডেল ১৯০৬ সালে ইংল্যান্ডে আমদানি করা হয়। এরপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অফসেট মুদ্রণযন্ত্র নির্মাণ করতে থাকে। আজ এর প্রসার ও ব্যবহার বিশ্বের সর্বত্র।[৪৩]

---

42 ফজলে রাব্বি, 'ছাপাখানার ইতিকথা' বাংলা একাডেমি, দ্বিতীয় সং, মে ২০০২, পৃ. ৭–৫২

43 ফজলে রাব্বি, তদেব.

দিনে দিনে লেটার প্রেসের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লিথোর মাধ্যমে অফসেট প্রিন্টিংয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে আজকে মুদ্রণশিল্পের নানা দিক, যেমন: পলিমার লিথো এবং পলিমার প্রিন্টিং পদ্ধতির দিকটি উন্মোচিত হয়েছে। এদিকে অফসেট প্রিন্টিংয়ের দ্রুততম পদ্ধতি চলে আসার পরে লিথোগ্রাফির ড্রাফটসম্যান কারিগররা এই নতুন পদ্ধতির (অফসেট প্রিন্টিং) দিকে ঝুঁকে পড়েন। তারই উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস আজ আমাদের হাতের নাগালে চলে এসেছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে, এক একটি নতুন নতুন মুদ্রণযন্ত্র আসছে আর কারিগররা জীবিকানির্বাহের তাগিদে বাস্তবতার প্রয়োজনে সেদিকে ঝুঁকতে বাধ্য হচ্ছেন। তবে আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয়— ক্যামেরা আবিষ্কারের পর শিল্পীদের বলা হতো, তাদের আর কাজ নেই, এখন থেকে তাদের কাজ ক্যামেরাই করে দিতে পারবে, শিল্পীদের আর প্রয়োজন পড়বে না। ঠিক সেই সময় নানামুখী স্ট্রাগলের মধ্য দিয়ে শিল্পীরা প্রমাণ করেছেন সমাজে তার অবস্থানের গুরুত্ব কতটা? লিথোগ্রাফির ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, কারিগররা যখন অন্যদিকে চলে যাচ্ছেন শিল্পীরা তখন এটিকে তাদের শিল্পভাষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে আজ পর্যন্ত এর চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। তবে আজকের এই শিল্পজগতের মাধ্যমগুলোর নানামুখী শিল্পধারা বা ভাষা, অফসেট প্রিন্টিং, অফসেট লিথো, পলিমার লিথো, পলিমার প্রিন্টিং যা-ই বলা হোক না কেন, এই মডার্ন-পোস্টমডার্ন যুগে এসেও লিথোগ্রাফারদের প্রমাণ করতে হচ্ছে যে, এই ভাষার (লিথোগ্রাফি) গুরুত্ব কতটা আছে বা নেই এবং সেই সূত্র ধরেই আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এর চর্চা অব্যাহত রয়েছে।

৪.২ লিথোগ্রাফি আবিষ্কারের ঘটনা ও ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতা

এটি সাধারণভাবে সকলেই একমত হবেন যে, আলইস সেনেফেলডার (১৭৭১–১৮৩৪) (একজন অভিনেতা, লেখক, লিথোগ্রাফার) ১৭৯৮ সালে লিথোগ্রাফি আবিষ্কার করেন। আবিষ্কারটি কোনো দুর্ঘটনা নয়। যেমন ধরা যাক, ইউরোপে অনেকের মধ্যে তিনিও একজন, যিনি স্টোন থেকে কেমিক্যাল প্রিন্টিংয়ের প্রসেসটির সঠিক ও আয়ত্তে আনার উপায় নিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এই আবিষ্কারটি যে শুধু শিল্পকলার মাধ্যমগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার তা নয়, এটি কমার্শিয়াল প্রিন্টিংয়ের ক্রমবিকাশের একটি ধাপও বটে। আলইস সেনেফেলডার তার প্রথম 'লিথোগ্রাফি' আবিষ্কার সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্মৃতি থেকে বললেন:

> 'যখন আমার মা আমাকে একটি লন্ড্রি লিস্ট লেখার জন্য বলছিল তখন আমি একটি রিভার্স রাইটিং মেথড অনুশীলন করার জন্য একটি স্টোনের ওপর এচিং ফ্লুইড দিয়ে গ্রাউন্ড করে রেখেছিলাম। কিন্তু লন্ড্রি থেকে আগত ব্যক্তিটি আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। লেখার জন্য কোনো কাগজ পাচ্ছিলাম না, আমার নিজের সাপ্লাইয়ের কাগজগুলো ইতোমধ্যে প্রুফপ্রিন্ট নিয়ে শেষ করে

ফেলেছিলাম। এমনকি লেখার কালিটিও শুকিয়ে গিয়েছিল। তখন আমি লেখার জন্য কোনো জিনিস (কলম বা অন্য কিছু) না খুঁজে একটি পরিষ্কার পাথরের ওপর দ্রুত তৈরি (পূর্বে নিজের তৈরি করা) মোম, সাবানমিশ্রিত কালি দিয়ে লিখে ফেললাম এবং ভাবলাম পরে প্রিন্ট নেওয়া যাবে। এরপর প্রিন্ট করার জন্য কালি এবং কাগজ তাড়াতাড়ি সাপ্লাই করলাম। অ্যাকোয়া ফরটিস (নাইট্রিক এসিড) দিয়ে এচিং করার পর ওয়াশ আউট করলে লেখাটির কী অবস্থা হবে? এ বিষয়ে আমি খুব উৎসুক ছিলাম। আমি মনে করেছিলাম লেখাটি হয়তো রিলিফ হয়ে যাবে ও উডব্লকের মতো করে কালিকে ধারণ করবে এবং তা থেকে উডব্লকের মতো করে প্রিন্ট নেওয়া যাবে। আমার এচিংয়ের এই অভিজ্ঞতা থেকে দেখলাম অ্যাকোয়া ফরটিস দ্রবণটি সমগ্র দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এটি আমাকে আশান্বিত করল না, দেখলাম যে খুব একটা রিলিফ হয়নি (যতটা আশা করেছিলাম)। তবে দেখা গেল কাজটি সাধারণ কাজের মতো না হয়ে কোর্স (কোর্স অ্যাকোয়ার মতো হলো) হলো। কাজেই আমি বারবারই ট্রায়াল দেওয়ার চেষ্টা করলাম। এখন ১০ ভাগ পানির সঙ্গে ১ ভাগ অ্যাকোয়া ফরটিস (নাইট্রিক এসিড)-এর দ্রবণটি পুরো প্লেটের ওপর পাঁচ মিনিট রাখলাম বা এচিং করলাম, (এটাকে দুই ইঞ্চি গভীর করার জন্য ছেড়ে দিলাম) তখন আমি ফলাফল হিসেবে ১০ ভাগের ১ ভাগ থিকনেসসম্পন্ন লাইন (খুব সামান্য পরিমাণ রিলিফ লাইন) পেলাম, যেটা অনেকটা তাসের পাত্তার মতো রিলিফ।'[৪৪]

আলইস সেনেফেলডার 'The invention of lithography' বই থেকে উদ্ধৃত ওপরের অনুচ্ছেদ থেকে বোঝা যায়, রিলিফ ইমেজ তৈরির প্রতি মনোযোগ ছিল এবং তখনো তাঁর মন পূর্বের জানা প্রিন্টিং মেথডের সঙ্গেই কাজ করছিল, যা কি না তলের (সারফেসের) বিভিন্ন লেভেলের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। তাই বোঝা যায় যে, ভবিষ্যতে উদ্ভূত হবে এমন কেমিক্যাল লিথোগ্রাফি প্রিন্টিং পদ্ধতিটা তখনো তার মনের ভেতরে সুপ্ত অবস্থা হিসেবেই থেকে গেছে। পরে তিনি বারবার চেষ্টা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেই পদ্ধতিটির সঠিক উপায় বের করেছেন। তার লিথোগ্রাফি সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা, গবেষণা ও রসায়ন (যেমন: পরিমিত কালির পরিমাণ, প্রেস, ট্রান্সফার পেপার, ড্রইংয়ের মেথড এবং স্টোন, জিংকপ্লেট, অ্যালুমিনিয়াম প্লেট ও অন্যান্য আবিষ্কার) এখনো তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি এই পদ্ধতিকে বলতেন 'chemical printing' এবং এটি পরিচিত হয়েছিল '*steindruckerei*' (stone printing) ও পলিঅটোগ্রাফি

---

[44] Jules Heler, *Printmaking Today*, Second edition,1972, New York, p.1; "first impression", 'The early history of lithography–A comparative survey', NGA, National Gallery of Australia, 3 May–24 August 2003, http://nga.gov.au/FirstImpressions/; John Ross, Clare Romano & Tim Ross, *The complete printmaker*, 'Revised and expanded edition', Roundtable press, New York,1990, p.191

(polyautography[৪৫]) নামে।[৪৬] প্রথম যে প্রেসটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন তাকে তিনি 'stangen oder Galgen-presse' বলতেন।[৪৭]

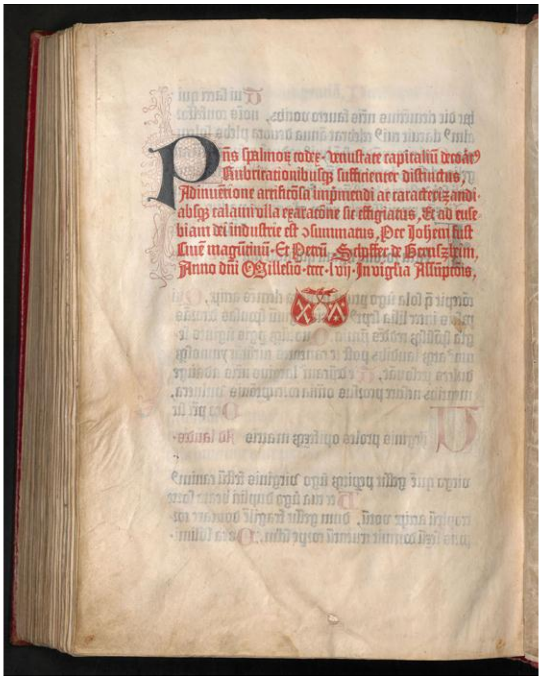

Plate:4.1, ‘Vollstandiges Lehrbuch der Steindruckerey’ মেনুয়াল বইতে দুইকালারে লিখিত আকারে ক্রমোলিথোগ্রাফির প্রথম ছাপ প্রকাশ।

প্রথম দিকে লিথোগ্রাফি মিউজিক্যাল স্কোর ও নাটকের পোস্টার করার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে রিপ্রডাকশন প্রিন্ট নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হতো। একজন লেখক হিসেবে সেনেফেলডারের জার্মানি ও ইংল্যান্ডের মিউজিক পাবলিশার্স, এন্ডার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কমার্শিয়াল সুবিধা নেওয়ার প্রতি ঝোঁক ছিল। ১৮০০-১৮০১ সালে তিনি লন্ডনে গিয়েছিলেন, সেখানে ফিলিপ এন্ডারকে (Philip Andre) লিথোগ্রাফি প্রেস সেটিং করায় সহায়তা করতে। এই প্রেস থেকেই ইংল্যান্ডে লিথোগ্রাফি চর্চার যাত্রা শুরু হয়েছিল বলা যায়। পরে এই মাধ্যমটি অন্য মাধ্যমের (মিডিয়ার) সঙ্গেও পুনরুৎপাদন (রিপ্রডাকশন) করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে প্রাথমিকভাবে শিল্পমাধ্যম হিসেবে লিথোগ্রাফি ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮০৩ সালে শিল্পীদের দ্বারা সৃষ্ট শিল্পকর্ম Philip Andre কর্তৃক ১২টি ইমেজ নিয়ে ‘স্পেসিম্যান অফ

---

[45] John Ross, Clare Romano & Tim Ross, *The complete printmaker*, ‘Revised and expanded edition’, Roundtable press, New York, 1990, p.191

[46] Jeremy Norman “Alois Senefelder Invents & Develops Lithography (1796 – 1819)”, Hiistory of Information.co, March 11, 2017. http://www.historyofinformation.com/expanded.php?id=503

[47] “Lithography (i) Definition and Historical outline”, 'A technical Dictionary of printmaking, Andre beguin, ' (No Date), http://www.polymetaal.nl/beguin/mapl/lithography/lithodefinition.htm

পলিঅটোগ্রাফ' (Specimen of Polyautography) নামকরণে একটি ফোলিও প্রকাশিত হয়। এই কাজগুলোর সবই পেন এবং তুষ (Lithographic ink) মাধ্যমে করা। যদিও এরই মধ্যে লিথোগ্রাফিতে ক্রেয়ন পেনসিলের সাহায্যে কাজ হয়ে গেছে। Polyautography-এর অর্থ হচ্ছে একটি হাতের তৈরি করা বা অরিজিনাল কপি থেকে অনেকগুলো কালার (মাল্টিপল কপি) কপি তৈরি করা।

কার্যত দুটি ভঙ্গিমাতে লিথোগ্রাফি হয়েছে: আলংকারিক ও অনালংকারিক। সাদাকালো ও রঙিন এই দুটি ধরনের মধ্যে ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে রঙিন লিথোগ্রাফি চর্চা পেইন্টিংয়ের বা যেকোনো খসড়ার কালার ক্রম অনুসারে হয়েছে বলে তাকে 'ক্রমোলিথোগ্রাফি' বলা হয়েছে। ১৮১৭ সালে যখন সেনেফেলডার মিউনিখে 'Vollstandiges Lehrbuch der Steindruckerey' নামক মেনুয়াল প্রকাশ করেন, সেখানে বিস্ময়কর কিছু লিথোগ্রাফি চিত্র ছিল। সেখানে প্রথম পৃষ্ঠায় দুইকালারে লিখিত ছাপ আকারে প্রকাশিত করে ক্রমোলিথোগ্রাফির সাথে পরিচয় করানো হয়েছে।[৪৮] (চিত্র.৪.১) আর এই পেইন্টিংয়ের কপি করার পর যেসব লিথোগ্রাফি প্রিন্টের ওপর ভার্নিশ দিয়ে পেইন্টিংয়ের মতো আদল তৈরি করেছে, সেগুলোকে 'অলিওগ্রাফি' বলা হয়েছে। ক্রমোলিথো আবার তিনটি স্টাইলে করা হয়েছে: (ক) বই অলংকরণ (খ) ফ্রেঞ্চশৈলী (জলরঙের ন্যায় স্বচ্ছ বা অস্বচ্ছ কোনো ছবির অনুকরণ) (গ) জার্মানশৈলী (অয়েল পেইন্টিংয়ের অনুকরণ)। লিথোগ্রাফিতে মূলত 'স্টিপলিং' নামক প্রসেসে কাজ করা হয়, যা পয়েন্টালিস্টদের অনুরূপ।

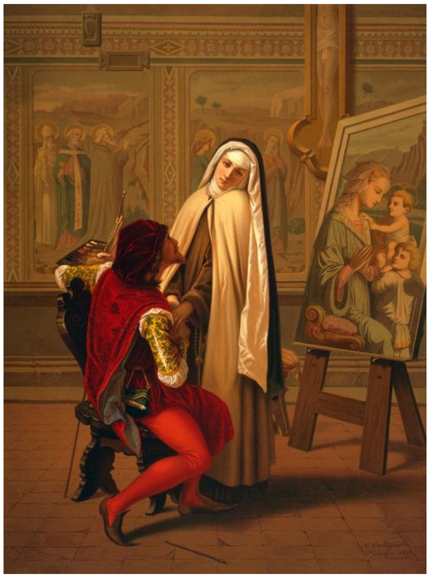

Plate:.4.2, Chromolithograph, Love or Duty, by Gabriele Castagnola, 1873

Plate:4.3, Painting, Castagnola Gabriele pittore ligure, Love or Duty, 1840, castagnola1

48 Jeremy Norman, "Alois Senefelder Invents & Develops Lithography (1796 – 1819)", 'Hiistory of Information.co', March 11, 2017. http://www.historyofinformation.com/expanded.php?id=503

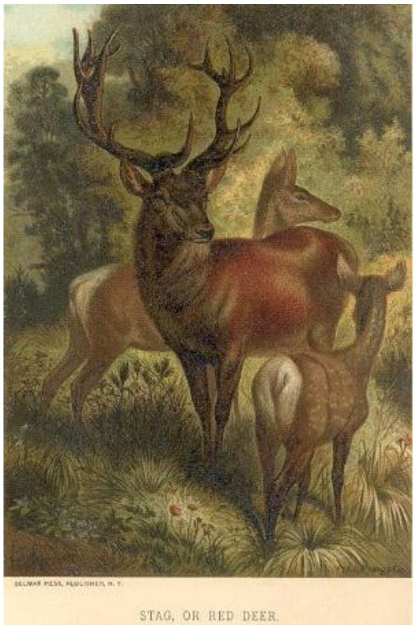

Plate: 4.4, Chromolithography primarily as book illustrations or inexpensive 'art'

Plate:4.5, জলরঙের ন্যায় স্বচ্ছ ক্রমোলিথোগ্রাফি (ফ্রেঞ্চশৈলী)

Plate:4.6, স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ মিশ্র পদ্ধতির ক্রমোলিথোগ্রাফি (ফ্রেঞ্চশৈলী), Chromolithograph by Armstrong & Co, Boston, Shooting Pictures, 1895, 13x20, (ফিলাডেলফিয়া প্রিন্ট শপ থেকে সংগ্রহ)

Plate:4.7, জার্মানশৈলী (অয়েল পেইন্টিংয়ের অনুকরণ)

ছাপচিত্র বিভাগের চারটি প্রধান মাধ্যম হলো: স্টেনসিল প্রসেস, রিলিফ প্রসেস, ইন্টাগ্লিও প্রসেস ও প্লেনোগ্রাফিক প্রসেস। তা যথাক্রমে ধীরে ধীরে ৩৫০০০ বছর আগে গুহাচিত্রে হাতের স্টেনসিল ছাপ, ষষ্ঠ শতকে রিলিফ প্রসেস, ষোড়শ শতাব্দীতে ইন্টাগলিও প্রসেস ও ১৭৯৮ সালে প্লেনোগ্রাফিক প্রসেসের চর্চা শুরু হয়ে আজ অবধি চলছে। প্লেনোগ্রাফি চর্চায় কয়েক ধরনের লিথোগ্রাফি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। লিথোগ্রাফি, কালার লিথোগ্রাফি, ক্রমোলিথোগ্রাফি, অলিওগ্রাফি ইত্যাদি তার মধ্যে অন্যতম। লিথোগ্রাফি ও কালার লিথোগ্রাফি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা সকলেরই আছে। ক্রমোলিথোগ্রাফি ও অলিওগ্রাফি পরিভাষাটি মূলত বাণিজ্যিক লিথোগ্রাফি চর্চার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোনো একটি পেইন্টিংয়ের রঙের ক্রম অনুসারে অনেকগুলো প্লেট তৈরি করে, সেগুলো একের পর এক ইম্প্রেশন নিয়ে প্রস্তুত করা পেইন্টিংয়ের অনুলিপিকে ক্রমোলিথো বলা হয়।[৪৯] একটা ইমেজ বা রূপকল্প তৈরির ক্ষেত্রে ২০-২৫টি স্টোন ব্যবহার করা যেন স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৫০] ক্রমোলিথোগ্রাফিতে ফটোগ্রাফির ন্যায় ইমেজ আনার জন্য যখন ফটোগ্রাফির নেগেটিভ থেকে কয়েকটি স্টোনে প্রতিস্থাপন করা হয় এবং কয়েকটি ইম্প্রেশনের সমন্বয়ে অনেকগুলো কালারের মাধ্যম যখন রঙিন ক্রমোলিথোগ্রাফির প্রিন্ট নেওয়া হয়েছে তখন তার ক্ষেত্রে 'photochrome' পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছে।[৫১] (চিত্র.৪.৯) আর এই ক্রমোলিথোর ওপর ভার্নিশের (অ্যারাবিক গাম, ডিমের সাদা অংশ ও তরল সাবানমিশ্রিত বিশেষ মিশ্রণ) প্রলেপ দিয়ে পেইন্টিং সদৃশ চকচকে ভাবসমৃদ্ধ লিথোগ্রাফি চিত্রকে ‘অলিওগ্রাফি’ বলা হয়। (চিত্র.৪.৮) তবে এদের চর্চা বর্তমানে সারা বিশ্বে বন্ধ আছে।

Plate: 4.8, Raja Ravi Varma, Usha's Dream, Oleography,

Plate:4.9, Photochrom print (Hildesheim শহরের ফটোক্রম লিথোগ্রাফি), 1890

49 Michael Clapper, “I Was Once a Barefoot Boy!: Cultural Tensions in a Popular Chromo.” ‘American Art 16 (2002)’, p.16–39; “Planographic Printing”, *Seeing is Believing*. 2001. The New York Public Library. 11 April 2007 <http://seeing.nypl.org/planographic.html>; 'Chromolithography' 'Wikipedia, the free encyclopedia', 16 February 2017, at 19:12. http://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography,

50 “Chromolithography”, *Beautiful Birds Exhibit*.1999, Cornell University Library. 11 April 2007, <http://rmc.library.cornell.edu/ornithology/exhibit/exhibit5.htm>; “Chromolithography and the Posters of World War I.” *The War on the Walls*. Temple University. 11 April 2007 <http://exhibitions.library.temple.edu/ww1/chromo_essay.htm>.

51 “Chromolithography and the Posters of World War I”, *The War on the Walls*, Temple University. 11 April 2007, https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography

লুইস প্রাং (Louis Prang, March 12, 1824–September 14, 1909) নামক একজন ফেমাস লিথোগ্রাফার ও পাবলিশার ক্রমোলিথোগ্রাফির উৎপাদনে বলিষ্ঠ সহায়তা (প্রডাকশনে স্ট্রংলি সাপোর্ট) দিয়ে যাচ্ছিলেন।[৫২] প্রতিটি রঙের জন্য আলাদা প্লেট বা স্টোন ব্যবহার করে সবচেয়ে ভালো গুণাগুণসম্পন্ন ছাপাই ছবি তৈরি করা তখন খুব ব্যয়বহুল (Expensive) হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দক্ষ কারিগরদের দ্বারা তৈরি ছাপচিত্র বের হয়ে আসতে মাসব্যাপী সময় লেগে যেত, কখনো তিন মাস প্লেট তৈরি ও পাঁচ মাস ছাপ নিতে, অর্থাৎ আট মাস সময় লেগে যেত এক হাজার প্রিন্ট নিতে।[৫৩] ক্রমোলিথোগ্রাফি যেহেতু পেইন্টিংয়ের রঙের 'ক্রমো' অনুসারে আলাদা আলাদা প্লেট তৈরি করে একটি পূর্ণাঙ্গ ছাপচিত্র রচনা করা হতো, তাই অনুকরণ বলে পেইন্টিংয়ের তুলনায় এই ছাপচিত্রগুলো সস্তায় পাওয়া যেত। আবার সস্তায় বিজ্ঞাপন (*Advertisement*) শিল্পের জন্য করা ক্রমোলিথোগ্রাফির ক্ষেত্রে ছাপচিত্রে '*stippling*' নামক কৌশল (technique) ব্যবহৃত হতো।[৫৪] (চিত্র.৪.১০) মূলত লিথোগ্রাফিতে স্টিপলিং প্রসেসে ডট্সগুলো পড়ে থাকে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, সস্তা (Cheaper litho process) ও এক্সপেনসিভ (Expensive litho process)— এ দুই ধরনের লিথো প্রিন্ট হতো। প্রথম দিকের ক্রমোলিথোগ্রাফি ছিল কালারের নির্দিষ্টসংখ্যক ডটস (distinctive deposits of colour/ random dots/ If the patterns are random, it was most likely printed by the chromolithography process & If the patterns are regular, it was most likely printed by offset printing process.) যাকে বলা হয় 'সাইড-বাই-সাইড' ছাপ ('side-by-side' printing)।[৫৫](চিত্র.৪.১০) পরবর্তী সময়ে প্রিন্টাররা অনেক কালারে প্রিন্ট নেওয়ার জন্য কালারের পর কালার প্লেট বাড়িয়ে ছাপ নেওয়া শুরু করে। ফলে কালারের স্টিপলিং এবং ইন্টারমিংলিং (একত্রে মেশানো) ডটসের ফলাফল অনেকটা পয়েন্টালিস্টদের অনুরূপ দাঁড়ায়, যা অপটিক্যাল কালার মিক্সিংয়ের তৃতীয় অবস্থানকে নির্দেশ করে।[৫৬] জার্মানিতে জন্ম লুইস প্রাং আমেরিকার প্রথম বড়দিনের কার্ড

---

[52] Mary Ann Stankiewicz, "A Picture Age: Reproductions in Picture Study", *Studies in Art Education* 26(1985), p. 86–92, https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography, 3 June 2014, at 08:30; "Planographic Printing", 'Seeing is Beleiving', 2001 The New York Public Library, 11 April 2007 <http://seeing.nypl.org/planographic.html>.

[53] Dawn Glanz, "The Democratic Art: Pictures for a Nineteenth-Century America, Chromolithography 1840-1900 (Review)", '*Winterthur Portfolio* 16(1981), P. 96–97'; https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography, 3 June 2014, at 08:30

[54] "Chromolithography: Origins", 'Wikipedia, the free encyclopedia', https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography, 3 June 2014, at 08:30

[55] "Chromolithography: Origins", *ibid.*

[56] "Chromolithography: Origins", *ibid.*

(Christmas card) ছাপার উদ্যোক্তা ছিলেন।[৫৭] তিনি অনুভব করলেন যে, ক্রমোলিথোগ্রাফি দেখতে মোটামুটি ভালো। মূল পেইন্টিংয়ের (Real Painting) চেয়ে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তিনি জনপ্রিয় (popular) পেইন্টিংয়ের বেশ কিছু ভালো ক্রমোলিথোগ্রাফ প্রিন্ট করেছিলেন। ইস্টম্যান জনসনের [Eastman Johnson, (১৮২৪-১৯০৬) ছিলেন আমেরিকার শিল্পী (painter) এবং মেট্রোপলিটিন মিউজিয়াম অব আর্ট, নিউ ইয়র্ক সিটির কো-ফাউন্ডার] The Barefoot Boy নামক ছবিটি তেমনই একটি ক্রমোলিথোগ্রাফি ছাপের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।[৫৮] ক্রমোলিথোগ্রাফির সমালোচনা (criticism) সত্ত্বেও লুইস প্রাং ক্রমোলিথোগ্রাফি ছাপ তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন— আর্ট শুধু ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছে থাকবে কেন? নিম্নবিত্ত লোকদের জন্য করা হতো বলে তাদের প্রিন্ট কখনো কখনো নিম্নমানসম্পন্ন মনে হতো। এদিকে তলে তলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশন হতে চলেছে, যা আমেরিকানদের কাছে নতুন কিছু নয়। অনেক শিল্পীই তাদের মূল শিল্পের (original painting) সঙ্গে গুণগত পার্থক্য বুঝে ওঠার পূর্বেই ক্রমোলিথোতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন।[৫৯] বেশি লাভের জন্য কিছু শিল্পী পেইন্টিংয়ের ক্রমোলিথো প্রিন্ট নিচ্ছিলেন।

Plate:4.10, Uncle Sam Supplying the World with Berry Brothers Hard Oil Finish, c. 1880 স্টিপলিং এবং ইন্টারমিংলিং (একত্রে মেশানো) ডটসের ফলাফল (লিথোগ্রাফি মাধ্যম)।

ফলে সমাজে সাধারণ মানুষ পেইন্টারদের কাছে পরিচিত হতে থাকে। একসময় শিল্পীও সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত হতে থাকেন। অর্থাৎ শিল্পী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা যোগাযোগ ঘটতে শুরু করে। এ ধরনের শিল্পচর্চার বিরোধিতামূলক বক্তব্য হচ্ছে: ক্রমোলিথোগ্রাফি সে সময় সমাজের নানা কাজে

---

[57] Mary Ann Stankiewicz, "A Picture Age: Reproductions in Picture Study", '*Studies in Art Education* 26 (1985)', P. 86–92; https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography, 3 June 2014, at 08:30

[58] Michael Clapper. "I Was Once a Barefoot Boy!: Cultural Tensions in a Popular Chromo", '*American Art* 16(2002)', p.16–39, https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography, 3 June 2014, at 08:30

[59] Michael Clapper. "I Was Once a Barefoot Boy!: Cultural Tensions in a Popular Chromo", '*American Art* 16(2002)', p.16–39, https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography, 3 June 2014, at 08:30; "Chromolithography Prints- Why they are considered 'originals", '*Free Clip Art', The Stoke Solution and Stock Photos*. http://www.tssphoto.com/index.php?p=693, Saturday, December 26, 2009

ব্যবহৃত হচ্ছিল— এটা যেমন ভালো, তেমনি পেইন্টিংয়ের অনুকরণ হচ্ছে বলে অনেকে তাদের শিল্পকে মূল শিল্পকর্ম নয় বলে (lack of authenticity-এর কারণে) এই পরিকল্পনার (idea) বিরোধিতা করেছিলেন। তাদের কপিমূলক (depictive, প্রতারণামূলক) গুণের কারণে নতুন শিল্পকলা (New Forms of Art) কখনো কখনো এ ধরনের শিল্পকে 'ব্যাড আর্ট' (bad art) বলেও উল্লেখ (tagged) করতেন। এই ছবিগুলোর চারদিকে এসিডিক ফ্রেমের কারণে বেশ কিছু ছবি নষ্ট হয়ে গেছে। কেউ কেউ অবশ্য অনুভব করেছেন— সবকিছু মিলিয়ে এটা আর্ট ফর্ম হতে পারে না, কারণ এটা খুব বেশি যান্ত্রিক কৌশল (Mechanical Process) নির্ভর পদ্ধতি। একজন সত্যিকার শিল্পী (true spirit of a painter) কখনোই এই ছাপ নেওয়ার পুরো প্রক্রিয়াকে (a printed version of a work) আয়ত্ত করতে পারবেন না। একটি পেইন্টিংয়ের দামের তুলনায় যদিও একটি ক্রমোলিথোগ্রাফি সস্তা, তবু এখনো পর্যন্ত এটি ছাপচিত্রের অন্য মেথডগুলোর থেকে এক্সপেনসিভ।[৬০]

Plate:4.11, Honse (1860-1939)-1896 Job, poster

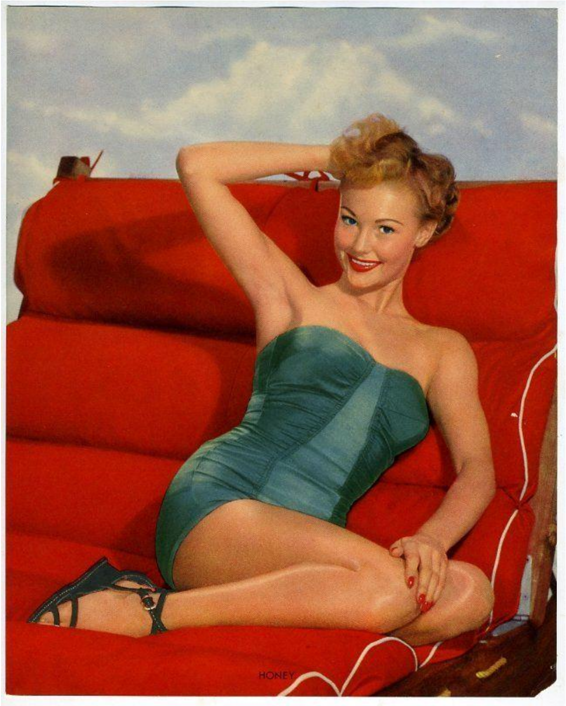

Plate: 4.12, 1950's Pin-Up-Sexy Redhead Girl in green swimsuit, arm up, Honey, 8x10 inch.

উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য তারা সস্তা প্রক্রিয়া অর্থাৎ কালো রং দিয়ে একটা ইম্প্রেশন নিয়ে তার ওপর হয়তো লিথোগ্রাফি মাধ্যমে দুটি বা তিনটি ইম্প্রেশন দিয়ে রূপকল্প (ইমেজ) তৈরি করতেন। ব্যয় যখন কম হয়ে এসেছিল, তখন ক্রমোলিথোগ্রাফির এই মিথ্যা কাহিনি বা নির্মাণকরণ বা জাল দলিলগুলো শিল্প

[60] Michael Clapper. *Ibid.*

সৃষ্টির তুলনায় বাণিজ্যিক দিকে ব্যবহারের প্রক্রিয়াতে পরিণত হয়।[৬১] অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করার ফলে আমেরিকার একটি নির্দিষ্ট দশককে 'chromo civilization' নামেও অবহিত করা হয়।[৬২] ক্রমোলিথোগ্রাফিকে কালার লিথোগ্রাফির প্রথম দিককার অবস্থা বা প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। পরের দিককার কালার লিথোগ্রাফির মেথডে স্ক্রিন ডট প্লেট ব্যবহার করা হয়েছে (prepared from photo negatived) যেটা আমাদের আধুনিক অফসেট ছাপাইয়ের অনুরূপ।[৬৩] (চিত্র.৪.১২) অনেক মধ্যবিত্তের ঘরে 'art' সাজাবার জন্য কম দামে জলরঙে অঙ্কিত চিত্রের কপি করার জন্য ক্রমোলিথোগ্রাফ পদ্ধতিতে অনেকগুলো অনুলিপি ছাপা হতো। এমনও হয়েছে যে, একই সময় অনেকে মূল জলরং বা পেইন্টিং অঙ্কন করে যা আয় করতেন তার থেকে বেশি আয়ের আশায় এই পদ্ধতিতে ছাপ নিয়ে থাকতেন।[৬৪] (চিত্র.৪.৫, ৪.৬)

মূলত তিন ধরনের ক্রমোলিথোগ্রাফি চর্চা হয়েছে—

(১) প্রথমত ক্রমোলিথোগ্রাফি বই অলংকরণের বা সস্তা দরের ‘শিল্প’ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (১৮৯০)। (চিত্র.৪.৪)

(২) কখনো কখনো এ ধরনের ক্রমোলিথোগ্রাফিকে ‘ফ্রেঞ্চ’ স্টাইল বলা হয়। এটি জলরং (transparent) বা আলোকবাহী কিন্তু অস্বচ্ছ ছবির (translucent) কপি করানোর জন্য স্বচ্ছ বা অস্বচ্ছ এ দুই পদ্ধতিতেই চিত্র রচনা করা হয়েছে। যার ফলে ছাপচিত্রটিকে মূল ছবিরই অনুকরণ মনে হয়। এ ধরনের ছাপচিত্রগুলো (১৮৮০–১৮৯০) খুবই জনপ্রিয় ছিল। এগুলো বইয়ের জন্য প্রিন্ট নেওয়া হলেও বেশির ভাগ সময়ে পোর্টফোলিও আকারেও ছাপ নেওয়া হয়েছে। (চিত্র. ৪.৫, ৪.৬)

(৩) এ ধরনের স্টাইলকে আবার কখনো কখনো ‘জার্মান স্টাইল’ বলা হয়, যেখানে পেইন্টিংয়ের হুবহু কপি করা হতো। (চিত্র.৪.৭) এ ধরনের ছাপচিত্রগুলো বোর্ড বা ক্যানভাসে পেস্ট করে কাচের ফ্রেম ছাড়া বিক্রি করা হতো।[৬৫] ১৯৩০ সালে অফসেট প্রিন্টিং ক্রমোলিথোগ্রাফির স্থান অধিকার করে নেয়।[৬৬] নিম্নে

---

[61] “Chromolithography: Opposition to chromolithography”, 'Wikipedia, the free encyclopedia', https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography, 3 June 2014, at 08:30

[62] Dawn Glanz, “The Democratic Art: Pictures for a Nineteenth-Century America, Chromolithography 1840-1900 (Review)”, '*Winterthur Portfolio* 16(1981), P. 96–97'; https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography, 3 June 2014, at 08:30; 'Chromolithography: Arrival in America' https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography, 3 June 2014, at 08:30

[63] “Chromolithography Prints-Why they are considered 'originals”, *Free Clip Art, The Stoke Solution and Stock Photos*. http://www.tssphoto.com/index.php?p=693, Saturday, December 26, 2009

[64] Chris Lane, “Chromolithography”, 'Antique Prints Blog', http://antiqueprintsblog.blogspot.com/2009/06/chromolithography.html, Friday, June 12, 2009.

[65] *Ibid.*

[66] “Chromolithography: Uses”, 'Wikipedia, the free encyclopedia', https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography, 3 June 2014, at 08:30

ইউরোপ, ভারত ও বাংলাদেশে এই লিথোগ্রাফি চর্চার বিভিন্ন চরিত্রের সময়কাল সম্পর্কে সংক্ষেপে একটি ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

লিথোগ্রাফি ও অলিওগ্রাফি (ইউরোপ, ভারত ও বাংলাদেশ)

লিথোগ্রাফি (১৭৯৮)	
লিথোগ্রফি আবিষ্কার (১৭৯৮ সালে জন্ম)	অলিওগ্রাফি আবিষ্কার (১৮৩০–১৮৬০)
ইউরোপে (১৭৯৮–)	ইউরোপে (১৮৩০–১৮৬০, ১৯৩০ সাল পর্যন্ত চলে)
ভারতে (১৮২২ সালে শুরু হয়, ১৯৪০-এর দিকে ব্যক্তিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যম হয়ে ওঠে)	ভারতে (১৮৩৫–১৯০৬?) রবি বর্মার প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়–১৮৯৪ সালে (প্রথম শুরুটি জানা যায়নি)
বাংলাদেশে (১৮৭০–বর্তমান পর্যন্ত)	বাংলাদেশে এর কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি
কলকাতা গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট কলেজ (১৮৫৪ সালের পর)	কলকাতা গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট কলেজ (চর্চা হয়নি)
ঢাকা চারুকলা (১৯৫২–বর্তমান পর্যন্ত)	ঢাকা চারুকলা (চর্চা হয়নি)
ভারতে ১৮৬০ সালে কালার লিথো বা ক্রোমোলিথোগ্রাফি প্রিন্ট ছড়িয়ে পড়ে।	ঢাকা চারুকলায় ষাটের দশক থেকে কালার লিথোগ্রাফি চর্চা শুরু হয়।

দুই

৪.৩ লিথোগ্রাফির সামগ্রিক উত্থান এবং পতন

প্রিন্টমেকিং বা ছাপচিত্রের প্রয়োজনীয়তা মানুষকে প্রথম অনুধাবন করিয়েছিল গুহাচিত্রের দেয়ালে হাতের ছাপগুলো। ছাপচিত্র তখন যেমন ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল এখনো তেমনি ভাষা হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে অনেক। প্রাথমিকভাবে এটি ব্যবহারিক মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে এটি শিল্পের একটা গণমুখী চরিত্র প্রকাশে নিমিত্ত ব্যবহৃত ট্র্যাডিশনাল শিল্পের (traditional art) পাশাপাশি বর্তমানে কনসেপচুয়াল শিল্পের (প্রত্যয়বাদ, conceptual art) মতো শক্তিশালী স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষার দাবি নিয়ে শিল্পীদের কাছে উপস্থিত হয়েছে। কারণ কনসেপচুয়াল শিল্পও প্রথমে 'দাদাবাদ' নামে ১৯১৭ সালে '*সকলের জন্য শিল্প (art for all)*' হিসেবে উপস্থাপিত হয়; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 'শিল্প' একটি '*পরিকল্পনা*' *(art as*

idea)-তে পরিণত হয়। পরিবর্তী সময়ে *'শিল্প'*— একটি *দর্শন (as philosophy), তথ্য (as information), ভাষা সংক্রান্ত (as linguistics), অঙ্কশাস্ত্র (as mathematics), আত্মজীবনী (as autobiography), সমাজ সমালোচনামূলক (as social criticism), লাইফ রিস্কিং (as life-risking), কৌতুক (as joke) ও গল্প বলা (as story-telling)* ইত্যাদিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে এসথেটিক পিওরিটি ও পলিটিক্যাল আইডিয়ালিজমের সংমিশ্রণে পরিণত হয়েছে।[৬৭] আর ছাপচিত্র নিজে একটা ভাষা হওয়ায় এর ভবিষ্যৎ গ্রহণযোগ্যতার সম্ভাবনা সহজেই অনুমেয়। ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, যখনই এর অন্তর্ভুক্ত কোনো নতুন মাধ্যম পুরনো মাধ্যমের চেয়ে বাণিজ্যিক সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, তখন পুরাতন মাধ্যমটিকে নিয়ে শিল্পীরা সবসময় নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আসছেন শিল্প হিসেবে ভাষার ব্যাপ্তিতার প্রয়োজনে। সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। 'বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চা, বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা' হলো এই গবেষকের গবেষণার শিরোনাম। গবেষণাটির প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে ইউরোপ ও ভারতের বিশেষ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের লিথোগ্রাফি চর্চাও আলোচিত হয়েছে। মূলত বাংলাদেশে লিথোগ্রাফির চর্চা, তার ক্রমোন্নতির ইতিহাস, বর্তমান অবস্থা প্রকৃতভাবে বুঝতে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের লিথোগ্রাফি চর্চার সঙ্গে একটি তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। ইউরোপের লিথোগ্রাফি সম্পর্কে আলোচনা করতেই হয়েছে, কেননা অলিওগ্রাফিসহ লিথোগ্রাফির বিবিধ মাধ্যমে কৌশলের প্রাথমিক চর্চা ও বিকাশ ইউরোপেই হয়েছে। দেখা যাবে যে, বর্তমান পর্যন্ত ব্যবহারিক প্রয়োজন, আলংকারিক (illustrative purposses) ও অনালংকারিক প্রয়োজন অর্থাৎ চারুশিল্প (nonillustrative purposses, ক্রিয়েটিভ লিথোগ্রাফি চর্চা) বা মৌলিক সৃজনশীল— উভয় ক্ষেত্রেই লিথোগ্রাফি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এদের চরিত্রও দাঁড়িয়েছে ভিন্নরূপ। অলংকরণের উদ্দেশ্যে দুই ধরনের লিথো চর্চা হয়েছে। একটি হলো অলিওগ্রাফি (Oleography) আরেকটি হলো ক্রমোলিথোগ্রাফি [Chromolithography, আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের (সিভিল ওয়ারের) পর এটা খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং সেইসঙ্গে একটা দশকের নামকরণই হয়ে যায় 'ক্রমোসিভিলাইজেশন' (chromo civilization)[৬৮]নামে][69]। এই দুটি পদ্ধতি আবার চারুশিল্পের প্রয়োজনে করা লিথোগ্রাফি অনুশীলনেও

---

[67] Robert Smith, *Concepts of Modern Art: Conceptual Art,* 3rd edition, Singapore, 2001, pp. 256–258–259.
[68] Dawn Glanz, "The Democratic Art: Pictures' for a Nineteenth-Century America, Chromolithography 1840–1900 (Review)", *Winterthur Portfolio* 16(1981), p. 96–97, https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography
[69] Amit Mukhopadhyay and Nirmalendu Das, *Graphic Art in India (Abrief Background and History): 1850 to 1950,* 1st edition, New Delhi: Lalit Kala Akademi; Rabindra Bhavan, September 1985, p. 4;

অর্থবহ ভূমিকা রেখেছে। চরিত্রগত অভিব্যক্তিতে বা ভঙ্গিতে ভিন্নতা থাকলেও এদেরকে প্রায়ই আলাদা করে ব্যাখ্যা করা কঠিন। বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চর্চার গতিপথে অলংকরণের জন্য করা লিথোগ্রাফির ছায়া সামান্য পড়লেও অলিওগ্রাফির প্রভাব পড়েনি বললেই চলে। সে প্রসঙ্গকে স্পষ্ট করতে পটভূমি হিসেবে ভারতীয় শিল্পকলায় অলিওগ্রাফি, ক্রমোলিথোগ্রাফি ও কালার লিথোগ্রাফির প্রভাব আলোচিত হয়েছে এই গবেষণাপত্রে। বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চর্চাকে বর্তমান সময়ে সম্ভাব্যতাপূর্ণ (prospective) ও অতীত-পর্যালোচনামূলক (retrospective) এ দুইভাবে দেখা হয়েছে। এ দুটি প্রক্রিয়ায় মূল্যায়নের মাধ্যমে লিথোগ্রাফি চর্চার তাৎপর্যপূর্ণ গতিময়তা সৃষ্টির একটা উপায় খুঁজে বের করা যেতে পারে। ড. নির্মলেন্দু দাসের মতে, ভারতের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের (শান্তিনিকেতন) পশ্চিমবঙ্গতে ছাপচিত্রের চারুশিল্প চর্চার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে ভারতের মধ্যযুগের চিত্রকলা ও তৎকালীন আধুনিক পেইন্টিংয়ের অনুকরণ করানো। (চিত্র.৪.১৩) ফলে সেখানে সংস্করণ (edition) ঠিকমতো নেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।'[৭০] ছাপচিত্রের প্রথাগত বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি অর্জিত না হলেও দৃশ্যশিল্পের একটি ভিন্নধর্মী গুণগতমানের উন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তারা ধীরে ধীরে সংস্করণ নেওয়ার মতো পরিশীলনের দিকে এগিয়ে যায়। তবে তাদের বর্তমান কাজে অতীতের (Retrospective litho) লিথোগ্রাফির প্রভাবও লক্ষণীয়। অন্য অঞ্চল ও প্রতিষ্ঠানের এ ধরনের বিবর্তনের সঙ্গে বাংলাদেশের চর্চার তুলনার মাধ্যমে এর ধারাবাহিকতা, তাৎপর্য, মিল, অমিল, স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদির স্বরূপ অন্বেষণ করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য। একই সঙ্গে সৃজনশীল লিথোগ্রাফির ক্ষেত্রে সম্ভাবনার দিকগুলো উন্মোচনের প্রচেষ্টাও এই গবেষণার আরেকটি উদ্দেশ্য। লেখ্য ও ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফলাফলের উপস্থাপনের মাধ্যমে শিল্প সৃষ্টিতে সৃজনশীলতাকে সীমিত পরিসরে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টাও এই গবেষণা প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বাকিটা সময়ের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। এর সফলতাও নির্ভর করবে গবেষণাটি শেষ হওয়ার পর— এ বিষয়ে অনুভূত ফলাফলের ওপর। এই গবেষণায় প্রধানত আলোকপাত করা হচ্ছে লিথোগ্রাফির সৃজনশীল অনুশীলনে। যদিও লিথোগ্রাফির বাণিজ্যিক দিকটিকে নিয়ে বিশদভাবে একটি আলাদা গবেষণা হতে পারে, তবু একজন সৃজনশীল অনুশীলক হিসেবে এ ভাষার ব্যবহারকল্পের দিকটিকেই গবেষক গুরুত্ব দিতে সচেষ্ট হয়েছেন বলে নিম্নে ইউরোপ, ভারত ও বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চার পথপরিক্রমাটি নিয়ে আলোচনা করা হলো।

'Chromolithography' 'Wikipedia, the free encyclopedia', 3 June 2014, at 08:30, http://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography

[70] Nirmalendu Das, “Brief History of Printmaking at Santiniketan”, ‘*art etc* (news & views-monthly art magazine)’, August 2011. http://www.artnewsnviews.com/view-article.php?article=a-brief-history-of-printmaking-at-santiniketan&iid=23

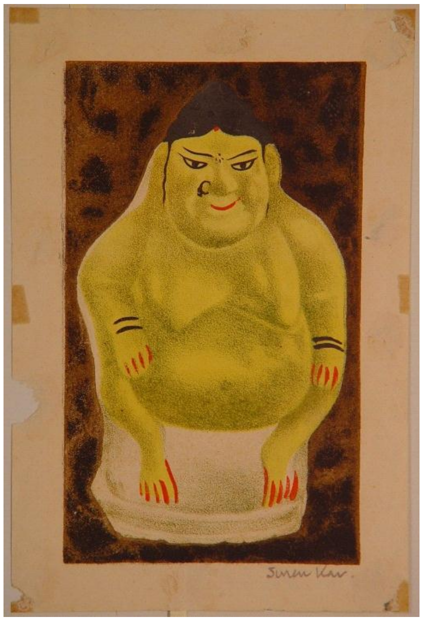

Plate:4.13, Surendranath Kar, Lithography, Collected from Nandan Archive, Shantiniketan, (শান্তিনিকেতনের প্রথম দিককার চিত্র)

৪.৩.১ ইউরোপ, ভারত ও বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চার পথপরিক্রমা

ইউরোপে জন্ম নেওয়া লিথোগ্রাফি প্রসেস প্রথম দিকে মূলত উডকাট, উড এনগ্রেভিং ও এচিংয়ের চেয়ে দ্রুততম মুদ্রণশিল্প মাধ্যম হিসেবে বাণিজ্যিক কারণেই ব্যবহৃত হতো। এর পাশাপাশি চারুশিল্পের ভাষা হিসেবে বর্তমান পর্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। জুলিয়াস হেলার (Julies Helleer) তার ‘প্রিন্টমেকিং টুডে *(Printmaking Today)*’ বইয়ে বলেন: হঠাৎ, রোমান্টিসিজমের সঙ্গে একসঙ্গে বের হয়ে এসেছে এবং ওই আন্দোলনের শিল্পীদেরকে ‘উডকাট ও উড এনগ্রেভিংয়ের চেয়ে অধিকতর স্বাধীন ও ড্রাফটসম্যানের হাতের স্বতোৎসারিত অভিব্যক্তির কাছাকাছি অভিব্যক্ত করার সুযোগ করে দিয়েছে।’(উদ্ধরণ চিহ্ন বর্তমান লেখকের) ইউরোপে টেম্পারার জায়গায় ওয়েল পেইন্টিং যেমন পঞ্চদশ শতকের শিল্পকে প্রভাবিত করেছিল, লিথোগ্রাফিও রোমান্টিসিজমের সমসাময়িক কালে আবিষ্কারের ফলে সেই ইজমের শিল্পীদের অভিব্যক্তি— ‘উডকাট ও উড এনগ্রেভিংয়ের চেয়ে অধিকতর স্বাধীন ও অভিব্যক্তময় করে শিল্পীকে তার হাতের স্বতোৎসারিত দক্ষতার খুব কাছাকাছি প্রকাশ করার জন্য সুবিধা করে দেয়।’[৭১]

---

[71] Jules Heller, *Printmaking Today*, 2nd edition, New York, p. 20; Toby Michel, *How Stone Lithography Works,* Toby Michel: (Toby is a master printer who trained at the Tamarind Institute.) Stone lithography's popularity with artists came about because it was the first printmaking medium to allow the artist to naturally 'paint' or 'draw' onto a flat stone to create an image. The artist creates the work directly and naturally. http://entertainment.howstuffworks.com/arts/artwork/stone-lithography.htm

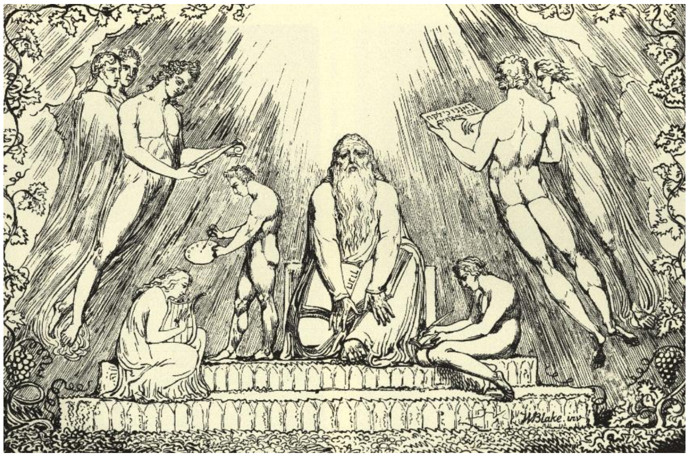

Plate:4.14, William Blake, litho, 1806, Job in Prosperrity, 8x12 inch,

Plate: 4.15, Horace Vernet, Napoléon in 1815 Lithography, 64x52 cm. ??

মানসিক আবেগ জাগায় এমন রূপকল্প, সংবেদনশীল, সূক্ষ্মানুভূতি, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও গভীর অনুরক্তি (Divotional) গুণের সমন্বিত ফেনোমেনন (Phenomenon) এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ের পুনর্জাগরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে ছবি আঁকায় লিথোগ্রাফি ব্যবহৃত হতে থাকে। (চিত্র.৪.১৪) শিল্প হিসেবে লিথোগ্রাফি ফ্রান্সে নেপোলিয়নের (Napoleon, ১৫ আগস্ট ১৭৬৯–৫ মে ১৮২১) রাজত্বকালে (১৮০৪–১৮১৪/১৫ সাল নাগাদ) গোল্ডেন এজের (Golden age) দিকে এগিয়ে যায়।[৭২] ১৮১৬-তে প্যারিসে চাহিদা পূরণের জন্য কিছু লিথো প্রেস বসানো হয়, যার থেকে ছাপ নেওয়া ছবির ফলাফল দেখে সমসাময়িক শিল্পীরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। (চিত্র.৪.১৫) ইউরোপে ১৮০০ সাল থেকেই লিথোগ্রাফি চারুশিল্পের মাধ্যম হিসেবে অলংকরণ ছাপাইয়ের (ইলাস্ট্রেটিভ প্রিন্টিংয়ের: ওলিওগ্রাফ, ক্রমোলিথোগ্রাফ বা কালার লিথোর পাশাপাশি) পাশাপাশি চলছিল, সেটা সেই সময়ের জর্জ বেক্সটারের (George Baxter, ১৮০৪–১৮৬৭, ইংরেজ শিল্পী ও লন্ডনের প্রিন্টার) অলিওগ্রাফি ও শুটার বয়েজের (Thomas Shotter Boys, ১৮০৩–১৮৭৪, ইংল্যান্ডের একজন ইংরেজ জলরং ও লিথোগ্রাফি শিল্পী ছিলেন) মতো শিল্পীদের লিথোগ্রাফির চরিত্র বা ভঙ্গির ভিন্নতা দেখলে সহজে অনুমেয় হয়ে উঠবে। কারণ, 'পঞ্চদশ শতকের মধ্যবর্তী (১৪৫০ সাল) সময় থেকেই ইউরোপের শিল্পী ও শিক্ষক সচেতনভাবেই গ্রাফিক মিডিয়াকে ব্যবহার করেছেন।'[৭৩] *'The Decorative Painters and Glaziers Guide'*-এ শিল্পী Nathaniel (Whittock, ২৬ জানু, ১৭৯১–১৮৬০) ওক, মেহগনি, মেপেল কাঠ, গোলাপ ইত্যাদি অনেক ধরনের বৃক্ষের অনুকরণচিত্র লিথোগ্রাফি মাধ্যমে ছাপাই করে সেগুলোর ওপর এরাবিক গাম ও

---

[72] Jules Heller, *Printmaking Today*, 2nd edition, New York, p. 20
[73] Amit Mukhopadhyay and Nirmalendu Das, *Multiple Encounters 2012: Graphic Art in India (Abrief Background and History): 1850 to 1950*, 2nd addition, P. 7.

ভার্নিশ লাগিয়েছিলেন চকচকে ভাব আনার জন্য। (চিত্র. ৪.১৯) এটি লিথোগ্রাফি চিত্রের ওপর প্রথম জলরং দিয়ে আঁকা চিত্র ধরা[৭৪] হলেও এর আগেই এডওয়ার্ড হাল (Edward Hull)-এর আঁকা ১৮২১ সালের Sir Henry Dymoke নামক লিথোগ্রাফি চিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। (৪.১৮) সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লিথোগ্রাফিতে কারিগরি ও করণ-কৌশলগত (Technological) পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং সেদিকে এগিয়েও যায়।

Plate: 4.16, George Baxter, oleograph, 12 x 7 inch

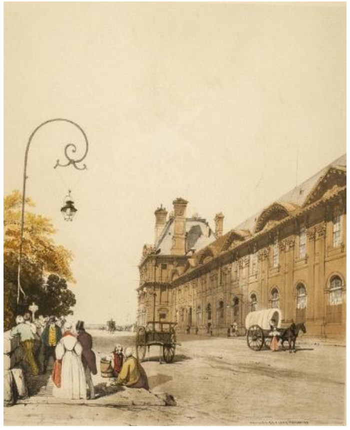

Plate:4.17, Shotterboys, lithography

আলোকচিত্রকর নেপকি (Niepce) লিথোগ্রাফি সম্পর্কে খুব ভালো অবহিত ছিলেন বলে ১৮১৫ সালে লিথোপাথর ও জিংক প্লেটের ওপর আলোকচিত্র তৈরির চেষ্টা করেন। তার এই প্রসেসটি হেলিওগ্রাফি heliographie (হেলিওগ্রাফি-১৮২৬ সাল, গ্রিক '*helio*' অর্থ হলো '*sunlight*', যেখানে '*photo*' অর্থ হচ্ছে *light*)[৭৫] নামে পরিচিত, যার অর্থ হচ্ছে 'sun drawing'। (চিত্র.৪.২০, ৪.২১) পরে ১৮৫৫ সালে এল. এ. পয়েটভিন (L. A. Poitevin) স্টোনের ওপর পুনরুৎপাদনের জন্য ফটো লিথোগ্রাফি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।[৭৬]

---

[74] "Color printing in the nineteenth century-Lithography: Early Lithographic Processes", 'University of Delaware Library', http://www.lib.udel.edu/ud/spec/exhibits/color/lithogr.htm, Last modified 12/21/10; "Bird's-eye view", 'London, Hull and York and of Melbourne: Oxford Art Online; Australia: Sanders of Oxford', https://en.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Whittock, 16.5.2011, Nathaniel Whittock: (born 26 January 1791–1860) was a Victorian topographical engraver, who published bird's-eye views, e.g. of York (1856), Oxford (1834), Melbourne, Australia (1854), Hull (1855), and London (1845, 1849, 1859).

[75] "Daguerreotype", 'Wikipedia, the free encyclopedia', /daguerreotype-1839/photography-1836

[76] "Lithography, 1. Definition and Historical outline", A technical dictionary of printmaking, 'Printmaking dictionary, Andre Beguin' http://www.polymetaal.nl/beguin/mapl/lithography/lithodefinition.htm

১৮২০–১৮৫০-এর মধ্যবর্তী সময়ে আলোকচিত্রের[৭৭] [ট্যালবোট (William Henry Fox Talbot ১১ ফেব্রু. ১৮০০–১৭ সেপ্টে. ১৮৭৭) ১৮৩৯ সালে তার ফটোগ্রাফি আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন]'[৭৮] আবিষ্কারের পর থেকে গ্রাফিক শিল্পের ইতিহাসে স্টোন ব্লক বা স্ক্রিনপ্রিন্টের পক্ষে শিল্পীর অতৃপ্ততাকে পূরণ করা সম্ভব হলো না। শিল্পনগরীর (industrial society) চাহিদা এবং শিল্পীদের অভিব্যক্তি ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতার জন্য লিথোগ্রাফি প্রিন্টের চাহিদা কমে কমে আসতে থাকে।[৭৯]

Plate: 4.18, Edward Hull, litho, Sir Henry Dymoke, litho, printed by Charles Joseph Hullmande, 14 x 19 inch, 1821.

Plate: 4.19, Nathaniel Whittock, 1st water colortouch on litho-1832.

Plate: 4.20, Heliographie-1-W-51St-NewYork-August-2014.

Plate:4.21, Niépce,1825, Héliographie (photolitho)

[77] ট্যালবোট (William Henry Fox Talbot ১১ ফেব্রু. ১৮০০–১৭ সেপ্টে. ১৮৭৭) ১৮৩৯ সালে তার ফটোগ্রাফি আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন

[78] Larry J. Schaaf, 'Hill, David Octavius (1802–1870)', Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004; online edn, May 2013 [http://www.oxforddnb.com/view/article/13270, accessed 15 May 2014]; http://www.gsaarchives.net/archon/?p=creators/creator & id=282# sthash.wYVie6cq.dpuf;
Hill, David Octavius (1802-1870),
http://www.gsaarchives.net/archon/?p=creators/creator&id=282#sthash.Jcz5ZID

[79] Jules Heller, *Printmaking Today*, 2nd edition, New York, p. 29

১৮৪২ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ স্যার জন হার্সেল (Sir John Frederick William John Herschel, ১৭৯২-১৮৭১) সাইনোটাইপ (Cyanotype) আবিষ্কার করেন। (চিত্র.৪.২২) যেটা একধরনের ফটোগ্রাফিক প্রিন্টিং প্রসেসের মধ্য দিয়ে নীল রঙের প্রিন্ট বের হয়ে আসে।[৮০] এই শতকেই ক্রমোলিথোগ্রাফির রঙিন ছাপাইয়ের (colour printing) অনেক ধরনের প্রক্রিয়া (methode) আবিষ্কার হয়। জনপ্রিয় থাকলেও সেগুলোর গুণাগুণ ছিল খুব সাধারণ (poor) ধরনের।[৮১]

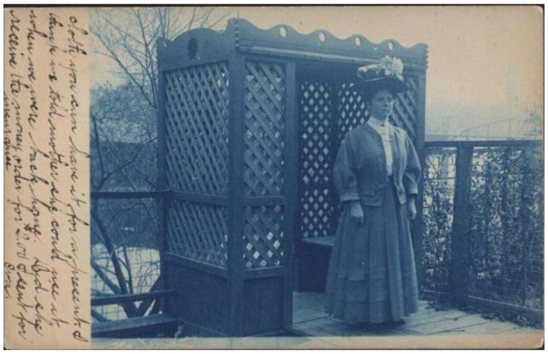

Plate:4.22, Cyanotype postcard, Racine, Wis, c. 1910,

Plate: 4.24, গডেফ্রয় এঞ্জেলম্যান, প্রথম রঙিন লিথোগ্রাফি (ক্রমোলিথোগ্রাফি) পদ্ধতির প্যাটেন্ট করেন ১৮৩৭ সালে।
In France, Godefroy Engelmann is awarded a patent on chromolithography, a method for printing in color using lithography. Chromolithographs or chromos are mainly used to reproduce paintings.

আবিষ্কারক আলইস (Alois Senefelder জ. ৬ নভেম্বর ১৮৭১–২৬ ফেব্রু. ১৮৩৪) সেনেফেলডার অবশ্য ১৮১৮ সালেই তার *A Complete Course of Lithography (Vollstaendiges Lehrbuch der Steindruckerey)* বইয়ে রঙিন লিথোগ্রাফির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে ছাপ প্রক্রিয়ার পরিলেখ সম্পর্কে

---

[80] “Cyanotype”, ‘Wikipedia, the free encyclopedia’, 1 March 2017, at 09:51, https://en.wikipedia.org/wiki/Cyanotype

[81] Kathryn Ferry, “Printing the Alhambra: Owen Jones and Chromolithography: Architectural History 46(2003)”, 'Wikipedia, the free encyclopedia', pp. 175–188, https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography**,** 3 June 2014, at 08:30

বলেন, পরে যেকোনো সময় এভাবে প্রিন্ট নেওয়া যেতে পারে। তিনি রঙের টিনটিন মিডিয়াম আবিষ্কার করেন। তা ছাড়া সেনেফেলডারের লিখিত পরিলেখ দেখে অন্য দেশের প্রিন্টাররা যেমন ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের প্রিন্টাররাও রঙিন লিথোগ্রাফি ছাপ তৈরির চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। ফ্রান্সের মুলহাউসের (Mulhouse) গডেফ্রয় এঞ্জেলম্যান (Godefroy Engelmann, ১৭৮৮–১৮৩৯) জুলাই ১৮৩৭-তে ক্রমোলিথোগ্রাফির[৮২] (লিথোগ্রাফিতে রঙিন কালারে প্রিন্ট নেওয়ার পদ্ধতি) প্যাটেন্ট প্রয়োগ করতে সফল হন এবং এর জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন।[৮৩] (চিত্র.৪.২৪) কিন্তু এখানে উল্লেখ্য যে, এই তারিখের আগেই ক্রমোলিথোগ্রাফি আবিষ্কার হয়, যেমন কিছু তাসের কার্ড ছাপানোর কাজ (প্লেইং কার্ডের প্রডাকশন) সেই দিকটিকে নির্দিষ্টায়ন করে।[৮৪.] যদিও রঙিন ছাপচিত্রের উন্নতি চীনে পূর্বের শতকে ঘটেছে[৮৫] তবু পরবর্তী সময়ে রঙিন লিথোগ্রাফির (Fine art বাদে) প্রক্রিয়াগুলো গডেফ্রয় এঞ্জেলম্যান[৮৬], আর রঙিন ছাপাইয়ের অন্য (এচিং, উডকাট) প্রক্রিয়াগুলো জ্যাকব ক্রিস্টোফ লি ব্লন [Jacob Christoph Le Blon, জ. ২ মে ১৬৬৭–১৬ মে ১৭৪১, একজন ফ্রাংকফুটের পেইন্টার ও এনগ্রেভিং শিল্পী, যিনি তিন-চার কালারের কালার ছাপাইয়ের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, যেটা কালার মডেলের CMYK-এর অনুরূপ],[৮৭] জর্জ বেক্সটার [George Baxter (1804–1867), রঙিন লিথোর অলিওগ্রাফির প্রক্রিয়ার আবিষ্কারক] ও এডমুন্ড ইভানস [Edmund Evans (২৩ ফেব্রু. ১৮২৬–২১ আগস্ট ১৯০৫), ভিক্টোরিয়ান যুগের বিখ্যাত উড এনগ্রেভিং এবং কালার প্রিন্টার শিল্পী]-এর মতো ছাপচিত্রকর (Printer/Printmaker) উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনেকগুলো রঙে কাজ করার জন্য প্রথমে উডকাট ব্লকের ওপর নির্ভর করে ছাপ নিয়ে, বাকি ছাপগুলো লিথোগ্রাফি মাধ্যমে নেওয়া হতো।

---

[82] Kathryn Ferry, “Printing the Alhambra: Owen Jones and Chromolithography: Architectural History 46(2003)”, 'Wikipedia, the free encyclopedia', pp. 175–188, https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography, 3 June 2014, at 08:30

[83] “The history of print from 1800 to 1899”, 'Pressure.com', http://www.prepressure.com/printing/history/1800-1899, 16 July 2015.

[84] Kathryn Ferry, ibid.

[85] Lycett, p. 8. https://en.wikipedia.org/wiki/George_Baxter_%28printer%29,

[86] “Artist Summary”, 'Artfact’ Retrieved 2014-06–30, https://en.wikipedia.org/wiki/Godefroy_Engelmann#cite_note-2; chromolithography, http://en.wikipedia.org/wiki/Godefroy_Engelmann

[87] Arnold Houbraken, “Filip Roos Biography”, ‘De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen (1718)’, Digital library for Dutch literature, http://www.dbnl.org/tekst/houb005groo01_01/houb005groo01_01_0294.php; https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Christoph_Le_Blon, 7 July 2015, at 19:34

‘১৮৩০ সালে অলিওগ্রাফ আবিষ্কৃত হলেও বাণিজ্যিকভাবে ব্যাপকতা পেতে সময় লেগে যায় ১৮৬০ সাল নাগাদ। তবে খুব জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে টিকে ছিল এই শতকের শেষ পর্যন্ত।’[৮৮] ১৮৭৫-এর পূর্ব পর্যন্ত দাপ্তরিক ব্রিটিশ অর্ডিন্যান্সের সার্ভের (Ordnance Survey) মানচিত্রের রঙের অংশে হাত দিয়ে তুলির স্পর্শে শ্রমিকরা (বালক/বালিকা/মহিলা) রঙিন ছাপচিত্র রচনা করত। অর্থাৎ হ্যান্ড টাচের একটা গুরুত্ব ছিল। অনেকগুলো লিথোপাথর ব্যবহারের কৌশল প্রয়োগ করা শুরু হলো।[৮৯] হ্যান্ড টাচ ছাড়া প্রথম সাফল্যজনক রঙিন লিথোগ্রাফি চিত্র বের হয়ে আসে শিল্পী শুটার বয়েজের তৈরি শিল্পকর্মে ১৮৩৯ সালে।[৯০] (চিত্র.৪.১৭) যে এচিং বা কাঠখোদাই লিথোগ্রাফির মতো এত দ্রুততম মুদ্রণযন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনি; তার আবার পুনর্জাগরণ ঘটল ১৮৫০–১৮৯০ সালের মধ্যে, তবে তা পুনরুৎপাদনের (Reproduction) চেয়ে ছাপাই (print) মাধ্যমে মৌলিক শিল্প রচনায় উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যই ছিল মুখ্য। তাই এ সময়টিকে ইউরোপে এচিংয়ের পুনর্জাগরণ (Etching revival) বলে ধরে নেওয়া হয়। 'These qualities led etching to be viewed as more authentic, artistic, and expressive than other printmaking processes in nineteenth-century France.' ফেলিক্স ব্রাকিউমন্ড (Felix Braquemond, ১৮৩৩-১৯১৪) 'Society of etchers' প্রতিষ্ঠা করে পেইন্টার ও ছাপচিত্রীদের পুনরুৎপাদন বন্ধ করে ছাপাই ছবির (printmaking) দিকে উদ্বুদ্ধ করেন। তারা 'painter-printmaker' নামকরণে একীভূত হয়েছিলেন। হুইসলার (J. M. Whistler, ১৮৩৪–১৯০৩) এই সংগঠনের একজন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক ছিলেন। পাশাপাশি তিনি ৪৪২টি এচিং, ড্রাইপয়েন্ট ও ১৫০টি লিথোগ্রাফি রচনা করে আধুনিক ছাপচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।[৯১] শিল্পী হুইসলারের তৈরি ‘রিভার থিমস’-এর সূক্ষ্ম ভিউ থেকে প্রতিস্থাপন (transfer process) করে আঁকা তেজদীপ্ত লিথোগ্রাফি কমার্শিয়ালি ইউনাইটেড স্টেটের কুরিয়ার ও ইভস নামক ফার্ম থেকে প্রকাশিত হয়। (চিত্র.৪.২৪) ১৮৮৬ সালের দিকে ওরেল গেসনার ফুজিলি 'Orell Gessner Füssli' নামক সুইস কম্পানি লিথোগ্রাফিতে ফটোক্রম 'photochrom' পদ্ধতি ব্যবহার শুরু করে। (চিত্র.৪.২৫) এরূপ চিত্রে ছয় থেকে ১৫টি স্টোন

---

[88] Nalini Malaviya, “Raja Ravi Varma's Oleographs: Glimpses from the Past”, ‘Art Scene India’, http://www.artsceneindia.com/2014/10/raja-ravi-varmas-oleographs-glimpses.html

[89] Michael Clapper, “I Was Once a Barefoot Boy!: Cultural Tensions in a Popular Chromo”. ‘American Art 16(2002)’, p.p 16–39. http://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography

[90] Jules Heller, *Printmaking Today*, 2nd edition, New York, P.22

[91] “The Etching Revival in Nineteenth-Century France”, ‘Heilbrunn Timeline of Art History’, Britany Salsbury, Department of Drawings and Prints New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000, http://www.metmuseum.org/toah/hd/etre/hd_etre.htm,September 2014.

ব্যবহার করা হতো এবং ১৮৯০ সালের দিকে শহরের বিভিন্ন দৃশ্যপটের ছাপচিত্রগুলো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[৯২]

Plate: 4.24, Whisler, litho, The Thames at Battersea, 1878, 6.75x10.75inch.

Plate: 4.25, photochrom Lithography, (Neuschwanstein Castle)[৯৩], arond 1886.

Plate: 4.26, Henri de Toulouse Lautrec, Lithography.

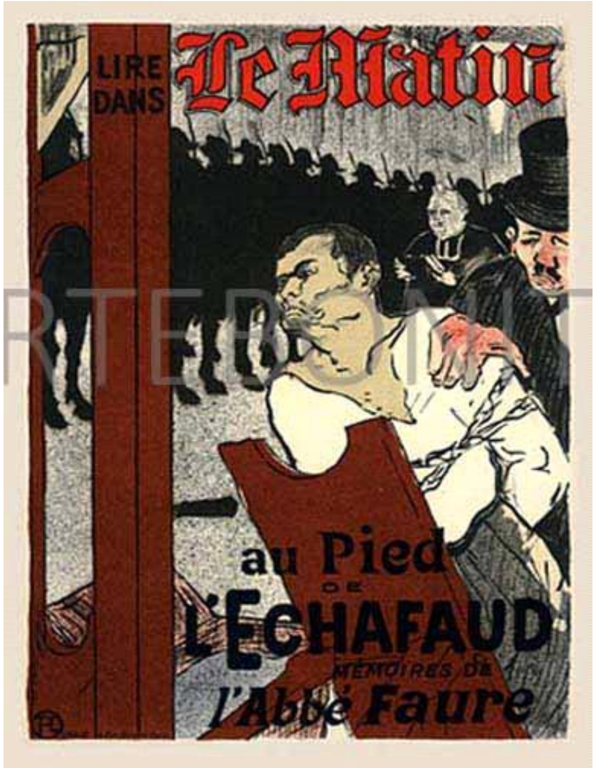

Plate: 4.27, Henri de toulouse-lautrec, Le matin, litho, 10x14 inch, 1966.

---

[92] "The history of print from 1800 to 1899", 'Pressure.com', http://www.prepressure.com/printing/history/1800-1899, 16 July 2015

[93] http://www.neuschwanstein.de/englisch/palace/, নিউয়াস্কওয়ানস্টেইন দুর্গের (Neuschwanstein Castle)ঃ ১৮৮৬ সালে জার্মানিতে রাজা লুড ইউগ (২)-এর মৃত্যুর সাত সপ্তাহ পরে দুর্গটি দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। ইউরোপে বর্তমানেও এটি মোটামুটি খুব জনপ্রিয় দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। ফটোক্রম পদ্ধতিতে অঙ্কিত জার্মানির বেভেরিয়া অঞ্চলের নিউয়াস্কওয়ানস্টেইন দুর্গের (Neuschwanstein Castle)[৯৩] লিথোগ্রাফি চিত্র, ১৮৯০।

Plate: 4.28, Edouard Vuillard, lithography, Sur le Pont de l'Europe (E.Vuillard Portfolio, 9x13 inch, 1950.

Plate: 4.29, Pierre Bonnard, woman-with-a-parasol, lithography, Style-Japonism,

ফটোক্রম পদ্ধতিতে একটি সাদাকালো আলোকচিত্রের নেগেটিভ থেকে লিথো পাথরে ট্রান্সফার করে অনেকগুলো প্লেট তৈরি হয়। ১৮৯০ সালের দিকে তুলজ লুত্রেকের (Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa, ২৪ নভেম্বর ১৮৬৪–৯ সেপ্টেম্বর ১৯০১) হাত দিয়েই রঙিন লিথোগ্রাফি শিল্পের নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়। (চিত্র. ৪.২৬, ৪.২৭) লুত্রেকের কাজের উদাহরণগুলো ফরাসি শিল্পী পল গঁগ্যা (Paul Gauguin, জ. ১৮৪৮–১৯০৩), পিয়ারে বোনার্ড (Pierre Bonnard, ১৮৬৭–১৯৪৭, ফরাসি চিত্রকর ও ছাপচিত্রী) এবং এডওয়ার্ড ভুইলার্ড (Edouard Vuillard, ১১ নভেম্বর ১৮৬৮–২১ জুন ১৯৪০, চিত্রকর ও ছাপচিত্রী) প্রবল উৎসাহের সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন।[৯৪] (চিত্র. ৪.২৮, ৪.২৯) বাণিজ্যিক সিনেমার রঙিন পোস্টার, খেলনার ছবি ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে ব্যবহারের কারণে ইউরোপে বিংশ শতকের প্রথম দিকে শিল্পীরা লিথোগ্রাফি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৬০ সালে শিল্পী জেসপার জোনস (Jasper Johns, জ. ১৫ মে ১৯৩০, আমেরিকার পেইন্টার ও ছাপচিত্র শিল্পী) ও রবার্ট রজেনবার্গ (Robert Rauschenberg, ২২ অক্টোবর ১৯২৫–১২ মে ২০০৮, আমেরিকার পেইন্টার ও ছাপচিত্র শিল্পী) লিথোগ্রাফিকে পুনরায় শিল্পমাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন।[৯৫] বিংশ শতকে নরওয়ের শিল্পী এডভার্ড মুঙ্ক (Edvard Munch, ১২ ডিসেম্বর ১৮৬৩–২৩ জানু. ১৯৪৪), জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট ম্যাক্স বেকম্যান (Max Beckmann, ১২ ফেব্রু. ১৮৮৪–২৭ ডিসে. ১৯৫০, জার্মান পেইন্টার, ড্রাফটসম্যান, ভাস্কর ও লেখক), আর্নেস্ট ক্রিসনার (Ernst Ludwig

[94] Dennis Gaffney, 'Tips of the Trade -Lithography 101', *Antique Roadshow,* http://www.pbs.org/wgbh/roadshow/tips/lithography.html, 9.10.2001
[95] Dennis Gaffney, “Tips of the Trade -Lithography 101”, ‘Antique Roadshow’, http://www.pbs.org/wgbh/roadshow/tips/lithography.html, 9.10.2001

Kirchner, ৬ মে. ১৮৮০–১৫ জুন ১৯৩৮, জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট পেইন্টার ও ছাপচিত্রকর) ও কাথ কলুইজ (Kathe Kollwitz, জ. ৮ জুলাই ১৮৬৭–২২ এপ্রিল ১৯৪৫, জার্মান পেইন্টার, ভাস্কর ও ছাপচিত্রকর), জসি ক্লিমেন্ট অরজকো (José Clemente Orozco, জ. ২৩ নভেম্বর, ১৮৮৩–৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯, মেক্সিকোর শিল্পী), দিয়াগো রিভেরা (Diego Rivera, জ. ৮ ডিসেম্বর ১৮৮৬–২৪ নভেম্বর ১৯৫৭, মেক্সিকোর স্বনামধন্য শিল্পী) এবং মেক্সিকোর রুনিফো তামায়ো (Rufino Tamayo, জ. ২৬ আগস্ট ১৮৯৯–২৪ জুন ১৯৯১, পেইন্টার), আমেরিকার শিল্পী জর্জ ওয়াজেলি বিলোওস (George Wesley Bellows, জ. ১২ অথবা ৯ আগস্ট ১৮৮২–৮ জানু. ১৯২৫, আমেরিকার বাস্তবধর্মী শিল্পী), রবার্ট রজেনবার্গ এবং জেসপার জোনস, ফরাসি শিল্পী হেনরি মাতিস (Henri-Émile-Benoît Matisse, জ. ৩১ ডিসে. ১৮৬৯–৩ নভে. ১৯৫৪), জর্জেস রাউল্ট (Georges Henri Rouault, জ. প্যারিস ১৮৭১–১৩ ফেব্রু. ১৯৫৮) এবং আরো স্পেনের শিল্পী পাবলো পিকাসো (Pablo Picasso, জ. ২৫ অক্টোবর ১৮৮১–৮ এপ্রিল ১৯৭৩) মাধ্যমটিকে অনুপ্রাণিত করে জীবনীশক্তি ও ক্ষমতা দান করেছেন।[৯৬]

Plate: 4.30, Jasper Jhons, Lithography, Figure 1, 1969.

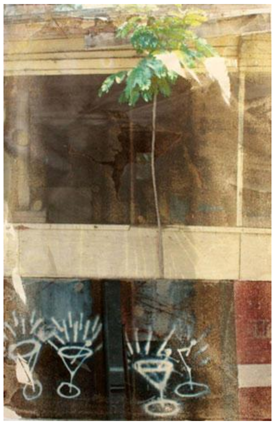

Plate: 4.31, Rauscheberg, Lithography

বর্তমানে ৯/১০/২০০১ তারিখের একটি লেখায় বলা হয়, Artists have long been enamoured with lithography because it's a painterly process that produces painting-like results,[97] ট্যামারিন্ড (*tamarind*, University of New Mexico, চারুশিল্পে লিথোগ্রাফির জন্য শিল্পীদের শিক্ষাবিষয়ক ও প্রফেশনাল শিল্পীদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান) ওয়ার্কশপের শপ ম্যানেজার বিল (Bill Lagattuta, ট্যামারিন্ডের মাস্টার প্রিন্টার এবং ওয়ার্কশপের ব্যবস্থাপক। বিলসহ এই দশকের

---

96 “Lithography”,_'Wikipedia, the free encyclopedia', http://www.britannica.com/EBchecked/topic/343748/lithography

97 Dennis Gaffney, ibid.

তিনজন কিংবদন্তি প্রিন্টার Tamarind Institute থেকে এ বছরে অবসর গ্রহণ করবেন।) বলেন যে, 'Etching and woodcuts feel much more stiff and static.' তিনি আরো বলেন, 'The lithographic process seems to suit painters well because it's more fluid and spontaneous.' ডান এলিয়াস বলেন, 'If you take a brush full of ink and splash it on a stone, that's what you'll get in the finished print.' [৯৮]

ভারতে কিন্তু একটু ভিন্নভাবেই শুরু হয়েছে। কারণ গ্রাফিক আর্ট চারুশিল্পের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে ১৯৫০ সালের পর থেকে। লিথোগ্রাফি শুধু বাণিজ্যিকভাবেই ব্যবহারের জন্য শুরু হয়েছিল ১৮২৪ সাল থেকে। স্যার চার্লস ডয়েলি (Sir Charles D'oyly, জ. ১৭৮১–১৮৪৫) তার লিথোগ্রাফি ছাপাই ছবি তৈরি করে ছিলেন পাটনার 'বিহার এমেচার লিথোগ্রাফিক প্রেস'-এ ১৮২৮ সালে।[৯৯] (চিত্র.৪.৩২) প্রাতিষ্ঠানিকভাবে লিথো চর্চা ১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট কলেজ' কলকাতাতে শুরু হলেও সেখানে ছাপাখানাগুলোর উদ্দেশ্য সাধনই ছিল মুখ্য। ক্রমোলিথোগ্রাফি ও কালার লিথোগ্রাফি চর্চা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হতে সময় লেগে যায় ১৮৬০ সাল নাগাদ। ১৮৭০ সালে ভারতে সিঙ্গেল শিট ছাপাই ছবির (print, Fine art print) জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং অনেক আর্ট স্টুডিও, ছাপাই ছবির প্রেস ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।[১০০] ১৮৮০ সালে লিথো প্রেসে নাটকের (থিয়েটারের) বড় বড় কালার পোস্টার ছাপা হয়।[১০১] এরপর রবি বর্মার হাত ধরে ওলিওগ্রাফ ১৮৯৪ সালের দিকে ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। (চিত্র.৪.৩৩) ভারতে কখন যে প্রথম ওলিওগ্রাফ ছাপাই শুরু হয় এবং বন্ধ হয়ে যায়, তার সঠিক দিন-তারিখ এখনো গবেষণার বিষয়। উনিশ শতকে এতটাই জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, রবি বর্মার মৃত্যুর (১৯০৬ সালের পর) পরও ভারতে অলিওগ্রাফি ছাপ নেওয়া হয়েছে।[১০২] এই শতকের মধ্যে কলকাতাতে আরো প্রিন্টিং প্রেস ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। এদের কয়েকটির মধ্যে 'কলকাতা আর্ট স্টুডিও (১৮৪৯–১৯০৫)' ও 'ভারত লিথোগ্রাফিক স্টুডিও' ছিল খুব স্বনামধন্য। পোস্টার, ম্যাপ এবং বিজ্ঞাপনশিল্পের কাজ ছাড়াও প্রেসগুলোর বড় বড় শিটের রঙিন লিথোগ্রাফি (Multicolour lithography) সমাজের সাধারণ মানুষের

[98] Dennis Gaffney, "Tips of the Trade -Lithography 101", 'Antique Roadshow', http://www.pbs.org/wgbh/roadshow/tips/lithography.html, 9.10.2001

[100] Kavita Shah, "Printmaking practices in India: An historical sketch and contemporary printmakers", Mohile Parekh Center, Presentation and Discussion, 20th Thursday, July. 2006 6.30pm http://mohileparikhcenter.org/site/?q=node/232,

[101] Kavita Shah, *Ibid*.,

[102] Nalini Malaviya, "Raja Ravi Varma's Oleographs: Glimpses from the Past", 'Art Scene India', http://www.artsceneindia.com/; http://www.artsceneindia.com/2014/10/, raja-ravi-varmas-oleographs-glimpses.html, 15 Oct 2014

চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যবহৃত হতো। এই প্রিন্টগুলোর বেশির ভাগই ধর্মীয় (religious) এবং পৌরাণিক (mythological) বিষয়নির্ভর ছিল।

Plate: 4.32, Sir Charles D'oyly, handcolored litho, View near the Circular Road (Calcutta), 34x28 inch, 1848.

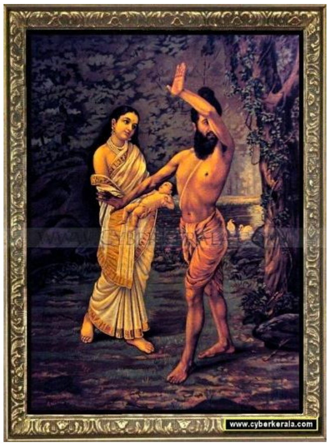

Plate: 4.33, Raza Ravi Varma, Shakuntala Patralekhan, Oleograph, late 19th century, 20x27.5 inch.

উনিশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথম অংশে ওই রঙিন লিথোগুলো বেঙ্গলের ধর্মীয় পরিবারগুলোর কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ছাপগুলোর মার্কেট মূলত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কালীঘাট মন্দির, চিতেশ্বরী মন্দিরের কাছাকাছি দোকানগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে।[১০৩] সম্ভবত বটতলার (The term 'Bat-tala' is earned from the area of north Calcutta where this indigenous school of printmaking developed) শিল্পীদের হাতে তৈরি (menually produced) করা বড় বড় উডকাট ছাপচিত্রগুলো যান্ত্রিক রঙিন (mechanicaly produced multicolour) লিথোগ্রাফি ছাপচিত্রগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়। আশ্চর্যজনকভাবে অফসেট ও ডিজিটাল ছাপাইয়ের এই যুগেও কলকাতার চিৎপুরে ওই সব লিথো প্রেসের কয়েকটি (যদিও খুব অল্পসংখ্যক) এখনো টিকে আছে। সে প্রেসগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সিনেমা ও নাটকের বিজ্ঞাপনের জন্য পোস্টার ও অন্য বাণিজ্যিক ছাপাই চিত্র (commercial product) তৈরি করে টিকে আছে। বিংশ শতকের শুরু থেকে বাণিজ্যিক (কমার্শিয়াল) মুদ্রণ ও পর্নোগ্রাফি ছাপার জন্য ‘বটতলা’র প্রকাশনা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। (চিত্র.৪.৩৪) ভদ্রলোক, লেখক ও প্রকাশক ‘বটতলা’ পরিভাষাটি অবমাননাকর হিসেবে ব্যবহার করতেন।[১০৪] ধীরে ধীরে সব দিক থেকে লিথোগ্রাফি চর্চার মান নিচের দিকে যেতে থাকে।

---

[103] Kavita Shah, “Printmaking practices in India: An historical sketch and contemporary printmakers”, Mohile Parekh Center, Presentation and Discussion, 20th Thursday, July. 2006 6.30pm http://mohileparikhcenter.org/site/?q=node/232,

[104] Sirajul Islam, “Bat-tala”, 'National Encyclopedia of Bangladesh, Banglapedia in Bangla, ©Copyright Banglapedia 2012.' http://www.banglapedia.org/HT/B_0396.htm; Kavita Shah, “Printmaking practices in

Plate: 4.34, Bat-tala,s Lithography,

Plate: 4.36, Agamani, Chromolithograph, Calcutta Art Studio, Calcutta, 19th Century, Bengal Art Scene in the Colonial Period

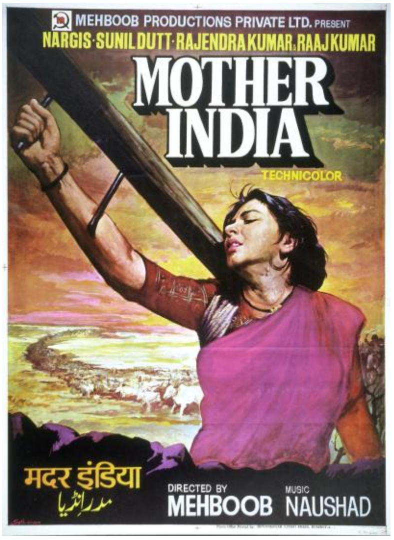

Plate:4.37, colour lithograph, SETH STUDIOS (designer), Mother India 1957, (printed 1980s) 107x80 cm

Plate: 4.38, Ratna Brand of Medicine, product label, chromolithograph, published by Mashhoor, Davaghar (Chemist Shop), Kasauli, Punjab, mid 20th century

Plate: 4.39, East and West, product label for trading company, chromolithograph, mid 20th century.

পরবর্তী সময়ে ১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ১৯২৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ করের (Surendranath Kar, জ. ১৮৯২–১৯৭০) হাত দিয়ে পুনরায় লিথো চর্চা চারুশিল্পের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শুরু হলেও ১৯৬৯ (সম্ভবত) সালের দিকে সোমনাথ হোরের (Somnath Hore, ১৯২১–২০০৬) হাত দিয়েই পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।[১০৫] তবে ১৯১৭ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত বিচিত্রা স্টুডিওকেই এই সাবকন্টিনেন্টের প্রথম ভাববিনিময় কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান

India: An historical sketch and contemporary printmakers", Mohile Parekh Center, Presentation and Discussion, 20th Thursday, July. 2006 6.30pm http://mohileparikhcenter.org/site/?q=node/232,

[105] Nirmalendu Das, "A Brief History of Printmaking at Santiniketan" 'art etc.', news & views-monthly art magazine, August 2011; Dr Prag Roy, Privet collection from email. 20/10/2014

হিসেবে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে। সেখানে প্রতিষ্ঠিত লিথোগ্রাফি প্রেস থেকে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (Gaganendranath Tagore, September, জ. ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬৭–১৯৩৮) 'নব হুল্লোড়' নামকরণের কার্টুন অ্যালবাম বের করা হতো। সেটাই ছিল বাণিজ্যিক মুদ্রণযন্ত্র থেকে চারুশিল্পের জন্য ছাপ নেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। বিচিত্রা সভা বেশি দিন টিকে থাকেনি। আর প্রেসটি ১৯২৬ সালে কলাভবনে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল।[১০৬] এদিকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে লিথোগ্রাফি নিয়ে ১৯৪০-এর পর থেকে ব্যক্তিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা (indivisual Experiment) শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে মনে রাখতে হবে যে, সার্থকভাবে চারুশিল্পের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে সময় লেগে যায় ১৯৫০ সাল নাগাদ। উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে 'গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট' (১৮৫৪, ১৬ অগাস্ট) কলকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট হিসেবে পরিচিত ছিল। ব্রিটিশ সরকার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল মূলত কারখানার প্রচার, গণযোগাযোগ ও ছাপ (ইন্ডাস্ট্রির পাবলিসিটি ও প্রিন্টিংয়ের সাপোর্ট) তৈরির সহায়তা দেওয়ার জন্য। একাডেমিক পাঠ্যক্রম হিসেবে স্কুলগুলো তার শিক্ষার্থীদের ছাপচিত্রের বিভিন্ন মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার (লিথো, এচিং ইত্যাদি) চেষ্টা করেছিল। ছাত্ররা গ্র্যাজুয়েশন পাস করার পরপরই যেন সেই ছাপাখানার উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই প্রশিক্ষণগুলো দেওয়া হতো।

এই মনোভাবটি (ভঙ্গিটি, attitude) তিন দশকের দিকে মুকুল দে (Mukul Chandra Dey ,জ. ২৩ জুলাই ১৮৯৫–১ মার্চ ১৯৮৯) [১৯১৭ সালে গগনেন্দ্রনাথের বিচিত্রা সভা চালু হয়, সেখানে মুকুল চন্দ্র দে ছিলেন একজন বিশিষ্ট সদস্য। মুকুল দে ১৯১৬ সালে আমেরিকা থেকে এচিং শিখে এসেছিলেন। ১৯২০ সালে আবার ইংল্যান্ডে গিয়ে এচিং ও এনগ্রেভিং শিখে এসেছিলেন Murohead Bone-এর কাছ থেকে।] কলেজে যোগদান করার পর পরিবর্তিত হয়। আর মুকুল দে ছিলেন প্রথম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাপচিত্র শিল্পী এবং কলেজের অধ্যক্ষ। পরবর্তী সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন স্টুডিও ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কাজ শেখা ছাপচিত্রকর রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী[১০৭] কলেজে যোগদান করেন। তার অভিভাবকত্বে একদল নবীন শিল্পী ছাপচিত্রে আগ্রহী হয়েছিলেন। তাদের কয়েকজনের মধ্যে ছিলেন হরেন্দ্র নারায়ণ দাস (Harendra Narayan Das, জ. ১ ফেব্রু. ১৯২১, দিনাজপুর–৩১ জানু. ১৯৯৩), সফিউদ্দীন আহমেদ (Shafiuddin Ahmed, জ. ১৯২২–২০১২) ও মুরলীধর টালি (Muralidhar Tali).

---

[106] Prag Roy, Privet collection from email. 20/10/2014

[107] Nirmalendu Das, "Brief History of Printmaking at Santiniketan", 'art etc.', news & views-monthly art magazine, http://www.saffronart.com/sitepages/printmaking/history.aspx) August 2011; Kavita Shah, "Printmaking practices in India: An historical sketch and contemporary printmakers", Mohile Parekh Center, Presentation and Discussion, 20th Thursday, July. 2006 6.30pm http://mohileparikhcenter.org/site/?q=node/232,

Plate: 4.40, Gaganendranath Tagore, Naba Hullod-Reform Screams, 1921, book, lithography, ink on paper, 23 x 30 cm, 1921.

Plate: 4.41 Suren Kar, litho

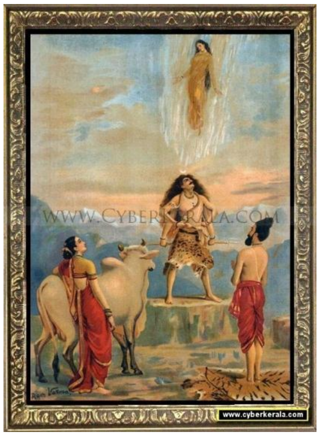

Plate: 4.42, Raja ravi varma, gangawatan, oleograph, 1900, 27.2 x 19.5 inch

Plate: 4.43, Ajit Seal, litho

Plate: 4.44, Salvador dali, endloses raetsel, Art prints are created on paper similar to that of a postcard or greeting card using a digital or offset lithography press

ড. পরাগ রায়ের মতে, ষাটের দশকে সোমনাথ হোর কলাভবনে যোগদানের পর কলাভবনে গ্রাফিক্স ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে একটি বিভাগ ছাপচিত্র প্রশিক্ষণের জন্য উৎসাহী হয়েছিল (প্রিন্টমেকিং ট্রেইনিংয়ের জন্য ডেডিকেটেড ছিল)। আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ও পোস্টগ্র্যাজুয়েট লেবেলে স্পেশালাইজেশন দেওয়া চালু হয়েছিল। তার তত্ত্বাবধানে কলাভবনের লিথোগ্রাফির চর্চা একটা নতুন মোড় নিল।[১০৮] এর পর থেকে ভারতে সফলতার কথা যদি বলতে হয় তবে বর্তমান পর্যন্ত শান্তিনিকেতনেই লিথোগ্রাফি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বেশি হচ্ছে এবং এ চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বলে স্বীকার করে নিতে সারা

---

108 Nirmalendu Das, “Brief History of Printmaking at Santiniketan”, ‘art etc.’, news & views-monthly art magazine, http://www.saffronart.com/sitepages/printmaking/history.aspx) August 2011; Prag Roy, Privet collection from email. 20/10/2014

ভারতের কারোরই দ্বিমত হওয়ার কথা নয়। তবে এটা অবশ্যম্ভাবী অনুমেয় যে, শান্তিনিকেতনেও দুই ধরনের লিথোর একটা সংমিশ্রণ ঘটেছে। (চিত্র.৪.৪২, ৪.৪৩, ৪.৪৪) সেটা হলো, রঙিন লিথোগ্রাফির (অলিওগ্রাফি পদ্ধতি, ক্রমোলিথোগ্রাফি পদ্ধতি ও কালার লিথোগ্রাফি) পদ্ধতি ও পরিশীলিত গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টের বা পশ্চিমা শুটার বয়েজদের অঙ্কন পদ্ধতি। যদিও প্রথম দিকে কৌশলগত (technical) দুর্বলতা ছিল, তবু বর্তমান চর্চার ফলস্বরূপ সূক্ষ্মভাবে দেখলে তা ধরেই নেওয়া যায়।

৪.৩.২ বাংলাদেশের ঢাকা চারুকলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লিথোগ্রাফির ইতিহাস ও চর্চা

বাংলাদেশে প্রথম লিথোগ্রাফি প্রেস এসেছিল ১৮৭০ সালের দিকে ঢাকায়। প্রথম লিথোগ্রাফি ছাপ তৈরি হয় ১৮৭৮ সালে। তবে ঢাকা চারুকলার প্রথম লিথোগ্রাফি প্রেসটি ১৯৫২ সালের পর থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই লিথোপ্রেস ও কিছুসংখ্যক স্টোন তৎকালীন সময়ে কমার্শিয়াল মার্কেট থেকে সংগৃহীত, যেগুলোতে উর্দু পত্রিকা ছাপা হতো।[১০৯] আমরা ধরেই নিতে পারি যে, বাংলাদেশে ক্রিয়েটিভ প্রিন্টমেকিং চর্চা ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হয় ঢাকা চারুকলার চারটি বিভাগের একটি গ্রাফিক্স আর্ট বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে। শিক্ষার্থীর সংখ্যাগত কারণে সকল বিভাগের সাবসিডিয়ারি সাবজেক্ট হিসেবে লিথোগ্রাফি ক্লাসই অল্প সময়ে স্কেচ করতে জানলেই করানো সম্ভব বলে বেশি নেওয়া হতো। কালার লিথোগ্রাফির পরিশীলিত গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টের বা পশ্চিমা শুটার বয়েজদের অঙ্কন পদ্ধতি বা ভঙ্গিকে অনুসরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ঢাকা চারুকলায় ১৯৪৮ সালের পর থেকে দুই বছর এলিমেন্টারি ও তিন বছর সার্টিফিকেট কোর্সের সময় থেকে চারুশিল্পে লিথোগ্রাফি চর্চা আরম্ভ হয়ে আজ পর্যন্ত চলছে। আমিনুল ইসলামের বইয়ের তথ্য ও সার্বিক দিক বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে যে— বাংলাদেশে চারুশিল্পে লিথোগ্রাফির প্রথম নিদর্শনটি ১৯৫২ সালে অঙ্কিত। এ সময়ে শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে বছরে একটি বা দুটি ক্লাস পেত। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৩ সাল থেকে প্রি-ডিগ্রি ও ডিগ্রি কোর্স চালুর পর শিক্ষার্থীরা বছরে দুই-তিনটি লিথোগ্রাফি ক্লাস করার সুযোগ পেত। ১৯৭৭ সালে ঢাকা চারুকলার প্রিন্টমেকিং বিভাগে প্রথম স্পেশালাইজেশন ব্যাচ ভর্তি হয়। এর আগে প্রিন্টমেকিং বিষয়টি সাবসিডিয়ারি কোর্স হিসেবে পড়ানো হতো। তখনো বছরে দুই-তিনটির বেশি লিথোগ্রাফি ক্লাস করানো সম্ভব হতো না। ১৯৯২ সাল থেকে অনার্স (চার বছর) ব্যাচ ঢোকে। তখন থেকে বর্তমান ২০১৬ সাল পর্যন্ত ডিগ্রি বা সম্মান কোর্সে একই সংখ্যক ক্লাস হয়ে থাকে। তবে ২০১২-২০১৩ সেশন থেকে বিভাগের এম. এফ. এ পর্বে দুই বছর

---

[109] Syed Abul Barq Alvi, 'Dhaka Charukalar litho press', Personal Conversation, 21/7/2015

মেয়াদি (যেকোনো মাধ্যমকে গুরুত্ব দিয়ে) লিথো করার সিলেবাস অনুমোদিত হয়েছে। এর ফলে ভবিষ্যতে লিথোগ্রাফির আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া যাবে।

৪.৩.৩ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম আর্ট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও চর্চা

এদিকে স্বাধীনতার ঠিক পূর্বে ১৯৭১ সালে দেশের অন্যত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা অনুষদ (ফাইন আর্ট ফ্যাকাল্টি) খোলা হলো। সেখানে শুধু ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং বিভাগ চালু করা হয়। এরপর প্রিলিমিনারি কোর্স খোলা হলো। ১৯৭২–৭৪ সালের দিকে অনার্স কোর্স চালু করা হলো। আর চট্টগ্রাম আর্ট কলেজ প্রথম দিকে প্রাইভেট কলেজ ও পরে সরকারি কলেজ হিসেবে চলতে থাকে। ১৯৭৫–৭৬ সাল পর্যন্ত গ্রাফিক্স (প্রিন্টমেকিং) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে এচিংয়ের কোনো মেশিন ছিল না। আর লিথোগ্রাফি মেশিনের তো কথাই নেই। শুধু উডকাট করা যেত। শিক্ষক মিজানুর রহিম ১৯৭৫ (অক্টোবর) সালে বেলজিয়াম চলে গেলেন 'Heigher studies in Fine Arts, specialization in Litho' নামক বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ যে শিক্ষার্থী যে বিষয়টিতে স্পেশালাইজ করতে চায়, তার সার্টিফিকেটে সে বিষয়টির নাম লেখা থাকবে। তিনি ফিরে এলেন ১৯৮০ (জুনে) সালে। ১৯৭৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়কে ইউনেসকো টিচিং এইড হিসেবে কিছু বই দিতে চেয়েছিল। তখন মিজানুর রহিম বলেন— যেহেতু তাদের ব্যবহারিক (প্রাকটিক্যাল) ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালু আছে, তাই শুধু বই দিয়ে তাদের কাজ হবে না। সঙ্গে কিছু যন্ত্রাদি (মেশিনারিজ) লাগবে। তখন তারা তার এই প্রস্তাবে রাজি হলো। এভাবে তিনি ইউনেসকো কুপনের (শিক্ষা খাতে একধরনের এইড বা অর্থ প্রদান) ফাইলপত্র প্রস্তুতকরণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি এচিং মেশিনের ব্যবস্থা করে দিয়ে বেলজিয়ামে চলে যান, তখনো মেশিন আসেনি। ক্যাটালগ ঘেঁটে জার্মান এচিং প্রেস ও সিরামিকের জন্য একটি যন্ত্রের বিষয়ে সেখানে লিখিত দেওয়া হয়। তিনি দেশে এসে দেখতে পেলেন ছাত্র ও শিক্ষকরা কিছু এচিং প্রিন্ট নিয়েছেন। মূর্তজা বশীর, রশিদ চৌধুরীসহ অন্যদের কিছু ড্রাইপয়েন্ট প্রিন্ট নেওয়া হয়েছে। দেশে ফিরে এসে দেখলেন এচিং করার জন্য গ্রাউন্ড নেই। মেটেরিয়ালের বড়ই অভাব। ফলে তিনি হার্ড-গ্রাউন্ড বানানো আরম্ভ করলেন ১৯৮২ সালে। তখন এচিং করা আরম্ভ হলো, সেইসঙ্গে উডকাট প্রিন্ট নেওয়া এচিংয়ের আগে থেকেই চালু ছিল। এদিকে লিথো নেই, পাথর নেই, লিথোগ্রাফি মেশিনও নেই। ১৯৯০ সালে তিনি যখন ডিন হলেন, তখন তৎকালীন ভি.সি স্যারকে (আলমগীর সাহেব) তিনি বললেন— উচ্চতর পর্যায়ে লিথোগ্রাফি করে এসে তিনি এখানে পাথরের অভাবে লিথো চর্চা অব্যাহত রাখতে পারছেন না, শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত করতে পারছেন না। তখন ভি. সি স্যার ১৯৯২

সালে সরেজমিনে বিষয়টি দেখে তার অধীন কর্মচারীকে মিজানুর রহিমের কথামতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। দুই-তিন মাসের মধ্যে চারুকলার গ্রাফিকস (প্রিন্টমেকিং বিভাগ) সেখানে প্রতিস্থাপিত হয়। চট্টগ্রামে সুরমা লিথোগ্রাফি প্রেস নামের একটি ছাপাখানা ছিল। সেটি তখন পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। সেখানে অতিরিক্ত লিথো স্টোন ছিল না। চিটাগাংয়ের এক ভদ্রলোক স্টোন ও প্রেস সাপ্লাই দিতেন। তার কাছ থেকে স্টোন আনা হলো। মাত্র ২০ হাজার টাকায় প্রেসটি কেনা হয়েছিল। সে সময় দৈনিক আজাদীর আরেকটি লিথোগ্রাফি প্রেস ছিল, সেটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্রয় করতে চেয়েছিল। কেউ কেউ আবার ব্যক্তিগতভাবে ক্রয় করতে আগ্রহী ছিলেন। তখন আজাদী থেকে বলা হয়— ঐতিহ্যগত কারণে এটিকে উপহারস্বরূপ প্রদান করা হবে। কিন্তু বিভাগ ডোনেশন নিতে পারে না বলে কেনার প্রস্তাব দিয়েছিল। তাই এটি বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হলো না। তখন এই সুযোগটি চট্টগ্রাম আর্ট কলেজ গ্রহণ করে। **১৯৯৬** সালে এই আজাদীর লিথোগ্রাফি প্রেসটিকে আর্ট কলেজকে উপহার হিসেবে প্রদান করা হলো। এদিকে মোটামুটি **১৯৯৩** সালে সুরমা প্রেসের লিথোগ্রাফি প্রেস ও স্টোন বাহির থেকে কিনে লিথোগ্রাফি চর্চা আরম্ভ করা হয়েছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিভাগে লিথো রোলার বানানো হলো বাহির থেকে চামড়া কিনে সেটাকে সেলাই করে। কালি বা ইঙ্ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, প্রিন্টিং প্রেসের ইঙ্ক বেশি আঠালো বলে জড়িয়ে যাচ্ছিল। শিক্ষার্থীদের জন্য তখন তিনি বিকল্প ইঙ্ক হিসেবে এর আঠালো ভাবটি কমানোর জন্য তার সঙ্গে ট্যালকম পাউডার যুক্ত করে ব্যবহার উপযোগী করে তোলেন। এচিংয়ের বেলায়ও তিনি একই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়ে লিথোগ্রাফি ও এচিং চর্চা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অব্যাহত রেখেছিলেন। **১৯৯৩–৯৪** পর্যন্ত এক বছর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভাগে থেকে লিথো চর্চা করেছেন শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য। এই পরিস্থিতে চট্টগ্রামের লিথো চর্চার সীমাবদ্ধতা সহজেই অনুমেয়। ইঙ্ক তৈরির এই বিকল্প পদ্ধটি পরবর্তী সময়ে আবার বর্তমান লেখকের গবেষণার মধ্য দিয়ে বের হয়ে এসেছে। বিষয়টি লিখিত আকারে ছিল না বিধায় বর্তমান প্রজন্মকে এটি আবার নিরীক্ষা করে বের করতে হলো। পাশাপাশি এটি যুক্তিযুক্ত যে, বাংলাদেশের এই বিকল্প ইঙ্ক তৈরির সাহায্যে লিথো চর্চা অব্যাহত রাখার চেষ্টা বারবার প্রমাণিত হচ্ছে। এটিও এই গবেষণার একটি উৎসাহব্যঞ্জক দিক হতে পারে যে— ট্যালকম পাউডার ব্যবহারে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির চরিত্র নিশ্চয়ই সামান্য হলেও ভিন্নরূপ দাঁড়িয়েছে।

তিন

৪.৪ লিথোগ্রাফিতে বিভিন্ন ইজমের প্রতিফলন

বাংলাদেশে লিথোগ্রাফির বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বুঝতে হলে প্রাসঙ্গিকভাবেই পৃথিবীব্যাপী অথবা শুধু ইউরোপে লিথোগ্রাফির উন্নতির ইতিহাস ও এর বর্তমান অবস্থার সঙ্গেই তুলনা করে বুঝতে হবে। তাই বর্তমান ইউরোপীয় শিল্পে লিথোগ্রাফি মাধ্যমের গতি পথের ধারাবাহিক পদচারণটি দুটি দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করলে বর্তমান সময়ে এর ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি আবারও নজরে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে বলে মনে হতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি দুটি হচ্ছে— (১) ভাষাগত দিক দিয়ে শিল্পের দার্শনিক ইতিহাসের উন্নতির (Philosophical point of view) সঙ্গে লিথোগ্রাফি মাধ্যমের পদচারণ। (২) করণ-কৌশলগত বিবর্তন বা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে লিথোগ্রাফির কারিগরি উন্নতিটি (Technological point of view) কী হয়েছে এবং এর গুরুত্বটা কী প্রভাব ফেলেছে, তা আলোচনা করা। তাই সংক্ষেপে এই পয়েন্ট দুটি আলোচনা করা যেতে পারে।

৪.৪.১ ভাষাগত দিক দিয়ে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি (ফিলোসফিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ)

৪.৪.১.১ (ক) সংক্ষেপে দর্শন ও শিল্পের ইতিহাসের দার্শনিক উন্নতির সঙ্গে লিথোর পদচারণ

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, প্রাক-সক্রেটিস যুগের (খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০০ অব্দ থেকে ৪৩০ অব্দ পর্যন্ত) দুটি ভাগের একটি হলো প্রাক-সফিস্ট যুগ- বাহ্যজগতের মূল রহস্য কী, তা জানাই ছিল প্রাক-সফিস্ট যুগের দার্শনিকবৃন্দের আলোচ্য বিষয়। এজন্য প্রাক-সফিস্ট যুগের দর্শনকে নিসর্গবাদী বা প্রকৃতিবাদী দর্শন বলা হয়। এই যুগের দার্শনিকবৃন্দ দুটি প্রশ্নে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। প্রথম প্রশ্নটি হলো— সেই মৌলিক বস্তু কী, যার দ্বারা সব প্রাকৃতিক বস্তু তৈরি? দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে— সেই প্রক্রিয়ার স্বরূপ কী, যার দ্বারা মৌলিক বস্তুগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে পরিণত হয়? এরপর সফিস্টরা বাহ্য-জগতের আলোচনা বর্জন করে মানুষের জ্ঞান ও আচরণের সমস্যার প্রতি মনোযোগী হয়ে একটি নতুন দর্শনচিন্তার সূচনা করেন। দার্শনিক প্রোটাগোরাস তাই বলেন: মানুষ নিজেই সবকিছুর মাপকাঠি। সক্রেটিসের দর্শনের যুগে মূল চিন্তা বা দর্শনই ছিল ‘আপনাকে জানো’। গ্রিক দর্শনের শেষ যুগ অ্যারিস্টটলের পরবর্তী যুগে ধর্মীয় ও নৈতিক— এ দুই ধারায় দর্শনচিন্তা আলোচিত হতে আরম্ভ করেছে। ফলে ‘সততাই মানবজীবনের পরমার্থ’— এরূপ দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন জেনো স্টোয়িক। এপিকিউরাস সুখ মানুষের একমাত্র কাম্য বলে এপিকিউরীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রজ্ঞা যখন কল্পনার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে তখনই দর্শনের উদ্ভব হয়। ষষ্ঠ থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত তারা

প্রকৃত দার্শনিক তত্ত্বের পরিবর্তে ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় সবিশেষ উৎসাহী ছিলেন। খ্রিষ্টধর্মের আবির্ভাবের ফলে সম্রাট কন্সটানটাইন সে ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যাজকদের কথা ও বাণী গুরুত্ব পেতে থাকে। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, এ যুগে সর্বস্তরের মানুষ চার্চের আদেশ-নিষেধ মান্য করতে বাধ্য ছিল। দর্শন কেবল ধর্মের সহায়িকা হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করে। ফলে এ যুগের দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটে ধর্মতত্ত্বে। কোনো কোনো নির্ভীক দার্শনিক ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে নির্যাতিত ও নিগৃহীত হয়েছেন। পরবর্তী স্কলাস্টিক যুগে ৯০০ থেকে ১৪০০ শতাব্দী পর্যন্ত ধর্মীয় বিষয়ে আবরণ দেওয়া হলো এ যুগের বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত ধর্মের সঙ্গে যুক্তির বিরোধ দেখা দিলে বিশ্বাসকেই গ্রহণ করা হতো। অপার্থিব ও পারলৌকিক ধ্যান-ধারণা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায় এবং চিন্তার ক্ষেত্রে তা মুখ্য ভূমিকা পালন করে— পার্থিব ও জাগতিক চিন্তাচেতনা হয়ে ওঠে গৌণ। ধর্মের এরূপ অবস্থায় যিনি চিন্তার বীজ বপনের কৃতিত্ব অর্জন করেন, তিনি হচ্ছেন— সেন্ট আনসেলম। স্কলাস্টিক যুগের শেষ ভাগে জ্ঞানী ও শিক্ষিত লোকেরা অ্যারিস্টটলের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন, যুক্তি স্থান পায় ভক্তির ওপর।

১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কয়েকজন গ্রিক চিন্তাবিদ তুর্কিদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং তারা পরে ইতালিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সৃষ্টি হয় নতুন সভ্যতার। সৃষ্টি হয় রেনেসাঁস। পরবর্তী জ্ঞানালোক যুগ সেই ভাবধারাকে সুস্পষ্ট রূপ দান করে, যাকে পুনর্জাগরণ কর্তৃক গুরুত্বারোপ করা হয়। আধুনিক সংশয়বাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ এবং ১৭০০ শতকের মহান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা এই আন্দোলন ত্বরান্বিত হয়। বিভিন্ন ভাবধারা সংবলিত দার্শনিকবৃন্দের দ্বারা এই আন্দোলন প্রতিফলিত হয় এবং তারা সাধারণ শিক্ষা, অধিক জনপ্রিয় দর্শন, অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞান, পবিত্র গ্রন্থের সমালোচনা, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় অনুপ্রেরণা দান করেন। ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তত্ত্ববিদ্যাগত অর্থে জড় ও মনের পার্থক্যকরণের মধ্য দিয়ে ডেকার্টের দর্শনেই ভাববাদের রূপ আধুনিক দর্শনে বিশেষ পরিলক্ষিত হয়।

এই সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে (১৭৯৮ সাল) লিথোগ্রাফির জন্ম। ইউরোপে টেম্পেরা মাধ্যমের যায়গায় ওয়েল পেইন্টিং যেমন ১৫ শতকের শিল্পকে প্রভাবিত করেছিল, লিথোগ্রাফিও রোমান্টিসিজমের সমসাময়িক কালে আবিষ্কারের ফলে সেই ইজমের শিল্পীদের অভিব্যক্তি— উডকাট ও উড এনগ্রেভিংয়ের চেয়ে অধিকতর স্বাধীন ও অভিব্যক্তময় করে শিল্পীর দক্ষতার ধারাবাহিক কার্যকারিতার (ক্রাফটসম্যানশিপের স্পন্টিয়াস অ্যাকশনের) খুব কাছাকাছি প্রকাশ করার সুবিধা করে দেয়। 'Lithographic process offered the artists of the movement an expressive means

freer than woodcut or engraving and presenting far less existence to the spontaneous action of the draftsmanshand.'[110] মানবিক আবেগ জাগায় এমন সংবেদনশীল, সূক্ষ্মানুভূতি, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও ডিভোশনাল গুণের সমন্বিত ফেনোমেনন এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ের পুনর্জাগরণ ইত্যাদি বিষয়ে লিথোগ্রাফি ব্যবহৃত হতে থাকে।

Plate:4.45, Theodore Gericault, Litho, the boxer, 1818, 13.78x16.38 inch

Plate: 4.46, Delacroix, litho, Faust, 16x10 inch, 1828

শিল্প হিসেবে লিথোগ্রাফি ফ্রান্সে নেপোলিয়নের রাজত্বকালে (১৮০৪–১৮১৪, ১৫ সাল নাগাদ) গোল্ডেন এজের দিকে এগিয়ে যায় এবং ১৮১৬-তে প্যারিসে চাহিদা পূরণের জন্য কিছু লিথো প্রেস বসানো হয়, যার থেকে ছাপ নেওয়া প্রিন্টের ফলাফল দেখে সমসাময়িক শিল্পীরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাদের কাছে এটি গুরুত্বহও হয়ে উঠেছিল। এই সময় থেকে পরবর্তী সময়ে, পরিবর্তিত সৃষ্টিশীল নতুন কাজগুলোর উদাহরণ হিসেবে বলতে গেলে ১৮২৮ সালে অঙ্কিত দেলাক্রোয়ের ফস্ট ছবিতে নাটকীয় বর্ণনাধর্মী চরিত্রকে দক্ষতাপূর্ণভাবে ইলাস্ট্রেশনের কথা, ১৮১৮ সালে অঙ্কিত জে.এল.এ থিওডর গেরিকল্ট তার বক্সার ছবিটিতে সতর্কভাবে কৃষ্ণাঙ্গ ও শেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের বিষয়টি রিয়ালিস্টিক উপায়ে বিমূর্তভাবে আঁকার কথা, এমিলি জিন হোরাস ভার্নেটের আফ্রিকান হান্টার ছবিটিতে নোভেল সেভেজের রোমান্টিক ড্রিম, আদি মানুষের সঙ্গে বন্য প্রাণীর যুদ্ধে মানুষের জয়গানের দৃশ্য, এমনকি যুদ্ধবিষয়ক চিন্তার ছবিও রোমান্টিসিজমের আগস্ট রাফেটের ছবিতেও দৃশ্যমান। (চিত্র ৪.৪৫, ৪.৪৬)

[110] Jules Heller, *Printmaking Today*, 2nd edition, New York, p. 20

এরপর নিউক্লাসিক্যাল টেস্ট কমে আসছিল এবং একটি নতুন মুভমেন্ট শুরু হচ্ছিল। পরবর্তী সময়ে ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য দৃশ্যাবলির চিত্র লিথোতে ছাপিয়ে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়। এ ক্ষেত্রে বেরন টেইলরের প্রচেষ্টায় কিছু শিল্পীর দ্বারা মেগনাম অপাসের [(masterpiece or grate work) (magnum opus— the truly remarkable *Les Voyages pittoresques it romantiques dans l'ancienne France.*] জন্য কিছু লিথোর কথা বলা যায়। রাজনৈতিক কারণে গয়ার ছবিতে পুরোপুরিভাবে কালা বা বধির (deaf, refusing to listen), বিদ্রুপ (imbittered, not sweet) এবং রাজনৈতিক কারণে হেনস্তা ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে।

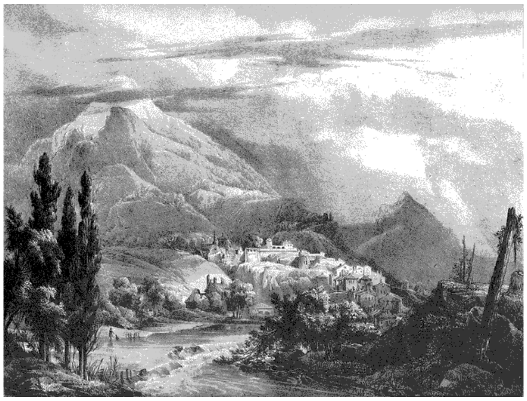

Plate: 4.48, Les Voyages pittoresques it romantiques dans l'ancienne France

Plate:4.49, Honore Daumier, Litho-Rue Transnonain, April 15,1834, L' association Mensuelle, 1834

রিয়ালিজমের সময়ে আইকনোগ্রাফিক্যাল (socio political context) ও টেকনোলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখলে যে সমস্ত লিথোগ্রাফির কথা বলতে হয়, তাদের মধ্যে দ্যমিয়েরের লা কেকিচার ও লি চেরিভরিতে অঙ্কিত লিথোগ্রাফি চিত্র এবং আরো অন্য একটি সিরিজ L'histoire ancienne-এ তিনি সিউডো ক্লাসিসিজম বা দুঃখবাদকে সে সময়ের শিল্পে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। দমিয়েরের বন্ধু শিল্পী পল গ্যাভার্নির কার্টুন এবং কমিকসও হালকা থ্রেটের সম্মুখীন হয়, কিন্তু তার *Embuscade* ('Ambush') লিথোগ্রাফিটি হিউম্যান সাফারিংয়ের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ বহন করে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লিথোতে টেকনোলজিক্যাল পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং সেদিকে এগিয়েও যেতে থাকে। পরে ১৮২০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ফটোগ্রাফি আবিষ্কারের পর থেকে গ্রাফিকস শিল্পের ইতিহাসে স্টোন ব্লক বা স্ক্রিন প্রিন্টের পক্ষে শিল্পীর অতৃপ্ততাকে পূরণ করা সম্ভব হলো না। শিল্পনগরীর (ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটির) চাহিদা এবং শিল্পীদের উদ্দীপনা ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতার জন্য লিথো প্রিন্টের চাহিদা কমে এসেছিল।

Plate: 4.50, Francisco Goya, Bovo Toro, 1825, Litho, 12.25x16 inch.

Plate: 4.51, Edouard Manet litho, Execution of the Emperor Maximilian, 1867, 6x8 inch, details, lithograph.

Plate: 4.52, Édouard Manet The Races, first state, litho, 15x20 inch.

উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশের (১৮৭৫–১৮৯৯) দিকে শিল্পীরা নতুন নতুন দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হন এবং আধুনিক শিল্পকলা ও এর প্রাথমিক দিক সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। তখন থেকে নানা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিল্পীরা শিল্পকর্ম রচনা করেছেন। এ গ্রুপগুলোর নামকরণ কখনো নিজেরা, কখনো ক্রিটিকরা, কখনো বা বিদ্রুপ করে দেওয়া হয়েছ। এমনই একটি গ্রুপের নাম ইম্প্রেশনিজম, যাদের মূল দর্শন ছিল 'সেনসেশনই রিয়ালিটি' অর্থাৎ কালারই দৃশ্যগত সেনসেশনের একমাত্র উপস্থাপক। এক মুহূর্তের অলোছায়ার সেনসেশনকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এই গ্রুপের শিল্পীরা ছবি তৈরির অনেক ট্র্যাডিশনাল উপাদানকে (লাইন, কালার ও ফর্ম) উপেক্ষা করেছেন। এই সময়ের শিল্পী মেনেট স্ট্রংলি কন্ট্রাস্টেড অলো-ছায়াসমৃদ্ধ (বোল্ড কালো রং ব্যবহারের মাধ্যমে, আবার কোথাও কালার একটু ব্লার করে দিয়ে আঁকা) মূল শৈলীর উন্নতি ঘটান, যার সঙ্গে স্প্যানিশ পেইন্টিংয়ের চারুশিল্পের জ্ঞানের তুলনা করা যায়। তার এ ধরনের একটি লিথোগ্রাফ হচ্ছে The Execution of the Emperor Maximilian. (চিত্র.৪.৫১, ৪.৫২)

ইম্প্রেশনিস্ট অন্য শিল্পী আগস্ট রেইনিয়র (১৮৪১–১৯১৯) মেনেটের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মনে, সেজান ও গ্রুপের অন্য শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাদের কালার প্লেট থেকে কাজের বিষয়ে সাহায্য নিয়েছেন এবং প্লেইন এয়ার পেইন্টিং চর্চা করেছেন। তার ফেম আউ সেপ ডি ভিগনে (Femme au cep de vigne I) লিথোগ্রাফির নুড ফিগারটি তার সেই সেলিব্রেটি ফিগারগুলোর এমবডিম্যান্টকে (ভাবনার বাস্তব রূপ, প্রতিমূর্তি নির্মাণ করা) প্রকাশ করে, যা তিনি আরো অনেকগুলো ছবিতে ব্যবহার করেছেন।

Plate: 4.53, Renoir, Lithograph, Femme au cep de vigne I, 1904.

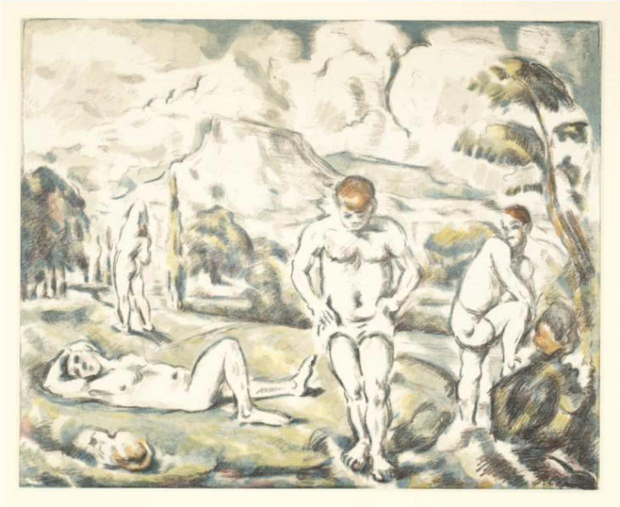

Plate: 4.54, Paul Cézanne, litho, Large Bathers, 16x20 inch, 1896-c. 1898.

এর পর পরই ইম্প্রেশনিজমের চোখে দেখা ফর্মহীন এবং ভাসমান রং বিশিষ্ট দৃশ্যের মধ্যে ফর্মের অস্তিত্বশীল কাঠামোকে (লাস্টিং স্ট্রকচারকে) খোঁজার চেষ্টা করেছেন শিল্পী সেজান। সেজান নতুন পদ্ধতি খুঁজে বের করেন। যদিও তিনি প্রাকৃতিক বস্তুকে কখনো জ্যামিতিক অ্যাবস্ট্র্যাকশনে নিয়ে যাননি (পরবর্তী সময়ে কিউবিস্টরা একে জ্যামিতিক অ্যাবস্ট্র্যাকশনে নিয়ে যায়)। নবীন অনুসারীদের সম্পর্কে তিনি বলেনঃ ‘the painter should 'treat nature in terms of the cylinder, and the sphere, and the cone.'[111] তার একটি উল্লেখযোগ্য ল্যন্ডস্কেপ লিথোগ্রাফি চিত্রে নুড কয়েকটি ফিগার স্নানরত অবস্থায় দৃশ্যমান। (চিত্র. ৪.৫৩, ৪.৫৪)

১৮৮৪ সালে ইম্প্রেশনিজম থেকে বের হয়ে আসে ‘নিয়োইম্প্রেশনিস্ট’ নামে একটি গ্রুপ, যাকে ‘ডিভিশনিজম’ Divisionism বা ‘পয়েন্টালিজম’ Pointillism বলা হয়। সেই গ্রুপের দর্শনটি অনেকটা এ রকম যে— যেখানে ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা 'instinctive and instantinious' সেখানে এই নিয়োইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা হচ্ছে 'deliberate and constant'। সর্বোপরি শুধু কালার প্লেটেই নয়,

---

[111]Helen Gardner, *Art Through the Ages*, United States of America-1976, p. 899

ক্যানভাসেও কালারগুলো স্বতন্ত্র কালার হিসেবে স্ট্রোক দেওয়া হয়েছে। কালারগুলো ডটস অথবা পয়েন্ট, জাক্সটাপোজ কিন্তু আলাদা আলাদা স্ট্রোকে আঁকা। দ্য বাউ (The Buoy) এবং লেস এন্ডলেস (Les Andelys) লিথোগ্রাফি চিত্রটি এর একটি উদাহরণ। সিগনাক এই উপায়ে পোতাশ্রয়ের ছবি এঁকেছেন যেখানে আছে ছোট নৌকা ও নদীর কিনারায় কিছু মানুষের জীবনচিত্র। (চিত্র. ৪.৫৫)

Plate: 4.55, Paul Signac, The Buoy (Saint Tropez Harbor), Lithograph, 1894

Plate: 4.56, Odilon Redon, Yeux Clos, 1890, Transfer lithograph, 22 × 16 inch.

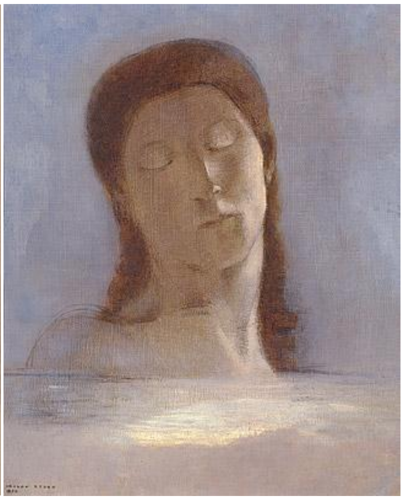

Plate: 4.57, Odilon, Eyes closed , [Les yeux clos] 1890, oil on canvas, laid on card

দেগাসের মতো আরেক ইনডিভিজুয়াল শিল্পী ওডিলন রেডন। তিনি তার লিথোচিত্রেও মানব অবয়বের ফর্মকে ফেন্টাসম্যাগোরিক্যাল মেটামরফসিসের (স্বপ্নে দেখার মতো করে রূপান্তরিত করা) মাধ্যমে উপস্থাপন করে (phantasmagorial metamorphosis of plant,animal and human forms) লিথোর পথপরিক্রমাকে সমৃদ্ধিশালী করেছেন। ফ্রেঞ্চ মডার্ন শিল্পীদের মধ্যে রেডনও ১৯১৩ সালে নিউ ইয়র্কে ফেমাস আর্মোরি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই প্রদর্শনীটি থেকে দর্শকরা মর্মাহত হয়েছিল এবং আমেরিকান আর্টের প্রভাবশালী প্রবণতাকে (টেনডেন্সিকে) পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়। দৃষ্টিভঙ্গি (ভিশন) এবং দক্ষতার দিক থেকে তার প্রিন্ট ছিল উচ্চমানসম্পন্ন। কাজের গভীরতার দিক থেকে অন্তর্জগতের স্বপ্নের কথা বলেন (চিত্র-৪.৫৬)। তিনি বলেন, ‘লিথোগ্রাফির চরিত্র অনুযায়ী সে আমাকে যা দেয়, আমি আমার কল্পনাকে সেভাবেই স্বাধীন করে দিয়েছি। আমার প্রত্যেকটি প্লেটই সেই ফলাফলকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে টেনে বের করে আনে, যা সম্মিলিতভাবে ক্রেয়ন, পেপার ও স্টোন ব্যবহারের ফসল।’ তার বেশির ভাগ ট্রান্সফার করা লিথো স্টোনে ট্রন্সফার করার পর আবার কাজ করেছে, ফলে ছবিতে উপস্থিত হয়েছে নতুন ধরনের গুণ।

Plate: 4.57, Rodolphe Bresdin, The Good Samaritan, 1861 lithograph. 29.8×23.7 inch.

Plate: 4.58, Henri Fantin latour, Buuquet de Rose, Litho with chinecolle, 1879, 41.7x35.5 cm.

Plate: 4.59, Henri Fantin latour, Buuquet de Rose, oil paintaing.

রেডন কিছু ক্ষেত্রে রডলফ ব্রেসডিনের (১৮২২-৮৫, Rodolphe Breesdin) থেকে প্রভাবিত হয়েছিলেন। নেদারল্যান্ডসের পেইন্টারদের মধ্যে হিয়েরোনিমাস বস্ক[১১২] (Hieronymus Bosch)-এর সংস্কৃতির (ট্র্যাডিশনের) পর এবং পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকের ও ষোড়শ শতাব্দীর শুরুর দিকে পিটার ব্রুগেলের মতো যে সংস্কৃতি চলছিল তার পরবর্তী সময়ে ব্রেসডিন (ভ্রমণকারী, সন্ন্যাসী) বাস্তবতাকে অবাস্তবভাবে অঙ্কন করে পুলকিত হয়েছেন। শিল্পী ব্রেসডিন গাছ ও জীবজন্তুর পরিবেশ দ্বারা আবিষ্ট ছিলেন এবং তার লিথোগ্রাফি ও এচিং কল্পনা থেকে তৈরি। মানুষ এবং বর্ণনাধর্মী উপাদান প্রায়ই মিনিয়েচার প্রেক্ষিতে (প্রপরশনে) ছোট হয়ে এসেছে, যার চতুর্দিকটা সচেতন এবং অদ্ভুত ডিটেইল করে আঁকা (the human, narrative element is often reduced to miniature proportions and surrounded with infinite macabre and grotesque detail). (চিত্র.৪.৫৭)

১৮৭৯ সালে হেনরি ফেনটিন-লেতুরের ফুলেল পেইন্টিংগুলোর (floral painting) মতো Bouquet de Roses ((Henri Fantin latour, Buuquet de Rose, 1879, lithograph with chine colle), নামক লিথোগ্রাফিটি আমাদেরকে ডাচ্ শিল্পীদের জড়জীবনের মতো মিরাকলস (অদ্ভুত) রিয়ালিজমের প্রসঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। (চিত্র.৪.৫৮)

[112] Hieronymus Bosch: (Dutch: born Jheronimus van Aken c. 1450 – 9 August 1516) was an Early Netherlandish painter. His work is known for its fantastic imagery, detailed landscapes, and illustrations of religious concepts and narratives. Within his lifetime his work was collected in the Netherlands, Austria, and Spain, and widely copied, especially his macabre and nightmarish depictions of hell. Wikipedia, the free encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Bosch, published-19 November 2016, at 03:11, collected date, 28-11-2016

Plate: 4.60, Pierre Bonnard, lithography, Les Boulevards, 11x14 inchBonnard, 1895

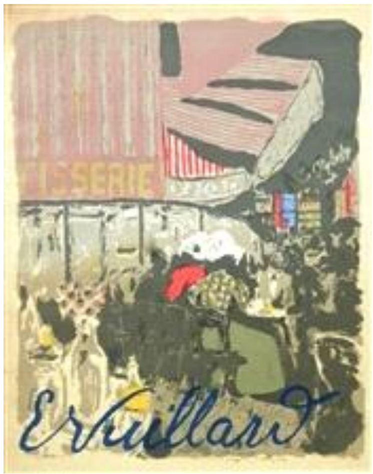

Plate: 4.61, Edouard Vuillard, Lithography, The Pastry Ship from the Series Landscapes and Interiors

ইম্প্রেশনিজমের পরবর্তী শাখা-প্রশাখা (further offshoot of Impressioism) যাকে বলা হয় লেস নবিসের (les Nabis) ক্ষেত্রে যে দুজন শিল্পীর নাম সাধারণত একসঙ্গে নেওয়া হয়, তারা হলেন জে. এডুয়ার্ড ভুইলার্ড (১৮৬৮–১৯৪০) J. Edouard Vuillard এবং পিয়েরে বোনার্ড (১৮৬৭–১৯৪৭) Pierre Bonnard। দৃশ্যজগতের (ভিজ্যুয়াল ওয়ার্ল্ডের) সাবজেক্টিভ ও সাইকোলজিক্যাল ভিউয়ের কারণে তারা ইম্প্রেশনিজমের বাস্তবতার তাৎক্ষণিক দৃশ্যগত উপস্থাপনকে (রিয়ালিটির ইমিডিয়েট অপটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনকে) অস্বীকার করে, যদিও দেগাস ও অন্য কিছু শিল্পীর দেখানো পথ এবং কিছু ক্ষেত্রে ইম্প্রেশনিস্ট কালার ও চিন্তা বা বিষয়বস্তুকে (থিমকে) এড়াতে পারেনি। এভাবে তারা কালার ক্রমানুক্রমিকের চেয়ে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিল্পের পোস্ট-ইম্প্রেশনিজমের গোলকের মধ্যে পড়ে যায়। এ সময়ের শিল্পী ভুইলার্ডের (চিত্র: টুডেস প্রিন্টমেকিং, পৃ. ৪৩, প্লেট-৪) চিত্রটি যেমন ফ্যাশনের বা চলনের দিক থেকে জাপানিজ প্রিন্টের স্ট্রাইকিং এভিডেন্সকে নির্দেশ করে, তেমনি দ্য প্যাস্ট্রি ফ্রম দ্য সিরিজ ল্যান্ডস্কেপ অ্যান্ড ইন্টরিওর জার্দিন দেস টুইলারিস (The Pastry Ship from the Series Landscapes and Interiors) নামক লিথোচিত্রের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। (চিত্র: ৪.৬১) শিল্পী বোনার্ডের (Bonnard) লেস বাউলিভার্ড (Les Boulevards) (চিত্র:৪.৬০) চিত্রটি প্যারিসের জীবনের প্রাণোচ্ছল খেলাকে প্রদর্শন করে। পাবলিশার্স এমব্রোস ভোলার্ড শিল্পী ও লিথোগ্রাফার ইউজিন ক্যারিয়ারের লিথো চিত্রের সম্পর্কে বলেন, তার পয়েটিক পোর্ট্রেটগুলোতে চিয়োরিসকিউরো ও ব্লাক ডেপথ ছিল।

যত দূর বলা হয়েছে তা শুধু হুইসলার ও বেঞ্জামিন ওয়েস্টের মতো এক্সপার্টদের সম্পর্কে বলা ছাড়া ইউনাইটেড স্টেটের লিথোগ্রাফির বিস্তার সম্পর্কে কমই বলা হয়েছে। বাণিজ্যিক চিন্তার দিক থেকে লিথো প্রসেসটি মেথড আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে (ফ্লোরিশ হয়েছে), যেটা রিপ্রডাকশন হিসেবে পপুলার ইমেজ তৈরির ক্ষেত্রে গৃহীত (পারমিটেড) হয়েছিল। এদিকে উনিশ শতকের মধ্যভাগের একটু আগে কুরিয়ার ও ইভস্ (Currier & Ives) নামে একটি ফার্মের আন্ডারে ১৮৫৭ সালে ব্যবসার বাজার বিস্তারের (ওয়াইড মার্কেটের) জন্য লিথোগ্রাফি প্রিন্টিং শুরুও হয়েছিল।

যাহোক, বিংশ শতকের পূর্বেই ইউনাইটেড স্টেটের লিথোগ্রাফির সম্পদ তৈরির প্রসেসটা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। নিউ ইয়র্কে তিনটি জেনারশনের মধ্যে ফ্যামিলি প্রিন্টার, জর্জ সি. মিলার ও পুত্র (George c. Miller an Son) শিল্পকে লালন করেন এবং শ খানেক শিল্পীকে প্রিন্টিংয়ের ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল গাইডেন্স দিয়েছিলেন।

ইতোমধ্যে ইউরোপে অদ্ভুতভাবে একধরনের টান টান উত্তেজনা তৈরি (ডেভেলপ করে) হয়। ফলে মানসিক চাঞ্চল্য উদ্রেককারী (a search for emotive expression) অভিব্যক্তায়নের খোঁজে কখনো আনন্দঘন, কখনো বা স্বাধীনভাবে (ফ্রিকুয়েন্টলি) ট্র্যাজিক বিষয়ে প্রাকৃতিক অনুশীলনের অনুভূতিগত বাস্তবতাকে প্রতিস্থাপন করেছে (ন্যাচারাল স্টাডির পারসেপচুয়াল রিয়ালিটিকে রিপ্লেস করেছে)।

এরপর ফভ শিল্পীদের দর্শন হচ্ছে—

“The fauves freed color from its traditional role as the description of the local tone of an object and helped to prepare both artists and public for the use of color as an expressive end in itself. In a sense, color became the 'subject' of the picture.”

অর্থাৎ আগে রেনেসাঁ থেকে আজ পর্যন্ত শিল্পীরা ছবি আঁকার জন্য প্রথমে ড্রইং করে তারপর সেকেন্ডারি সাবজেক্ট ম্যাটার হিসেবে কালার ব্যবহার করতেন। কিন্তু, ফভিজমে এসে শিল্পীরা কালারকে ফ্রি করে দিয়েছেন এবং কালারই ছবির বিষয়বস্তু (সাবজেক্ট মেটার) হিসেবে ব্যবহার হয়েছে।[১১৩] মাতিস বলেন:

Matisse himself tells us that his procedure is one of continuous adjustment of color to color, shape to shape, and color to shape until the exactly right 'feel' is achieved and painting is completed.[114]

---

[113]Helen Gardner, *Art Through the Ages*, United States of America-1976, p.492

[114]Helen Gardner, ibid. p. 892

Plate: 4.62, Henri Matisse, Lithograph, 12x14 inch, 1929

Plate: 4.63, Kandinsky, Litho, Composition, 1922, 38x33 cm

তাঁর নোট অফ এ পেইন্টারে বলেন:

> ‘As his Notes of a painter reveals, his art reflects a great love of nature, of color, and of joyoussubjects. He once observed that he did not care for weighty themes and moods and that art should be as restful as a comfortable chair after a hard day’.[115]

এরপর German Expressionism was a manifestation of subjective feeling toward objective reality and the word of imagination.[116] তাৎক্ষণিক ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি (ইমিডিয়েট পার্সোনাল এক্সপ্রেশ্ন) প্রকাশের উপাদান, বিশেষ করে ফভ পেইন্টিংয়ের চরিত্র (ক্যারেক্টার) জার্মান পেইন্টারদের প্রতি এমন একটি আহ্বান করেছিল—ফলশ্রুতিতে একটি গ্রুপ অরগানাইজ করে নেচার এবং ইমোশনকে সিম্বোলাইজ করে ছবি এঁকেছে। অর্থাৎ তারা সাবজেক্টিভ অনুভূতিকে (যেকোনো বিষয়বস্তুকে) অবজেক্টিভ ওয়ার্ল্ডে (চিন্তার জগৎ) নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিল। যার ফলস্বরূপ পাওয়া গেল নন-অবজেক্টিভিটিকে।

এক্সপ্রেশনিজমের ব্লুরাইডার দলের অপর শিল্পী ক্যান্ডিন্স্কি ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে লিথোগ্রাফির কৌশল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তার নিজস্ব শিল্পভাবনা এইভাবে ব্যক্ত করে বলেন যে, ‘লিথোগ্রাফিতে অনেক রং ব্যবহারের ফলে লিথোগ্রাফি পেইন্টিংয়ের কাছাকাছি পর্যায়ে চলে আসে এবং অনেক ক্ষেত্রে পেইন্টিংয়ের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।’ বলা যেতে পারে, গণতান্ত্রিকতাই লিথোগ্রাফির স্বভাবগত রূপ। ক্যান্ডিন্স্কি তাঁর কম্পোজিশন

---

[115] Helen Gardner, *Art Through the Ages,* United States of America-1976, p. 893
[116] Helen Gardner, *ibid.* p. 895

(Kandinsky, Litho, Composition, 1922, 38x33 cm) লিথোগ্রাফিটি এই গ্রুপটি ব্যান্ড হওয়ার পরে করা, যা তার নন-রিপ্রেজেন্টেশনাল সাবজেক্টের দিকে যাওয়ার পথকে নির্দেশ করে (চিত্র-৪.৬৩)।
অন্যদিকে কান্দেনেস্কি ১৯১৪ সালে তার কাজকে দুটি গ্রুপে বিভক্ত করেন। আর সেটা হলো (১) কম্পোজিশন (Composition) সিরিজ, (২) ইম্প্রোভাইজেশন (Improvisation) সিরিজ। প্রথম গ্রুপে জ্যামিতিক আকৃতিগুলো চেতন মনে ছক করে (কনশাসলি প্ল্যান করে) এবং ইন্টালেকচুয়ালি অর্ডারের মাধ্যমে আঁকা। দ্বিতীয় গ্রুপে তিনি কোনো রকম পূর্ব ধারণা বা পূর্বে চিন্তিত বিষয়বস্তু বা চিন্তাভাবনা ছাড়া ক্যানভাসে কালার ঢেলে দিতেন বা কালারগুলো যেভাবে ক্যানভাসে আসতে চাইত সেভাবে আসতে দিতেন, কিন্তু চেতন-অচেতনের মধ্যবর্তী অবস্থায় থেকে (সাবকনশাসলি) সেই কাজটি করতেন। এই কাজে ব্রিলিয়ান্ট কালারগুলো ক্যানভাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং চেতন অবস্থায় শিল্পী সেটিকে খুব অল্পই কন্ট্রোল করার চেষ্টা করেন। ১৯১২ সালে পাবলিকের সামনে ক্যান্ডিন্স্কি তার 'কনসার্নিং দ্য স্পিরিচুয়াল ইন আর্ট ১৯১২' (Concerning the Spiritual in art 1912)-এ তার শিল্পের গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যায় মেথড ও ফিলোসফি সম্পর্কে বলেনঃ 'in Which he proclaims the independence of color and the spiritual value inherent in it', অর্থাৎ তিনি কালারের স্বাধীনতা ও এর ভেতরে বিদ্যমান আধ্যাত্মিক গুণাগুণের (স্পিরিচুয়াল ভ্যালুর) বিদ্যমানতার কথা ঘোষণা করেন। ক্যান্ডিন্স্কির দৃষ্টিতে কালারের আছে নিজস্ব গভীরতা (deep-seated), আছে সাইকিক পারস্পরিক সম্পর্ক (psychic correlations) এবং শিল্পীর রয়েছে সাময়িক (আপৎকালীন) ও পুরোপুরি অনভ্যাসগত (utterly uninhibited) কালারকে অভিব্যক্ত করার ক্ষমতা। 'যৌক্তিক' (ratonal) বিশ্ব একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি দিচ্ছে। প্রতারণামূলক এবং বিভ্রান্তিমূলক নিরাশা (IS HOPELESSLY DECEPTIVE), মানুষ 'দেখা' (seeing) থেকে অলাদা করে এবং মানুষের গভীর বাস্তবতা (ডিপার রিয়েলিটি), যেখানে অবচেতন অবস্থার (সাবকনশাস লেবেলের) জ্ঞানীয় বিশ্বের (ইনটিনকচুয়াল ওয়ার্ল্ডের) মাধ্যমেও বাস্তবতাকে দেখা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি ফ্রয়েডের অবচেতন উপসংহারের সঙ্গে (কনক্লুশনে) ও আর্থার রিমবাউদ যেখানে বলেছেন: 'ট্রু আর্টিস্ট হচ্ছেন ভিশনারি'— এই কথাগুলোর সঙ্গে মিল পাওয়া যায়।[১১৭]এই 'ইম্প্রোভাইজেশন সিরিজ' থেকে শিল্পকলা ধীরে ধীরে নন-অবজেক্টিভ আর্টের দিকে এগিয়ে যায়।

এদিকে বোচ্চিয়নি ১৯১০ সালের পর থেকে ফিউচারিজমে রিয়ালিটিকে ধরতে গিয়ে গতিকে জীবন হিসেবে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে গতিকে জীবনের প্রতীক হিসেবে ধরে তার স্থির গতিকেই (স্ট্যাটিক মোশনকেই) প্রকাশ করেছে মাত্র। অর্থাৎ পুরো ট্র্যাডিশনাল শিল্প স্থির গতিতে (স্ট্যাটিক রিদমে)

---

[117]Helen Gardner, *Art through the Ages*, United States of America-1976. P. 898

রূপান্তরিত হলো। আর এই স্থির গতির সঙ্গে সত্যিকার গতি (মোশন) যোগ করে ১৯৭০-এর পর উৎকর্ষ সাধনকারী কাইনেটিক শিল্পের মাধ্যমে গতিকে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে বাস্তবতাকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন কাইনেটিক শিল্পীরা। এর আগে অবশ্য কনস্ট্রাকটিভিস্ট শিল্পীরা 'রিয়েলিস্ট মেনুফেস্টো' প্রকাশ করেছেন। তবে ট্র্যাডিশনাল শিল্প এবং কনস্ট্রাকটিভিজ্‌ম এই উভয় শিল্পের মধ্যে পার্থক্যগত দিক হলো— কনস্ট্রাকটিভিজমে অনুভূতিকে দ্বিতীয় বিষয়স্তু (ফিলিংকে সেকন্ডারি সাবজেক্ট ম্যাটার) হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, ট্র্যাডিশনাল শিল্পে অনুভূতিকে প্রধান বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

একই ধরনের সামাজিক দুরবস্থা নিয়ে নির্দিষ্ট মুভমেন্ট থেকে আলাদাভাবে সবসময় কাজ করে গেছেন শিল্পী কাথ কোলুইজ। কাথ কোলুইজের রূঢ় সামাজিক বাস্তবতার (harsh social realism) লিথোগ্রাফি ও এচিং চিত্রগুলো অপ্রীতিকর, বর্বরতার নিষ্ঠুর সত্যের প্রকাশ, করুণা থেকে করা নয়, একজন মানুষের বিবেক থেকে করা এবং শিল্পের স্বগোত্রীভূত।

এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পী এডওয়ার্ড মুঙ্ক— প্যারিস থেকে টেকনিক শেখার পর তিনি বার্লিনে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ১৮৯২ সালে, আর একই সময়ে জার্মান পেইন্টাররা একাডেমিক রিয়ালিজমের বিরুদ্ধে রিভোল্ট করেছিলেন।

এক্সপ্রেশনিজমের আভিব্যক্তির বিরোধিতা করে তীক্ষ্ণ ও মূল কেন্দ্রীয় বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খ (ডিটেইল) করে এঁকে বাস্তবতাকে প্রকাশ করেছেন জর্জ গ্রস ও ম্যাক্স বেকম্যান নামক দুই শিল্পী।

ম্যাক্স প্যাকস্টেইন (Max Pechstein) (১৮৮১–১৯৫৫) একই ধরনের প্যাশন শেয়ার করেছেন। তিনি বলেন:

> 'লিথোগ্রাফির ভার্সেটাইলিটি বোঝা যাবে, যখন আপনি একটি স্টোনকে নিজে তৈরি করে এচিং করে নিজে প্রিন্ট নেবেন। নিজে নিজে প্রিন্ট নেওয়া একমাত্র উপায় যেকোনো বিষয়ে! স্মুথ ও পাতলা রং ব্যবহার, পেপার ভেজানো অথবা শুকনো একটি নতুন ফেসিনেশন ও উদ্দীপনা বয়ে আনে। কাজটি নিজে একটি প্রাপ্তি। যখন পেইন্টিংয়ের করা হয়, তার থেকে অধিকতর দ্রুতবেগসম্পন্ন (রেপিড) এবং সরাসরি ফলাফল পাওয়া যায় এবং আপনি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার সামনে একটি প্রিন্ট বের হয়ে আসবে।'[১১৮]

---

[118] Jules Heller, *Printmaking Today*, Second edition, New York, 1972, p.38, Max Pechstein: 'How versatile lithography is when you prepare the stone yourself for printing, etch it, and then print it yourself. Printing it yourself is the only way, in any case! Using the paints smoother or thinner, the paper drier or damper brings new fascination and new stimulus. The work is a reward in itself. The effect is obtained much more rapidly and directly than when painting and you are fascinated by the work until the finished print lies before you.'

Plate: 4.64, Max Pechstein, litho, Compositio, 21 x 17 inch, 1909

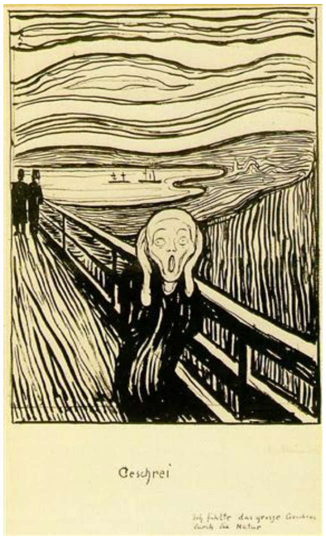

Plate: 4.65, Edvard Munch, The Cry, litho, 1893

প্রথম শতাব্দীর বিষদ পরিসংখ্যান ও লিথোগ্রাফির অর্ধেক ইতিহাসের পর উপসংহারে বিংশ শতকের তিনজন শিল্পী হেনরি মাতিস (১৮৬৯–১৯৫৪), জর্জ ব্রাক (১৮৮১–১৯৬৩) ও পাবলো পিকাসো (জন্ম ১৮৮১) সাম্প্রতিক উন্নতির সঙ্গে (রিসেন্ট ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে) ফিটিং ট্রানজিশন (fitting transition) প্রোভাইড করে। এই কম্বাইন্ড ক্যারিয়ার ইম্প্রেশ্নিজম, ফভিজ্‌ম, কিউবিজ্‌ম থেকে শুরু হয়ে এবং সফল্যজনকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আজকের সময় পর্যন্ত চলছে। অনেক মাধ্যমে (মিডিয়ায়) তাদের আবিষ্কারের খোঁজের কারণে (সার্চিং ইনোভেশনের কারণে), বিস্ময়াবহরূপে অসংখ্য অনুসারী তৈরি করেছিল। পিকাসো এবং ব্রাক সিমুলটিনিয়াসলি ফরম ও কালারের জ্ঞানীয় পর্যবেক্ষণ (ইন্টেলেকচুয়াল অ্যানালাইসিস) করেছেন, যেটার অ্যাপ্রোচটা ছিল সেজানের মতো। এই নতুন শৈলীকে অনেকে বিমূর্ত শিল্পধারার পূর্বপুরুষ হিসেবে ধারণা করেন। তাদের কাজের এই প্রভাব (স্কোপ) একই সময় পেইন্টিং, স্কাপচার, সিরামিকস্‌, কোলাজ, আর্কিটেকচারাল ডেকোরেশন, স্টেজ ডিজাইন, টেপেস্ট্রি, পোস্টার, প্রিন্টস এবং বইয়ের অলংকরণও পড়ে। এই বহুমুখিতা বা বৈচিত্র্য বহুল পরিমাণে তিনটি লিথোচিত্রে (চিত্র.৪.৬৬, ৪.৬৭) পরিস্ফুট হয়েছে। প্রিমিটিভ কালচারের ইমেজের প্রভাব (ইমপ্যাক্ট) যেমন আফ্রিকান ওসেনিক কালচারের প্রভাব পরের দিকে যেমন গগিনের কালার উডকাটের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়।

মাতিসের (Henri Matisse) বসে থাকা নুড (Seated Nude, 1929, Lithograph, 16x17.5 inch, todays Printmaking, চিত্র.৪.৬২) লিথোগ্রাফটি পুরোপুরিভাবে লাইনে অঙ্কিত। অনেকটা ইনগ্রেসের ওডালিস্ক ছবির মতো এটি কোনো কোনো অংশে গ্রিক ক্লাসিক্যাল ছবির কাছে ঋণী।

Plate: 4.66, Pablo Picasso, litho, Woman in Striped Blouse, 25x19inch, 1949

Plate: 4.67, George Braque, litho, Helios v,1948, 42 x 50 cm

ব্রাকের হেলিওস Helios (Helios.1947, Color Lithograph, 20.62x14.87 inch, চিত্র. ৪.৬৭,) চিত্রটিতে গ্রিক পুত্র গড কালো রাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন— বিষয়টি উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। গ্রিক মিথলোজির ওপর ব্রাকের আগ্রহটা তার প্রথমদিকের হেসিওডস 'থিয়োগনি' (Hesiod`s *Theogony)* নামক এনগ্রেভিং সিরিজেও লক্ষ করা যায়। এভাবে ৯০০ বি.সি. এর প্রাচীন গ্রিক জিওমেট্রিক পিরিয়ডের বিষয়বস্তু এঁকে কিউবিস্টিক স্টাইলের সঙ্গে সংযোগ (লিংক) তৈরির মাধ্যমে লিথোগ্রাফি রেখা চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল। পিকাসোর গতানুগতিক নামকরণকৃত স্ট্রাইপট ব্লাউজ (চিত্র-৪.৬৬) চিত্রটি ইজিপশিয়ান শিল্পের প্রতি তার খুব আগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

দার্শনিক সময়কালের হিসাবে রেনেসাঁসকে (১৪০০ সাল) যদি আধুনিক দর্শনের শুরু ধরা হয় তবে লিথোগ্রাফির জন্মও আধুনিককালে। রোমান্টিসিজ্‌মের সমসাময়িক কালে জন্মের কারণে এর পূর্ববর্তী সময়ের অর্থাৎ প্রি-হিস্টোরিক পিরিয়ড থেকে এ পর্যন্ত সকল শিল্পীর কাজ লিথোগ্রাফি মাধ্যমে আশা করা অর্বাচীন। আর রোমান্টিসিজ্‌ম থেকে এখানে বর্ণিত আধুনিককালের ইতিহাসের মধ্যে লিথোগ্রাফি শিল্পমাধ্যমটি এভাবেই শিল্পকলার দর্শনের সঙ্গে পদচারণে ব্যস্ত ছিল। এর পর থেকে শিল্পীরা তাদের নিজ উদ্যোগেই হোক আর মাধ্যমের মোহে পড়েই হোক— এর চর্চা অব্যাহত রেখেছেন পৃথিবীর আনাচকানাচে। তা না হলে এই শিল্পভাষাটির মৃত্যু ঘটার কথা ছিল। তবে শিল্পীরা কেন এর চর্চা করছেন? এর ভেতর কী আছে যে শিল্পী সমসাময়িক অনেক দর্শনের তোয়াক্কা না করেও এর চর্চায় মগ্ন থাকতে পারেন? কারণ পরবর্তী সময়ে যেমন কনস্ট্রাকটিভিজ্‌ম বা উল্লেখযোগ্যভাবে বলতে হলে বলতে হয়

কাইনেটিক আর্টের দর্শনে দু-একটি ছাড়া লিথোগ্রাফি মাধ্যমে তেমন কোনো কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। কাইনেটিক শিল্পে স্থির গতি (স্ট্যাটিক মোশন) ও কাইনেটিক (সত্যিকারের) মোশনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রিয়াল মোশনকে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে জীবন নামক গতিশীল মানববস্তুর বাস্তবতাকে (রিয়ালিটিকে) গতির মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত করে প্রকাশ করা হয়। সে ক্ষেত্রে লিথোগ্রাফি মাধ্যমে তা অসম্ভব। তাহলে কি লিথোগ্রাফি মাধ্যম এই মডার্ন ও পোস্ট-মডার্ন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মতো মাধ্যম নয়? নাকী এর অন্য কোনো মডার্ন, পোস্ট-মডার্ন গুরুত্ব আছে? এ প্রশ্নের জবাব পরে কনটেম্পরারি কিছু লিথোগ্রাফি সম্পর্কে আলোচনা ও এই গবেষণার মূল আলোচনার শেষে সম্মিলিত অনুভূত ফলাফলের মাধ্যমে পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করা যায়।

৪.৪.১.২ (খ) করণ-কৌশলগত বিবর্তন (টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট)

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে লিথোর করণ-কৌশলগত বা টেকনোলজিক্যাল উন্নতিটি কী হয়েছে এবং এর গুরুত্বটা কী প্রভাব ফেলেছে তার আলোচনা:

রোমান্টিসিজম থেকে সমসাময়িক যুগ পর্যন্ত টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট:

১৭৯৮ সালে লিথোগ্রাফি আবিষ্কারের পর, ১৮০৩ সালের দিকে ইংল্যান্ডে প্রাথমিকভাবে ইংলিশ বেইজ শিল্পীদের দ্বারা সৃষ্ট শিল্পকর্ম ফিলিপ এন্ডার (Philipp Andre) কর্তৃক ১২টি ইমেজ নিয়ে 'Specimen of Polyautography' নামকরণে একটি ফোলিও প্রকাশিত হয়। এই কাজগুলোর সবই পেন এবং তুষ মিডিয়ায় করা। যদিও এরই মধ্যে লিথোগ্রাফিতে ক্রেয়ন পেনসিলের সাহায্যে তৈরি কাজ প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। ১৮০৪ সালে প্রথম সফলভাবে 'chalk (crayon) drawings' করা হয়েছিল, যেটি উনিশ শতকের শিল্পীদের লিথোগ্রাফির প্রতি উৎসাহী করে তুলেছিল।[১১৯] এদিকে ফ্রান্সের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম শিল্পী এইচ. বি স্যালন ১৮০৪ সালে লিথোচিত্রে টোনের মাধ্যমে আলোছায়াকে উদ্ভাসিত করেন। জার্মান শিল্পী এলরিউচার প্রথম পর্যায়ে শৈল্পীক গুণাবলিসমৃদ্ধ লিথোচিত্র নির্মাণে মনোনিবেশ করেন এবং নিজের ও অন্য শিল্পীদের আঁকা লিথোগ্রাফি চিত্র নিয়ে একটি মনোরম পোর্টফোলিও প্রকাশ করেন। এ সময় লিথোগ্রাফির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হেরার বন।

ফ্রান্সের রাজা নেপোলিয়ন এই নতুন মাধ্যমের গুরুত্ব অনুভব করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য লিথো প্রেস নিয়ে আসেন। প্যারিসে লিথোগ্রাফি মাধ্যমটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় ১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে গড্রিফোম

---

[119] GaroZ. Antreasian and Clinton Adams, *The Tamarind Book of Lithography: Art & Techniques*' New York, p. 79; Jules Heler, *Printmaking Today*, Secondedition,1972, New York, p.18

অ্যাংগেলম্যান কর্তৃক লিথো প্রেস মেশিনটি নিয়ে আসার পর থেকে। মূলত গ্রন্থ চিত্রণ ও সমসাময়িক চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে লিথো প্রথা উৎকর্ষ লাভ করে।[১২০] পরের (১৮২৭ সালের পরের দিক থেকে জার্মানিতে) দিকে দুর্বল ও হালকা ইমেজের ছবির প্রিন্ট থেকে আরো একটু উন্নতির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে জার্মানিতেই শিল্পীরা লিথোগ্রাফির এই প্রাথমিক অবস্থা থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। যাই হোক, বার্লিন শিল্পী উইলহেম রিউটার Wilhelm Reuter (1768-1838), (১৭৬৮–১৮৩৮) ফিলিপ এভারের স্পেসিম্যান (Specimens) থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বার্লিনের শিল্পীদের দিয়ে Polyautographic Drawings by Outstanding Berlin Artist নামে কতগুলো লিথোগ্রাফি প্রকাশ করেন। ১৮৫১ সালে এডলফ ভন মেনজেলের 'এক্সপেরিমেন্ট অন স্টোন উইথ ব্রাশ এন্ড স্ক্র্যাপার' গবেষণাটি প্রকাশিত হয়, যা এই মিডিয়ার ভার্সেটেলিটির একটি প্রমাণ হিসেবে রয়ে গেছে। উপরোক্ত বিষয়ের উদাহরণ হিসেবে শুরু থেকে বলতে গেলে— ব্লেকের (William Blake, ২৮ নভেম্বর ১৭৫৭–১২ আগস্ট ১৮২৭) কাজের টোনাল ভেরিয়েশন ব্যবহার না করে মূল বিষয়বস্তুর পেছনে পেন ও তুষের মাধ্যমে লাইন দিয়ে টোনাল শেড সৃষ্টি করা কাজ, এই মাধ্যমের ফ্লুয়েন্ট লাইন ও অনেক ধরনের টোনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তৈরি করা শিল্পী ইসাবের কাজ, থমাস শুটার বয়েজের তৎপরবর্তী সময়ের প্রথম সফল কালার লিথো— যেগুলোতে ওয়াটার কালার ইফেক্ট ছিল সেগুলো, দেগাসের প্রথমে কপার প্লেটে ড্রয়িং করে প্রিন্ট নেওয়ার পর সেখান থেকে স্টোনে ট্রান্সফার করে কাজ করা শিল্পকর্ম, ১৮৮৬ সালে নিওইম্প্রেশনিস্ট সিগনাকের লেস এন্ডলেস ছবিতে প্রাথমিকভাবে ব্ল্যাক ক্রেয়নে কাজ করে

পরে ফাইনাল ভার্সনটি প্রিন্ট নেওয়ার সময় সাতটি কালারে নেওয়া প্রিন্ট, তুলুজ লুত্রেকের সরাসরি স্টোনে আঁকা চিত্রে টুথব্রাশের সাহায্যে স্প্যাটার টেকনিকে রং ছিটানো পদ্ধতি ডেভেলপ করা শিল্পকর্ম, ইউজিন ক্যারিয়ারের চিওরেসকিউরো সংবলিত অ্যারেস্টিং ইফেক্টগুলো স্টোনে ট্রান্সফার প্রসেসের মাধ্যমে ইম্প্রেশন নিয়ে তার ওপর কাজ করে প্রিন্ট নেওয়া শিল্পকর্ম ও কনটেম্পর‍্যারি কিছু টেকনিক, যেগুলো কনটেম্পর‍্যারি প্রিন্টের আলোচনার সময় আলোচনা হবে— সেগুলোর কথা বলতে হয়।

৪.৪.১.৩ (গ) কনটেম্পর‍্যারি সময়ে করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত বিবর্তন

এরপর কনটেম্পর‍্যারি সময়ে আরো কিছু টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট দেখা যায়, যা পূববর্তী সময়ে দেখা যায়নি এবং বিভিন্ন ব্যবহারিক সাফল্যের কারণে লিথোকে নতুন করে শুধু ট্র্যাডিশনাল টেকনিকের দিক থেকেই নয়, মিডিয়া হিসেবে এক্সট্রিমলি ফ্লেক্সিবল মিডিয়ার গুরুত্ব বহন করার বিষয়টিও রিয়েলাইজ

---

[120] ড. নিহার রঞ্জন সিংহ, অভিসন্দর্ভ, পৃ. ৫

করে। সেইসঙ্গে এসথেটিক কনসেপ্টের দিক থেকেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সেটাও এখানে সংক্ষেপে বলা হলো।

টেকনিক্যাল জটিলতা এড়িয়ে কাজ করতে গিয়ে শিল্পী বিয়েল বলেন, লিথোগ্রাফি পেইন্টিংয়ের খুব কাছাকাছি একটি মাধ্যম closest to painting. তিনি তার ডলিস গ্লোভ Doly's Glove (চিত্র-৪.৬৮) প্রিন্টটি সিম্পল ঘরোয়া বিষয়বস্তুর অ্যাবস্ট্রাক্ট ধরনের ছবি, ছবিটি পেস্টেল রং দিয়ে তৈরি মাস্টার স্কেচের থেকে ট্রেসিং করে নিয়ে পাঁচটি কালারে লিথো স্টোনে ক্রেয়ন, তুষের মাধ্যমে অ্যাবস্ট্রাক্ট করে এঁকেছেন।

Plate: 4.68, Jack Beal, Doyle's Glove, five-color lithograph on Rives BFK paper, 1969, 12x13 inch.

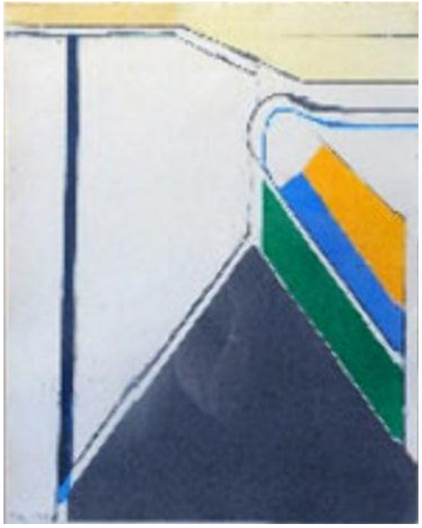

Plate: 4.69, Richard Diebenkorn Untitled Ocean Park Series, lithography, Untitled, 1969, 24x18 inch.

১৯৬৯ সালে রিচার্ড ডাইবেনকর্ন (Richard Diebencorn)-এর 'ইউনাইটেড ১৯৬৯' (Untitled 1969) কালার লিথোগ্রাফি করার ধরনটি (অ্যাপ্রোচটা) এমনই ছিল, যেন তিনি পেইন্টিং করছেন। তিনি তার (Untitled 1969, চিত্র.৪.৬৯)-এ লিথোগ্রাফি স্টোনে বা প্লেটে বারবার এঁকেছেন, প্রিন্ট নিয়েছেন এবং পছন্দসই ইমেজে না পৌছানো পর্যন্ত বারবার রিসেনসিটাইজ করে প্রিন্ট নিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছনোর চেষ্টা করেছেন। ডাইবেন কর্ন লিথো তুষ দিয়ে ব্রাশের মাধ্যমে ওয়াশ দেওয়ার পর কিছু বর্জন করা অংশে সম্ভবত রাবিং ইঙ্কও ব্যবহার করেছেন। তিনি এ কাজে কাউন্টার এচিং করে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, নতুন কিছু টোন সংযোগ করা যায়, সময় সময় ইমেজ ও কালারের একটা পরিবর্তনও হয়। ফলত কাউন্টার এচিং করে শিল্পী বারবার কাজ করতে পারেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছান। একজন পেইন্টার ক্যানভাসে স্বতঃস্ফূর্ত উপায়ে স্বাধীনভাবে ইমেজ তৈরি করতে পারেন, কিন্তু লিথোগ্রাফিতে শিল্পী এই মেথডে স্পন্টেনিয়াস স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন। কখনো কখনো

অতি যত্নশীল হয়ে শিল্পীরা এ মেথড অবলম্বন না করেই কাজ সমাপ্ত করেন, ফলে তিনি তার পূর্ণ অনুভূতি ব্যক্ত করতে ব্যর্থ হন।

ব্রুস কনার তার ব্রাউন-কালো (Bruce Conner, b. 1933, fig-75, Todays Printmaking, Jules Heler, page-73) অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশ্‌নিজ্‌মের ক্যালিগ্রাফির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কাজটি চার্বোনেল জিংকোগ্রাফিক লিকুইড কর্ন তুষ দিয়ে কাজ করে পুরোপুরি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ড্রইং করে তারপর আবার ওই একই স্টোনে কাজ করে আড়াই দিনে শেষ করেছেন।

ভাস্কর পিটার ভাউলকস Peter Voulkos (জন্মঃ ১৯২৪) আসলে কর্ন তুষকে জিংক প্লেটে ড্রইং ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহার করে ফিগারকে কোলাজ শেপে নিয়ে যান। তিনি তার রিটার্ন টু গো লিথোগ্রাফিতে (Return to Go 1967, Todays Printmaking, Jules Heler, page-73) জোরালো থ্রি ডাইমেনশনাল কোয়ালিটিকে লিথোর টু ডাইমেনশনাল কোয়ালিটির মাধ্যমে (সেই থ্রি ডাইমেনশনকে ইন্টারপ্রেট করার জন্য) প্রকাশ করানোর চেষ্টা করেছেন।

হেনরি পিয়ারসনের [Henry Pearson (b.1914) (জন্মঃ ১৯১৪)] ফরম হোরাইজন সিরিজ [(a series of Horizons) চিত্র-৪.৭০,]-এর প্রিন্টটি একটি পথকে ডেমোনেস্ট্রেট করে, যার মধ্য দিয়ে লিথোগ্রাফিক ড্রইং টেকনিকটা অতি সতর্কভাবে অপটিক্যাল আর্টের (Op Art) ডিমান্ড পূরণ করতে পারে। একটি দিক থেকে এই হোরাইজোন রিয়াল বা বাস্তব, কারণ এটা গতির সঙ্গে সংযোগ বা গতির সংঘর্ষতাকে রিপ্রেজেন্ট করে। দেখলে এ রকম মনে হতে পারে যে, ছোট্ট বিরোধী মেসের বিপরীতে ওপর থেকে নিচের দিকে পতিত একটা বিশাল সিম্বলাইজ পালসকে (কম্পিত সিম্বলাইজ মেস বা ভর) প্রকাশ করছে। এই কনসেপ্টটা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে শিল্পী ওয়াটার কালার ব্রাশ এবং চার্বোনেলের জিংকোগ্রাফিক ইঙ্ক ব্যবহার করেছেন এমনভাবে, যেমনটি তিনি বলেন যে— এটি একটি অস্থির সমতল ধরনের 'unsubtle flatness'. শিল্পী অনুভব করছিলেন যেটাকে তিনি ‘প্রতিস্থাপিত করা হলো’ 'was placed' বলছেন, সেটা অপ আর্টের ক্যাটাগরির দিক থেকে যুক্তিনির্ভরভাবে অপ আর্টেই পড়ে, যখন শিল্পী কোনো কোনো সময় লিনিয়ার রিলেশনশিপের প্রতি মনোযোগী সেটাকে অর্থাৎ সম্পর্কটিকে (রিলেশনশিপটাকে) তিনি টাইমলেস ও ইউনিভার্সাল হিসেবে দেখেছেন। তিনি বলেনঃ ‘ছোট্ট শিশুর মতো কম অভিজ্ঞতা এবং মানচিত্রকর, মুদ্রণশিল্পীর মতো অভিজ্ঞতা, মহাসমুদ্রবিদ ও পরিকল্পনাকারীর মতো অধিক অভিজ্ঞতা নিয়ে

এটা করা হয়েছে। এটা অনেকটা পানির কারণে, পানিতে তৈলের ফোঁটার কারণে ন্যাচারালি হয়ে থাকে... ।'[১২১]

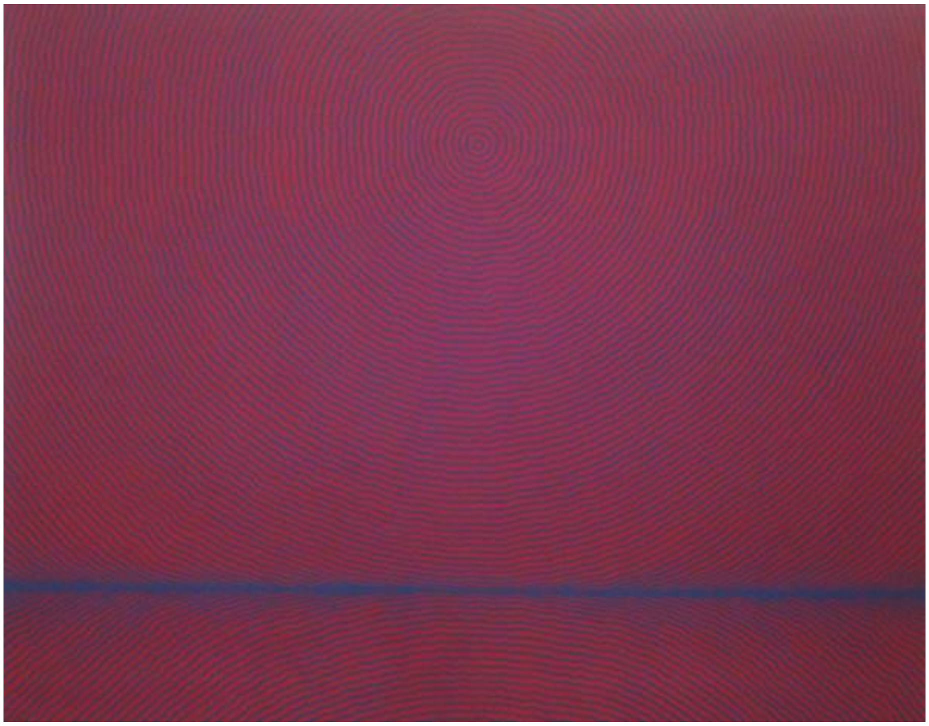

Plate: 4.70, Henry Pearson, Gyros V, stone lithograph, 1965, 16x20.5 inch.

ডিক রে Dick Wray ক্রেয়ন এবং ব্রাশের মাধ্যমে তুষও টারপিনটাইনের বা লিথোটিনের মিশ্রণ দিয়ে একটি জিংক প্লেটে এক সেন্সে কালারের টোনালিটিটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে তৈরি করেছেন ৭৭ নম্বর Untitled, 1964, Lithograph, 14.75x19.75. Todays Printmaking, Jules Heler, page-74) চিত্রটিতে।

সাম ফ্রান্সিস (Sam Francis, জন্ম-১৯৩৩), (Lithograph, Untitled, 38.75x26 inch. Todays Printmaking, Jules Heler, page-61) স্টিক তুষে পানির তারতম্য অনুযায়ী মিশিয়ে ব্রাশের মাধ্যমে ব্যবহার করে, সাতটি কালারের জন্য সাতটি করে প্লেট তিনটি স্টেপে ব্যবহার করে, প্রথম স্টেপে জিংক প্লেটে লাল, নীল ও সবুজ রঙে প্রিন্ট নিয়ে, দ্বিতীয় ধাপে কমলা ও হলুদ রঙে প্রিন্ট নেওয়ার পর তৃতীয় ধাপে একটা স্টোনে পারপেল এবং ভিন্ন ধরনের সবুজ রঙে প্রিন্ট নেওয়া হয়েছে। এই নন-অবজেক্টিভ ডিজাইনটিতে মার্জিন বা কর্নারের মার্জিনের দিকে স্ট্রং ফোকাস করেছেন আর framing a relatively negative center penetrated by lively and more delicate movement .

[121] Jules Heller, *Printmaking Today,* 2nd edition, New York, 1972, p.74

৪.৫ লিথোগ্রাফির বর্তমান অবস্থা

৪.৫.১ ইউরোপ, ভারত ও বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চার বর্তমান অবস্থা

(ক) সমগ্র ইউরোপের শিল্পকলার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাব যে, মোটামুটি ১৯২০ সালের রিয়ালিস্ট মেনুফেস্টোর[১২২] পর থেকে কাইনেটিক শিল্পের দিকে ধাবিত হওয়ার ফলে কাইনেটিক শিল্পের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত শিল্পে শুধু স্ট্যাটিক রিদমের সাহায্যে (motion-এর মাধ্যমে) এবং পরবর্তী সময়ে স্ট্যাটিক ও কাইনেটিক রিদমের সমন্বয়ে মোশনকে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে রিয়ালিটিকে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন।[১২৩] সে ক্ষেত্রে লিথোগ্রাফির পদচারণটা রোমান্টিসিজমের সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত শুধু স্ট্যাটিক মোশন তৈরির ক্ষেত্রেই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। ভারত ও 'বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চা, বর্তমান অবস্থা'র ক্ষেত্রেও একই বিষয় ঘটেছে। তবে কি বর্তমান সমসাময়িক (কনটেম্পর্যারি আর্টের) সময়ে এর গুরুত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন? অন্নদাশঙ্কর রায় তার 'আর্ট'-এ বলেন:

> আর্ট ও আর্ট-নয়ের মাঝখানে কোনো সুনির্দিষ্ট সীমান্তরেখা নেই। তাকে গায়ের জোরে টানতে গেলে দ্বন্দ্ব বাধে। উপনিষ্দ পড়তে পড়তে অনেক সময় মনে হয়েছে যা পড়ছি তা কাব্য। প্লেটোর রচনা পড়ে বুঝতে পারিনি কেন আর্ট নয়। বাইবেলের যেখানে সেখানে কবিতার কণা ছড়ানো। এসব উড়িয়ে দেবার জো নেই। অথচ একথা কখনো মানতে পারিনে যে ধর্মগ্রন্থের বাইরে দর্শনগ্রন্থের বাইরে আর্ট নেই বা থাকলেও নিচু দরের আর্ট। আসল কথা, কোথায় আর্ট শেষ হয়ে দর্শন আরম্ভ হয়েছে, কোথায় ধর্ম শেষ হয়ে আর্ট আরম্ভ হয়েছে তা কেউ জানে না, জানতে পারে না। কেউ কি বলতে পারে কোনখানে হেমন্তের সারা, শীতের শুরু? কোনখানে বসন্তের শুরু, শীতের সারা?[১২৪]

(খ) ইউরোপে বিভিন্ন ইজমের মধ্য দিয়ে লিথোগ্রাফির বিভিন্ন চরিত্র বের হয়ে এসেছে। দমিয়ের বা এক্সপ্রেশনিজমের লিথোগ্রাফি ছাপগুলো ছাড়া অন্য ইজমগুলোর লিথোগ্রাফি ছাপগুলো সে সময়ের পেইন্টিংগুলোর চেয়ে মানগত দিক থেকে ইজমের উদ্দেশ্য সাধনে কতটা সফল হয়েছিল সে 'বিষয়টি' লিথোগ্রাফির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের প্রশ্নে সম্পর্কিত। কারণ লিথোগ্রাফি চর্চা যদি পেইন্টিং বা অন্য

---

[122] Helen Gardner, *Art through the Ages*, United States of America-1976, P.-923, Realist Manifesto: Pevvsner (1886–1962) championed the individual freedom of the artist and the right to free experimentation. In the1920, Naum Gabo and Antoine Pevsner issued their Realist Manifesto, in which theycalled for the representation of a 'new reality': Inorder to interpret the reality of life, art must be based upon two fundamental elements: space and time. Volume is not the only concept of space. Kinetic and dynamic elements must be used to express the true nature of time. The static rhythms are no longer sufficient. Art must not be more imitative, but seek new forms.

[123] Helen Gardner, Ibid.,

[124] অন্নদাশঙ্কর রায়, 'আর্ট', কলকাতা ১০, পুনশ্চ সংস্করণ, গ্রন্থমেলা ১৯৮৯, প্রকাশক-সন্দীপ নায়ক, ১১৪ এন, ডা. এস.সি. ব্যানার্জী রোড, পৃ. ১১

মাধ্যমের চেয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিক ক্ষমতাবান না হয়ে থাকে, তবে তার চর্চা ভবিষ্যতে মুখ থুবড়ে পড়বে। এই ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের চূড়ান্ত আলাদা আলাদা কিছু রূপ আমরা দেখেছি, খুলে গেছে অসীম সম্ভাবনার দ্বার। লিথোগ্রাফি কি তাহলে ভার্সেটাইল চরিত্র? নাকি অয়েল পেইন্টিংয়ের মতো একটাই চরিত্র? সেই চরিত্রটা কি আমরা নির্ণয় করতে পেরেছি? লিথোগ্রাফি কেন! সমস্ত ছাপাই মাধ্যমেরই একটা ধন্যাত্মক দিক হলো— যেকোনো ছাপচিত্রই ভালোভাবে সম্পন্ন হলে তা নিজেই শক্তিশালী অভিব্যক্তিরূপে আবির্ভূত হয়।

(গ) লিথোগ্রাফি যেহেতু শিল্পীর (draftsman) হাতের সরাসরি অভিব্যক্তি দিতে পারে সে ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনার বিষয়টিও সম্পূর্ণ আবিষ্কার এখনো বাকি রয়ে গেছে।

(ঘ) দুই ধরনের অলংকরণ বা ভঙ্গি [অলংকরণ (illustrative purposes) ও চারুশিল্প (nonillustrative purposes)] আবার একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে চমৎকারভাবে। হুট করে প্রথম দিকের রবি বর্মার একটি অলিওগ্রাফি ও সালভাদর ডালির একটি লিথোগ্রাফি ছাপ দেখলে— দুটির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা যে কারো জন্যই যেমন কঠিন হবে তেমনি এর ভেতরই লুকিয়ে আছে সেই দুটি ভঙ্গিমা সমন্বিত রূপ। এ চরিত্র বা ভঙ্গিমা দুটির সমন্বয় যতটা ইউরোপে হয়েছে ততটা ভারতে হয়নি, আর যতটা ভারতে হয়েছে ততটা বাংলাদেশে হয়নি।[১২৫] আবার হাইপোথিসিস করে এটিও বলা যায় যে, ক্রমোলিথোগ্রাফি বা অলিওগ্রাফি পদ্ধতি ইউরোপে শিল্পীরা তাদের কাজের কনসেপ্ট অনুযায়ী যতটা স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন, ভারতে অতীতের লিথোর ছাপ লক্ষণীয় স্বভাবজাত কারণে। অতীত পর্যালোচনামূলকভাবে নয়। এ দুটি শিল্পভাষাকে একসঙ্গে ব্যবহার করার দরুন ইউরোপের লিথোগ্রাফি চিত্র আরো সম্ভাবনাময় হয়ে উঠেছে।

(ঙ) কিন্তু অফসেট ছাপাই (১৯২০) আবিষ্কারের পর আরো দ্রুততম মাধ্যম চলে আসায় লিথোগ্রাফিতে আর ছাপ নেওয়ার প্রয়োজন পড়ল না। বর্তমানে শিল্পীদের প্রচুর এডিশনেরও প্রয়োজন নেই বলে কেউ

---

[125] http://www.saffronart.com/sitepages/printmaking/history.aspx), *কারণ*, ভারতে কিন্তু ১৮২৪ সাল থেকে ১৯১৯ সাল অর্থাৎ শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত ক্রিয়েটিভ ক্ষেত্রে না হয়ে কমার্শিয়ালিই এটা অধিকতর ব্যবহৃত হয়েছে। এ কথাটির সত্যতা পাওয়া যাবে আরো উক্তির মধ্য দিয়ে। The practice of printmaking as a fine art medium gained immense popularity with the establishment of Kala Vaban founded by the Tagores in1919. (৩/২/২০১৫) মিডিয়া হিসেবে বেঙ্গলে লিথোগ্রাফি শুধু বই ইলাস্ট্রেশন, জার্নাল ও অন্যান্য পাবলিকেশনের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। আবার হাইপোথিসিস করে এটিও বলা যায় যে, ক্রমোলিথো বা ওলিওগ্রাফ পদ্ধতি ইউরোপে শিল্পীরা তাদের কাজের কনসেপ্ট অনুযায়ী যতটা স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন, ভারতে কিন্তু নাক সিটকানো ভাবের কারণে অতীতের লিথোর ছাপ লক্ষণীয় স্বভাবজাত কারণে। অতীত পর্যালোচনামূলকভাবে নয়। ফলে বাণিজ্যিক ও চারুশিল্পের শিল্পভাষা হিসেবে লিথো ব্যবহারের ফলে শিল্পীরা যখন এটাকে নিয়ে কাজ করছিলেন তাদের প্রত্যেকেরই চরিত্রটা একটু ভিন্ন রকম দাঁড়িয়েছে।

কেউ তো একটি ছাপ (edition) নিচ্ছেন স্বল্প মূল্যে প্রচারযোগ্য গণমাধ্যম হিসেবে এর গ্রহণযোগ্যতাকে অতিক্রম করে শিল্পের স্বভাবজাত ভাষাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জায়গা থেকে। আবার চারুশিল্পীদের মধ্যে যারা সময়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন ইজমে লিথোগ্রাফি ছাপাই ছবি তৈরি করেছেন আমরা সেগুলোর চরম উৎকর্ষ বাদে কিছু উদাহরণই পেয়েছি মাত্র। যার ফলে আমরা বলি ইম্প্রেশনিস্ট বা পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট ধারার লিথোগ্রাফি চিত্র। কখনো বলতে পারি না লিথোগ্রাফি তার ভাষাগত সীমাকে অতিক্রম করে গেছে। ওই শিল্পীদের বিভিন্ন সময়ের কাজের মধ্য দিয়ে লিথোগ্রাফির যে উৎকর্ষ দেখার কথা ছিল তা সবসময় হয়ে ওঠেনি। কারণটা ২০১১-এর আগস্টে *Sarmistha Maiti*-এর *A Lowdown on the Print Market, Market Monitor* লেখায় ইঙ্গিত করে Nicholas Forrest[126] বলেন যে:

> 'Printmaking is often seen as being a lesser form of art because most artists use printmaking as a secondary source of income but there are still plenty of artists out there who are primarily print markers. By purchasing works by such print markers 'you are not only making a good investment but you are able to purchase much better quality works for much less money.'[127] (উদ্ধারচিহ্ন বর্তমান লেখকের)

যারা সারা জীবন ধরে শুধু লিথোগ্রাফি প্রিন্ট করেছেন তাদের ছবির চরিত্রটা দাঁড়িয়েছে একটু ভিন্ন রকম। এই গ্রুপের শিল্পীদের মধ্যে চারুশিল্পের বহুমাত্রিক কর্মদক্ষতার (ডায়নামিক চরিত্রের) অভাবে ভাষা তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি আজও। তাই এ ভাষার গুরুত্বটা সমসাময়িক (Contemporary) সময়ে নবীন শিল্পীদের কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন। যেমন ধরা যাক দ্যমিয়ের (*Honoré Daumier*, জ. ২৬ ফেব্রু. ১৮০৮–১০ ফেব্রু. ১৮৭৯, ফরাসি ভাস্কর, পেইন্টার ও কেরিকেচার শিল্পী, ৫০০-এর মতে পেইন্টিং এবং ৪০০০ লিথোগ্রাফি করেছেন) ও তুলজ লুত্রেকের (*Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa*, ২৪ নভেম্বর ১৮৬৪–৯ সেপ্টেম্বর ১৯০১) কথা। পেইন্টার হিসেবে দ্যমিয়ের রিয়ালস্টিক বিষয়বস্তুর পথিকৃৎ। কিন্তু ইতিহাসে তাকে গণ্য করা (treat) হয় সাবজেক্টিভ[১২৮] দৃষ্টিভঙ্গি

[126] Nicholas Forrest, "Art Market Blog with Nic Forrest' In 2007" http://www.artmarketblog.com/about-nick/

[127] Sarmistha Maiti, "A Lowdown on the Print Market, Market Monitor", 'art etc.' news & views- monthly art magazine, http://www.artnewsnviews.com/view-article.php?article=a-lowdown-on-the-print-market&iid=23&articleid=608, August2011, Updated 03–25 July 2015.

[128] G. I. Gurdjieff, "Objective and Subjective Art", OSHO NEWS online magazine, http://www.oshonews.com/2011/05/objective-and-subjective-art/, 29 May 20011, 13/2/2015.

থেকে।[১২৯] তারা লিথোগ্রাফার হলেও মূলত পেইন্টার হিসেবেই বেশি পরিচিত। তাই তাদের পেইন্টিংয়ের চরিত্র এবং লিথোগ্রাফির চরিত্রের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ফাঁক বাণিজ্যিক বা সোশ্যাল গণমুখী কারণ ব্যতীত শিল্পের অন্তর্গত সীমার মধ্যে অসীমকে খোঁজার স্বাদের যে অভাব, তা অন্তত ছাপচিত্রীদের (Printmaker) চোখে পড়ার কথা।

৪.৫.২ বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চার বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চার বর্তমান অবস্থা হচ্ছে এই যে— প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করে যাওয়া একজন শিক্ষার্থীও এর অনুশীলনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেননি। দু-একজন শিক্ষক আর ক্লাসের গুটিকয়েক শিক্ষার্থীরা ছাড়া কেউই বিষয়টি বুঝে ওঠার পূর্বেই অনুশীলনের পথ বন্ধ হয়ে যায় নানা কারণে। এর মধ্যে অন্যতম কারণ হলো, এখানে ভারতের 'ললিতকলা একাডেমি'র মতো কোনো সরকারি ও ব্যক্তিগত স্টুডিও গড়ে ওঠেনি। আর পূর্বোল্লিখিত দুটি বিষয়ই (আলংকারিক ও অনালংকারিক ভঙ্গিমা বা চরিত্রের মিশ্রণ) বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চর্চার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ১৯৪৮ সালে চালু হওয়া এ বিভাগে কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে আগত সফিউদ্দীনের (যিনি কলকাতা গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টে লিথোগ্রাফি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন) হাত ধরে পরিশীলিত লিথোগ্রাফি পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ১৯৬২ সালে লিথোগ্রাফির ওপর জাপান থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে আসা মোহাম্মদ কিবরিয়া কর্তৃক পরিচালিত এই বিভাগে সবসময় সৃজনশীল লিথোগ্রাফি পদ্ধতি বা ভঙ্গিমাতেই কাজ বেশি হয়েছে। ক্রমোলিথোগ্রাফি বা কালার লিথোগ্রাফির অনুশীলন খুবই কম হয়েছে। আর ওলিওগ্রাফের চর্চা না হলেও ক্রমোলিথোগ্রাফির চর্চা চিহ্ন যেমন ভারতীয় শিল্পীদের ভেতর সুপ্ত অবস্থায় কাজ করে গেছে, বাংলাদেশি নবীন অনুশীলকদের মধ্যেও বর্তমানে এর লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা তারা নিজেরাও খেয়াল করে দেখেছেন কি না সন্দেহ আছে। মোহাম্মদ কিবরিয়া, আব্দুর রাজ্জাক, মিজানুর রহিম, মো. আব্দুস সাত্তারসহ উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছাড়াও সাইদুল হক জুইস, অশোক কর্মকার, আহমেদ নাজির, রশিদ আমিন, মো. আনিসুজ্জামান ও মো. ফখরুল আলমের পর কাজ করে যাচ্ছেন এমনদের মধ্যে শেখ মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান, কামরুজ্জামান, ঝোটন চন্দ্র রায়, জয়নাল আবেদিন, রাশিদা আক্তার ববি, পাপড়ি বাড়ৈ রাত্রি প্রমুখের নাম গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে মোহাম্মদ কিবরিয়া বিভাগে এর কিছু সাধারণ লক্ষণীয় উদাহরণ হিসেবে শিক্ষার্থীদের থেকে সংগৃহীত কাজ প্রদর্শন

---

[129] "Honoré Daumier", 'Wikipedia, the free encyclopedia', http://en.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_Daumier,_18 May 2015, at 04:33.

করে রখে গেছেন। আর ভারতে ২০০১ সালে শান্তিনিকেতনে পড়তে গিয়ে বর্তমান লেখক তাদের উপরোল্লিখিত দুটি দিকেরই সমন্বিত চর্চা (অলিওগ্রাফি ও আধুনিক শুটার বয়েজদের থেকে আজ পর্যন্ত শিল্পীদের লিথোগ্রাফি চর্চা ও অলিওগ্রাফি বা ক্রমোলিথোগ্রাফির চর্চার সমন্বিত প্রয়াস) দেখে দুই বাংলার লিথোগ্রাফি অনুশীলনের তারতম্য বুঝতে পারেন।

চারুশিল্পের ক্ষেত্রে ইউরোপে ও ইউরোপের বহির্ভাগে প্রযুক্তিগত ও সামগ্রিকভাবে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ঘটে, যার প্রভাব লিথোগ্রাফির ওপরও পড়েছে, আর তা হলোঃ

(ক) এক্স-রে (In 1895) আবিষ্কারের পর মোটর কারের উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান বিশ্ব সম্পর্কে একটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি (perception) প্রকাশ করতে সাহায্য করে। শিল্পী হিসেবে ফার্নান্দ লেজার ১৯১৪ সালে বলেন যে, ‘যদি দৃশ্যশিল্পের ভাষা (pictorial language) পরিবর্তন হয়ে থাকে, তবে তার কারণ হচ্ছে আধুনিক জীবন সেই প্রয়োজনীয়তাকে তৈরি করেছে।’[১৩০] মডার্নিজমের স্পিরিটের কেন্দ্রে এই উক্তির প্রতিফলন দেখা যায় এভান্ট-গার্ড ধরন (attitude) হিসেবে। শিল্পীরা তাদের চারপাশের বিশ্বকে প্রকাশ করার নতুন নতুন উপায় বা পথ অন্বেষণ করছিলেন, কখনো এটাকে বাদ দিয়ে (রিজেক্ট করে) অথবা পশ্চিমা নন্দনতত্ত্বকে ভেঙে আরেক ধরনের কৌশলকে অনুসরণ করে [(some times by rejecting it, or by pursuing strategies of dissolution, flux and fracture in place of Western notions of aesthetic unity and wholeness.), ওয়েস্টার্ন নোশন অব এসথেটিকস ইউনিটি ও হোলনেসের স্থানে ডিসলিউশন, ফ্লাক্স (নিরন্তর পরিবর্তন পরম্পরা, প্রবাহ, গলনের সাহায্যার্থে ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত পদার্থ) ও ফ্রাকচারের স্ট্র্যাটেজিকে আনুসরণ করে]। এই নতুন কৌশলের অনুসন্ধানটা এটিকে একটি অধিকতর পলিমিক্যালি (polemically— a verbal attack on a belief or openion) কনসেপচুয়াল এটিচুয়েডের দিকে চালনা করে।[১৩১]

(খ) ১৮৪০ সালে আলোকচিত্রের আবির্ভাবের পর একজন ফ্রেঞ্চ শিল্প শিক্ষক ডেলারকি (Delaroche) বলেন, 'From today, painting is dead.' আলোকচিত্রকর ও শিল্পীরা প্রথম থেকেই একে অপরের শিল্প সম্পর্কে জানতে ও শিখতে থাকেন। আলোকচিত্রকররা শিল্পীদের দৃশ্যগত ধারণা (pictorial concept) ও আদর্শগুলোকে (norms-নিয়ম, নমুনা বা আদর্শ) তাদের ফটোগ্রাফিতে ব্যবহার করতে

---

[130] Anna Moszynska, *Abstract art*, Singapor, Reprinted-1995, page-8
[131] Anna Moszynska, *Ibid*.

শুরু করেন।[১৩২] দেগাস (Edgar Degas, ১৯ জুলাই ১৮৩৪–২৭ সেপ্টে. ১৯১৭) ও তার সমসাময়িক শিল্পীরা ফটোগ্রাফি থেকে অনেক কিছু নিতে পেরেছিলেন। যেমন: দেগাসের ছবিতে ফিগারের ফ্ল্যাশকাট কম্পোজিশনে (বিরজন কৌশল) জাপানিজ উডকাট ও ফটোগ্রাফির প্রভাব লক্ষণীয়। তা ছাড়াও (শিল্পীদের) বাস্তবতার ছবি তৈরি করার পর্যাপ্ততাকে কঠিনভাবে পুনঃপরীক্ষণ করা হয়। এমনকি বাহ্যিক উপস্থাপনের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে অনেক শিল্পীই পুনরায় আবার সাবজেক্টিভ, ইন্টেরিয়র রিয়ালিটি এবং ইমোশন থেকে ছবি আঁকা শুরু করেন। যেমন গঁগ্যার 'পেইন্ট বাই হার্ট' উপদেশটা থেকে (Artists draw on their own innerresources) এ রকম একটি রাজপথ— পরবর্তী সময়ে সুরিয়ালিস্ট, অ্যাবস্ট্রাক্ট, এক্সপ্রেশনিস্ট ও অন্যদের মধ্যেও (Explored) ছড়িয়ে পড়েছে।[১৩৩]

(গ) আলোকচিত্রের সুন্দর এক রঙের বর্ণবিভাগত বিভিন্ন (The smoothly monochromatic qualities of the photograph), বর্ধিত সংখ্যক কালার পেইন্টের বাণিজ্যিক পর্যাপ্ততার (availability— উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে) এবং লাইট ও কালারের আবিষ্কার শিল্পীদের সেই দিকে উৎসাহিত করেছে যেটা পেইন্টিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল: কালার এবং সারফেস টেক্সচার। পেইন্টার মিউরিস ডেনিস ১৮৯০ সালে বলেন: একটি ছবি— হোক না সেটা যুদ্ধের ঘোড়া, একটি নুড ওমেন অথবা কিছু নামবিহীন ছবি, প্রয়োজনের তাগিদে সমতল পটভূমিতে (plain surface) একটি নির্দিষ্ট আদেশ বাস্তবায়ন করার জন্য কালার দিয়ে সাজানো হয়েছে। [১৩৪]

(ঘ) ডেনিসের উক্তিটা একটা তাত্ত্বিক যৌক্তিকতার সুযোগ করে দেয়, যেটা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন উপায়ে উন্নতির দিকে এগিয়ে গেছে। এই সময়ের মধ্যে আরো একটি বিষয়, যেমন পশ্চিমা শিল্প ছাড়া অন্য অর্থাৎ প্রাচ্যশিল্প (non-Western art) নতুন দৃশ্যশিল্পের রাজপথ শিল্পীদের জন্য খুলে দেয়— যেখানে বিশেষ অনুভূতি (special perception) ও শিল্পীদের ছবি আঁকাটা (artistic depiction, শৈল্পিক মনন থেকে আঁকা ছবি) অপেক্ষাকৃত কম যৌক্তিক (rational) ও ভিন্ন বিষয়ের ওপরই নির্ভর করে গড়ে উঠেছে।[১৩৫]
বিশ্বভারতী (শান্তিনিকেতন) বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একটু তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চর্চার বর্তমান অবস্থাটি সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক:

---

[132] Kavita Shah, *Multiple Encounters 2012: Jyoti Bhatt in conversation with Kavita Shah*, p. 19
[133] Anna Moszynska, *Abstract art*, Singapor, Reprinted-1995, page-8
[134] Anna Moszynska, *Ibid*.
[135] Anna Moszynska, *Ibid*.

(ক) চারুশিল্পে লিথোগ্রাফি চর্চার ক্ষেত্রে ভারতের বিশ্বভারতী (শান্তিনিকেতন) বিশ্ববিদ্যালয়ে লিথোগ্রাফি চর্চা অলিওগ্রাফি ও শুটার বয়েজদের পদ্ধতির সমন্বয় একটা পরিমার্জিতরূপে নিয়ে আসতে ১৯২৬ সাল থেকে প্রায় সোমনাথ হোরের সময় (১৯৬৮ সাল) পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। কারণ ১৯৬৮ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে ওয়ার্কশপ আয়োজন করেছিল। তখন লিথোগ্রাফি এবং এচিংয়ের প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখানো হয়েছিল। সোমনাথ হোর ১৯৬৯ সালে গ্রাফিক বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। সোমনাথ হোর ও বিশ্বরূপ বোসের দক্ষ তত্ত্বাবধানে ছাপচিত্রের প্রতি আবার প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ১৯৭০ সালে ছাপচিত্রে স্পেলশালাইজেশনের প্রথম ব্যাচ ঢোকে। সোমনাথ হোর অনেক ধরনের কৌশল সম্পর্কে, বিশেষ করে— লিথোগ্রাফি ও এচিংয়ের সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দিতে কালক্ষেপণ করেননি। ওই সময়টি ছিল গ্রাফিক মিডিয়ার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়। সোমনাথ হোর ও বিশ্বরূপ বোস— এ দুই নিরীক্ষক মাধ্যমের গবেষণার ক্ষেত্রটিতে গ্রাফিক মিডিয়াকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ছাত্রদের গবেষণাকে সাদরে গ্রহণ ও তত্ত্বাবধান করে গেছেন।[১৩৬] বাংলাদেশে কিন্তু ১৯৪৮ সাল থেকেই লিথোগ্রাফির করণ-কৌশল মোটামুটি চারুশিল্পে (জর্জ বেক্সটারদের অলিওগ্রাফি পদ্ধতি অনুসরণ না করে) শুটার বয়েজদের পদ্ধতিই অবলম্বন করেছে।

(খ) ইউরোপ থেকে ভারতে এবং ভারত থেকে বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চার আগমন হলেও চারুশিল্পে লিথোগ্রাফি চর্চার শুরু ভারতের শান্তিনিকেতনের তুলনায় খুব একটা পিছিয়ে শুরু হয়নি। কারণ শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ইতিহাসে দেখা যায়, ১৯২৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ কর (একজন কারুশিল্পী, টেকনিশিয়ান ও আর্কিটেক্ট) লিথোগ্রাফি এবং এচিংয়ের কৌশল শেখার জন্য লন্ডনে গিয়েছিলেন। সেখানকার একটি জেলায় তিনি কিছু লিথোগ্রাফি ও অফসেট প্রিন্ট করেছিলেন। যদিও সুরেন্দ্রনাথ নিজে লিথোগ্রাফি এবং এচিংয়ের জন্য দক্ষ ছিলেন না তবুও কলাভবনে ফেরার পর অন্য শিল্পীদের মধ্যেও লিথো ও এচিং শুরু করার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। নন্দলালের তীক্ষ্ণ ইন্টারেস্টের কারণে ১৯২৬ সালে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার লিথোগ্রাফি প্রেসটিকে (যেটা এর আগের দশকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল) কলাভবনকে দান করেছিলেন এবং সেটাকে দেখাশোনা করার জন্য একটি লোকও নিয়োগ করা হয়েছিল। যাই হোক, সেখানে কোনো অভিজ্ঞ লিথোগ্রাফার বা টেকনিশিয়ান না থাকার কারণে লিথোগ্রাফি খুব বেশি

[136] Nirmalendu Das, "A Brief History of Printmaking at Santiniketan", 'art etc.' (news & views- monthly art magazine.), August 2011, http://www.artnewsnviews.com/view-article.php?article=a-brief-history-of-printmaking-at-santiniketan&iid=23&articleid=593

উন্নতি হয়নি।[১৩৭] শিল্পগুরু সফিউদ্দীনের হাত ধরে ১৯৪৮ সালেই লিথোগ্রাফি চারুকলায় চালু হয়। লিথোগ্রাফির কৌশলটি সম্পর্কে তিনি খুব ভালোই অবহিত ছিলেন এবং এখানে কলকাতা আর্ট কলেজ থেকে আগত মো. শওকত আলী লিথোগ্রাফি প্রিন্টিং দেখাশোনা করতেন বলে এর চর্চা কখনো বন্ধ হয়ে যায়নি, যেমনটা শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বোস, রমেন্দ্রনাথ ও কলাভবনের অন্য কয়েজন শিল্পী মিলে কিছু লিথোগ্রাফি প্রদর্শন করেছিলেন; কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে (lithography section got closed due to lack of proper maneuvers) maneuvers-এর অভাবের জন্য লিথোগ্রাফি সেকশন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন রমেন্দ্রনাথ ও কিছু শিল্পী এচিং এবং উডকাট চর্চা চালু রেখেছিলেন।[১৩৮] বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের তাদের বিভাগ অনুযায়ী লিথোগ্রাফির ব্যবহারিক দিকটি নিয়ে সফিউদ্দীন কাজ করাতে পেরেছিলেন। যেমন কমার্শিয়াল বিভাগের ছাত্রদের লিথোগ্রাফিতে বইয়ের প্রচ্ছদ করানো হতো। তা ছাড়া সেই সময়ের কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ বিভাগে রক্ষিত রয়েছে। যে কাজগুলোর ভেতর কিছু বাণিজ্যিক লিথোগ্রাফি চর্চার প্রভাবও লক্ষণীয়। আর ১৯৬২ সালে মোহাম্মদ কিবরিয়া জাপান থেকে লিথোগ্রাফির ওপর উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে বিভাগে যোগদান করেন বলে, আজও পর্যন্ত কখনো এর চর্চা বন্ধ হয়ে যায়নি।

(গ) শান্তিনিকেতনে প্রথম দিকে লিথোগ্রাফিকে পেইন্টারলি (painterly, চিত্রগুণ) ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের বেশির ভাগ কাজই গ্রাফিক গুণের চেয়ে অনেক বেশি পেইন্টারলি গুণসম্পন্ন ছিল। যেহেতু গ্রাফিক মিডিয়া তাদের কাছে পুরোপুরি 'duplicative' মিডিয়া ছিল না সেহেতু তাদের তৎবর্তমান কাজেও গ্রাফিক মাধ্যমের অনেক ধরনের ইফেক্টের নির্দিষ্ট সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণার অভাব ছিল।[১৩৯] গ্রাফিক মাধ্যমে এই একটা পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমবারের মতো ইন্ডিয়ান শিল্পীরা গ্রাফিক মিডিয়ার পুনরুৎপাদনের প্রতি খুব বেশি মনোযোগী ছিলেন না। মূলত তারা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাজ করার প্রতি বেশি মনোযোগী ছিলেন, যাতে কাজটি নিজে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পকর্মে পরিণত হতে পারে।

আর বাংলাদেশে চারুশিল্পের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া জানা ছিল। ফলে ছবিতে গ্রাফিক গুণ প্রয়োগে বেশি মনোযোগী হওয়ার কারণে ছবিকে গ্রাফিক গুণের ঊর্ধ্বে একটি ছবি ভাবার মানসিক সাহসের অভাব কখনো কখনো লক্ষণীয়। অথবা সময়ের অভাবে সে অনুশীলন করার সুযোগ কখনো হয়ে ওঠেনি। যদিও সফিউদ্দীন, কিবরিয়া ও তার অনুসারীরা সবসময় ছবির কথা বলেছেন বারংবার; কিন্তু এর প্রয়োগটা

---

137 Nirmalendu Das, *ibid.*

138 Nirmalendu Das, *Ibid*.

139 Nirmalendu Das, “A Brief History of Printmaking at Santiniketan”, ‘art etc.’ (news & views- monthly art magazine.), August 2011, http://www.artnewsnviews.com/view-article.php?article=a-brief-history-of-printmaking-at-santiniketan&iid=23&articleid=593

বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চিত্রে আসতে সময় লেগেছে। শান্তিনিকেতনের ছাপচিত্রে পেইন্টারলি ব্যবহারের ফলে গ্রাফিক চরিত্রের গুণগত মান কম থাকলেও গুণাগুণ বিচারের দিক থেকে একটু ভিন্নভাবে এগিয়েছে, সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়াটা শুধু পরিশীলিত বা শুটার বয়েজদের লিথোগ্রাফি চর্চা পদ্ধতি অনুসারে হয়ে থাকার কারণে এখানকার লিথোগ্রাফি অনুশীলক ও দর্শকদের মধ্যেও লিথোগ্রাফি সম্পর্কিত ভাষাগত কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়।[১৪০] কিন্তু লিথোগ্রাফির ভাষাগত গভীরতার অভাব শিল্পী ও শিল্পসমাজে দেখা দিয়েছে প্রকটভাবে।

(ঘ) ষাটের দশকে সোমনাথ হোর কলাভবনে যোগদানের পর এ বিষয়টি অনুমেয় যে— তাদের লিথোগ্রাফি চর্চা বর্তমানে সত্যিকার অর্থে বাণিজ্যিক দিকটিকে ছাপিয়ে ভাষার নিজস্ব স্বাদ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ভাষা যেন নিজেই কত কিছুই না বলছে। সেই জায়গাটিতে আমাদের চর্চার অভাব যেন আমাদেরকে এর চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে তুলছে প্রতিনিয়ত। তারই সুর আমরা আমাদের এ সময়ের তরুণ শিল্পীদের মধ্যে খুঁজে পাই।

(ঙ) চিঠির ভাষা, ফোনের ভাষা, সাহিত্যের ভাষা, কনসেপচুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজের (প্রত্যয়বাদ) ভাষাগত অপরিসীমতা ও সীমাবদ্ধতা আছে। লিথোর ক্ষেত্রে কোন ধরনের বিষয়বস্তু নিলে ভালো হয় বা এই ভাষা দ্বারা কোন সীমানায় পৌঁছানো সম্ভব সেটা অনেকগুলো গবেষণা বা অনুশীলকদের সম্মিলিত ফলাফলের প্রয়োজন রয়েছে, যা পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

(চ) তবে বর্তমানে কয়েকজন পূর্বোল্লিখিত শিল্পী যারা লিথোগ্রাফি উৎসর্গীকৃতভাবে (*dedicated*) করেছেন বা করে যাচ্ছেন তাদের কারো কারো কাজে দুটি পদ্ধতি বা ভঙ্গিরই লক্ষণীয় পজিটিভ গুণ অনেকেরই দৃষ্টি কাড়বে। প্রবীণদের মধ্যে মোহাম্মদ কিবরিয়া, আব্দুস সাত্তার, মিজানুর রহিম, অশোক কর্মকার, সাইদুল হক জুইস, আহমেদ নাজির, রশিদ আমিন, মো. আনিসুজ্জামান, মো. ফখরুল আলম ছাড়াও নবীনদের মধ্যে কামরুজ্জামান, শেখ মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান, জয়নাল আবেদীন, রাশীদা আক্তার, রবিউল ইসলাম প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশেও বর্তমানে আর তেমন কোনো

---

[140] যেমন লিথোতে গ্লাস মার্কার দিয়ে কাজ করলে অনেকেই এর সঙ্গে পেনসিল মাধ্যমের তারতম্যটাই বোধগত জায়গা থকে এখনো পরিষ্কার করতে পারেননি । তারপর যেমন লিথো মানেই স্টোনের কর্নারের এজের দাগ থাকলে ভালো লাগে। এটা যে বিষয়ের ওপরই নির্ভশীল অর্থাৎ পাথরের কর্নারে ধারের দাগটি (এজটা) প্রিন্টে থাকলে ছবিটি একটি পাতার ভেতর চলে আসে। আর এজ না থাকলে ছবিটি বিশালত্বের দিকে এগিয়ে যায় সে বিষয়টিও অনেকে অনুভব করতে ভুলে যান। লিথো মানেই— তুষ পদ্ধতিতে কাজ হলে ভালো লাগে। এটার অবশ্য একটা হাইপোথিসিস করে বলা যায় যে, যেহতু নদীমাতৃক বাংলাদেশের শিল্পীরা অধিকাংশই জলরঙের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই হয়তো জলরঙের প্রভাবটাই লিথোর তুষ ওয়াশের মধ্যে খুঁজে পেলে ভালো লাগে বলে স্বস্তি বোধ করেন।

উপকরণের অভাব থাকছে না বলে লিথোগ্রাফি অনুশীলন ভবিষ্যতে আলোর মুখ দেখবে বলে বিশ্বাস করা যায়।

এই অধ্যায়ের আলোচনায় লিথোগ্রাফি মুদ্রণযন্ত্রেরই একটি সংস্করণ বলে এর আবিষ্কার ও মুদ্রণযন্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা পাওয়া গেল। লিথোগ্রাফি আবিষ্কারের ঘটনা ও ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে লিথোগ্রাফির সামগ্রিক উত্থান এবং পতন আলোচিত হয়েছে। উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য কয়েক ধরনের লিথোগ্রাফির চর্চা এবং বিভিন্ন সময়ে এর গতিশীলতা সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে আলংকারিক ও অনালংকারিক লিথোচর্চার গুণাগুণ নিয়ে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করা হয়েছে, যাতে এর সস্তা ও মূল্যবান (এক্সপেনসিভ মেথড) প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব পরবর্তী অনুশীলকদের পুনরায় ব্যবহারে উদ্যোগী করে তোলে। অর্থাৎ এতে যেমন স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ পদ্ধতিতে কাজ করা সম্ভব, তেমনি সস্তা ও এক্সপেনসিভ প্রক্রিয়াতেও ইমেজ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এ দুটি পদ্ধতির গুণগত মিশ্রণের উপস্থিতি মডার্নিজমের কাজগুলোতে রয়েছে বলে প্রাসঙ্গিক প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। আরো সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, লিথোগ্রাফি বিভিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আজকে এই পর্যায়ে পৌঁছেছে। কারণ মাধ্যমটিকে একবার উডকাট ও এচিংয়ের বিরুদ্ধে এবং পরে ফটোগ্রাফির বিপরীতে সংগ্রাম করতে হয়েছে, যা আজ পর্যন্ত চলছে। এরপর অফসেট প্রিন্ট আসার পর কারিগররা একে ছেড়ে চলে গেছেন। ডিজিটাল প্রিন্ট ও সি প্রিন্টের (কম্পিউটার প্রিন্ট) আজকের সময়ে এসেও তাকে তার তাৎপর্যতা প্রমাণ করতে হচ্ছে শুধু কৌশলগত দিক দিয়ে নয়, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও। ফলে এই অধ্যায়ে আলোচনায় এতটুকু স্পষ্টত প্রমাণিত যে— লিথোগ্রাফি বিভিন্ন ইজমের দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যভাবে তার উদ্দেশ্য চরিতার্থে সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সামগ্রিক উত্থান-পতন ও ভারতের শান্তিনিকেতনের লিথোগ্রাফির ইতিহাসের মধ্য দিয়ে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে— ইউরোপে লিথোগ্রাফি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে চারুশিল্পে এর চর্চা আরম্ভ হলেও নানাবিধ বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে লিথোগ্রাফি আজকে এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। ভারতে একটু ভিন্নভাবে অর্থাৎ চারুশিল্পের ছবি আঁকার মাধ্যম হিসেবে শান্তিনিকেতনে চর্চা শুরু বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। তাই ভারতের অন্য জায়গাগুলোতে আগে লিথোগ্রাফি চর্চা আরম্ভ হলেও শান্তিনিকেতন বর্তমান লিথোগ্রাফির তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশে শুরু হয়েছে খসড়াকে অনুকরণের মধ্য দিয়ে। চারুশিল্পের ক্ষেত্রে ইউরোপে ও ইউরোপের বহির্ভাগে প্রযুক্তিগত ও সামগ্রিকভাবে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ঘটে, যার প্রভাব লিথোগ্রাফির ওপরও পড়েছে। 'paint by heart' উপদেশটা থেকে প্রাচ্যশিল্পও দৃশ্যশিল্পের নতুন রাজপথ খুলে দিতে

পেরেছিল। ফলে নন-ইউরোপিয়ান আর্ট গ্রহণযোগ্যতা পেল। তাই এত সব অভিজ্ঞতাকে আমলে নিয়েই বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি ভাষার দোরগোড়ায় যেতে পারবে বলে বিশ্বাস করা যায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির চর্চার করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত চর্চা নিয়ে বিশদ আলোচনা করে দেখানো হবে— এ দেশে চর্চিত লিথোগ্রাফি কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত বিবর্তনের দিকটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করা হবে। ফলে এ দেশের লিথোগ্রাফির চিহ্নিত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও ভাষাগত বিবর্তনটির মধ্য দিয়ে এর নতুনতর কৌশল ও মাধ্যম সৃষ্টির বিষয়টি সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

৫. পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চর্চা

বাংলাদেশে ১৮৭০ সাল থেকে প্রায় ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ১২০ বছর ধরে লিথোগ্রাফি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে ১৯৫২ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এর চর্চা অব্যাহত রয়েছে। এই উভয় ধরনের লিথোগ্রাফি সংগ্রহের বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। দুটি উদ্দেশ্যে লিথোগ্রাফি ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের এই মাধ্যমের চর্চার বিবর্তন বা বর্তমান অবস্থাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক হচ্ছে ঢাকা চারুকলা শিল্পপ্রতিষ্ঠান সৃষ্টির পূর্বে কমার্শিয়াল বা বাণিজ্যিক কারণে এর চর্চা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে চারুশিল্প শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিষ্ঠার পর থেকে মাধ্যম হিসেবে ও শিল্পভাষা হিসেবে লিথোগ্রাফি ব্যবহার হয়ে আসছে। প্রথম পর্যায়টিতে উডকাট, এচিং, লেটার প্রেস ও হাফটোনের পাশাপাশি উর্দু পত্রিকা, বই ছাপা, বইয়ের অলংকরণ, সিনেমার পোস্টার, ব্যানার ইত্যাদি ছাপতে এই মাধ্যমটিকে ব্যবহার করা হয়। সংরক্ষণের অভাবে এই লিথোচিত্রগুলো পাওয়া দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ভাগে ১৯৫২ সাল থেকে যখন চারুশিল্পের ক্ষেত্রে লিথোগ্রাফিকে ব্যবহার করা শুরু হচ্ছে, তখনো পাশাপাশি আশির দশকের শেষ দিক পর্যন্ত বাণিজ্যিকভাবে লিথোগ্রাফি চর্চা অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশের মূলধারার শিল্পীরা ও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের যৌথ চেষ্টায় লিথোগ্রাফি আজকে একটি বিশেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রবীণ শিল্পীদের লিথোচিত্রে রয়েছে একধরনের নিজস্ব শৈলীগত পরিপক্বতার ছাপ এবং করণ-কৌশলগত দক্ষতা, পাশাপাশি নবীন শিক্ষার্থীদের লিথোচিত্রে রয়েছে নিজস্ব শৈলীগত ছাপ সৃষ্টির অকাঙ্ক্ষা এবং এর মধ্যে অপার সম্ভাবনা খোঁজার চেষ্টা। এই দুটি প্রজন্মের মিলন ক্ষেত্র সৃষ্টি হতে আবার অনেকটা সময় লেগেছে। করণ-কৌশলগত দিক দিয়ে পঞ্চাশের দশকে লিথোচিত্রগুলো লিথোগ্রাফিক তুষ ক্রোকিল নিবের সাহায্যে অথবা কন্টি দিয়ে অঙ্কিত। কন্টির ব্যবহার আশির দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত চলতে থাকে। লিথোগ্রাফি চিত্রাঙ্কনে কন্টির পাশাপাশি গ্লাসমার্কারের ব্যবহার শুরু হয়ে যায় আশির দশকের প্রথম দিক থেকেই।[141] ফলে চিত্রে গুণাগুণগত কিছু পরিবর্তন আসে। এর পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নানা গ্রেডের গ্লাসমার্কারের উপস্থিতিতে চিত্রতলে সৃষ্টি হয়েছে টোনাল ভেরিয়েশন (বর্ণ ভিন্নতা)। ষাটের দশকে মনোক্রম ও কালার (রঙিন) লিথোগ্রাফির চর্চা আরম্ভ হয়েছে। তার মধ্যে কিছু বইয়ের অলংকরণভিত্তিক

[141] Discusion with Ashok Biswas, 9 April, 2017; Discusion with Syed Abul Barq Alvi, 10 April 2017

চিত্রেরও সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলো গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের শিক্ষার্থীদের দ্বারা অঙ্কিত। ২০০৪ সালের পর থেকে বাংলাদেশে তথা ঢাকা চারুকলার প্রিন্টমেকিং বিভাগে নতুন একটি পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তা হলো বলপয়েন্ট লিথোগ্রাফি। পাশাপাশি উড লিথোগ্রাফির চর্চা সীমিত আকারে হতে থাকে। পরবর্তী ২০১২ সালে অ্যালুমিনিয়াম প্লেট-লিথোগ্রাফির সঙ্গে পরিচিত হয়ে শিক্ষার্থীরা এই মাধ্যমে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিয়োজিত রয়েছে। ২০১৬ সালে ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। ফলে এত সব মাধ্যম ও উপকরণের সমাবেশ ঘটায় চিত্রতল হয়ে উঠেছে ব্যঞ্জনাময় ও আধুনিক। নবীন ও প্রবীণ প্রজন্মের কাজের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে আধুনিকতার সেতুবন্ধন।

ভাষার ক্ষেত্রে ভারতীয় চিত্রকলার ভাষাগত দিকটিই স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের শিল্পীরা গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহ্য হিসেবে পেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, রবি বর্মা, রবীন্দ্রনাথ, শের-গিল প্রমুখের চিত্রশিল্প এবং কলকাতার একাডেমিক চিত্রাঙ্কন ধারা পেয়েছিলেন। প্রবীণ শিল্পীদের মধ্যে জয়নুল আবেদিন থেকে শুরু করে অনেক শিল্পীই লিথোগ্রাফিতে অল্প কিছু কাজ করেছেন। তাদের মধ্যে কারো কারো লিথোগ্রাফি এই মাধ্যমের ভাষার শক্তিমত্তাকে বৃদ্ধি করে আধুনিকতার ছোঁয়া দিলেও বাংলাদেশে একমাত্র মোহাম্মদ কিবরিয়াই উচ্চতর পর্যায়ে পড়াশোনা করার পর লিথোগ্রাফিকে শিল্পভাষা হিসেবে ব্যবহার করে ‘ওয়ানম্যান আর্মি’র মতো বা প্রায় এককভাবে এই মাধ্যমটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আর এই এগিয়ে নিয়েছেন বলেই লিথোগ্রাফিকে নন-অবজেক্টিভিটির সঠিক উপযোগী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। জয়নুল আবেদিন বা অন্য যারা অল্প কিছু লিথোগ্রাফি করেছেন, ভাষার ক্ষেত্রে তাদের যৌক্তিক অবদান রয়েছে। সম্ভাবনাও ছিল, যা পরে আলোচনা করা হবে। আর ১৯৪৮ সালের পর থেকে চিত্র ভাষার ক্ষেত্রে নবীনরা নিজস্ব শিল্পভাষা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে গেছেন। তারা প্রবীণদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আশির দশকে এশিয়ান আর্ট বিয়েনাল থেকে শুরু করে নানাবিধ দেশি-বিদেশি প্রদর্শনী, কর্মশালা ও রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের মাধ্যমেও সমৃদ্ধ হয়ে নানাবিধ নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। মডার্ন ও পোস্টমডার্ন শিল্পে ভূমিকা রাখছেন। উভয়ের সমন্বিত ফলাফলই এ গবেষণায় দৃশ্যমান হবে।

৫.১ চারুশিল্পে লিথোচিত্র

বাংলাদেশের চারুশিল্প চর্চায় বিভিন্ন সময়ে দর্শনগত ও শৈলীগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। দেশ-বিদেশ থেকে প্রশিক্ষিত শিল্পীদের নানামুখী প্রদর্শনী দেখা এবং আধুনিক শিল্পের সঙ্গে যোগাযোগই হচ্ছে এই পরিবর্তনের মূল কারণ। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক লিথোগ্রাফি চর্চার ক্ষেত্রে এর প্রভাবটি পড়েছে ধীর গতিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫২ সাল থেকে), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৩ সাল থেকে) ও চট্টগ্রাম আর্ট কলেজ (১৯৯৬ সাল থেকে)—এই তিনটি প্রতিষ্ঠানে এর চর্চা এখনো চালু রয়েছে। কোনো ব্যক্তিগত স্টুডিও গড়ে ওঠেনি বলে প্রতিষ্ঠিত সব শিল্পী এই বিভাগগুলোতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিলে লিথোগ্রাফি চর্চা করেছেন সীমিত আকারে। দু-একজন ছাড়া প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের বেশির ভাগেরই শিল্পকর্মগুলো সাদা-কালো রঙে অঙ্কিত। মোহাম্মদ কিবরিয়া (১৯২৯ খ্রি.–২০১১ খ্রি.) ছাড়া লিথোগ্রাফি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা খুব অল্পই হয়েছে। সেইসঙ্গে বর্তমান প্রজন্ম এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে কাজ করে যাচ্ছে বলে সৃষ্টি হচ্ছে নানা সম্ভাবনার দুয়ার।

৫.১.১ পঞ্চাশের দশকে লিথোচিত্রের করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক

পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশে লিথোগ্রাফির চর্চা শুরু হয়। প্রবীণদের মধ্যে জয়নুল আবেদিন (১৯১৪ খ্রি.–১৯৭৬ খ্রি.), সফিউদ্দীন আহমেদ কলকাতা আর্ট কলেজে যে লিথোগ্রাফির চর্চা করেছিলেন তার সন্ধান পাওয়া কঠিন। তাই এই দশকে শুধু কামরুল হাসান (১৯২১ খ্রি.–১৯৮৮ খ্রি.), মোহাম্মদ কিবরিয়া ও মুর্তজা বশীর (জ. ১৯৩২) এবং নবীন প্রজন্মের লিথোচিত্রের গুণাগুণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিকটি এই গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৫.১.১.১ তুষ ও ক্রেয়ন আলাদাভাবে ব্যবহার

পঞ্চাশের দশকে নবীন শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রেণিতে বা নিজস্ব উদ্যোগে যেসব লিথোগ্রাফি অঙ্কন করেছিলেন সেগুলোর বেশির ভাগই অনুশীলনধর্মী নিসর্গচিত্র। সবগুলোই সাদা-কালো রঙে আঁকা। চিত্রগুলোতে ব্যবহৃত উপকরণের দিক থেকে লিথোগ্রাফিক তুষ (একধরনের তেলযুক্ত বিশেষ কালি) দিয়ে ক্রোকিল নিবের সাহায্যে এবং কোনো কোনো কাজ শুধু কন্টি মাধ্যমের সাহায্যে অঙ্কিত হয়েছে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিত্রের সময়কাল অনুসারে অঙ্কিত কয়েকজন লিথোগ্রাফি শিল্পী হলেন আলফাজ উদ্দীন, রশিদ, হাশেম খান, সালাউদ্দীন আকবর, ইদ্রিস, সৈয়দ আলী আজম, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, আবু তাহের, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, হাফিজা খাতুন, রফিক প্রমুখ।

এই গবেষণায় প্রাপ্ত বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক চারুশিল্পে লিথোগ্রাফি চর্চার ক্ষেত্রে প্রথম দিককার লিথোগ্রাফিগুলোর মধ্যে সংগৃহীত সবচেয়ে পুরাতন লিথোগ্রাফিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রিন্টমেকিং বিভাগে সংগৃহীত রয়েছে। সন-তারিখ অনুযায়ী এই প্রথম লিথোগ্রাফিটি ১৯৫২ সালের ১১ নভেম্বরে আঁকা। শিল্পীর নামটি স্বাক্ষর দেখে উদ্ধার করা কষ্টকর বিষয়। (চিত্র.৫.১) তবে কামরুল হাসানের কলকাতা গভর্মেন্ট আর্ট কলেজ থেকে প্রাপ্ত এর পূর্বের সময়কার আরো দুটি লিথোচিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। বর্তমান চিত্রটি লিথোগ্রাফিক ইঙ্ক (একধরনের তেলযুক্ত বিশেষ কালি) দিয়ে ক্রোকিল নিবের সাহায্যে লিথো পাথরে বাস্তবানুগ ভঙ্গিতে অঙ্কন করা হয়েছে। সম্ভবত বাজার থেকে সংগ্রহ করা লিথোগ্রাফিক ইঙ্ক (একধরনের তেলযুক্ত বিশেষ কালি) দিয়েই কাজটি করা হয়েছিল। ভারত থেকে আনা কিউব আকৃতির লিথোগ্রাফিক ইঙ্ক গুলিয়েও এ ধরনের কালি তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু ব্যবহারের সুবিধার্থে তৈরি তরল ইঙ্কই উর্দু পত্রিকাগুলো ছাপতে ব্যবহৃত হতো। ছবিটিতে নদীর ঘাট থেকে ওপারে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। ঘাটে শস্যবোঝাই একটি নৌকা এবং পাশে একটি খালি নৌকা রাখা আছে। আলোর উৎস হচ্ছে বিষয়বস্তুর বিপরীত দিক থেকে নেওয়া। এ ধরনের বেশির ভাগ লিথোগ্রাফি চিত্রে দৃশ্যশিল্পের গুণাগুণের থেকে পিকটোরিয়াল ডকুমেন্টেশন গুণটির উপস্থিতি বেশি মনে হয়। যেখানে আলোছায়ার বিষয়টি মুখ্য মনে হয় না। দেখলে সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন যে—কোন দিক থেকে আলো আসছে।

Plate: 5.1, Unknown Artist, Lithography, Drawing the image with tusch by Crow Quill nibs or pen, 9-11-1952, 10x13 inch, এখনো পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক প্রথম দিককার লিথোচিত্র, Collection- F.F.A, D.U

১৯৫২ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ক্রোকিল নিব দিয়ে এ ধরনের লিথোগ্রাফি চিত্র আঁকা হয়েছে। তার মধ্যে ১৯৫২–১৯৫৩ সালে বেশি অঙ্কিত হয়েছে। ১৯৫৮ সালের পর এই ক্রোকিল নিব দিয়ে আঁকা লিথোগ্রাফি আর খুব একটা অঙ্কন করতে দেখা যায়নি। সেইসঙ্গে কন্টি মাধ্যমে ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে লিথোচিত্র অঙ্কন করা হলেও ষাটের দশকের শেষ অবধি পর্যন্ত কিছুটা ব্যবহৃত হয়েছে। আর এই দশকে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চর্চার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া জাপানে গিয়ে লিথোগ্রাফির তুষ মাধ্যম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করেন। ফলে চিত্রতলে বৈচিত্র্যময়তা আসা শুরু করেছিল এবং ছবির ভাষাগত দিকটি নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে একটি সঠিক দিকনির্দেশনা পেতে থাকে।

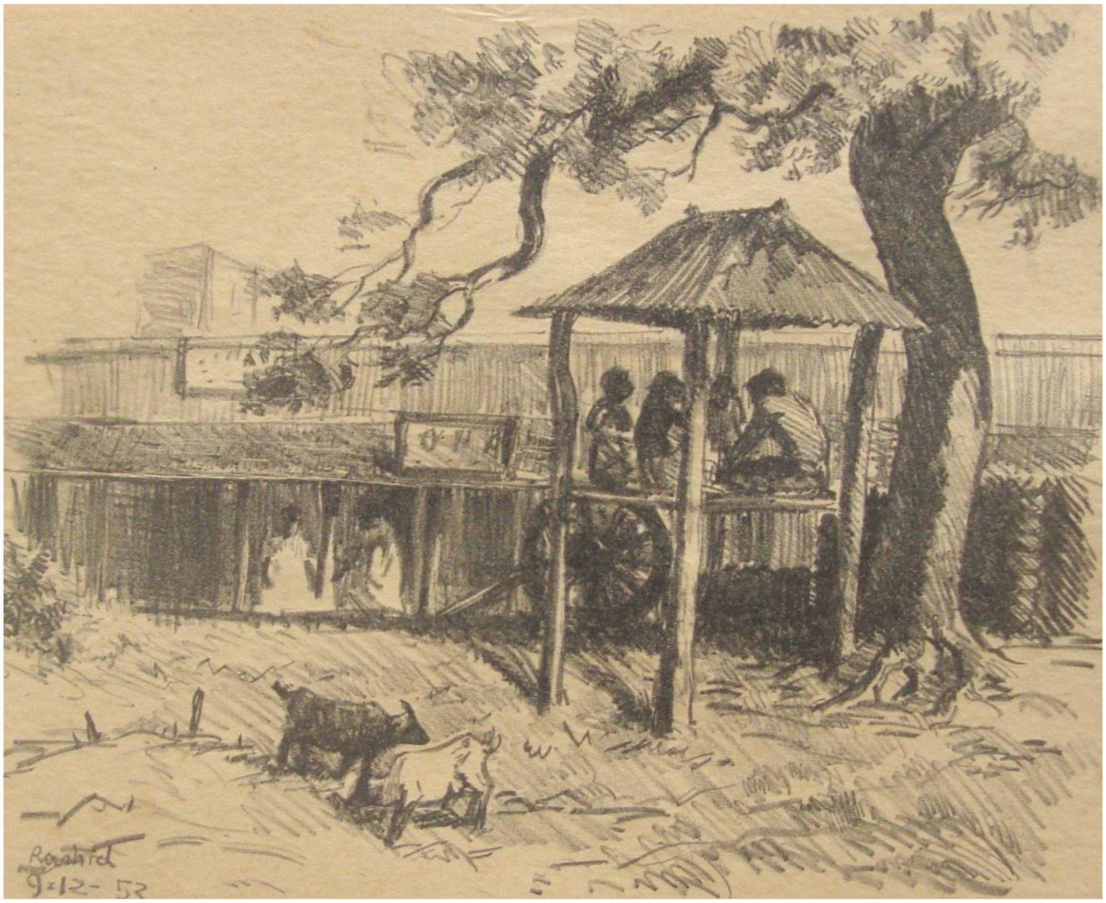

Plate: 5.2, Rashid, Lithography (Drawing with Crayon), 9-12-1952, 26x36 cm, Collection- F.F.A, D.U

৫.১.১.২ ক্রেয়ন বা কন্টি দিয়ে অঙ্কিত লিথোচিত্র

শিল্পী রশিদের ৯-১২-১৯৫২ সালে অঙ্কিত লিথোগ্রাফিটি (চিত্র. ৫.২) পঞ্চাশের দশকের অন্যতম শক্তিশালী চিত্র হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। ল্যান্ডস্কেপ লিথোচিত্রটিতে একটি উঁচু ছাউনিযুক্ত মাচার নিচে কয়েকজন লোক আড্ডারত অবস্থায় রয়েছে। পাশে রয়েছে একটি বয়স্ক গাছ। সামনের দিকে ঘাসের ওপর একটি সাদা ও একটি কালো ছাগল ঘাস খাচ্ছে। পেছন দিকে আরেকটি লম্বা ছাদের নিচে দুটি মানব অবয়বে যে আলোছায়া পড়েছে সেটা অত্যন্ত দক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। সব মিলিয়ে ছবিটির কম্পোজিশন, আলোছায়া, টোন দেওয়া এবং কন্টি বা ক্রেয়ন চালানোর স্বতঃস্ফূর্ত সমন্বিত ফলাফলকে একজন সফল শিল্পী হিসেবে কেউ বলতে পারবে না যে কাজটি দুর্বল বা মানোন্নীত হয়নি। বরং বলা যেতে পারে—পঞ্চাশের দশকের কাজগুলোর মধ্যে তিনটি টোনে এত সহজ-সরলভাবে অঙ্কিত চিত্রটি চোখে পড়ার মতো একটি লিথোচিত্র। শৈলীগত দিক বলতে গেলে বাস্তবধর্মী শৈলীই অবলম্বন করা হয়েছে।

তবে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে বলা যায় যে, অন্তত এই বিভাগ ও বিভাগবহির্ভূত সংগ্রহে পঞ্চাশের দশকে কোনো কালার লিথোগ্রাফির চর্চা হয়নি। এ পর্যন্ত এই দশকের চারুশিল্পের চর্চায় লিথোগ্রাফিতে আজ পর্যন্ত কোনো রঙিন লিথোচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৫.১.২ পঞ্চাশের দশকে লিথোচিত্রের ভাষাগত দিক

এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চর্চা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভাষাগত দিক দিয়ে বিভিন্ন ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে যতটা না এগিয়েছে, কামরুল হাসান তার থেকে বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন ১৯৫৮ সালে অঙ্কিত 'আফটার বাথ' লিথোচিত্রের মাধ্যমে। বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত ছয়টি লিথোগ্রাফি চিত্রের মধ্যে তার উপরোক্ত একটি এবং মুর্তজা বশীরের তিনটি লিথোচিত্রের মধ্যে একটির করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত দিক নিয়ে এখানে আলোচনা করা হলো। অন্যদিকে মোহাম্মদ কিবরিয়া জাপানে লিথোগ্রাফি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ আরম্ভ করে দিয়েছেন। তার 'ফুল হাতে বালক' লিথোচিত্রটি এই সময়ের করণ-কৌশলগত ও ভবিষ্যৎ ভাষাগত দিকনির্দেশনার আরম্ভ বলা যায়। নিম্নে তাদের লিথোচিত্র নিয়ে গবেষণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আলোচনা করা হলো।

৫.১.২.১ কামরুল হাসানের 'আফটার বাথ' (১৯৫৮) লিথোচিত্র

কামরুল হাসানের একটি উল্লেখযোগ্য লিথোগ্রাফি চিত্র হলো আফটার বাথ, যা ১৯৫৮ সালে লিথোগ্রাফি স্টোনে অঙ্কিত হয়েছে। (চিত্র. ৫.৩) তার নারী চিত্রে আবহমান বাংলাদেশ প্রতীয়মান। নারী ও নিসর্গ একাত্ম হয়েছে। বিবৃত হয়েছে কখনো কন্যা, জায়া ও জননীরূপে। কামরুল হাসানের চিত্রে নারী বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পেতে থাকে পঞ্চাশের দশক থেকে। পনেরো বছর বয়সে জননীকে হারিয়ে (১৯৩৬) আমৃত্যু মায়ের স্মৃতিতে আবেগপ্রবণ ও কাতর থেকেছেন।[১৪২]পরিণয়সূত্রে (১৯৫৯) আবদ্ধ হওয়ার কয়েক বছর আগেই প্রণয় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল; যে সম্পর্কটি ছিল অতিমাত্রায় আবেগদীপ্ত, উত্তেজনাময় ও বৈচিত্র্য ব্যঞ্জকতার প্রতিফলন ঘটেছে। বিশেষভাবে উল্লেখিত আফটার বাথ, স্নান (লিথোগ্রাফি, ১৯৫৮), জলকেলি ও স্নান (১৯৬৬) এই তিনটি চিত্রেই নগ্ন নারীদেহের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পর্বে নারীর দেহসৌন্দর্য ভিন্ন মাত্রা নিয়ে তার ছবিতে এসেছে বোঝা যাচ্ছে। এই নারী অবয়বটি গোসলের পর একটু নুয়ে চুল থেকে পানি চিপে ফেলছে।

Plate: 5.3, Quamrul Hasan, After Bath, litho,75x54cm, 1958,

Plate: 5.4, (Close Detail Picture)

৫.১.২.২ 'আফটার বাথ' লিথোচিত্রের করণ-কৌশলগত দিক পর্যালোচনা (চিত্র.৫.৩)

ছবিটিতে ডান দিকে নিচে কর্নারের অংশে স্টোনের ভাঙা অংশের ছাপ স্পষ্টই জানান দেয় যে এটি পাথরে অঙ্কন করা। ছবিটি সম্ভবত তুষ গুলিয়ে নিয়ে তুলির সাহায্যে এঁকে স্ক্র্যাচ করে অঙ্কন করা অথবা কন্টি দিয়ে অঙ্কিত জড়ানো ইমেজকে ব্লেড দিয়ে স্ক্র্যাচ করে ইমেজ সৃষ্টি করা। কারণ এ ধরনের ফ্লাট রঙের

---

142 সৈয়দ আজিজুল হক, "কামরুল হাসানঃ জীবন ও কর্ম (ঢাকা, ১৯৯৮)", বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, পৃ. ৭

ইমেজ থেকে লিথোগ্রাফিতে কয়েকটি উপায়ে ইমেজ সৃষ্টি করা যায়। এক. লিথোগ্রাফিক তুষ গুলিয়ে তুলির সাহায্যে ফ্লাট ইমেজ অঙ্কন করা হয়। এরপর স্ক্র্যাচিং পদ্ধতিতে স্ক্র্যাচ করে ইমেজটিকে পরিবর্তন করে এচিং করার পর প্রিন্ট নেওয়া হয়। দুই. পুরো অঙ্কিত ইমেজ অংশকে প্রিন্ট নেওয়ার পর ফ্লাট ইমেজে পরিণত করা। এরপর স্ক্র্যাচিং পদ্ধতিতে স্ক্র্যাচ করে ইমেজটিকে পরিবর্তন করে এচিং করার পর প্রিন্ট নেওয়া হয়। এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটির সম্ভাবনা এই চিত্রের ক্ষেত্রে খুবই ক্ষীণ। তিন. সরু তুলিতে এরাবিক গাম লাগিয়ে পরিষ্কার স্টোনের ওপর টোন সৃষ্টি করে অন্য একটি উপায়ে (যাকে গাম রেজিস্ট প্রিন্টও বলা হয়) তার ওপর প্রেস ইঙ্ক দিয়ে রোল করা এবং পুরো স্টোন ফ্লাট হয়ে এলে স্পঞ্জ দিয়ে পানি স্টোনে ছিটিয়ে বারবার রোল করতে থাকলে একসময় গামের অংশের থেকে ইঙ্ক উঠে আসবে। এরপর এচিং করে প্রিন্ট নিলে এরূপ প্রিন্ট পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু এই ছবিটিতে যে ৩ নম্বর পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়নি, সে বিষয়টি স্পষ্ট। এ বিষয়ে একটু আলোচনা করা ভালো। জয়নুল আবেদিনের লিথোগ্রাফিটিতে যেমন চারিপার্শ্বে একটি বোল্ড লাইন দিয়ে প্রতিকৃতিকে আবদ্ধ করা হয়েছে, এখানে কামরুল হাসানও অবয়বের পেছনের দিকে ব্যাকগ্রাউন্ডে পুরো স্পেসকে কালো করে দিয়েছেন। এরপর স্ক্র্যাচ পদ্ধতিতে ব্লেড দিয়ে স্ক্যাচ করে এরূপ ব্ল্যাক লাইন সৃষ্টি করেছেন অনেকটা ফভ শিল্পীদের লাইন সৃষ্টি করার মতো করে। ফভ শিল্পীরা কোনো একটি ফ্লাট রঙের ওপর দুই পাশে দুটি কালার দিয়ে মাঝখান থেকে লাইন সৃষ্টি করতেন। আরেকটি বিষয় হলো, এই চিত্রটিতে স্ক্র্যাচগুলোর সাদা লাইনসমূহ স্পষ্ট নয়। প্রিন্ট নেওয়ার সময় একটু জড়িয়ে এসেছে। ফলে লাইনটি যতটা স্পষ্টভাবে স্ক্র্যাচ করা হয়েছিল ততটা স্পষ্ট আসেনি। কারণ এটি লিথোগ্রাফির স্ক্র্যাচিং পদ্ধতির একটি চারিত্রিক সীমাবদ্ধতা ও গুণও বলা যায়। স্ট্রং এচিং করলে কিছুটা স্পষ্ট হবে, কিন্তু পুরো সাদা লাইন পেতে গেলে ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একমাত্র গামিং পদ্ধতিতে (৩ নম্বর পদ্ধতি) তৈরি ইমেজকে পরবর্তী সময়ে এচিং করে প্রিন্ট নিলে পরিষ্কার সাদা লাইনের অসংখ্য টোন পাওয়া যেত। তাই বলা যায়, এটি গামিং পদ্ধতিতে নয়, অঙ্কন কওে তার উপর স্ক্র্যাচিং পদ্ধতিতে অঙ্কিত হয়েছে। সেইসঙ্গে অবয়বকে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আলাদা করেছেন। ফভিস্টরা যেমন অনেক সময় লাইন না অঙ্কন করে কালো পরিতলের দুই পাশে দুটি ফ্লাট রং দিয়ে মধ্যবর্তী স্থান থেকে লাইন সৃষ্টি করেছেন। এখানেও কামরুল হাসান ফিগারের চারপাশে স্ক্র্যাচ করে ফর্মকে আলাদা করেছেন। অন্যদিকে স্ক্র্যাচিংয়ের ফলে সৃষ্ট এর গ্রাফিক গুণটির কারণে লিথোগ্রাফিটির অবয়বের দিকে দৃষ্টি দিতে সাহায্য করছে। এই গেল এর কারগরি দিক।

৫.১.২.৩ 'আফটার বাথ' লিথোচিত্রের শৈলীগত ও ভাষাগত দিক পর্যালোচনা

লোক ঐতিহ্য ও আধুনিকতা তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্পাদর্শ ও শিল্পরীতির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে কামরুল হাসানের শিল্পকর্মে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চীনা শিল্পশৈলীর অনুপ্রবেশ করে শিল্পকর্মে ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছে। সত্তার গভীর মূল থেকে আবির্ভূত রূপের অন্বেষণ করার ইচ্ছা আমৃত্যু তার মধ্যে সক্রিয় ছিল (বা কাজ করেছে)। ফলে নারীর রূপ ও ভঙ্গিকে তিনি অক্লান্তভাবে চিত্রিত করে গেছেন। বর্তমান এই লিথোচিত্রটির শৈলীগত দিক পর্যালোচনা করে বলা যায়—চিত্রটিতে লোককলার রেখা ও ফর্মের সঙ্গে কিউবিস্ট রীতির সমন্বয় ঘটানোর যে সফলতা তিনি পরবর্তী সময়ে অর্জন করেন, তার প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে এই চিত্রটি গুরুত্বের দাবি রাখে। কারণ এর পূর্বে তিনি এ ধরনের কাজ করেননি বললেই চলে। নানা ধরনের নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়াই ছিল তার শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য। এই নিরীক্ষাধর্মিতা যেমন একদিক থেকে নানা মাধ্যমের বৈচিত্র্য অনুধাবনে তাকে অনুপ্রাণিত করে তুলতে সাহায্য করেছে, তেমনি অন্যদিকে শিল্পের বহুমাত্রিক বৈচিত্র্যময় ভাষা আয়ত্ত করার কাজটিও তার জন্য সহজতর হয়েছে। মূলত নানাবিধ নিরীক্ষামূলক আগ্রহের কারণে ভাষা ব্যাপ্তির প্রয়োজনে, সারা জীবন শুধু লিথোগ্রাফি নিয়ে শিল্পকর্ম রচনা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে লিথোগ্রাফিতে অল্প কাজ করলেও বাংলাদেশের এই লিথোগ্রাফির মাধ্যমে আধুনিক শিল্পধারাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে এর ভাষাগত দিকটিকে আধুনিকতার আঙ্গিকে পৌঁছে দেওয়ার কাজটি করেছিলেন অনায়াসেই।

৫.১.২.৪ 'ফুল হাতে বালক' লিথোচিত্রের করণ-কৌশলগত, শৈলীগত ও ভাষাগত দিক পর্যালোচনা

পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে ১৯৫৯ সালে মোহাম্মদ কিবরিয়া জাপানে কাজু ওয়াকিতার (Kazu Wakita) তত্ত্বাবধানে লিথোগ্রাফি অনুশীলন করার সময় লিথোর তুষ ওয়াশ দ্বারা অকৃষ্ট হন (চিত্র. ৫.৬, ৫.৭)। 'ফুল হাতে বালক' (১৯৫৯) লিথোচিত্রটি তেমনই একটি স্টোন লিথোগ্রাফি। অবয়বধর্মী লিথোগ্রাফি হিসেবেও এর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। জাপানে যাওয়ার পূর্বে শিল্পী অনেকটা কিউবিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চিত্র রচনা করেছিলেন। যেমন: জলকেলি (তেলরং, ১৯৫৩), পূর্ণিমা (তেলরং, ১৯৫৭) ইত্যাদি ছবির শৈলীগত কিউবিস্টিক দিকটিরই ধারাবাহিকতা বলা যায়। তবে এই চিত্রে এর প্রভাবও কমে এসেছে। কারণ ছবিটিতে অবয়ব বাদে বাকি পশ্চাৎপটে কিউবিক শৈলীর কোনো প্রভাব পড়েনি। শুধু অবয়বেই তা অনুসৃত হয়েছে, অ্যানালিটিক্যালভাবে অনেক তলে নয়। এখানেই তার সঙ্গে কিউবিস্টিদের পার্থক্য হলো—কিউবিস্টদের বিশ্বাস ছিল এরূপ এক হাজার তল প্রয়োগের মাধ্যমেও একটি বস্তুর সম্ভাব্য

বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা যায়, তাও সম্পূর্ণ বাস্তবতাকে নয়। ছবিটির সঙ্গে পিকাসোর ১৯১০ সালের দিকে অঙ্কিত একটি অবয়বের সঙ্গে মিল খুঁজে দেখা যেতে পারে, যেখানে একটি অবয়ব কিছুটা কিউবিস্টিক বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু তার পেছনে পরিতলগুলো সম্পূর্ণ বিমূর্ত আঙ্গিকে বিন্যস্ত হয়েছিল (চিত্র. ৫.৫)। কিবরিয়া সম্ভবত এরূপ কোনো তল সৃষ্টি করতে চাননি, অন্তত এই ছবিতে, শুধু চেয়েছিলেন তুষের ওয়াশের মাধ্যমে তার গুণকে শিল্প মাত্রা দিতে। ফলে পরিতলটি হয়ে ওঠে কিউবিস্টিক ও নন-অবজেক্টিভ পরিতলের সমন্বিত প্রয়াস। কিবরিয়ার এই সময়ের ছবিগুলো কিউবিস্টিক রীতি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এ ছবিটিও আধুনিক শিল্পধারার শৈলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

Plate: 5.5, Picasso, 1910, Portrait of Daniel-Henry Kahnweiler.

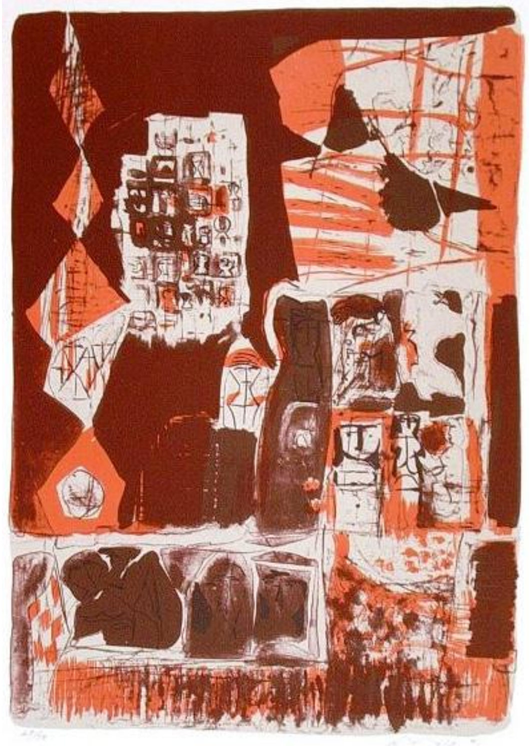

Plate: 5.6, Wakita Kazu, Lithograph,People living in the Neighborhood, 1974, 50x35 cm

ফুল হাতে বালক ছবিটির কম্পোজিশনে রয়েছে কয়েকটি উলম্ব ভাগ—কালো, তারপর সাদা, আবার কালো, আবার সাদা এবং শেষে কালো রঙের প্রভাব। তবে সাদা ও কালো উভয় অংশের মধ্যেও রয়েছে খুবই সংবেদনশীল কিছু তুষ ওয়াশের কাজ। এই লিথোচিত্রটি অঙ্কন করতে গিয়ে শিল্পী কিছু অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। আর তা হলো ছবিটিতে বালকের অবয়ব তার পশ্চাৎ পটের তুষের কাজ অপেক্ষা বেশি

Plate: 5.7, Mohammad kibria, lithography, Boy with flowers, 1959, 46x60 cm

গুরুত্বপূর্ণ হয়ে চিত্রে ফুটে উঠেছে। কিন্তু তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ছবির সাবজেক্টিভ তল থেকে নন-অবজেক্টিভ তলে চলে যাওয়া। এই অর্থে তিনি এই চিত্রে সফল হতে না পারলেও পরবর্তী চিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে প্রথমে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এবং পরে নন-অবজেক্টিভ শিল্পধারায় যাওয়ার এই উদ্দেশ্য সার্থকভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

৫.১.২.৫ 'আত্মপ্রতিকৃতি' লিথোচিত্রের করণ-কৌশলগত, শৈলীগত ও ভাষাগত দিক পর্যালোচনা

শিল্পী মুর্তজা বশীরের 'আত্মপ্রতিকৃতি' লিথোচিত্রটি ১৯৫৯ সালে অঙ্কিত হয়েছে (চিত্র.৫.৮)। ফয়েজ আহমেদের (উর্দু কবি ও শিল্পরসিক) আমন্ত্রণে প্রস্তুতি নিয়ে ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তান আর্টস কাউন্সিল লাহোরের 'আল-হামরায়' তার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীটির নাম ছিল 'পেইন্টিংস, ড্রইং অ্যান্ড লিথোগ্রাফস বাই মুর্তজা বশীর'। সেখানে ছয়টি লিথোগ্রাফি ছিল। এগুলো ১৯৫৯ সালে জয়নুল আবেদিনের উপদেশে ঢাকা চারুকলায় বিদ্যায়তনে গিয়ে এঁকেছিলেন। তার মধ্যে আত্মপ্রতিকৃতি ও মাছ লিথোগ্রাফি দুটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রিন্টমেকিং বিভাগে প্রিন্ট নেওয়া। চিত্রটিতে প্রথম ইম্প্রেশনে অন্য একটি লিথো স্টোনে একটি বাদামি রঙের ফ্লাট কালারের প্রিন্ট নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় আরেক স্টোনে তুষ দিয়ে একটি ইমেজ তৈরি করা হয়েছে। সেখানে তুথ ব্রাশ বা যেকোনো ব্রাশ দিয়ে স্প্যাটার পদ্ধতিতে অবয়বটির চারদিকে তুষ ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। চিত্রটিতে শুধু নাকের ড্রইং দেখে কিউবিস্টিক কাজের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তবে শিল্পী ফ্লোরেন্সে থাকা অবস্থায় তার ছবির আঙ্গিক বা বিন্যাসকে তিনি 'ট্রান্সপারেন্সিজম'[১৪৩] বলে আখ্যায়িত করেন। অর্থাৎ তার মতে, ছবিতে তল বা আঙ্গিক বলে কিছু নেই। কিউবিজমে একেক অ্যাঙ্গেল থেকে একেকটি ট্রান্সপারেন্ট শিটে ছবি এঁকে সেগুলোকে একসঙ্গে করে একটি তলে বিন্যস্ত করাকে অ্যানালিটিক্যাল কিউবিজম বলা হয়। আর মুর্তজা বশীর একটি অ্যাঙ্গেল থেকে দেখে প্রথমে ফিগার বা অবয়বকে এঁকেছেন এবং তার পারিপার্শ্বিকতাকে অঙ্কন করেন। সেইসঙ্গে এই সামনের বস্তুটির প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে তার ফর্মের গায়ে রং প্রয়োগ করেন এবং প্যালেট নাইফ দিয়ে ফর্মটির লাইন অঙ্কন করেন। এরপর তার পেছনে ধরা যাক একটি টেবিল আছে—সেই টেবিল ও তার পারিপার্শ্বিকতাকেও একই রূপে তিনি অঙ্কন করেছেন। এভাবে শেষ লেয়ারের ফর্মটিও অঙ্কন করেন। এই কয়েকটি ধাপের সমন্বয়ে ছবিটি অঙ্কিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে তিনি 'ট্রান্সপারেন্সিজম' নামকরণ করেন।

---

[143] Hasnat Abdul Hye, *Murtaja Baseer*, Art of Bangladesh *series-11*, Bagladesh Shilpakala Academy, 2004, pp. 30

ট্রান্সপারেন্সিজম': মুর্তজা বশীর ফ্লোরেন্সের ছাত্রজীবনের মাঝামাঝি অর্থাৎ এক বছর পর ছবির তল বা আঙ্গিক বা পটভূমি সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে আসেন। তা হলো ছবিতে পটভূমি বলতে কিছু নেই। ছবির বিষয়ের প্রতিটি অংশই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। পৃথক করে দেখার জন্য এই মায়ার সৃষ্টি হয়, যার জন্য কোনো কোনো বস্তু বা দৃশ্য পেছনে, কোনোটি মাঝখানে আর কোনোটি সামনে হয়। তিনি এই ধারণার ভিত্তিতে তৈরি আঙ্গিক বা বিন্যাস ব্যবহার করে ফিগারের ভেতর আঁকলেন টেবিল, তারপর চেয়ার, দেয়াল আর সব শেষে পর্দা। প্রতিটি ফর্মের জন্যই তিনি ব্যবহার করলেন তাদের প্রাসঙ্গিক রং, আর প্যালেট নাইফ দিয়ে এই ফর্মের লাইন স্পষ্ট করে তুললেন। এভাবে কম্পোজিশনে ও ভেতর স্পেসের বিভাজন (ইন্টারসেকশন) হয়ে যেত। এরপর তিনি দেখলেন, প্যালেট নাইফ দিয়ে লাইন এঁকে স্পেস বিভাজন না করে যদি আলোছায়া ব্যবহার করা হয় তাহলে একই ইফেক্ট সৃষ্টি করা যায়। তার এই আঙ্গিকে আঁকা ছবিকেই মনে হয়েছে এটি কিউবিস্ট ধারার অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ এই আঙ্গিককে বা বিন্যাসকে 'নিউ কাইন্ড অব কিউবিজম' বলেছেন।

এভাবে ফর্ম বাদে ছবির স্পেস নিয়ে অথবা স্পেস ও ফর্ম—এ দুটোর সমন্বয়েও ছবি আঁকা সম্ভব। এখানে পার্থক্য হলো কিউবিস্টরা বস্তুর সম্ভাব্য রিয়ালিটি বা বাস্তবতা আবিষ্কারে এরূপ নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। আর মুর্তজা বশীর ট্রান্সপারেন্সিজমের মাধ্যমে চিত্র অঙ্কন করে বাংলাদেশের শিল্পকলাকে যেমন কিউবিজম থেকে একটু ভিন্নভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তেমনি এ পদ্ধতির আভাসে সৃষ্ট লিথোগ্রাফি প্রয়োগের মাধ্যমে আধুনিক শিল্পধারা থেকে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির শিল্পভাষাকে বিশ্ব দরবারে একটু আলাদা করেই চিহ্নিত করতে পারা যেত যদি তিনি এই পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে আরো বেশ কিছু লিথোচিত্র অঙ্কন করে যেতেন।

Plate: 5.8, Murtaja Baseer, Self Portrait, Lithography, 1959, 51x36 cm, Collection-F.F.A, D.U.

৫.১.৩ ষাটের দশকে লিথোচিত্রের করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক

মূলত এই দশকেই বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি অনুশীলনের দিকনির্দেশক অন্যতম শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া উচ্চতর পর্যায়ে পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফেরেন। তিনি বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত দিক নিয়ে একাই যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তা সহজেই দৃষ্টি কাড়ে এবং সেটাই এই দশকের লিথোগ্রাফির করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণিত হবে। কিবরিয়াকে বাংলাদেশে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ও নন-অবজেক্টিভ আর্টের অগ্রপথিক বলা হয় বলে লিথোগ্রাফিও তার সৃষ্ট শিল্পকর্মের মাধ্যমে

সম উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে। আর করণ-কৌশলের দিক থেকে লিথোগ্রাফির তুষকে পরবর্তী সময়ে এচিং মাধ্যমে ব্যবহার করে বাংলাদেশের ইন্টাগলিও মাধ্যমেরও উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ অবদান রাখতে পেরেছেন। মোহাম্মদ কিবরিয়ার ষাটের দশকের লিথোগ্রাফি চিত্রের করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত দিক নিয়ে পর্যালোচনা করা হলো।

৫.১.৩.১ 'দুই ফুল' লিথোচিত্রের করণ-কৌশলগত, শৈলীগত ও ভাষাগত দিক পর্যালোচনা

১৯৬০ সালের 'দুই ফুল' নামক চিত্রটিতে দুটি ফুলকে অ্যাবস্ট্র্যাক্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।(চিত্র. ৫.৯) একটি ওপরে এবং আরেকটি নিচে রেখে কম্পোজিশনটি করা হয়েছে। হঠাৎ দেখলে কোনো একটি গোল ফর্মের ওপর সাদা রঙের কিছুটা স্বচ্ছ, কিছুটা অস্বচ্ছ হালকা গোলাপি রঙের প্রলেপ দিয়ে কোনো ফর্মকে বের করে আনা মনে হতে পারে। ছবিটি লিথোগ্রাফি মাধ্যমে করা। প্রথম ইম্প্রেশনে কালো রঙের তুষের ওয়াশ দিয়ে ইমেজ অঙ্কন করে প্রিন্ট নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী ইম্প্রেশনে কিছু অংশে তুষ দিয়ে ওয়াশ দিয়ে বাকি অংশে ফ্লাটিং পদ্ধতিতে ফ্লাট ইমেজ সৃষ্টি করে প্রিন্ট নেওয়া হয়েছে। এই জাপানের পর্বে টোকিও ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব ফাইন আর্টস ও মিউজিক থেকে তাকেশি হায়াশির (Takeshi Hayashi) তত্ত্বাবধানে পেইন্টিং, কোমাই তেৎস্যুরুর (Tetsuro Komai) তত্ত্বাবধানে এচিং, কাজু ওয়াকিতার (Kazu Wakita) তত্ত্বাবধানে লিথোগ্রাফি এবং হিদেয়ো হাগিওরার[১৪৪] (Hideo Hagiwara, 1913-2007) তত্ত্বাবধানে উডকাট অনুশীলন করে **১৯৫৯–১৯৬২** সাল পর্যন্ত উচ্চতর পর্যায়ে গবেষণা করেছেন। জাপানে শুরুর দিকে শিল্পী কিবরিয়া তার পূর্বের রীতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে 'ফুল হাত বালকে'র মতো সাবজেক্টিভ কাজ করেছেন। আসলে তিনি কাজু ওয়াকিতার লিথোগ্রাফির ওয়াশ পদ্ধতি থেকে উৎসাহিত হয়ে কাজ করতে চেয়েছিলেন। ওয়াকিতার কাজের তুষের ইফেক্টগুলো তার

[144]. Hideo Hagiwara : (1913-2007) হিদেও হাগিওয়ারার তত্ত্বাবধানে কাজ করার বিশেষ সুযোগটি করে দিয়েছিল জাপানিজ মিনিস্ট্রি অব এডুকেশন। বাবার পুলিশি চাকরির সুবাদে হাগিওয়ারা প্রথম জীবনে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত কোরিয়াতে বড় হন। দেশে ফিরে টোকিও স্কুল অব ফাইন আর্টসে মিমিনো উসাবুরোর (১৮৯১–১৯৭৪) তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করেন। হাগিওয়ারাও জীবনের প্রথম ২০ বছর পেইন্টার হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৩৮ সালে টোকিও স্কুল অব আর্ট থেকে পেইন্টিংয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন। যক্ষ্মা রোগ থেকে আরোগ্য লাভের পর তিনি উডকাট প্রিন্টকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন ১৯৫৫-১৯৫৫ সালে। এর পূর্ব পর্যন্ত তাকামিজাওয়া উডকাট কম্পানিতে উকিয়ো-ই (ukiyo-e) কপি করার জন্য কর্মরত ছিলেন। ট্র্যাডিশনাল উডব্লকের সঙ্গে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট অভিব্যক্তির সমন্বয় করেন। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে অন্যতম সফল ও আন্তর্জাতিক ছাপচিত্র শিল্পী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেই সময়ের শিল্পীদের জন্য উদাহরণস্বরূপ হয়ে দাঁড়ালেন তার দৃঢ়চিত্তে নতুন চিন্তাগত খোঁজ বা গবেষণা, অ্যাবস্ট্র্যাকশনকে গুরুত্বারোপ করা ও বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টমেকিং টেকনিকের মিশ্রণের মাধ্যমে। কিবরিয়াকে হিদেয়ো হাগিওয়ারার তত্ত্বাবধানে কাজ করার বিশেষ সুযোগটি করে দিয়েছিল জাপানিজ মিনিস্ট্রি অব এডুকেশন।
https://www.artelino.com/articles/hagiwara-hideo.asp;
http://www.myjapanesehanga.com/home/artists/hideo-hagiwara-1913---2007-

ভালো লেগেছিল। কিন্তু ওয়াকিতার যেমন পাখির ফর্মকে মুখ্য করে অ্যাবস্ট্রাকশনে যাওয়ার চেষ্ট করেছেন, কিবরিয়া সেখানে তাঁর ছবিকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে নন-অবজেক্টিভ দিকে যাত্রায় আগ্রহী ছিলেন। ফলে কাজ করতে গিয়ে তিনি দেখলেন টেক্সচারের বুনোটগুলো ফর্মের ভিড়ে গৌণ হয়ে যাচ্ছে। তাই এ সময়ের পর থেকে তিনি টেক্সচারকে কাজে লাগিয়ে সরাসরি নন-অবজেক্টিভ কাজের দিকে চলে গেলেন। ১৯৬০ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত দুই ফুল (১৯৬০ সাল), কম্পোজিশন: কালো হলুদ (১৯৬২ সাল), কম্পোজিশন (১৯৬৩ সাল), লাল, কালো ও সাদা (১৯৬৬ সাল), সবুজ ও কালো (১৯৬৬ সাল), কালো ও ধূসর (১৯৬৬ সাল), বাদামি (১৯৬৮ সাল), কালো ও ধূসর (১৯৬৮ সাল) ইত্যাদিসহ চিড়-২ (১৯৮৮ সাল) নামক লিথোগ্রাফিগুলোতে সে বিষয়টি স্পষ্ট লক্ষণীয়। এ সময়ে দু-একটি লিথোগ্রাফি একটু ভিন্ন শৈলীর ছিল। যেমন: বর্ণমালা নামক ১৯৬৫ সালে অঙ্কিত লিথোগ্রাফিটিতে ক্যালিগ্রাফি ধরনের ফর্মকে বিষয়বস্তু হিসেবে নিয়ে কাজ করেছেন। এরপর প্রিন্ট ও পেইন্টিংয়ে এই নন-অবজেক্টিভ কাজের প্রভাব দেখা যায় ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত।

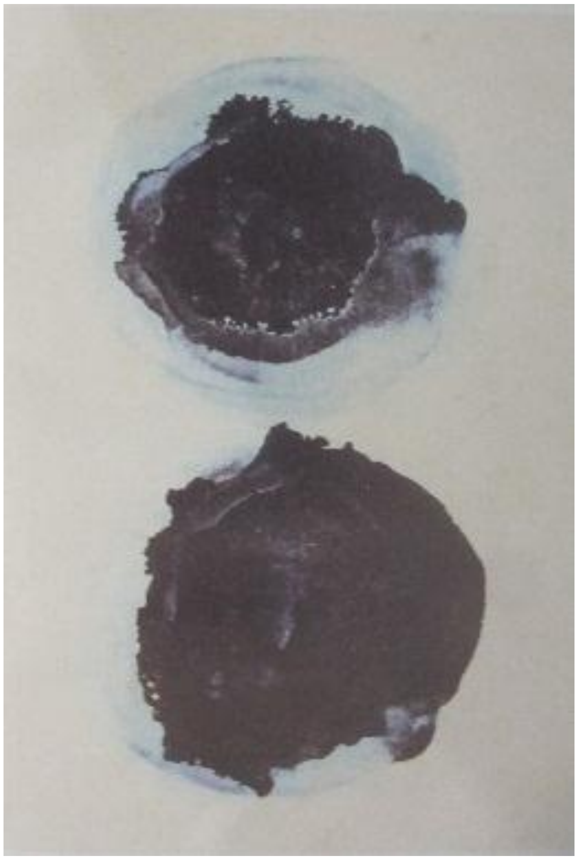

Plate: 5.9, Mohammad Kibria, Lithography, Two flowers, 1960, 46 x 60 cm.

শৈলীগত বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এ সময় তিনি তার পূর্ববর্তী কিউবিস্টিক ধারা থেকে বের হয়ে এসে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ধারার দিকে চলতে শুরু করেন। এ ধরনের ধারাগুলোতেও শিল্পীর প্রথম জীবনের শিক্ষকের কাছ থেকে শেখা ফোকাল পয়েন্টের প্রয়োগ স্পষ্ট ছিল। দর্শন হিসেবে এই পূর্ববর্তী দর্শন। যেমনঃ ফোকাল পয়েন্টের কেন্দ্রটি নির্ণয়ের জন্য যে পূর্বপরিকল্পিতভাবে করা যায় না এবং ফর্মগুলো যে স্বতঃস্ফূর্ততা ও অনিবার্যতার মধ্য দিয়ে সাজানো হয়—সে বিষয়টিও এখানে বিদ্যমান। কিবরিয়ার এ সময়ের কয়েকটি লিথোচিত্র 'কম্পোজিশন ব্ল্যাক'সহ (১৯৬০, ১৯৬১), বর্ণমালা (১৯৬৫), কালো ও ধূসর (১৯৬৬), কালা ও ধূসর (১৯৬৮) ইত্যাদি চিত্রের অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ধারা আধুনিক শিল্পাঙ্গনে বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি মাধ্যমকে ব্যবহার করে শিল্পভাষাকে সমৃদ্ধই করেছেন।

ষাটের দশকে বিষয় হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক লিথোগ্রাফি চর্চায় উঠে এসেছে জড়-জীবন, ল্যান্ডস্কেপ, প্রতিকৃতি চিত্র, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, বই অলংকরণ ও নকশাভিত্তিক লিথোচিত্র। এগুলোর কোনটি বাস্তবধর্মী, সেমি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট, কিউবিস্টিক কিংবা সাবজেক্টিভ ধরনের শৈলীর অন্তর্ভুক্ত। করণ-কৌশলের দিক থেকে কোনোটি ক্রেয়ন বা কন্টি মাধ্যমে, কোনোটি আবার শুধু তুষ মাধ্যমে করা। আবার তুষ ও কন্টির মিশ্র মাধ্যমেও কিছু লিথোচিত্র রচনা করা হয়েছে। কিছু কিছু কাজে ফ্লাট ইমেজ ব্যবহার করে বই অলংকরণ, কিউবিস্টিক ও সাবজেক্টিভ ধরনের চিত্র রচনা করা হয়েছে। ষাটের দশকের প্রাতিষ্ঠানিক লিথোগ্রাফিগুলোতে কর্ন কোম্পানির কন্টির ব্যবহার কমে এসে বিভাগে তৈরি নিজস্ব কন্টি বা ক্রেয়নের ব্যবহার আরম্ভ হয়। কর্ন কোম্পানির কয়েক ধরনের কন্টি (০-৪ গ্রেডের শক্ত থেকে নরম ধরনের) বিভাগ থেকে শিক্ষার্থীদের দেওয়া হতো। এ সময় বিভাগে এগুলো আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিভাগ নিজ উদ্যোগে কন্টি বানিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দান করার ব্যবস্থা নিয়েছিল। তবে একটি গ্রেডের কন্টি বানানো যেত। এটি চলতে থাকে প্রায় আশির দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের এই সময়ে অঙ্কিত লিথোগ্রাফি চিত্রগুলোতে তাদের তৎবর্তমান শৈলীগত ছাপ সুস্পষ্ট। করণ-কৌশলগত দিক থেকে রয়েছে শৈলীগত রূপ সৃষ্টির জন্য তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার।

ষাটের দশকের অঙ্কিত লিথোচিত্র শিল্পীদের প্রাপ্ত সময়কাল বা সাল অনুযায়ী যাদের নাম উল্লেখযোগ্য তারা হলেন আশিষ সেন গুপ্ত, পরেশ কুমার মাইতি, বিজন চৌধুরী, রশিদ চৌধুরী, আব্দুল মতিন, আবু তাহের, জি. (গোলাম) সারওয়ার, রণজিৎ নিয়োগী, প্রফুল্ল রায়, নাসির বিশ্বাস, মো. আনোয়ার, কেরামত মওলা, সৈয়দ এনায়েত হোসেন, মো. রফিকুন্ নবী, মনিরুল ইসলাম, কাজী বজলুর রহমান, আমিনুল ইসলাম,

জাহিদ উদ্দীন, আবদুল হাকিম, হামিদুজ্জামান, সৈয়দ আবুল বারক্ আলভী, মাহমুদুল হক, মনোজ, মান্নান প্রমুখ।

৫.১.৩.২ ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠানে ক্রেয়ন বা কন্টি দিয়ে অঙ্কিত লিথোগ্রাফি

ষাটের দশকে ঢাকা চারুকলার প্রিন্টমেকিং বিভাগে যেসব লিথোচিত্র অঙ্কিত হয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত বিভাগের ড্রয়ারে রয়ে গেছে, সেগুলোর বেশির ভাগই কন্টির সাহায্যে করা। তার মধ্যে কন্টি মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য একটি লিথোচিত্র শিল্পী পরেশ কুমার মাইতীর অঙ্কিত (চিত্র.৫.১০)। ১৯৬০ সালে অঙ্কিত চিত্রটিতে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রামবাংলার দৃশ্য ফুটে উঠেছে। গ্রামের ভেতর দিকে বড় বড় গাছের আলোছায়া ঘেরা উঁচু রাস্তার পাশে যেমন দু-একটি চায়ের দোকান বা মুদির দোকান দেখা যায়, সেই রাস্তা দিয়ে কয়েকটি লোক হেঁটে যাচ্ছে, এমন দৃশ্যটি শুধু কন্টি দিয়ে লিথো স্টোনে অঙ্কন করে প্রিন্ট নেওয়া হয়েছে। কন্টির মোটা ও মাঝারি টোন এবং স্বতঃস্ফূর্ত বলিষ্ঠ স্কেচ করার ক্ষমতাটি আসাধরণ। শৈলীগত দিক থেকে এটি বাস্তধর্মী অঙ্কনরীতির অন্তর্ভুক্ত।

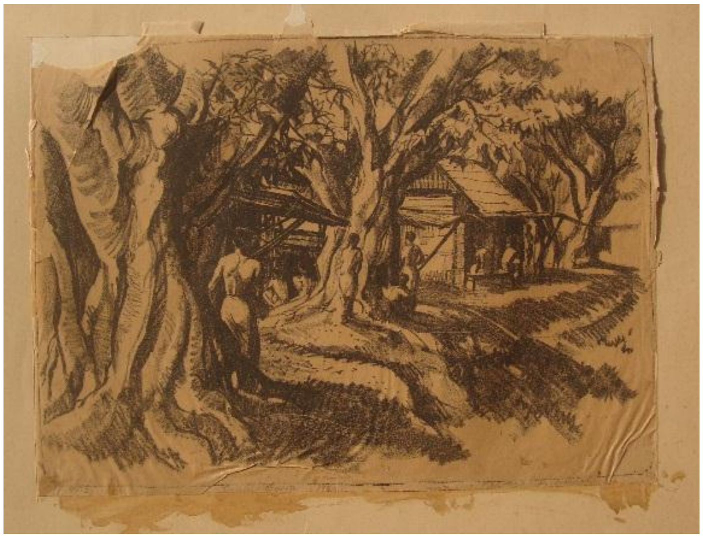

Plate: 5.10, Paresh Kumar Maity, Lithography (Crayan), 1960, 36x50cm, Collection-F.F.A, D.U.

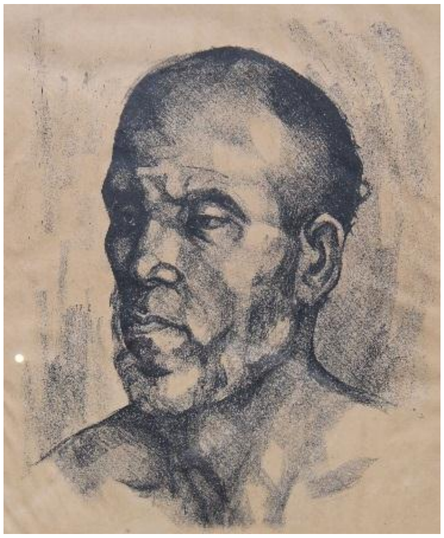

Plate: 5.11, Ashish Sen Gupta, Lithography (Crayan), 1969, 19x14inch, Collection-F.F.A, D.U.

৫.১.৩.৩ প্রাতিষ্ঠানিক চারুশিল্পে তুষ ও ক্রেয়ন বা কন্টি দিয়ে অঙ্কিত লিথোগ্রাফি

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক চারুশিল্পে তুষ ও কন্টির মিশ্রণে অঙ্কিত লিথোচিত্রের নিদর্শন এই ষাটের দশকে প্রথম পাওয়া গেল। রনজিৎ নিয়োগী এই চিত্রটি প্রথমে শীতলক্ষ্যার পাড়ে গিয়ে খসড়া করেছেন। এরপর করণ-কৌশলের দিক থেকে লিথো স্টোনে সরাসরি কন্টি ও তুষের সংমিশ্রণে চিত্রটি অঙ্কন করে প্রিন্ট নিয়েছেন। প্রথমে কন্টি দিয়ে ঘষে টোন সৃষ্টি করেছেন, তারপর তুষ গুলিয়ে ফ্লাট তুলি বা ম্যাচের খোল

ভেঙে তার সাহায্যে তুষ দিয়ে আঁকা হয়েছে। (চিত্র.৫.১২) ফলে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চিত্রতলে অন্য আরেক ধরনের শৈল্পিক মাত্রা যোগ হওয়া আরম্ভ হলো। এই মাধ্যমে আরো কয়েকটি লিথোগ্রাফি হলো শিল্পী আমিনুল ইসলাম ও ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে অঙ্কিত চিত্র। ১৯৬৫ সালে ভারত ও পকিস্তানের আর্মিদের মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যার চিত্ররূপ দেখতে পাওয়া যাবে এই সময়ের কিছু লিথোগ্রাফি চিত্রে। (চিত্র. ৫.১৩) এটি কোনো ক্লাসের কাজ ছিল না, শিক্ষার্থীরা নিজ উদ্যোগে কাজগুলো করেছিলেন।[১৪৫] সংগৃহীত শিল্পী তিনজনের নাম হচ্ছে আব্দুস সামাদ, সুধীর কুমার শাহা এবং এস.এ.কিউ মাইনুদ্দীন। ১৯৬৯ সালে আঁকা বিদেশি শিল্পী ট্রুশোর কাজে ফ্লাটিং পদ্ধতিতে ইমেজ তৈরি করার বিষয়টি লক্ষণীয়। বাংলাদেশ অবশ্য মোহাম্মদ কিবরিয়ার কাজের মধ্য দিয়ে এ বিষয়টির সঙ্গে পূর্বেই পরিচিত হয়েছিল।

Plate: 5.12, Ranjeet Neogy, Lithography (tusch and Crayon mix), Shitalaxha in rainy season, 1969, 46x61cm, Collection-F.F.A, D.U.

Plate: 5.13, Shudhir Kumar Shaha, Lithography (tusch and Crayon mix), 1966, 26x38cm, Collection-F.F.A, D.U.

৫.১.৩.৪ ফ্লাট কালার দিয়ে অঙ্কিত লিথোগ্রাফি

বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিতে মোহম্মিদ কিবরিয়া 'দুটি ফুল' চিত্রে ফ্লাট কালার ব্যবহার করেন ১৯৬০ সালের দিকে। এরপর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক চারুশিল্পে ১৯৬৩ সালে প্রথম কিছু ফ্লাট কালারে লিথোচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বুক কভারের জন্য গ্রাফিক ডিজাইনের শিক্ষার্থীদের সাবসিডিয়ারি ক্লাসে সেই লিথো চিত্রাঙ্কন করানো হয়েছিল। (চিত্র.৫.১৪) এ সময় কমার্শিয়াল বিভাগের শিক্ষার্থীদের সাবসিডিয়ারি বিষয় হিসেবে বেশির ভাগ ক্লাস লিথোগ্রাফি মাধ্যমে নেওয়া হতো। তখন সফিউদ্দীন আহমেদ তাদের বিভাগীয় বিষয়বস্তু অনুযায়ী বইয়ের বুক কভার বা প্রচ্ছদভিত্তিক কিছু রঙিন লিথোচিত্র ক্লাস নিয়েছিলেন। এর কয়েকটি নমুনা বিভাগের ড্রয়ারে এখনো রয়েছে। সেই শিল্পীদের নামগুলো হচ্ছে

[145] ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, সৈয়দ আবুল বারক্‌ আলভী, ১৮ সেপ্টে. ২০১৬

যথাক্রমে দেবদাশ রায়, হাসান আহমেদ, এ.কে.এম নুরুল ইসলাম, এ. সামাদ, মো. জমির উদ্দীন। করণ-কৌশলগত দিক দিয়ে এগুলোতে ফ্লাটিং পদ্ধতিতে প্রিন্ট নেওয়া হয়েছে। ভাষাগত দিক থেকে এগুলো চারুশিল্পের থেকে গ্রাফিক ডিজাইনের অন্তর্ভুক্ত।

কাজটিতে প্রথমে কিছু জায়গা গামিং করে ফেলা হয়েছে। গাম শুকানোর পর পুরো ইমেজ জুড়ে ব্ল্যাক রোলিং করে পুরো স্টোনকে ফ্লাট করে দেওয়া হয়েছে। এবার ভিসকোভিটা দিয়ে পানি স্টোনে দিয়ে রোলিং করা হলে গামের অংশ থেকে ইমেজ উঠে আসতে থাকে। এখন এচিং করে পরিষ্কার গামিং করে ওয়াশ আউট করে ডিপ ব্রাউন কালারে প্রিন্ট নিয়ে একটি ইম্প্রেশন নেওয়া হয়েছে। তারপর একই স্টোনে প্রিন্ট নেওয়া হয়ে থাকলে (মূল প্রিন্টটি দেখে এর করণ-কৌশল লিখতে হবে) রিভার্স পদ্ধতিতে প্রিন্ট নেওয়া হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তখন যেহেতু বাংলাদেশে রিভার্স পদ্ধতিতে অনুশীন চর্চা অব্যাহত ছিল না, তাই এখানে হয় পূর্ব ইমেজ ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে এবং রিসেনসিটাইজ করে প্রিন্ট নেওয়া অথবা অন্য স্টোনে রেজিস্ট্রেশন মেনে ইয়েলো অকার কালারের প্রিন্ট নেওয়া হয়েছে।

Plate: 5.14, Debdas Roy, litho, 1963, Book cover, 25 x 19cm, 8-6-1963 (Flat image), Collection-F.F.A, D.U.

Plate: 5.15, Aminul Islam, litho, River view, Media-litho, 28 x 51 cm, 1965, Collection-F.F.A, D.U.

তবে এ সময়ের কাজগুলোর মধ্যে ১২টি কালার লিথোগ্রাফি পাওয়া গেছে। যাদের মধ্যে কয়েকজন রয়েছেন দেশি ও একজন বিদেশি শিল্পী। তারা হলেন বিজন চৌধুরী, আশীষ সেন গুপ্ত, রফিকুন্ নবী, রণজিৎ নিয়োগী, মনিরুল ইসলাম, নাসির বিশ্বাস, সেতারা ইব্রাহীম, ইয়াসমিন, আমিনুল ইসলাম, দেলওয়ার, মো. কবির, কাজী শাহানুল হক, মো. মতিউর রহমান, একজন নাম না জানা শিল্পী এবং ফ্রান্সিস ট্রুশো (একটি রঙিন ও দুটি সাদা-কালো রঙে তৈরি লিথোগ্রাফি)। প্রফুল্ল রায়, সৈয়দ আবুল বারক্

আলভী, মনোজ, কাজী বজলুর রহমান, মান্নানের বেশির ভাগ চিত্রে বিষয়বস্তু হিসেবে এসেছে ল্যান্ডস্কেপ, যা বাস্তবধর্মী শৈলীতে অঙ্কিত। সময় স্বল্পতার কারণে, স্কেচ ভালো জানলেই লিথোগ্রাফি মাধ্যমে কাজ করানো সহজতর হবে, এমন মনোভঙ্গি থেকে বেশির ভাগ সাবসিডিয়ারি ক্লাসগুলো লিথোগ্রাফি মাধ্যমেই করানো হতো।[১৪৬] তাই বিষয়বস্তু হিসেবে প্রথম থেকেই এসেছে ল্যান্ডস্কেপ। লিথোগ্রাফি বিষয়টি সফিউদ্দীন আহমেদ ও হাবিবুর রহমান দেখাশোনা করতেন। শিক্ষার্থীরা অনেকগুলো স্কেচ করে আনতেন। তার মধ্যে থেকে একটিকে লিথোগ্রাফিতে আঁকতে বলতেন। লিথোর চরিত্র যেন বজায় থাকে, সে বিষয়টিতে গুরুত্ব দিতে বলতেন। তিনি আরো বলতেন লিথো পাথরের কর্নারের যে ভাঙা এজ থাকে সেটাকে সহ ছবির কথা চিন্তা করতে হবে। তবে শিক্ষার্থীরা অতটা না বুঝে কন্টিকে সিক্স-বি পেনসিল মনে করেই কাজ করে যেত।[১৪৭]

বর্তমানে স্বনামধন্য কয়েকজনের মধ্যে ষাটের দশকে যেসব লিথোচিত্র পাওয়া যায় তাদের মধ্যে প্রফুল্ল রায় (তিনটি), মো. রফিকুন্ নবী (তিনটি), রণজিৎ নিয়োগী (ছয়টি), মনিরুল ইসলাম, নাসির বিশ্বাস (চারটি), সেতারা ইব্রাহীম, হামিদুজ্জামান খান (ছয়টি), আবু তাহের, মাহমুদুল হক, সৈয়দ আবুল বার্‌ক আলভী (তিনটি), শহীদ কবির, এস.এম আনসার ও মাহবুবুল আমিনের নাম উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া রয়েছে মনোজ, মান্নান, কাজী বজলুর রহমান (পাঁচটি), আমিনুল ইসলাম, মো. আনোয়ার (তিনটি), বশির উল্লাহ (তিনটি), মোহাম্মদ নজিব, জাহিদ উদ্দীন আহমেদ, গোলাম সারওয়ার, আব্দুল হাকিম, এস.এ.কিউ মাইনুদ্দীন, কেরামত মওলা, সৈয়দ এনায়েত হোসেন এবং নাম না জানা একজন শিল্পীর লিথোগ্রাফি চিত্র আছে। এই দশকের প্রথম দিকে (১৯৬২ সাল) শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া পড়াশোনা শেষ করে প্রিন্টমেকিং বিভাগে যোগদান করেন। মোহাম্মদ কিবরিয়ার পূর্ব পর্যন্ত (১৯৬২ সাল) বিভাগের লিথোগ্রাফি ক্লাসগুলো সফিউদ্দীন আহমেদ দেখাশোনা করতেন। সফিউদ্দীন আহমেদ ১৯৫৬–১৯৫৯ সাল পর্যন্ত লন্ডনে গিয়ে এচিং ও এনগ্রেভিং (মেটাল) মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে গিয়েছিলেন। তখন বিভাগের লিথোগ্রাফি ক্লাসগুলো শিল্পী জয়নুল আবেদিন নিজে দেখাশোনা করতেন।[১৪৮]

---

[146] Discusion with Syed Abul Barq Alvi, 3rd July 2016

[147] ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, মো. রফিকুন্ নবী, ৩০ অক্টোবর ২০১৬

[148] ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, ৮ এপ্রিল, ২০১৬

৫.১.৪ সত্তর থেকে নব্বইয়ের দশকে লিথোচিত্রের করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক

এই কয়েক দশকে লিথোগ্রাফি আরো একটু উন্নতির দিকে এগিয়েছে। মোহাম্মদ কিবরিয়ার সঙ্গে আরো যোগ হলো তার শিল্পগুরু জয়নুল আবেদিন ও সমকালীন শিল্পী আবদুর রাজ্জাকের লিথোগ্রাফি। তাই তাদের লিথোগ্রাফি চিত্রের করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক নিম্নে পর্যালোচনা করা হলো। কিবরিয়ার হাত দিয়ে 'কালো বাদামি, হলুদ' (১৯৭৫), 'ধূসর ও সবুজ' (১৯৭৫), 'বাদামি, কালো, হলুদ' (১৯৭৬), 'কম্পোজিশন: নীল, সবুজ, লাল' (১৯৭৬), 'কম্পোজিশন: কালো' (১৯৭৬) ইত্যাদি ছবি বের হয়ে আসে। যার মধ্যে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ও নন-অবজেক্টিভ শিল্প ধারার মিশ্রণ লক্ষণীয়। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আঁকেন অবয়বধর্মী লিথোগ্রাফি। আর আবদুর রাজ্জাক দেশে ফিরে কিছু লিথোগ্রাফি করেছিলেন, যেগুলো অনেকটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজমের অন্তর্ভুক্ত। আশির দশকের প্রথমার্ধে প্রাতিষ্ঠানিক লিথোচর্চায় কন্টির বিকল্প হিসেবে ধীরে ধীরে গ্লাসমার্কার ব্যবহার হতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে নবীন প্রজন্মের লিথোচিত্রের মধ্য দিয়ে রিভার্স, রি-রিভার্স পদ্ধতি পরিচিতি লাভ করেছে। নিম্নে জয়নুল আবেদিন ও আবদুর রাজ্জাক (১৯৩২–২০০৫ খ্রি.) এর লিথোচিত্রের করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক পর্যালোচনা করা হলো।

৫.১.৪.১ জয়নুলের লিথোগ্রাফির করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক (চিত্র.৫.১৬)

জয়নুল আবেদিন যে দু-একটি লিথোগ্রাফি করেছেন তার মধ্যে এটি অন্যতম অবয়বধর্মী লিথোগ্রাফি চিত্র। ১৯৭৫ সালে তিনি ভারতের কলকাতার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের (শান্তিনিকেতন) কলাভবনের স্টোনে চিত্রটি অঙ্কন করেছিলেন। ছবিটির কম্পোজিশন অনেকটা ক্লোজ করে নেওয়া। সাধারণত ফটোগ্রাফিতে এ ধরনের কম্পোজিশন নেওয়া হয় না। করণ-কৌশলগত দিক দিয়ে বলতে গেলে, দেখে মনে হয়—প্রথমে অবয়বটি এঁকেছেন, তারপর তার চারদিকে সেই ব্রাশ দিয়ে অর্গানিক শেপের বর্ডার অঙ্কন করা হয়েছে লিথোগ্রাফির তুষ মাধ্যমে। শেপটির সঙ্গে মুখাবয়বের সম্পর্ক তৈরি করার জন্য শেপের লাইন থেকে ভেতরের দিকে ব্রাশের আঁচড়ের টান দিয়েছেন। ফলে কখনো মনে হতে পারে চারদিকের এই শেপটি আগে অঙ্কন করা হয়েছে, আবার কখনো মনে হবে মুখাবয়বটি আগে আঁকা। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে অ্যান্টি-স্পেসে ব্রাশ স্ট্রোক সমন্বিত কিছু অস্বাভাবিক ধরনের (Unusual) আকৃতি, যেগুলো পুরো ছবিটিতে গ্রাফিক গুণাগুণকে[১৪৯] রক্ষা করেছে। ফলে ছবিটিতে ফোকাল পয়েন্ট হচ্ছে মুখাবয়ব। ঘাড়ের

---

[149] গ্রাফিক গুণাগুণ (গ্রাফিক কোয়ালিটি):
সাদাকালো উডকাট প্রিন্ট দিয়ে উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। একটি উডকাট প্রিন্টের খসড়া তৈরির সময় বলা হয় পোস্টার কালারের ব্লাক বা কালো রং নিতে হবে। এখন এই কালো রংটি দিয়ে কাগজে খসড়া তৈরি করা আরম্ভ হলো। যেকোনো ছবিতে রয়েছে হাইলাইট, মিডিল টোন ও হাই ডার্ক টোন। কিন্তু এই সলিড কালো রং দিয়ে শিল্পী কীভাবে মিডিল টোন তৈরি করবেন? তখন ছবি

ডান দিকে মাথা থেকে গলার যে লাইন নিচের দিকে নেমেছে সেখানে শিল্পী উল্টা করে 'জ' লিখেছেন। যেন প্রিন্টে সোজা হয়ে 'জ' অক্ষরটি আসে। কিন্তু স্বাক্ষর হিসেবে 'জ' অক্ষরটিকে এমনভাবে এঁকেছেন যেন ছবির কম্পোজিশনে ডিস্টার্ব না করে। লিথোচিত্রটিতে হাইলাইট রাখা হয়েছে। দুই ইম্প্রেশনে কাজটি প্রিন্ট নেওয়া হয়েছে। ছবিটির মুখাবয়বে ভারতীয় ধ্রুপদী শৈলীর সাথে একটি সম্পর্ক আছে বলে ধারণা করা করা যেতে পারে, যেখানে ওরিয়েন্টাল ও ওয়েস্টার্ন শৈলীর একটি চমৎকার সমন্বয় দেখতে পাওয়া যাবে।

প্রথম ইম্প্রেশনে ব্ল্যাক বা কালো রঙে প্রিন্ট নেওয়া হয়েছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে। এই কালো ইম্প্রেশনটি আগে নেওয়ার কারণ হিসেবে একটি যুক্তি আছে। শান্তিনিকেতনে একটা বিষয় খুব বেশি লক্ষ করা যায় যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা যেকোনো একটি ইমেজ তৈরির পর একটি ফ্লাট কালারের আরেকটি ইম্প্রেশন অবশ্যই নেবে। মনস্তাত্ত্বিক বিষয় হলো, তারা এক ইম্প্রেশনে বোধগত জায়গা থেকে কাজটিকে শেষ বলে মেনে নিতে পারে না। আরেকটি বিষয় হতে পারে যে, তারা প্রিন্ট মাধ্যমে সচরাচর এক ইম্প্রেশনে কাজকে শেষ বলে মেনে নিতে পারে না। এই দ্বিতীয় ইম্প্রেশনটি নেওয়ার জন্য সেখানে এচিংয়ের সময় টপ কালার দিয়ে এবং লিথোগ্রাফির সময় প্রথম ইম্প্রেশনের লিথো স্টোনটিকে কাজে লাগিয়েই টপ কালার দিয়ে দ্বিতীয় ইম্প্রেশনটি নেওয়ার অলিখিত একধরনের রেওয়াজ চালু রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে ঢাকা চারুকলার লিথোগ্রাফি চর্চার দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে সফিউদ্দীন, কিবরিয়াদের শিক্ষাদান পদ্ধতিতে প্রয়োজন না পড়লে ফ্লাটিং দেওয়া হয় না। ফ্লাট ইমেজটি আগে নিয়ে তার ওপর ব্ল্যাক ইম্প্রেশন নেওয়া হয়ে থাকে। প্রথম ইম্প্রেশনে ফ্লাট নেওয়ার পর মূল ইমেজের প্রিন্ট নেওয়া এবং মূল ইমেজের পর ফ্লাটিং নেওয়ার ফলে এই উভয় অভিব্যক্তির অবশ্যই পার্থক্য ঘটে থাকে। এতে একধরনের সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে।

দ্বিতীয় ইম্প্রেশনে ফ্লাট কালার নেওয়ার সুবিধাটি হলো পুরো ইমেজ জুড়ে একধরনের সমন্বয়কৃত ডেপথ সৃষ্টি করে, কিন্তু অসুবিধা হলো ইমেজের ওপর ফ্লাট কালারটি ট্রান্সপারেন্টভাবে দেওয়া হয় বলে কালো রঙের নিজস্ব ডেপথ একটু কমে যায় এবং পরিষ্কার দেখা যায় না। আর ফ্লাট ইমেজের ওপর মূল কাজের প্রিন্ট নিলে ব্ল্যাক কালারের ডেপথের অংশটি বেশি পরিষ্কার মনে হয়। বাংলাদেশের নাসির বিশ্বাসের

আঁকার সময় কিছু মিডিল টোন সাদা টোনে এবং কিছু মিডিল টোন হাই ডার্ক টোনে (কালো টোনে) পরিণত হয়, কিন্তু তার পরও ছবিতে হাইলাইট ও মিডিল টোন একটু দূর থেকে ভালোভাবেই উপলব্ধি করা যায়। এই সমস্ত মিডিল টোন না এঁকেও যখন ছবিতে সমস্ত টোনাল গুণকে বোঝানো সম্ভব হয় এবং ছবির স্পেস বিভাজন ঠিকমতো করা সম্ভব হয়, তখন প্রিন্টের এ ধরনের গুণাগুণকে গ্রাফিক কোয়ালিটি বলা হয়।

লিথোগ্রাফি প্রিন্টগুলোতে এই প্রক্রিয়াতে প্রিন্ট নেওয়া হয়েছে। (চিত্র.৫.১৭) কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, জয়নুলের এই কাজটি যেহেতু পরে প্রিন্ট নেওয়া, সেহেতু হয় তিনি আরেকটি স্টোনে হাইলাইটটি এঁকে দিয়েছিলেন, না হয় কাউকে বলে দিয়েছিলেন এই স্টোনেই প্রিন্ট নেওয়ার পর রিসেনসিটাইজ করে এরাবিক গামের মাধ্যমে হাইলাইট অংশটি তুলি দিয়ে অঙ্কন করে দু-একটি গামের ছিটেফোঁটা ছড়িয়ে দিতে। এরপর প্রয়োজনমতো প্রস্তুতি নিয়ে ফ্লাটিং পদ্ধতিতে লাইট অংশ বাদে টিন্ট কালারের সঙ্গে ব্রাউন কালার মিশিয়ে হালকা ব্রাউনের টিন্ট কালারসমৃদ্ধ প্রিন্টটি নেওয়া হয়েছিল। তবে এই ছবিটিতে দ্বিতীয় ইম্প্রেশনটি নেওয়ার জন্য আরেকটি স্টোন ব্যবহার করা হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। কারণ ছবিটির ওপর ও নিচের দিকে ফ্লাট ইম্প্রেশনটি ইমেজের ভেতরের দিকে পড়েছে।

Plate: 5.16, Zainul abedin, Lithography, 1975,? এখানে ফ্লাটিং প্রিন্ট পরে নেওয়া হয়েছে।

Plate: 5.17, Nasir Biswas, Lithography, Noor jahan, litho, 1965, 19x14inch, এখানে ফ্লাটিং প্রিন্ট আগে নেওয়া হয়েছে, Collection-F.F.A, D.U.

সাধারণত স্টোন ছোট হলে পরবর্তী ইম্প্রেশনে বিভলিং করার সময় পরবর্তী ফ্লাট ইমেজ একটু ছোট হয়ে যেতে পারে। তা না হলে অন্য প্লেট দিয়ে বা অন্য স্টোন দিয়ে এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে ফ্লাট ইমেজটি পূববর্তী ইমেজ থেকে একটু ছোট করে প্রিন্ট নেওয়া হয়েছে। শোনা যায়, পরবর্তী সময়ে এই স্টোনটি কিছু সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। আর একই স্টোন থেকে ফ্লাট প্রিন্ট নিলে পরে সেটি থেকে আর প্রথম ইম্প্রেশনের প্রিন্ট নেওয়া যায় না। অর্থাৎ ইমেজকে ধ্বংস করে নতুন ইমেজ সৃষ্টি করে ফ্লাট নেওয়া হয়ে থাকবে। সে ক্ষেত্রে প্রথম ইমেজ আসার প্রশ্নই আসে না। তাই এ দুটি বিষয়কে বিবেচনায় রেখে বলা

যেতেই পারে যে, ছবিটিতে দ্বিতীয় ইম্প্রেশনে অন্য একটি স্টোন দিয়ে ফ্লাটিং ইমেজ নেওয়া হয়েছে। জয়নুলের এ ধরনের ছবিগুলোতে সাধারণত ব্রাইট ইয়েলো কালার ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই লিথোগ্রাফিতে ব্রাউন কালারটি বাছাই করা দেখে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে—এটি শান্তিনিকেতনের সাঁওতালদের মুখাবয়বেরই প্রতিচ্ছবি।

ছবিটির ভাষাগত দিক বলতে গেলে—এ ধরনের অন্য ছবিগুলোর মতো এই প্রতিকৃতি লিথোচিত্রটিও লোকজ শিল্প দ্বারা অনুপ্রাণিত আধুনিক ধারার[১৫০] বলে বিবেচিত হতে পারে। তিনি ১৯৪৩ সালে বাস্তবধর্মী (Realist) ও এক্সপ্রেশ্নিস্ট, পঞ্চাশের দশকে লোকজ-আধুনিক এবং এক্সপ্রেশ্নিস্ট ধরনের কাজ করেছেন। অগ্রজ শিল্পী যামিনী রায়ের মতো একটা সময় তিনিও সরু রেখা ও হালকা স্বচ্ছ প্রাথমিক রং দিয়ে সামান্য জ্যামিতিক পদ্ধতিতে সুন্দর লোকজ-আধুনিক চিত্র রচনা করেছেন।[১৫১] অনুজ শিল্পী কামরুল হাসানের ছবিতেও এই গুণটি লক্ষণীয়। কিন্তু এই ধারা তিনি বেশি দিন ধরে রাখেননি। বরং তিনি প্রাণ খুঁজে পেতেন মজবুত পুরু ব্রাশের টানে, বেগবান রেখায়, উজ্জ্বল ভারী রঙে, এমনকি ভল্যুম নির্মাণে। জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষ-চিত্রের উদাহরণ দিয়ে শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া বলেছিলেন, 'তিনি যে রেখা ব্যবহার করেছেন, যে কন্ট্যুর ব্যবহার করেছেন, তাতে অ্যাবস্ট্র্যাকশনের নিকষিত রূপ—তার এসেন্স—ধরা পড়ে।'[১৫২] জয়নুলের প্রতিকৃতি লিথোচিত্রটি সে রকমই একটি শিল্পকর্ম। তাই এই লিথোচিত্রের মধ্যে যে অ্যাবস্ট্র্যাকশনের এসেন্স ধরা পড়ে সেটি লিথোগ্রাফি শিল্পভাষার যৌক্তিকতাকে আরো দৃঢ় অবস্থানে নিয়ে যায় নিঃসন্দেহে।

৫.১.৪.২ 'বিন্যাস-১' লিথোগ্রাফির করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক (৫.১৮)

এই লিথোগ্রাফিটি শিল্পী আবদুর রাজ্জাক ১৯৭৩ সালে অঙ্কন করেছেন। লিথোগ্রাফিক তুষ দিয়ে চিত্রটি অঙ্কন করেছেন। এই দশকে এসে লিথোগ্রাফি এতটাই করণ-কৌশলগত দিক দিয়ে স্বাধীন হয়েছে যে বাংলাদেশের এই মাধ্যমে নতুন শিল্পী হিসেবে তিনি যে সাবলীলতার পরিচয় দিয়েছেন, তা অনন্য। এর ভেতর রয়েছে ছোট ছোট অসংখ্য ডিটেইল কাজ। দেখলে মনে হবে খুব অল্প সময়ে কাজটি করা হয়েছে।

---

[150] নজরুল ইসলাম, "সমকালীন শিল্প ও শিল্পী", বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃ. ২৩।
লোকজ—আধুনিক ধারা: এই ধারার শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র কামরুল হাসান সম্বন্ধেই বলা যায় যে, সুদীর্ঘ কাল ধরে তিনি নিজস্ব একটি ধারা বজায় রেখেছেন, যে ধারার উৎস বাংলার লোকশিল্পে এবং যামিনী রায়ের শিল্পাঙ্কন পদ্ধতির প্রেক্ষাপট। আধুনিক ও লোকজ শিল্পের মতোই কামরুল হাসানের চিত্রে প্রাথমিক রংসমূহের প্রাধান্য লক্ষণীয় এবং লোকজ শিল্পও যে এক দিক থেকে আধুনিক শিল্পের অঙ্গ, হেনরি মাতিসের মতো কামরুল হাসানও তা দেখিয়েছেন। সচ্ছল, সবেগ ও সতেজ রেখা এবং হালকা প্রাথমিক রং ও দ্বিমাত্রিক ডিজাইনের মাধ্যমে কামরুল হাসান তার স্টাইল নির্মাণ করেছেন, যাকে সংক্ষেপে আমরা 'লোকজ-আধুনিক' বলতে পারি।

[151] নজরুল ইসলাম, তদেব.,

[152] Syed Manzoorul Islam, *Mohammad Kibria, Art of Bangladesh series-9*, Bangladesh Shilpakala Academy, 2004, P. 23

কিন্তু তার এ ধরনের পেইন্টিংগুলো যেহেতু অনেক সময় নিয়ে করা, সেহেতু তার এ লিথোচিত্রটি অল্প সময়ে করা হলেও এর পেছনে রয়েছে সেই অনেক সময়ের অভিজ্ঞতার ছাপ।

Plate: 5.18, Abdur Razzak, Lithography, Composition-1, 46x 16cm, 1973.

Plate: 5.19, Abdur Razzak, Acrylic, Composition-Red, 46x 110cm, 1976.

আবদুর রাজ্জাক যখন প্রশিক্ষণের জন্য আমেরিকায় গিয়েছিলেন, তখন ইউরোপ-আমেরিকায় অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজম (বিমূর্ত প্রকাশবাদী) চিত্ররীতির প্রবল প্রধান্য ছিল। তার পরও তিনি সেই স্রোতে গা না ভাসিয়ে এর বিবর্তনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। পঞ্চাশের শেষ দিক, এমনকি ষাটের দশকের শুরুতেও তিনি ফিগার অথবা প্রতিকৃতির আধা বিমূর্ত চিত্রশৈলীর দিকে বেশি মনোযোগী ছিলেন। ছবি প্রকাশবাদী বিমূর্ত আঙ্গিক বিবর্তিত হয় আরো কিছুদিন পরে, অর্থাৎ সত্তরের দশকে। তবে এই গুণের বহিঃপ্রকাশ— অন্যান্য মাধ্যমের মতো লিথোগ্রাফি মাধ্যমেও ঘটেছে। আমেরিকা থেকে ফিরে তার পেইন্টিংয়ের শৈলীগত ধরন অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশ্নিজমের মতো হওয়ার কারণে ‘বিন্যাস-১’-এর ন্যায় লিথোচিত্র বের হয়ে এসেছে। তার এই কম্পোজিশনটির সঙ্গে ১৯৭৬ সালে আঁকা বিন্যাস-লাল নামক অ্যাক্রিলিক পেইন্টিংয়ের একটি শৈলীগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। (চিত্র. ৫.১৯)

পেইন্টিংয়ের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করার ক্ষেত্রে ভাস্কর্যের ফর্ম গুণ এবং ড্রইংয়ের রেখার গুণ প্রয়োজন বলে মনে করতেন।[১৫৩] নানা মাধ্যমে কাজ করার যৌক্তিকতার কারণে, শুধু লিথোগ্রাফি মাধ্যম নিয়ে সারা জীবন কাজ করা হয়ে ওঠেনি। তবে যে সময়টিতে তার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লিথোগ্রাফিগুলো

[153] Nazrul islam, '*Art of Bangladesh series-7: Abdur Razzaque*', Bangladesh Shilpaka Academy, p. 10-20

বের হয়ে এসেছে, সে সময়টিতে (সত্তরের দশকে) তার শিল্পকর্মে (পেইন্টিং, প্রিন্ট ও ভাস্কর্যের উপরোল্লিখিত গুণাগুণ) এই দর্শনের পরিপক্বতার ছাপ আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিমূর্ত প্রকাশবাদের বিবর্তনের বিষয়টি। ১৯৭৫ থেকে ৮৫-র মধ্যে রাজ্জাকের অঙ্কিত বেশ কিছু তেলরং ছবিতে রং ও ফর্মে বিমূর্ত প্রকাশবাদী শৈলীগত গুণ প্রাধান্য পেয়েছে। এ সময়ে তিনি ছবিতে তীক্ষ্ণধার বা 'হার্ড এজ' পরিহার করেন। বরং সাধারণত রং ও ফর্মের ধীর মিশ্রণ পছন্দ করতেন। তবে নজরুল ইসলামের আর্ট অব বাংলাদেশ সিরিজ-৭-এর 'আবদুর রাজ্জাক' বইটিতে প্রকাশিত ছবিগুলোর সময়কালকে পর্যালোচনা করে কিছুটা হলেও ধারণা করা যায় যে—তার ১৯৭৩ সালের লিথোগ্রাফিটির একটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা এ সময়ের (সত্তরের দশক-পরবর্তী সময়ের) পেইন্টিংগুলোতে পড়েছে। কারণ পরের দিকে বলা হচ্ছে, 'রাজ্জাকের শিল্পকর্মেও একদিকে বড় মাপের ফর্ম, অন্যদিকে সূক্ষ্ম ক্ষেত্রের ডিটেইলস, এই দুয়ের একধরনের সমন্বয় সম্ভব হয়েছে।'[১৫৪]

উপরোক্ত বিষয়টির অতীত প্রেক্ষাপটটিও লিথোগ্রাফির গ্রাফিক গুণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত বলে ধরে নেওয়া যায়। তার এই লিথোগ্রাফিটিতে ছোট ডিটেইলগুলো বড় ধরনের কালো স্পেসে যে অনন্যতা দান করেছে এবং অন্যান্য ফর্মের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে তা অনস্বীকার্য। প্রিন্ট মাধ্যমে ছোট পরিসরে ডিটেইলস করা এবং ছোট ও বড় ফর্মের সমন্বয়ে বিরাট ভাব প্রকাশের সফলতার বিষয়টি নিশ্চয়ই তার মনের অগোচরে হলেও আয়ত্তে এসেছিল। শুধু এই সময়ের কেন, তার বেশির ভাগ লিথোগ্রাফি আসলে আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার পরে করা, সেগুলো এবং পরবর্তী পেইন্টিংগুলোতেও তার প্রভাব পড়েছে। তিনি যে সময়টিতে লিথোগ্রাফিগুলো করেছেন, সে সময়টিতে অন্য শিল্পীরাও লিথোগ্রাফি করেছেন। যেমনঃ কাইয়ুম চৌধুরী, মুর্তজা বশীর প্রমুখ শিল্পী বিভিন্ন দেশে প্রিন্ট প্রদর্শনীতে শিল্পকর্ম পাঠানোর উদ্দেশ্যে ঢাকা চারুকলার প্রিন্টমেকিং বিভাগে বা গ্রাফিক বিভাগে বেশ কিছু লিথোগ্রাফি প্রিন্ট নিয়েছিলেন। এই প্রিন্টটিও সেই সময়ের করা।

৫.১.৪.৩ শিরোনামহীন লিথোগ্রাফিরি করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক (চিত্র.৫.২০)

আশির দশকে শিল্পী আব্দুস সাত্তার আমেরিকার বিশ্বদ্যিালয়ে 'ফুল ব্রাইট স্কলারশিপ' নিয়ে দুই বছর প্রিন্টমেকিংয়ে অধ্যয়ন করার সময় 'শিরোনামহীন' লিথোগ্রাফি চিত্রটি অঙ্কন করেছেন। করণ-কৌশলের দিক থেকে লিথোগ্রাফিটিতে ট্রান্সফার পদ্ধতিতে কিছু ফর্ম অঙ্কন করা হয়েছে। এই সময়টিতে এসে

[154] Nazrul islam, '*Art of Bangladesh series-7: Abdur Razzaque*', Bangladesh Shilpaka Academy, p. 10-30

বাংলাদেশের শিল্পীরা লিথোগ্রাফির 'প্রতিস্থাপন পদ্ধতি'কে শিল্পকলায় অভিব্যক্তায়নের শক্তিশালী উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে পেরেছেন।

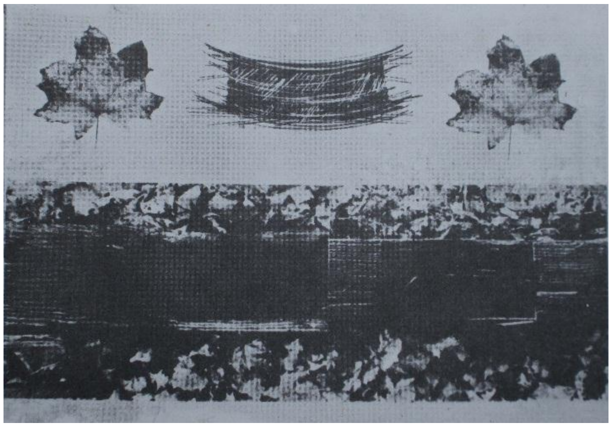

Plate: 5.20, Abdus Sattar, Lithography, Untitled,?

Plate: 5.21, Abdus Sattar, Lithography, Face, 35x51 cm, 2008, Collection-F.F.A, D.U.

আর বিষয়বস্তু হিসেবে সে সময়টিতে শিল্পীর ছবিতে এসেছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসভিত্তিক ল্যান্ডস্কেপ। সেইসঙ্গে ক্লোজ-আপ ধরনের বিষয়বস্তুকে নিজের মতো করে নিয়ে তার সঙ্গে আরো কিছু সংযোগ করে কম্পোজিশন তৈরি করেছেন। আশপাশে সুন্দর সুন্দর গাছের পাতা পরে থাকত। পাশে কখনো হয়তো কাঠের ক্ষয়ে যাওয়া পাটাতনের অবস্থান তাঁর নজর কাড়ত। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে পূর্বাভিজ্ঞতা। যোগ হয়েছে বাংলাদেশের গ্রামের ছোট ছোট ব্রিজের ফর্ম। আগে যেমন, গ্রামে ছোট ছোট কনভেক্স আকৃতির ব্রিজ বনানো হতো, সেখান থেকে তিনি শক্তির প্রতীকরূপে শিল্পের ফর্ম হিসেবে এটিকে ব্যবহার করেছেন। এই ফর্মটি তিনি পেইন্টিং, প্রিন্টসহ সব মাধ্যমেই ব্যবহার করেছেন। ফলে ভাষাগত দিক থেকে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিতে খসড়াকে গুরুত্ব না দিয়ে লিথোগ্রাফি নিজে একটা ভাষার পরিতল সৃষ্টি করতে পারে—এমন বিষয়টি কিবরিয়ার ছবিতে যেমন এসেছে, তার চিত্রের বেলায়ও তা প্রযোজ্য। আর ভাষা হিসেবে ওরিয়েন্টাল বিষয়ের ছাত্র ছিলেন বলে সে শিল্পভাষাটি নিয়ে তিনি বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আসছেন। ফলত তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে লিথোগ্রাফি মাধ্যমটিতে একটি ভিন্ন শৈলীগত বৈশিষ্ট্য উপস্থিত হয়েছে সার্থকভাবে। (চিত্র.৫.২১)

এই সত্তর থেকে নব্বইয়ের দশকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায়তনে ক্রেয়নের বদলে তুষ ও গ্লাসমার্কার মাধ্যমে কাজ বেশি হয়েছে। বিষয় হিসেবে জড়-জীবন, ফিগার কম্পোজিশন নিরীক্ষামূলক কম্পোজিশন চর্চা হয়েছে। কিছু অবয়বচিত্র বাস্তবধর্মী ও নিরীক্ষাধর্মী উপায়ে অঙ্কিত হয়েছে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে

কালারের নিরীক্ষা। বাস্তবধর্মী উপায়ে অঙ্কিত কালার লিথোগ্রাফির একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো রোকেয়া সুলতানার সাধুর চিত্র। আর এ সময়ের কয়েকটি নিরীক্ষাধর্মী ফিগারেটিভ ও সাবজেক্টিভ লিথোগ্রাফি হলো— অশোক কর্মকার, অশোক বিশ্বাস, আহমেদ নাজির, রফি হক, মোহাম্মদ ইকবাল, রশিদ আমিন, আনিসুজ্জামান ও নাম না জানা এক শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র। তাই কয়েকজন শিল্পীর শিল্পকর্ম নিয়ে এখানে আলোকপাত করা হলো।

৫.১.৪.৪ 'একটি দেশের কাহিনী-২' লিথোচিত্রের করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক

ওয়াকিলুর রহমান জার্মানিতে বসে দেশীয় ইমেজ নিয়ে শিল্পকর্ম রচনা করেছেন অফসেট লিথোগ্রাফি প্রসেসে। দূতাবাস থেকে পত্রিকা এনে দেশে খবর পড়া তারা নিত্য অভ্যাসগত বিষয়। সেখানে দেশের নানা ধরণের খবর তাকে বিচলিত করত এবং ইমেজ সৃষ্টি করতে আগ্রহী করে তুলত। সেই বিষয়বস্তু নিয়েই তার এই 'একটি দেশের কাহিনী-২' (A tale of a Country-2) নামক লিথোচিত্রটি অঙ্কিত। (চিত্র৫.২২) বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় অফসেট প্রেসের সাথে তার যোগাযোগ ছিল। সেই সুবাদে অফসেট প্লেটের সবুজ রঙের 'কোটিনটি' ওঠানোর জন্য যে কেমিক্যালটি প্রেসে ব্যবহৃত হতো, সেটি দিয়ে তিনি ইমেজকে মুছে আরেক ধরনের ইমেজ সৃষ্টির প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এরপর জার্মানিতে যান **১৯৯১** সালে।

গ্রাফিক্সের ক্ষেত্রে তিনি যে ইমেজগুলো ব্যবহার করেছেন, তার নির্দিষ্ট কিছু কারণ আছে। সেখানে দুইধরনের ইমেজ পাওয়া যায়। এক হচ্ছে বাংলাদেশে পত্রিকা কেটে তার থেকে ইমেজ সংগ্রহ করা। আর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে ধরনের পরিবর্তন তৎসময়ে হচ্ছিল সেগুলো নিয়ে তার অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত ইমেজ। অভিজ্ঞতাটি ছিল এরূপ যে— তখন পূর্ব জার্মানি পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, সোশালিস্টদের পতন হচ্ছে এবং পাশাপাশি ইস্টার্ন ইউরোপের দেশগুলো পরিবর্তন হয়ে গেল। আবার তিনি নিজেও একটু বামপন্থী আন্দোলনের ভাবাদর্শে বা এসথেটিক্সে জড়িত ছিলেন বলে তাঁর নিজের মধ্যেও একটি বিরাট পরিবর্তন হচ্ছিল। অন্যদিকে তিনি যেহেতু পূর্ব জার্মানিতে ছিলেন সেখানে দেখতে পেলেন— বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন এই জায়গাগুলোতে গ্রাফিক্স প্রিন্টের একটি বিরাট জনপ্রিয়তা ছিল— সরকারিভাবেই হোক আর যেভাবেই হোক। গ্রাফিক্সের বহুবিধ ব্যবহার সেই সমাজে প্রচলিত ছিল। ওখানকার শিল্পীরা গ্রাফিক্সপ্রিন্টগুলোকে একটি সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকেও চর্চা করতেন।

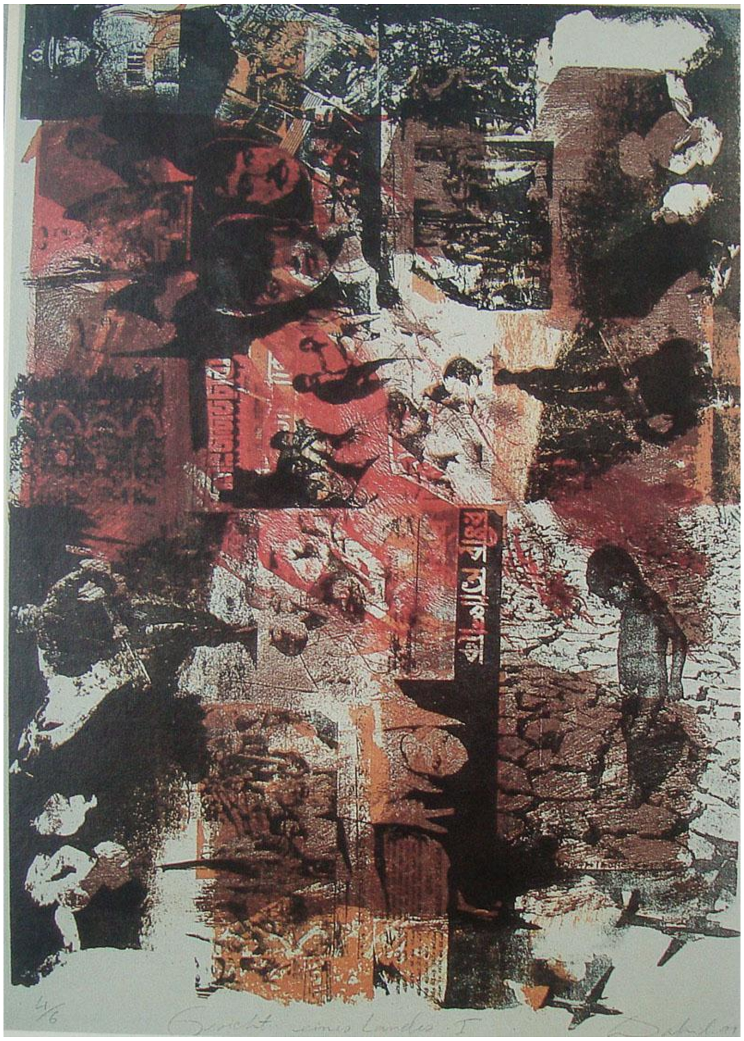

Plate: 5.22, Wakilur Rahman, Alugraphy, A tale of a Country2, 59x43 cm,1991

সেই সময়ে তিনি যে অ্যাবস্ট্র্যাকশনে যাননি, তার পেছনে একটি কারণ হলো সময় গ্রুপের কথা। আর ওই সময়ে পূর্ব ইউরোপের সোশ্যাল কমিটমেন্টের জায়গা থেকে শিল্পীরা গ্রাফিক্স নিয়ে যে কাজ করেছেন। যার ফলে তিনি ইমেজ প্রধান কাজ করেছেন এবং তাতে রয়েছে উপরোক্ত দুধরণের বিষয়বস্তু। শৈলীগত দিক দিয়ে এগুলো কোলাজ ধর্মী ইমেজকে প্রকাশ করছে। ফলে বলা যেতে পারে, সেই ইমেজ গুলোর মধ্যে দুইধরনের ইমেজের উপস্থিতি বিদ্যমান, একঃ বাংলাদেশের ইমেজ— পত্রিকা থেকে নেয়া, আর দ্বিতীয়টি আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিবর্তন। এপর্যায়ে তিনি ষাট-সত্তরটি কাজ করেছেন এবং এই কাজগুলো নিয়ে পরবর্তী সময়ে ঢাকায় প্রদর্শনী করেন। তিনি তার এই কাজগুলোর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত গ্রাফিকের ফ্লাট গুণাগুণের কারণে পরে এ মাধ্যমে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। আবার ইন্টাগলিও প্রিন্টের মধ্য দিয়ে ডেপথ প্রিন্টের সহায়তায় তা আবার ফিরে পান। জার্মানিতে তখন প্লেনোগ্রাফিজাতীয় প্রিন্টকে

ফ্লাট প্রিন্ট এবং ইন্টাগলিও জাতীয় প্রিন্টকে ডেপথ প্রিন্ট বলা হতো। ফলে পরবর্তী সময়ে এই ফ্লাট গুণের জন্য স্ক্রিন প্রিন্টের প্রতিও তার তেমন কোনো আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি।

তবে লিথোগ্রাফিতে ইমেজ ট্রান্সফারের যে সম্ভাবনা ছিল বা আছে সেখানটাতে, বিশেষ করে টেকনিক্যালি ফটোগ্রাফিক ইমেজ এদেশে নিশ্চয়ই এর আগেও হয়েছে । কিন্তু এদেশে কারিগরি সুবিধাটা বেশি না থাকায় খুব একটা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হয়েছে এমন নয়। অন্যদিকে অফসেট প্রিন্টের অফসেট প্লেটে ম্যানুয়ালিও কাজ কম করা হয়েছে। কোলাজ চরিত্র ও ফটোগ্রাফিক ইমেজ কাজে ব্যবহার করা এবং অফসেটের অন্যান্য সম্ভাবনা যেমন ইমেজ মুছে ফেলার মতো প্রক্রিয়া ইত্যাদির ব্যবহার— আমাদের মতো দেশের পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো একটি পরিচিতি ছিল।[১৫৫]

৫.১.৪.৫ 'রাতের প্রতিনিধি' লিথোচিত্রের করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক

নিরীক্ষাধর্মী চরিত্রময়তার অধিকারী শিল্পী অশোক বিশ্বাস **১৯৯১–১৯৯৩** সাল পর্যন্ত লিথোগ্রাফি নিয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার সময় লিথোগ্রাফির গতানুগতিক করণ-কৌশল ব্যবহার না করে অন্য ধরনের কৌশল অবলম্বন করে লিথোচিত্র রচনা করেছেন। যেমন: তার হাত দিয়েই ঢাকা চারুকলার প্রিন্টমেকিং বিভাগে প্রথম গ্লাস মার্কারের ব্যবহার আরম্ভ হয়। এরপর ভারতে অধ্যয়নের সময় বিষয় হিসেবে রাতের চাঁদ আর কুকুরকে 'নাগরিক প্রতিনিধি' নামে আখ্যায়িত করে চিত্রিত লিথোগ্রাফিটিতে তিনি একটু ভিন্ন প্রক্রিয়ায় নিরীক্ষণ করেছেন। যেমন: শান্তিনিকেতন বা বাংলাদেশে বেশির ভাগ লিথোচিত্রে প্রথম ইম্প্রেশনে কালো রঙের প্রিন্টটি নিয়ে তারপর 'ফিটকিরি' বা 'এলাম ওয়াটার' দিয়ে ইমেজ ব্যতীত অন্য অংশ থেকে এরাবিক গামকে ধুয়ে নিরপেক্ষ (নিউট্রাল) করে পুনরায় রিসেনসিটাইজ করেন। ফলে পুরো স্টোনটিতে পুনরায় কাজ করা যায়। সেইসঙ্গে পূর্ববর্তী ইমেজকে হগু চক দিয়ে ঘষে তুলে ফেলে নাইট্রিক এসিড দিয়ে এচিং করে প্রিন্ট নিলে পূর্বের ইমেজ প্রিন্টে আসবে না। রিভার্স পদ্ধতিতে গিয়েও নন-ইমেজ অংশে প্রিন্ট নিয়ে থাকে। অথচ অশোক বিশ্বাস সেখানে নন-ইমেজ অংশকে না ঘষে, প্রথমেই রিসেনসিটাইজ না করে গ্রিজমুক্ত করার জন্য তারপিন দিয়ে ওয়াশ আউট করেন। এবার জেট পাউডারের গুঁড়ো পানি দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হয়। তারপর এলাম ওয়াটার দিয়ে রিসেনসিটাইজ করেন। তখন ইমেজ ও নন-ইমেজ উভয় অংশই রিসেনসিটিভ হয়ে যায়। এইভাবে একই প্লেটকে দু-তিনবার ব্যবহার করেছেন। এর থেকে বেশিবার ব্যবহার করা যায় না। কারণ এতে গ্রেইন ভেঙে যায় এবং ইমেজকে বড় করে দেখলে সাদা ধরনের ডটস চোখে পড়বে। মূল সুবিধাটি হলো, বারবার গ্রেইন না

[155] ওয়াকিলুর রহমান, ব্যক্তিগত স্বাক্ষাৎকার, ৯ এপ্রিল ২০১৭

করে একই প্লেটকে কয়েকবার ব্যবহার করে প্ররিশ্রম কমিয়ে আনা যায়। সেইসঙ্গে সুবিধা হলো আগের ড্রইংটি থেকে যায়। অশোকের লিথোচিত্রটিতে প্রথমে পাতা ও কুকুরের ফর্মকে গামিং করে অন্য অংশে গোলাপি ধরনের রংটি প্রথম ইম্প্রেশনে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ওয়াশ আউট করে ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে সবুজ রঙের প্রিন্টটি নেওয়া হয়েছে। আবার একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কালো রঙের প্রিন্ট নেওয়া হয়েছে। (চিত্র. ৫.২৩)

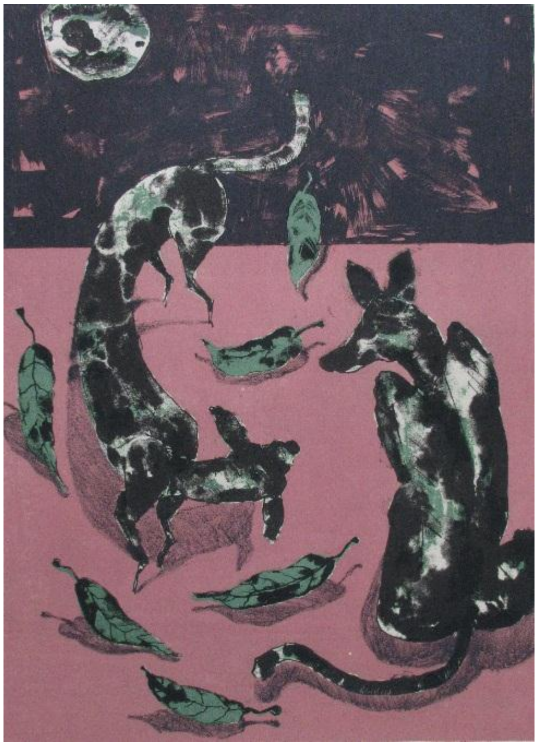

Plate: 5.23, Ashok Biswas, Lithography, Rater Pratinidhi, 1992, (collection-Chitark gallery) 12x18 inch (aprox),

Plate: 5.24, Ashok Biswas, litho, 12x18 inch (aprox), 1992, (collection-Chitark gallery).

৫.১.৪.৬ 'ড্রিম অব দ্যা ভিক্টোরি' লিথোচিত্রের করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক

প্রথম থেকেই নিরীক্ষাপ্রিয় শিল্পী আহমেদ নাজিরের এটি একটি স্টোন লিথোগ্রাফি (চিত্র. ৫.২৫)। ১৯৯৫ সালে করা তার এই 'ড্রিম অব দ্যা ভিক্টোরি' লিথোগ্রাফিটিতে লাল রঙের অংশে হ্যাঁন্ড টাচ করা, যাকে লিথোগ্রাফির ভাষায় 'হ্যান্ড টিন্টেড লিথোগ্রাফি' বলা হয়ে থাকে। ফলে বলা যেতে পারে যে, বাংলাদেশেও 'হ্যাঁন্ড টিন্টেড লিথোগ্রাফি' চর্চা হয়েছে। তার 'ওয়ার ফাইল' নামক সিরিজ ছবিগুলো লিথোগ্রাফির উন্নত সংস্করণ: ডিজিটাল প্রিন্ট বা সি প্রিন্ট মাধ্যমে করা। তিনি হার্টের এক্স-রে থেকে দেখতে পেলেন হার্টের মধ্যে নানারূপ শেপ, ফর্ম ও লাইন রয়েছে। এই ফর্মগুলোকে তার ছবির ফর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সর্বোপরি ফটোশপে এরূপ একটি ইমেজের ২৫−৪০টি লেয়ার তৈরি করতে তাঁর

এক মাস থেকে এক বছরও সময় লাগে। যেমন: তার 'ওয়ার ফাইল-২০১' নামক ছবিটি তারই একটি উদাহরণ।(চিত্র.৫.২৬)

Plate: 5.25, Ahmed Nazir, Dream of victory,mixed technique, Litho, 51X36cm, 1995

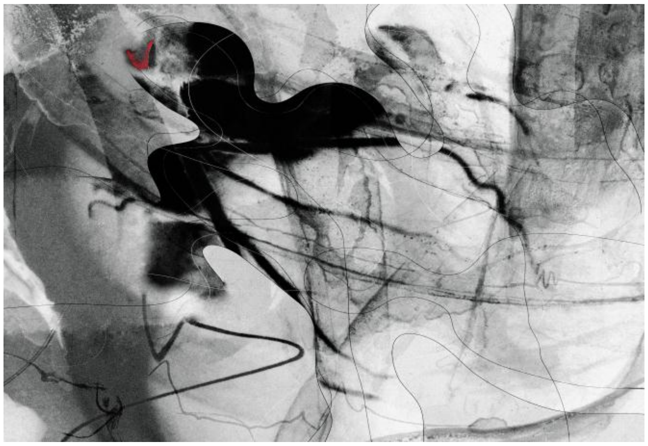

Plate: 5.26, The war file 201 , digital print , 65X95 cm , 2011

Plate: 5.27, Anisuzzaman, Lithography, The Moon, 17x17inch, 1997.

Plate: 5.28, Anisuzzaman, Lithography, Joy of season, 17x17inch, 1998.

৫.১.৪.৭ 'দ্য মুন' লিথোচিত্রের করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক

আনিসুজ্জামান রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় লিথোগ্রাফির করণ-কৌশলগত দিকের একটি কৌশল ('রিভার্স কৌশল') নিয়ে কিছু লিথোগ্রাফি চিত্র রচনা করেছেন। পান্তাভাতের প্লেটে মরিচ ও পেয়াজ দিয়ে গ্রামের কৃষক পেট ভরে খেয়ে মাঠে যান। সেই প্লেটকে তিনি চাঁদের সাথে তুলনা করে চিত্রিটি অঙ্কন করেছেন। তার এই কাজগুলোর বেশির ভাগই সাবজেক্টিভ শিল্পশৈলীর অন্তর্ভুক্ত। কিছু লিথো

চিত্রে বাস্তবিক উপায়ে সাবজেক্টিভ অনুভূতিকে অবজেক্টিভ রিয়েলিটির দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। ফলে শিল্পকর্মগুলো এক্সপ্রেশনিস্ট ধারারও অন্তর্ভূক্ত বলে মনে হবে। মূলত তার এই শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের শিল্পকলা লিথোগ্রাফির রিভার্স পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়। পদ্ধতিটি তিনি এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে, সাবজেক্টিভ উপস্থাপনে কখনো কখনো তার বিষবস্তু হয়ে উঠেছে বাস্তবধর্মী। ফলে লিথোগ্রাফি চিত্রতলে যুক্ত হয়েছে ভিন্ন মাত্রা। (চিত্র. ৫.২৭, ৫.২৮)

৫.১.৪.৮ 'আউল অ্যান্ড ফিলিং' চিত্রটির করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক (চিত্র. ৫.২৯)

'আউল অ্যান্ড ফিলিং' নামক লিথোচিত্রটি শিল্পী ফখরুল আলম বিশ্বভারতী বিশ্বদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় এম.এফ.এ দ্বিতীয় পর্বে অঙ্কন করেছিলেন। (চিত্র. ৫.২৯) চিত্রটি লিথো স্টোনে অঙ্কন করেছেন। তার সঙ্গে করণ-কৌশলগত দিক দিয়ে যোগ হয়েছে রিভার্স ও রি-রিভার্স পদ্ধতি। ছবির ভাষাগত দিকটি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন—শান্তিনিকেতনের প্রকৃতিতেই তো সব রয়েছে। নিজের অজান্তেই শিল্পী ফকরুল আলম কাকরের মধ্যে মানব মুখাবয়ব দেখতে পেলেন। ক্যাকটাসের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন মানব অবয়ব।

সেখানে তিনি গাছের নিচে পড়ে থাকা পাতার টুকরো, গাছের বাকলের টেক্সচার, প্রজাপতি, পেঁচা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মানব অবয়বের সরল ফর্মের দিকে যাত্রা শুরু করেছেন আত্মানুসন্ধানের নেশায় মত্ত হয়ে। খুঁজছিলেন কীভাবে একটু নতুন প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির খেলাকে নিজের মতো করে উপস্থাপন করা যায় সে বিষয়টিকে অনুসন্ধান করেছিলেন। সনৎকরের কথামতো কাজ করতে গিয়ে তিনি প্রকৃতি থেকে পেয়ে গেলেন নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। ফলে প্রকৃতির রং থেকে ফর্মে এসেছে ভিন্ন মেজাজের বর্ণবৈশিষ্ট্য, এসেছে পেঁচা ও গাছের আকৃতির মধ্যে মানব অবয়ব, যা শিল্পীর নিজস্ব ভুবনের পরিচয় বহন করে। ফর্ম হিসেবে ক্যাকটাস এসেছে বারবার। প্রজাপতির পড়ে থাকা পাখার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন নারীর অবয়ব। স্টোনের মধ্যেও পেয়েছেন এরূপ নানা ফর্মের খেলা। বিষয়বস্তু হিসেবে বরাবরই সেই সময়ের নিজস্ব গল্প উঠে এসেছে। পদ্ধতির ক্ষেত্রে লিথোগ্রাফি মাধ্যমে নানা পদ্ধতির ব্যবহার এসেছে বারবার। শিল্পী নিজে তুষ বানানো শিখেছিলেন, যেটা সেই মাধ্যমের প্রতি প্রেম তৈরি না হলে কেউ সাধারণত করেন না। তবে এত ধরনের কাজ দেখার অভিজ্ঞতা এবং ধরন সম্পর্কে পড়াশোনার কারণে তার পরোক্ষ প্রভাব মনের অজান্তে শিল্পীর কাজে এসে গেছে বলে শিল্পী মোটেও অনুতপ্ত নন। শিল্পী যেভাবে তৎসময়ে যে পদ্ধতিতে একের পর এক ইম্প্রেশন নিয়ে রিভার্স, রি-রিভার্স ইত্যাদি প্রসেসের সমন্বয়ে লিথোগ্রাফি চর্চা করেছেন সে

সময়টিতে মো. আনিসুজ্জামান ছাড়া আর কেউই লিথোগ্রাফিতে এ পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করেননি। তবে একধরনের রোমান্টিকতার ছাপ তার সমস্ত লিথোচিত্রের মধ্যেই বর্তমান।

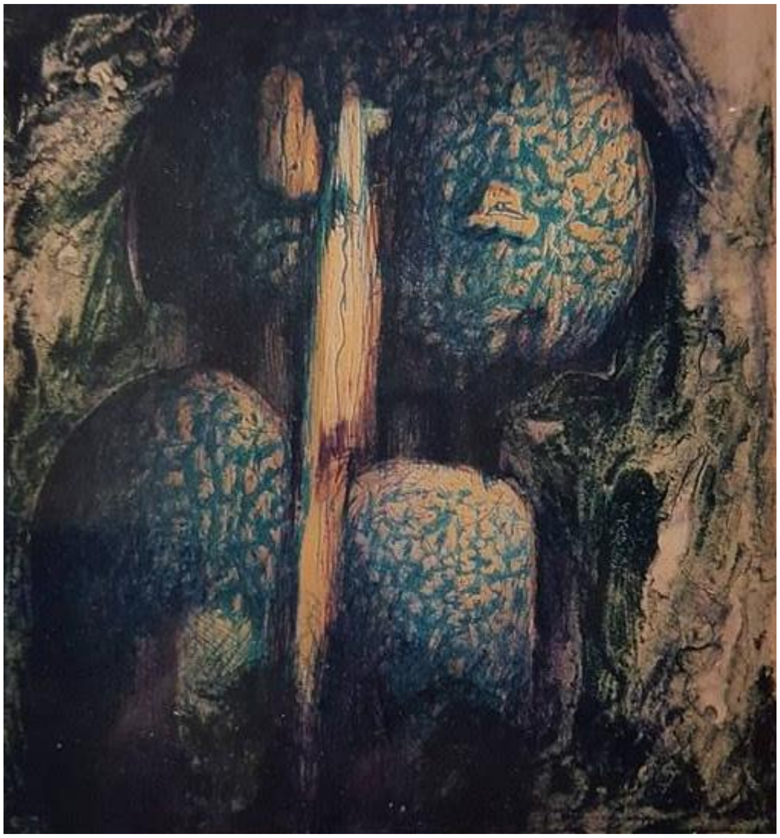

Plate: 5.29, Fakrul Alm Tofa, Lithography, ?

এটি (চিত্র. ৫.২৯) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত এম.এফ.এ দ্বিতীয় পর্বের শেষের দিকে করা লিথোগ্রাফি চিত্র। এই কাজটিতে দুটি ফর্ম একটি অপরটির সঙ্গে উলম্ব ফর্ম দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে। উলম্ব রেখাটি ছবিটিকে অনেকটা দুটি ভাগে ভাগ করেছে। সমন্বিতভাবে শিল্পী একটি পেঁচার সরলীকরণ ফর্মকে ক্যাকটাসের ফর্মের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সমস্ত কিছুকে একটু অতিরঞ্জিত করে দেখতে শিল্পী ভালোবাসতেন। একটু অন্য রকম করে দেখলে বাতাসের দোলা ও নেচারের সঙ্গে ফর্মের এক হয়ে যাওয়ার খেলাটি নিমগ্ন চিত্তে শিল্পী শান্তিনিকেতনে গিয়েই বেশি অনুভব করেছেন। চোখের বদলে দুটি ছোট ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে। ছবিটির ব্যাকগ্রাউন্ডে ওয়াশ পদ্ধতিতে তুষ দিয়ে অঙ্কিত ইমেজ মূল ফর্মের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য তুলনামূলকভাবে একটু ডার্ক করে অঙ্কিত। এখানে রিভার্স, রিভার্স পদ্ধতিতে কন্টি, গ্লাসমার্কার ও তুষ দিয়ে সমস্ত ইমেজটি অঙ্কন করা হয়েছে বেশ কয়েকটি ইম্প্রেশন নিয়ে।

Plate: 5.30, Nihar Ranjan Shingha, Discover, Lithography, 2005, 26x38 cm

৫.১.৪.৯ 'আবিষ্কার' (Discover) লিথোগ্রাফির করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক (চিত্র.৫.৩০)

'আবিষ্কার' লিথোগ্রাফিটি শিল্পী নিহার রঞ্জন সিংহ ২০০৫ সালে অঙ্কন করেন। ভারতের রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ও পিএইচ.ডি গবেষণার সময়ে লিথোগ্রাফি মাধ্যমে শিল্পচর্চা করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এর ধারা অব্যাহত রেখেছেন। তিনি মূলত লিথোগ্রাফি মাধ্যমে রিভার্স পদ্ধতি ব্যবহার করে মাধ্যমগত ও বিষয়ভিত্তিক নিরীক্ষা করেছেন— পরিবর্তনশীল প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতীকী উপস্থাপনের মাধ্যমে।(চিত্র.৫.৩০) মূল বিষয় অপরিবর্তিত রেখে প্রয়োগরীতি ও করণ-কৌশলের উৎকর্ষতা তাঁর লিথোগ্রাফিকে বিশেষায়িত করেছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করে। এ মাধ্যমে তাঁর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কাজ দেশেবিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। এ মাধ্যমে তাঁর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কাজ দেশেবিদেশে প্রশংসিত হয়েছে।

৫.১.৫ বর্তমান সময়ের লিথোচিত্রের করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক

বর্তমান সময়ে এসে লিথোগ্রাফি মাধ্যমের প্রতি প্রবীণ ও নবীন প্রজন্মের একধরনের আকর্ষণ তৈরি হয়েছে। ফলে উভয় প্রজন্ম লিথোগ্রাফি মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। তবে ২০০৪ সালের পর করণ-কৌশলের দিক থেকে বলপয়েন্ট লিথোগ্রাফির চর্চা আরম্ভ হলে কয়েকটি ক্লাসে এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। উড লিথোগ্রাফি যুক্ত হয়েছে ২০০৪ সালে। অ্যালুমিনিয়াম প্লেট-লিথোগ্রাফির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন ভারতের শিল্পী অজিৎ সিল ২০১০ সালে। এই প্লেট-লিথোগ্রাফির প্রাত্যহিক চর্চা আরম্ভ হয় ২০১২ সাল থেকে, যা বর্তমানে মূল চর্চা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ স্টোন বারবার গ্রেইন করার ফলে ক্ষয়ে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে এবং স্টোন কমে আসছে। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মালয়েশিয়ান শিল্পী রাহমান মোহামেদ ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফির একটি কর্মশালা পরিচালনা করেন। ফলে ওই কর্মশালার মধ্য দিয়ে ওয়াটারলেস ও ওয়াটারযুক্ত লিথোগ্রাফির সমন্বয়ে ইমেজ সৃষ্টির প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হলো, যা কোনো বইয়ে আজও লিখিত আকারে আসেনি। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে ‘ওয়াটার বেইজ অয়েলি মাধ্যমে’-র মতো নিজস্ব অন্য আরেক ধরনের শিল্প মাধ্যম ও অন্যান্য ছোটখাটো করণ-কৌশল। ভাষাগত দিক থেকে এই সমসাময়িক সময়ে বিভিন্ন দেশের শিল্প চর্চার সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষভাবে পরিচিত হওয়ার ফলে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চর্চায়ও এর ছোঁয়া লেগেছে। ভাষা হয়ে উঠেছে আধুনিক, উত্তরাধুনিক ও সমসায়িক গুণাবলিবিশিষ্ট। প্রবীণ প্রজন্মের মধ্যে এই সময়ে কাজ করে যাচ্ছেন এমনদের মধ্যে সমরজিৎ রায় চৌধুরী, হাশেম খান, মো. রফিকুন্ নবী, মনিরুল ইসলাম, মাহমুদুল হক হামিদুজ্জামান, আব্দুস সাত্তার, আব্দুস শাকুর শাহ, মোহাম্মদ ইউনুস, শহীদ কবির, নাইমা হক, ফরিদা জামান, রোকেয়া সুলতানা, জামাল আহমেদ, রনজিৎ দাস, মোস্তাফিজুল হক, লালা রুখ সেলিম, শিশিরকুমার ভট্টাচার্য, শেখ আফজাল, আলপ্তগীন তুষার প্রমূখের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে তাদের মধ্যে মো. রফিকুন্ নবী, মোহাম্মদ ইউনুস, শহীদ কবির, প্রমুখের লিথোগ্রাফি চিত্রের করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৫.১.৫.১ বর্তমান প্রবীন প্রজন্মের লিথোচিত্রে করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত দিক পর্যালোচনা

৫.১.৫.১.১ ‘দি ক্রো’ লিথোচিত্রটির করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক (চিত্র. ৫.৩১)

রফিকুন্ নবীর ছাত্রাবস্থায় বেশির ভাগ লিথোগ্রাফি কন্টিতে করা। বর্তমানে তার যে তিনটি লিথোগ্রাফি ঢাকা চারুকলার প্রিন্টমেকিং বিভাগে সংগ্রহে রয়েছে তার মধ্যে ল্যান্ডস্কেপ দুটি বি.এফ.এ দ্বিতীয় বর্ষে

করা। আর ২০০৮ ও ২০০১৪ সালে নিজস্ব শৈলীতে করা লিথোগ্রাফি দুটির একটি বিভাগের সংগ্রহে রয়েছে। ২০১৪ সালে আঁকা 'কাকগুলো' নামক লিথোগ্রাফিটি মূলত সাদা আর কালো রঙের খেলা। 'কালো রং'কে বিষয় করে কাজ করার জন্য তিনি কাককে বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছেন। চিত্রটি করণ-কৌশলের দিক থেকে লিথেগ্রাফিক তুষ, ক্রেয়ন বা কন্টি ও গ্লাসমার্কারের মাধ্যমে অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে অঙ্কিত। প্রথমে লালচে কালো রঙের ইম্প্রেশন নেওয়া হয়েছে। তারপর খুব হালকা ধরনের হলুদ টোন টিন্টিন কালারের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছে এবং আরেকটি প্লেট ব্যবহার করে দ্বিতীয় ইম্প্রেশনটি নেওয়া হয়েছে। ছবিটিতে অনেকগুলো কাক প্লেট থেকে খাবার খাচ্ছে। পেছনে রয়েছে সূর্য। ভাষাগত দিক থেকে চিত্রটিতে শুধু যে লিথোগ্রাফির চিত্রভাষা নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে, তা নয়। সামগ্রিক প্রিন্টমেকিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সাদা আর কালোর খেলা। সেই খেলাটিই শিল্পী খেলেছেন প্লেট লিথোগ্রাফিতে। ২০১৪ সালে আঁকা 'কাকগুলো' নামক লিথোগ্রাফিটি হলো কালোর বিভিন্ন রকম বিস্তার বা ব্ল্যাকের ডিস্ট্রিবিউশন। 'কালো রং'কে বিষয় করে কাজ করার জন্য তিনি কাককে বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছেন। দাঁড়কাক পুরো কালো এবং কালোর মধ্যে ভেরিয়েশন নেই বলে তিনি কখনো দাঁড়কাক আঁকেননি। এ ধরনের সাদা-কালোর খেলা তিনি পেইন্টিং ও জলরঙেও করে থাকেন। বিষয়বস্তু হিসেবে আসে কাক, মহিষ ইত্যাদি। তিনি মনে করেন, সব মাধ্যমের একটা ধর্ম রয়েছে। প্রিন্টমেকিংয়ে সাদা ও কালো বা এর মধ্যবর্তী টোনগুলোকে প্রকাশ করতে পারলেই প্রিন্ট ভালো লাগে। অর্থাৎ সাদা-কালোর খেলা কতটা সফলভাবে করতে পারা যায়, তার ওপর নির্ভর করে ছবির ভালো বা মন্দ এবং সেইসঙ্গে মাধ্যমটিতেও কাজ করা হয়ে গেল। উপলব্ধিবোধ থেকে তিনি বলেন:

> 'কোনো ছবির 'বিষয়'টা আসলে আমার কাছে বড় কিছু না। বিষয়টা হলো উপলক্ষ মাত্র, আর বাকিটা হলো ছবির বাঁধুনি। বিষয় আমাদের রং ও ফর্ম নির্বাচন করতে সাহায্য করে। সংগীতের বেলায় যেমন মিউজিক্যাল হ্যান্ডস দরকার, হ্যান্ডস ছাড়া গানের অবস্থা কিন্তু বেহাল। 'বিষয়' হলো সে রকম, আর গানটি বা ছবি আঁকাটা মূল। আমরা বিষয় দেখে আপ্লুত হই, আসলে বিষয়টা তা নয়। ছবিতে কীভাবে ফর্মগুলো সাজানো হলো? সেখানে কোথাও একটি রঙের অধিক্য বেশি পড়ে যেতে পারে। সেটার পরিপ্রেক্ষিতে বা সেটাকে ম্যানেজ করার জন্য অন্য কোথাও একটু কিছু করা বা কিছু ফোটা দেওয়া বা অন্য কী ভাবে কিছু করলে ভালো লাগবে? আসল বিষয়টি সেখানে।'[১৫৬]

---

156 রফিকুন্ নবী, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ৩০ অক্টো. ২০১৬

Plate: 5.31, Rafiqun Nabi, Plate-Lithography, 15x21 inch, 2014. Collection-F.F.A, D.U.

অনেক ধরনের ম্যানেজ করার ব্যাপার থাকে। যেমন তিনি ‘কাকগুলো’ নামক ছবিতে কাকগুলো বাদে বাকি ফাঁকা স্পেসে কিছু ডটস দিয়েছেন। কিছু চিকন, মোটা লাইন ও কিছু ডেকোরেটিভ ফর্ম ব্যবহার করেছেন। ছবিকে ম্যানেজ করার জন্য কিছু ডেকোরেটিভ ফর্ম থাকতেও পারে, মাঝেমধ্যে ভালোই লাগে। তিনি যদি ছবিতে সেই ডট্সটি না দিতেন তাহলে কীভাবে বুঝতেন যে—এখানে ডটসের প্রয়োজন আছে কি নেই? নাকি অন্য কিছু প্রয়োজন? যখনই ডটসটি দেওয়া হলো তখনই তিনি বুঝতে পারলেন যে, হ্যাঁ, দিলে ভালোই লাগছে। না দিলে তো বুঝতেই পারতেন না। আসলে তিনি বিশ্বাস করেন, একজন শিল্পী সব সময় তার নিজেকে অতিক্রম করার খেলায় মত্ত থাকেন। শিল্পীরা একটি কাজ করতে যে সময় লাগায়, একটি শিশু ১০ মিনিটে কীভাবে তা অভিব্যক্ত করে? এই প্রশ্নগুলোর অণুপ্রেরণা থেকেই সরলতা নিয়ে কাজ করেছেন। ছাত্রাবস্থায় রশিদ চৌধুরীর একটি বক্তব্য তাকে আজও অনুপ্রাণিত করে। রশিদ চৌধুরী বলতেন, একটি মোটা ব্রাশ দিয়ে একটা বড় ক্যানভাস তো অনেক সহজেই ভরাট করে দেওয়া যায়। কিন্তু মজাটা তখন হয়, যখন পুরো ক্যানভাস জুড়ে অনেক ধরনের ব্রাশের টোনে ভরে ওঠে। এভাবে কালো রংকে বিষয় করে অঙ্কিত লিথোগ্রাফিটির মধ্য দিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষণ সম্ভব হয়েছে সেটি বাংলাদেশর লিথোগ্রাফিক শিল্পভাষাকে আরো অনেকটা সমৃদ্ধ করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৫.১.৫.১.২ ‘ইটের ভাটা’ বিষয়ক লিথোগ্রাফি চিত্রটির করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক

শিল্পী শহীদ কবির ২০১৫ সালে ঢাকা চারুকলার প্রিন্টমেকিং বিভাগে জয়নুল উৎসব উপলক্ষে একটি অ্যালুমিনিয়াম প্লেট-লিথোগ্রাফি চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন গাবতলীর পাশে আমিন বাজার এলাকার ইটের ভাটার নিসর্গচিত্র বা ল্যান্ডস্কেপ। এই ছবি আঁকার পূর্বে শিল্পী নিজে সেখানে গেছেন, ড্রইং করেছেন, প্যাস্টেল কালারে পেইন্টিং করেছেন। লিথোচিত্রটি প্রথম ইম্প্রেশনে সেপিয়া রং দিয়ে প্রিন্ট নেওয়া হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় ইম্প্রেশনে আরেকটি প্লেট দিয়ে রেজিস্ট্রেশন অনুসরণ করে একটি ফ্লাট বা সমতলীয় পদ্ধতিতে সাদা রঙের কাছাকাছি একটি রং নির্বাচন করে প্রিন্ট নেওয়া হয়েছে।

ভাষাগত দিক থেকে সমগ্র প্রিন্টমেকিংয়ের ভাষাকে শিল্পী শহীদ কবির মনে করেন:

> ‘মাটিতে হাতের ছাপ, পায়ের ছাপ—এই রকমই হলো ছাপচিত্র। এর মধ্যে সাধনা আর প্রেম ছাড়া তেমন বিশেষ রহস্য নেই। যেভাবে আমি পেইন্টিং করি, একইভাবে একই তুলিতে ক্যানভাসে রঙের বদলে মেটালের ওপর আঁকাআঁকি করে শুধু নিজেকে প্রকাশ করতে চাই। আঙুলের ছাপের টিপ সইয়ের মতোই শিল্পী তার ব্যক্তিত্বের ছাপ রাখে ছাপচিত্রে। আমি এক সামান্য কর্মী মাত্র। এর থেকে বেশি বলার বা লেখার জ্ঞান আমার নেই।’[১৫৭]

Plate: 5.32 Shahid Kabir, Painting, painting, ?

Plate Litho, 27x33 cm, 2015, Collection-F.F.A, D.U.

Lithography & Mixed media (Water colour, Acrylic, sand), 2017

Lithography & Mixed media (Water colour, Acrylic, sand), 2017

পরে ২০১৬ সালের জয়নুল উৎসবে তিনি আবার এই প্রিন্টগুলোর একটির ওপর জলরং এবং আরেকটির ওপর অ্যাক্রেলিক রং দিয়ে আরেক ধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। (চিত্র.৫.৩২) এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন: কয়েকটি বিষয় সরা বিশ্বে প্রচলিত আছে। এক হলো: একজন শিল্পীর পেইন্টিং থেকে অন্য একজন শিল্পী উৎসাহিত হয়ে তার মতো করে অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারেন। তিনি ‘হোমেজ টু পিকাসো’ নামক চিত্রটি এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অঙ্কন করেছিলেন। এখানে শিল্পীর দুটি ব্যক্তিত্ব কাজ করে। যেহেতু পিকাসো থেকে নিয়েছে, সেহেতু পিকাসোর ব্যক্তিত্ব কাজ করছে এবং সেইসঙ্গে শিল্পী নিজের

---

[157] শহীদ কবির, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ২০১৬; Imprint (An Exhibition by masters), Edge Gallery, June-2016

মতো করে করছেন বলে উভয়ের ব্যক্তিত্ব মিলে আরেক ধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত. আনসেল্‌ম কিফারকে (Anselm Kiefer, জন্ম ৮ মার্চ ১৯৪৫) তিনি দেখেছেন, একটি নিসর্গের ফটোগ্রাফ করে বড় ক্যানভাসে প্রজেক্টার দিয়ে প্রতিবিম্ব ফেলে ড্রইং করে এরপর বালু বা অন্য বস্তুগুলোকে রং ও আঠার সাহায্যে যুক্ত করে হাতে কাজ করেছেন। কিছু কিছু জায়গায় ফটোগ্রাফির ইমেজ ইচ্ছা করে রেখেছেন, যেন বোঝা যায় যে, উনি ফটোগ্রাফি দেখে অঙ্কন করেছেন। ঠিক এ বিষয়গুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে শিল্পী লিথোগ্রাফিটি একটা অনুভূতি থেকে এঁকেছিলেন। বর্তমানে শিল্পী শহীদ কবির পূর্বের লিথোগ্রাফিটির ওপর কাজ করে আরেকটি অভিব্যক্তি প্রকাশ করছেন। তিনি মনে করেন, এভাবেও শিল্পীর কাজ করা উচিত। কারণ শিল্পী যখন কোনো শিল্পকর্মে স্বাক্ষর করেন, তখন তিনি তার স্বত্বাধিকারী হয়ে যান। তিনি তার একটি এচিং চিত্রে বালুকে আঠা দিয়ে সংযুক্ত করেছিলেন। নতুন দর্শনে বলে শিল্পী যখন তার কাজে স্বাক্ষর করছেন তিনি তার মালিক হয়ে যাচ্ছেন। কোথাও এরূপ কোনো স্বাক্ষর করা হয়নি যে—শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে এরূপ কোনো কিছু করা যাবে না, আর কোনো প্রিন্টের ওপর হ্যান্ড টাচ করতে পারা যাবে না। ১৯৮৬ সালে শিল্পীর স্ত্রীর একটি শিল্পকর্ম তাইওয়ান বিয়েনালে গ্রান্ড প্রাইজ পেয়েছিল। সেখানে তিনি ছবির নামকরণে লিখেছিলেন 'ড্রাইপয়েন্ট ইলুমিনেটেড বাই ওয়াটার কালার'। বিচারকগণ বলেছিলেন, যেহেতু শিল্পী স্বীকার করে বলেছেন যে, শিল্প সৃষ্টির জন্য জলরং ব্যবহার করেছেন, তাই এটিকে পুরস্কৃত করাই যায়। তাই তিনি বলছেন, এ বিষয়গুলো এখন স্বীকৃত। যেমন: আগে প্রিন্টের ওপর ওয়াটার কালার দিয়ে টাচ করে ছবি আঁকা হতো বলে এটিকে 'হ্যান্ড টিন্টেড লিথোগ্রাফি' বলা হতো। তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে আধুনিক সময়ে এসে শিল্পী এবং তার স্ত্রীর শিল্পকর্মে। তবে শিল্পী নিজে যে দুটি প্রিন্টে দুটি আলাদা ধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন তার সূত্র ধরে তিনি বলেন: একটিতে শুধু জলরং দিয়ে ছবি এঁকে শিল্পকর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে। অন্যটিতে অ্যাক্রিলিক কালারের সাহায্যে আঁকা। মাঝেমধ্যে বাদাম ভাজি করা কালো পোড়া বালুগুলো আইকা আঠা দিয়ে সংযুক্ত করে তার ওপর অ্যাক্রিলিক রং ব্যবহার করে অঙ্কিত হয়েছে। একটি ছবি খুব সফট এবং অন্যটি বোল্ড চরিত্র ধারণ করেছে। এভাবে একটি প্রিন্টের দশটি এডিশনের ওপর আবার কাজ করে অন্য দশ রকম অভিব্যক্তিসম্পন্ন চিত্র রচনা সম্ভব এবং প্রিন্টমেকিং সে ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি বলেন, শিল্পকে এখন 'আর্ট পিস' বলা হয়, এর কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। প্রিন্টমেকিংয়ের ভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রিন্টমেকিংয়ের মতো সবই একটি কপিকারক মাধ্যম, অর্থাৎ শিল্পীর মনের অভিব্যক্তিকে ব্যক্ত করে বা কপি করে। সে ক্ষেত্রে প্রিন্টমেকিং ও পেইন্টিংয়ের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। পেইন্টিং, অয়েল

প্যাস্টেল, ড্রইং ইত্যাদি শিল্পীর সঙ্গে কাগজের সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রিন্টমেকিং অনেকগুলো হাত হয়ে কাগজে অভিব্যক্ত হয়। যেমন: শিল্পী নিজে এক হাত, প্লেট আরেক হাত, ইঙ্ক মেকিং আরেকটি পর্ব, মেশিন, পেপার এক হাত এবং কাগজ ভালো না হলে প্রিন্ট ভালো হবে না, প্রেশার ঠিক না হলেও সামগ্রিক ফলাফল ভালো আসবে না। তাই প্রিন্টের ভাষাটি কঠিন বলে শিল্পীরা সরাসরি অভিব্যক্তির দিকে ঝুঁকে থাকেন। তবে প্রিন্টের ভাষা বুঝতে হলে প্রথমে পেইন্টিংয়ের ভাষা বুঝতে হবে। যারা পেইন্টিংয়ে ভালো নন, তারা প্রিন্টে ভালো করতে পারেন না।

তবে উপরোক্ত আলোচনায় একটি ছবির একেক সময়ের অনুভূতি ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে যে সামগ্রিকতায় পৌঁছেছেন তার মধ্যবর্তী অবস্থায় লিথোগ্রাফি ব্যবহার করে লিথোগ্রাফি মাধ্যমের ভাষাগত দিকটি নিয়ে কাজ করার জন্য বর্তমান প্রজন্মের শিল্পীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন।

৫.১.৫.১.৩ মোহাম্মদ ইউনুসের অঙ্কিত লিথোচিত্রের করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক (চিত্র. ৫.৩৩)

মোহাম্মদ ইউনুসের ২০১৫ সালে অঙ্কিত লিথোচিত্রটিতে তিন-চারটি প্লেট ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম ইম্প্রেশনে একটি প্লেটে তুষ, তারপিনটাইন ও গ্লাসমার্কারের সমন্বয়ে চিত্রটি অঙ্কন করে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রিন্ট নেওয়া হয়েছে। ধরা যাক এগারোটি প্রিন্ট নেওয়া হয়েছে। এই ১০ ও ১১ নম্বর প্রিন্টটি অন্য আরো দুটি প্লেটে এসিটোনের সাহায্যে ট্রান্সফার করা হয়েছে। সেখানে সামান্য গ্লাসমার্কার দিয়ে কাজ করে সূক্ষ্ম ফর্মমগুলো এঁকে ওই প্রথম ইম্প্রেশনের ওপর পরবর্তী ইম্প্রেশন দুটি নিয়ে চিত্রিত লিথোগ্রাফির ফলাফলটি বের করে আনা হয়েছে। ফলে এখানে প্রথম ইম্প্রেশনের অঙ্কিত ইমেজের তুলনায় আরো উন্নত ইমেজ পাওয়া সম্ভব হলো। এই করণ-কৌশলের মাধ্যমে লিথোগ্রাফিতে ট্রান্সফার পদ্ধতি ব্যবহার করেও যে শিল্পী তার অভিব্যক্তির অন্য একটি বিশেষ অবস্থানে নিয়ে যেতে পারেন, সেটি মোহাম্মদ ইউনুসের কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিতে প্রতিভাত হলো। আর এ বিষয়টি একমাত্র প্রিন্টমেকিংয়েই ঘটানো সম্ভব বলে এর উপযোগিতাটি অবশ্যই নবীন প্রজন্মর নজরে পড়া উচিত। মোহাম্মদ ইউনুসকে একজন নিরীক্ষাধর্মী শিল্পী বলেই সবাই জানেন। বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে ক্যানভাস, কাগজ বা প্রিন্টের মাধ্যমগত পরিতলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে তিনি খুব আনন্দ পান। তার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় বিচিত্র ধরনের টেক্সচার, যা তার শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। ফলে তার ভাষা অ্যাবস্ট্র্যাকশনের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। তবে তার এই লিথোচিত্রটিতে অ্যাবস্ট্র্যাকশনের সঙ্গে যোগ হয়েছে শিশুসুলভ মানসিক অবস্থা। এভাবে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিও আধুনিক শিল্পভাষায় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে করণ-কৌশল ও ভাষাগত দিক থেকে।

Plate: 5.33, Mohammad Eunus, Plate-Lithography, 27x 31inch, 2014, Collection-F.F.A, D.U.

৫.১.৫.২ বর্তমান নবীন প্রজন্মের লিথোচিত্রের করণ-কৌশলগত দিক পর্যালোচনা

বর্তমান সময়ের নবীন প্রজন্ম লিথোগ্রাফির করণ-কৌশল ও ভাষাগত এই উভয় দিকটি নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে রয়েছে শৈলীগত নানা ধরনের বৈচিত্র্যময়তা ও আধুনিকতার ছোঁয়া। তাই এ সময়ের একদম নবীন শিল্পীদের মধ্যে বর্তমান গবেষক শেখ মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান, কামরুজ্জামান, ঝোটন চন্দ্র রায়, পলাশ বরন বিশ্বাস, জয়নাল আবেদিন জনি, রাশিদা আক্তার, পাপড়ি বাড়ৈ রাত্রী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আসমা নাসরীন, মারুফ আদনান, নিশাত কামাল, সাবিহা, সুমিত চক্রবর্তী প্রমুখের অঙ্কিত লিথোচিত্রের মধ্যে রয়েছে সম্ভাবনার দিকনির্দেশনামূলক ইঙ্গিত। তাই এ সময়ের লিথোগ্রাফির করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত এই উভয় দিকটি নিয়ে আলোচনা করা হলো।

৫.১.৫.২.১ বলপয়েন্ট লিথোগ্রাফির করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত দিক

পঞ্চাশের দশকের ক্রোকিল নিব দিয়ে অঙ্কিত লিথোগ্রাফি ও এই বলপয়েন্ট লিথোগ্রাফির টোনের মধ্যে একটি প্রধান গুণগত পার্থক্য হলো ক্রোকিল নিবের লাইনটি বর্তমান সময়ের জেল পেনের লাইনের মতো দেখতে। আর বলপয়েন্ট লিথোগ্রাফির লাইনগুলো অনেকটা ড্রাইপয়েন্টের মতো দেখতে। তারপর এটাও সত্য যে, ড্রাই পয়েন্টের সাথে কিছু পার্থক্যও বিদ্যমান। তাহলো— ড্রাই পয়েন্টে বেশি প্রেশার দিয়ে অঙ্কিত লাইনের পাশে একটু বুদ বুদ ধরনের বড় বড় ডটস এসে লাইনটিকে মোটা করে ফেলে। আর কম প্রেশারে লাইনের পাশে ছোট ছোট ডটস দেখতে পাওয়া যায়। বলপয়েন্ট লিথোগ্রাফিতে এই ড্রাই পয়েন্টের কম প্রেশারে সৃষ্টি লাইনের খুব কাছাকাছি একটি অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। ড্রাইপয়েন্ট ও বলপয়েন্ট লিথোগ্রাফি পাশাপাশি রাখলে এর দৃশ্যগত পার্থক্য সকলেরই দৃষ্টি কাড়বে। তবে ব্যাপক চর্চা হয়নি বলে এর সম্পর্কে শিল্পীদেরও একটি অস্পষ্ট ধারণা রয়ে গেছে। (চিত্র. ৫.৩৪, ৫.৩৫)

Plate: 5.34, Rokonuzzaman, Ballpoint Lithography, 12x14 cm (detailed photo), 2010.

Plate: 5.35, Rokonuzzaman, Dry point, 2000, 7x4 inch.

৫.১.৫.২.২ উড লিথোগ্রাফির করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত দিক

গবেষক রোকনুজ্জামানের এই উড লিথোগ্রাফিটি (চিত্র. ৫.৩৬) ২০০৯ সালে প্লাই বোর্ডের ওপর অঙ্কন করে কাগজে প্রিন্ট নেওয়া হয়েছে। ছয়-সাতটি ইম্প্রেশনে কাজটি করা হয়েছে। কখনো একই প্লেট আবার কখনো আলাদা প্লেট ব্যবহার করে সম্পন্নকৃত কাজটি জাপানি উড লিথোগ্রাফি শিল্পী ‘কুনিকো সাতাকি’র করণ-কৌশল ও ফলাফল থেকে একটু ভিন্ন ধরনের। সাতাকি এরাবিক গামের বদলে র‍্যাবিট গাম এবং ইমেজ তৈরির জন্য ম্যাজিক ইঙ্ক ব্যবহার করে চিত্রতল নির্মাণ করেন। আর রোকনুজ্জামান এরাবিক গাম এবং ইমেজ তৈরির জন্য প্রেস ইঙ্ককে তারপিনের সাহায্যে পরিমাণমতো পাতলা করে হকিয়ার ব্রাশের ব্যবহার করে চিত্রাঙ্কন করেছেন। পরে এচিং প্রেসে প্রিন্ট নিয়েছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যে কালারের ইঙ্ক দিয়ে চিত্রাঙ্কন করেছেন, (ওয়াশ আউট না করে) সেই কালার দিয়েই উডকাট রোলারের সাহায্যে রোল করে প্রিন্ট নেওয়া হয়েছে। আবার কখনো কখনো ওয়াশ আউট করেও লিথো প্রেসে প্রিন্ট নিয়েও তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। করণ-কৌশলের পার্থক্যের কারণে শুধু যে সাতাকির কাজের সঙ্গেই তারতম্য ঘটেছে, তা নয়। উডকাট মাধ্যমে যে সফট্‌নেস আনা সম্ভব হয় না, সে বিষয়টি অনেক

সহজেই এ মাধ্যমে করা সম্ভব। এভাবে বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি মাধ্যমের চর্চার ফলে এখান থেকে আরেক ধরনের নতুন মাধ্যমের উদ্ভব শিল্পকলার সামগ্রিক ক্ষেত্রে কিছু না কিছু প্রভাব রাখছে।

Plate: 5.36, Rokonuzzaman, Wood Lithography, Rickshaw, 47x53 cm, 2009.

ভাষাগত দিক থেকে সাতাকি শুধু অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ধরনের শিল্পকলা চর্চায় বিশেষ ভূমিকা রাখলেও এই বাস্তবধর্মী নিরীক্ষাটি এটিই প্রমাণ করে যে—এই মাধ্যম ‘মাদার মাধ্যম’ (‘Mother medium’) হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অর্থাৎ এই মাধ্যমে সমস্ত ধরনের ইমেজসৃষ্টি করা সম্ভব।

২০১০ সালে ভারতের শিল্পী অজিৎ সিল অ্যালুমিনিয়াম প্লেট-লিথোগ্রাফির সঙ্গে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন। মোহাম্মদ কিবরিয়া বিভাগে জিংক প্লেটে-লিথোগ্রাফির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন জাপান থেকে আসার পর। কিন্তু ২০১২ সাল থেকে বিভাগে অ্যালুমিনিয়াম প্লেট-লিথোগ্রাফির ব্যাপক চর্চা আরম্ভ হয় বর্তমান গবেষক রোকনুজ্জামান ও কামরুজ্জামানের হাত দিয়ে। এর ফলাফল ও লিথোগ্রাফির ফলাফলের মধ্যে বাহ্যত কোনো পার্থক্য না দেখা দিলেও লিথোগ্রাফারদের কাছে তা অনুভূত হয়েছে। সহজ ও কম পরিশ্রমে ভালো ফল পাওয়া যায় বলে শিক্ষার্থীরাও এর চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে প্রবীণ শিল্পীদের মধ্যে রফিকুন্ নবী, হামিদুজ্জামান, শহীদ কবির, আব্দুস সাত্তার, মোহাম্মদ ইউনুস, জামাল আহমেদ, শেখ আফজাল, ফরিদা জামান, মোস্তাফিজুল হক, শিশির ভট্টাচার্য্যের মতো শিল্পীদের এবং রোকনুজ্জামান, কামরুজ্জামান, ঝোটন চন্দ্র রায়, জয়নাল আবেদিন জনি, পাপড়ি বাড়ৈ রাত্রি, রাশিদা আক্তার ববি প্রমুখ নবীন প্রজন্মের লিথোগ্রাফির সমন্বিত ফল বাংলাদেশে লিথোগ্রাফির বর্তমান আবস্থাকে তুলে ধরবে।

৫.১.৫.৩ বর্তমান নবীন প্রজন্মের ভাষাগত দিক পর্যালোচনা

৫.১.৫.৩.১ 'এ জার্নি ফরম ওয়ান রিয়ালিটি টু এনাদার' চিত্রের ভাষাগত দিক পর্যালোচনা (চিত্র. ৫.৩৭)

এটি বর্তমান গবেষক শেখ মোহাম্মদ রোকনুজ্জামানের ২০০৪ সালে স্টোন লিথোগ্রাফি মাধ্যমে এক্সপেনসিভ মেথডে করা একটি কনসেপচুয়াল ধরনের উল্লেখযোগ্য লিথোচিত্র। শিল্পী ছাত্রাবস্থায় শুরু থেকেই কিছু বিষয় নিয়ে সব সময় ভাবতেন এবং কিছু করার চেষ্টা করতেন। ছবি কী? ছবি কীভাবে সৃষ্টি করতে হয়? ছবির কনসেপ্টের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী? তিনি বিশ্বাস করেন, 'Concept without percept is blind and percept witout concept is empty.' ছবি কি শুধু লাইন, কালার, ফর্ম দিয়ে তৈরি হয়? নাকি এই সবগুলোর সমন্বয়েও চিত্রাঙ্কন করা সম্ভব? এই সব কিছু একসঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য তিনিও কান্দেনিস্কির মতো একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে—মানুষের ইমোশন প্রকাশ করার জন্য রংই যথেষ্ট। তাই তিনি একটি নিরীক্ষণের জন্য বেছে নেন প্রেস মেশিনের ওপর জানালা থেকে আলো পড়ার বিষয়টিকে। ছবিটির মধ্য দিয়ে তিনি এমন একটি কাজ করতে চেয়েছেন যেখানে ট্র্যাডিশনাল শিল্পচর্চা থেকে শুরু করে আধুনিক শিল্পকলার চিন্তাগত ধারাবাহিকতায় অনুপ্রবেশ করতে পারেন। ফলে ধীরে ধীরে ছবিটি একটি কালো পরিতলে পরিণত হয় এবং ছবির হাইলাইটটি একটি সাদা ডটসে পরিণত হয়। একটি কালো কাগজে সাদা বিন্দু কীভাবে শিল্পে পরিণত করা যায়, সেই নিরীক্ষণটিই তিনি লিথোগ্রাফি মাধ্যমে করেছেন। এভাবে তিনি লিথোগ্রাফি মাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন আধুনিক শিল্পাঙ্গিকে।

Plate: 5.37, Rokonuzzaman, Stone Lithography, 'A Journey From one reality to another', 330x 15 inch, 2004.

৫.১.৫.৩.২ 'ডিস্ট্রয়' লিথোগ্রাফিটির ভাষাগত দিক পর্যালোচনা (চিত্র. ৫.৩৮)

এটি শিল্পী কামরুজ্জামানের ২০১৪ সালে প্লেট-লিথোগ্রাফি মাধ্যমে অঙ্কিত লিথোচিত্র। করণ-কৌশলগত দিক থেকে লিথোগ্রাফিকে কোনো মাধ্যমের অনুকারক মাধ্যম হিসেবে না নিয়ে 'এক্সপেনসিভ মেথডে' কাজ করেছেন এম.এফ.এ প্রথম বর্ষ থেকেই। তিনি একটি প্লেটে ইমেজ তৈরি করে কয়েকটি এডিশন প্রিন্ট নিয়ে নেন। তারপর সেই প্লেটকে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে আবার ইমেজ সৃষ্টি করে তার ওপর প্রিন্ট নিয়ে চিত্র রচনা করেন। খসড়া ইমেজেকে অনুসরণ করে প্লেটে কাজ না করে মূলত ইম্প্রেশনের ইমেজকে চিন্তা করে পরবর্তী ইম্প্রেশনগুলোকে উন্নতির দিকে নিয়ে কাজ শেষ করেন। নেচারকে দেখার পর একজন শিল্পীর মনে একটি ইমেজ সৃষ্টি হয়। সেটিকে তিনি কাগজে উপস্থাপন করেন। কখনো প্লেটে অঙ্কন করে প্রিন্ট নেন। আবার কখনো প্লেটে যা ইমেজ রয়েছে সেটিকেই উন্নতির দিকে নিয়ে যান। শিল্পী এখানে প্রথম দুটি ধাপকে গুরুত্ব না দিয়ে তৃতীয় ধাপেই সমস্ত কাজ করেন। ফলে প্রিন্টমেকিংয়ের (লিথোগ্রাফির) প্রতিস্থাপনযোগ্য পদ্ধতি বা ডাবল মাইন্ডনেসের (ছায়ার ছায়া) ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনে সরাসরি মাধ্যমে পরিণত করে চর্চার মধ্য দিয়ে ভাষাগত জায়গাটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

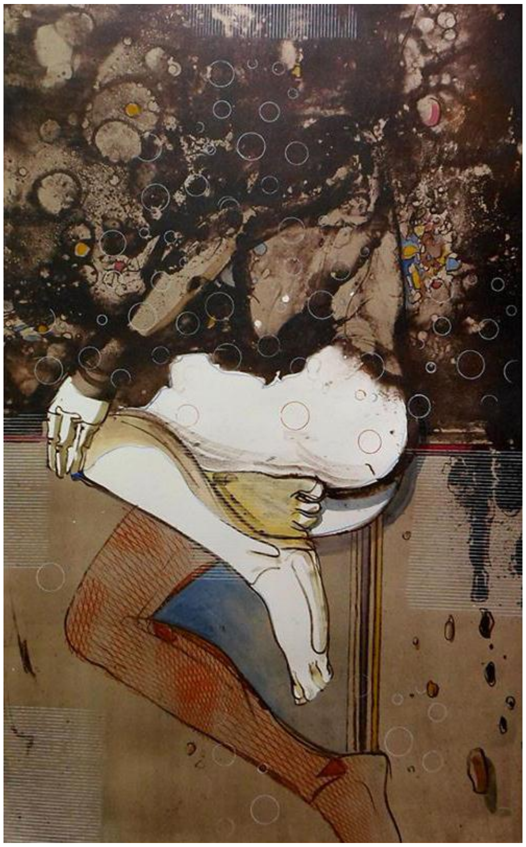

Plate: 5.38, Kamruzzaman, Lithography, Destroy, 2014, 70x45 cm.

এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের লিথোগাফি চর্চাকে কয়েকটি দশকে ভাগ করে পাঁচ দশকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লিথোগ্রাফির করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, প্রবীন প্রজন্মের লিথোগ্রাফিতে পঞ্চাশের দশকেই আধুনিকতার ছাপ বিদ্যমান। কামরুল হাসান তার 'আফটার বাথ' লিথোগ্রাফির মধ্য দিয়ে স্ক্র্যাচিং কৌশলটি ব্যবহার করেছেন। এই কৌশলটি যেকোনো দেশের প্রথম দিককার লিথোগ্রাফি হিসেবে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় বহন করে। এরপর ১৯৬৬ সালে আবার এই একই ধরনের নারী অবয়ব অঙ্কন করতে গিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডে পানি ও গাছগাছালির ফর্মে যে সরলতার সৃষ্টি করেছেন, তাতে তার পূর্ববর্তী লিথোচিত্রের বা গ্রাফিক অভিজ্ঞতার ছাপ সুস্পষ্ট। মোহাম্মদ কিবরিয়ার 'ফুল হাতে বালক' লিথোচিত্রের মধ্যে এসেছে নন-অবজেক্টিভিটিতে যাওয়ার পূর্ব নিরীক্ষণ। 'ট্রানসপারেন্সিজম'-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্পকলাকে কিউজিম থেকে একটু ভিন্নভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথিকৃৎ শিল্পী মুর্তজা বশীর তার 'আত্মপ্রতিকৃতি' চিত্রের মাধ্যমে এর পূর্বাভাস দিয়ে এ মাধ্যমের ভাষাগত সম্ভাবনার বিষয়টি আরো নিশ্চিত করেছেন। করণ-কৌশলগত দিক থেকে নবীন প্রজন্মের কাজে অনুশীলনধর্মিতা ও প্রথম দিকে ক্রোকিল নিব ও ক্রেয়নের ব্যবহার বর্তমান।

ষাটের দশকে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি মো. কিবরিয়ার চিত্রের মাধ্যমে অ্যাবস্ট্র্যাকশনে পৌঁছায়। প্রাতিষ্ঠানিক লিথোচিত্রে জড়জীবন, ল্যান্ডস্কেপ প্রভৃতিতে বাস্তবধর্মী, কিউবিস্টিক বা সাবজেক্টিভ শৈলীর ছাপ সুস্পষ্ট। এই দশকেই উপকরণের দিক থেকে গ্লাসমার্কারের ব্যবহার শুরু হয়। সেইসঙ্গে ফ্লাট কালার দিয়ে ইমেজ সৃষ্টি নবীন ও প্রবীণ উভয় প্রজন্মের চিত্রে বর্তমান দেখা যায়।

সত্তর থেকে নব্বইয়ের দশকের লিথোচিত্রগুলোর মধ্যে মো. কিবরিয়ার সঙ্গে আরো যোগ হলো তার শিল্পগুরু জয়নুল আবেদিন ও সমকালীন শিল্পী আবদুর রাজ্জাকের শিল্পকর্ম। জয়নুলের কাজের মধ্যে রয়েছে অ্যাবস্ট্র্যাকশনের নিকষিত রূপ। শিল্পী আবদুর রাজ্জাকের লিথোচিত্রে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশনিজমের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। আর কিবরিয়ার অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ও নন-অবজেক্টিভ লিথোগ্রাফির মাধ্যমেও এ দেশের শিল্পকলা সম উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে। আশির দশকে শিল্পী আব্দুস সাত্তারের 'প্রতিস্থাপন পদ্ধতি'-র লিথোগ্রাফি চিত্র এবং ওরিয়েন্টাল শৈলী নিয়ে অঙ্কিত লিথোচিত্র একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে।

নব্বইয়ের দশকে অশোক বিশ্বাসের ভিন্ন ধরনের কৌশলে রিসেনসিটাইজ করার সহজ উপায়টিতে প্রিন্ট নেওয়ার পদ্ধতি ও ভাষাগত দিক থেকে লিথোগ্রাফির ব্যবহার উপযোগিতা সকলেরই দৃষ্টি কাড়বে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আনিসুজ্জামানের রিভার্স পদ্ধতিতে করা প্রিন্ট ও ফখরুল আলমের রিভার্স, রি-

রিভার্স পদ্ধতির চিত্রগুলো বাংলাদেশের চিত্রে নতুন দিগন্ত আনার কথা ছিল। সে প্রভাবটি পড়েনি বললেই চলে।

এরপর বর্তমান সময়ের প্রবীণ প্রজন্ম রফিকুন্ নবীর 'কাক' কাজটি লিথোগ্রাফির সাদাকালো রঙের খেলাকে যেভাবে ব্যক্ত করেছে, তা সকলেরই দৃষ্টি কেড়েছে। মোহাম্মদ ইউনুসের চিত্রের শিশুসুলভ সরলতা ও কৌশলগত নিরীক্ষণ ভবিষ্যৎ লিথোগ্রাফারদের জন্য অনুসরণীয় হয়ে থাকবে করণ- কৌশল ও ভাষাগত দিক থেকে।

আর বর্তমান নবীন প্রজন্মের রোকনুজ্জামানের বলপয়েন্ট লিথোগ্রাফি, উড লিথোগ্রাফি প্রভৃতি ও নতুনতর মাধ্যম সৃষ্টি একদিকে যেমন লিথোগ্রাফির ভাষাকে সাবলীলতা দান করেছে, অন্যদিকে কনভেনশনাল ও ট্রানস সাবজেকটিভ শিল্পকর্মগুলোর প্রভাবে সমন্বিতভাবে এ অঙ্গন হয়ে উঠবে ব্যঞ্জনাময়। সেইসঙ্গে কামরুজ্জামানের গরম পানি দিয়ে রিসেনসিটাইজ পদ্ধতিতে বারবার ইমেজ অঙ্কন করে কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে পৌঁছনোর স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ লিথোগ্রাফি মাধ্যমের ভাষাগত দিকটিকে আরো সহজ ও সাবলীলতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে জয়নাল আবেদিন (জনি), পাপড়ি বাড়ৈ রাত্রী ও রাশিদা আক্তার ববির মতো প্রতিশ্রুতিশীল নবীন পাস করে যাওয়া শিল্পীদের লিথোচিত্রকর্ম।

ফলে এই অধ্যায়ের প্রাপ্ত ফলাফল হলো— বাংলাদেশের বিভিন্ন দশকের লিথোচিত্রগুলো করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত দিক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা গেছে। এখন এই লিথোগ্রাফিগুলো শিল্পগুণ বিচারে কতটা শিল্প হয়ে উঠেছে— সে দিকটি পরবর্তী আধ্যায়গুলোতে এর কৌশলের বিস্তারিত পদ্ধতি এবং এর নন্দনতাত্ত্বিক দিক বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। সেইসঙ্গে এর সম্ভাবনা বিষয়েও দৃষ্টিপাত করা হবে।

Plate: 5.39, Rokeya Sultana, Lithography, ,60X45cm,1979, Collection-F.F.A, D.U.

Plate: 5.40, Ashok Karmakar, Lithography, 36x32 cm, 1983, Collection-F.F.A, D.U.

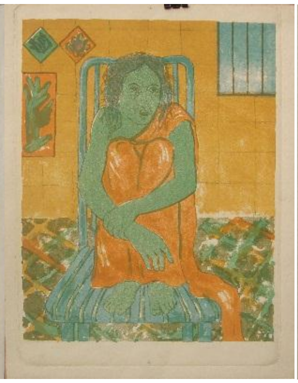

Plate: 5.41, Un Known Artist, Lithography,45x36 cm, 1976, Collection-F.F.A, D.U.

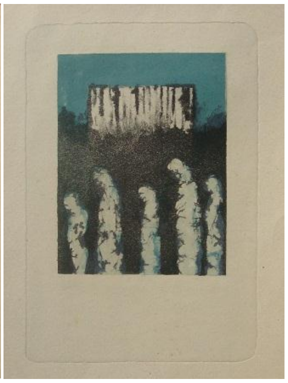

Plate: 5.42, Ashok Biswas, Lithography, 25x19cm, 1980, Collection-F.F.A, D.U.

Plate: 5.43, Md. Iqbal, Lithography, Composition, 1990, ?

Plate: 5.44, Swarup Kumar Basak, lithography, Windows, 2005, 30x29 cm.

Plate: 5.45 Juton Chandra Roy, Lithography, 2013, 8x16 inch

৬. ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে অনুসৃত লিথোগ্রাফি চর্চার করণ-কৌশল ও নতুনত্ব

৬.১ প্রিন্টের বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ

প্রিন্টমেকিংয়ের অন্যতম প্রধান তিনটি মাধ্যম হলো: রিলিফ প্রসেস, ইন্টাগলিও প্রসেস ও প্লেনোগ্রাফিক প্রসেস। রিলিফ প্রসেস হচ্ছে প্রিন্টমেকিংয়ের সবচেয়ে পুরাতন মাধ্যম। চীনে এটিকে শনাক্ত করা হয়েছে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে। রিলিফ প্রসেসে ছাপা প্রথম বই হীরক সূত্র। এশিয়ার দেশগুলোর যেখানে বুদ্ধিজমের চর্চা হয়েছে, সেখানে এই হীরক সূত্র তাৎপর্যপূর্ণভাবেই গ্রহণযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। পল গোল্ডম্যান তার 'প্রিন্টস, ড্রইংস এবং ওয়াটার কালারস' নামক গ্রন্থে বলেন, 'printing from woodblocks was known in Europe as early as the twelfth century, but originally only for stamping designs on textiles.' কোনো একটি প্লাইবোর্ডের উপরের অংশকে কাঠ খোদাই করার টুলস দিয়ে খোদাই করা হলে, রোলারের সাহায্যে শুধু উপরিতলে রোল করে তার ওপর কাগজ বসিয়ে হাতে ঘষে বা প্রিন্টিং মেশিনের সাহায্যে প্রিন্ট নেওয়ার পদ্ধতিকে রিলিফ প্রসেস বলা হয়ে থাকে। আর এর বিপরীত হলো ইন্টাগলিও পদ্ধতি। ইন্টাগলিও অর্থ 'to carve, to cut out, to incise'।[১৫৮] অর্থাৎ উপরিতল বাদে গর্তের ভেতরে ইঙ্ক ঢুকিয়ে উপরিতলকে কাপড় দিয়ে মুছে ইন্টাগলিও মেশিনের মাধ্যমে কাগজে যে ইমেজ প্রতিস্থাপন করা হয় তাকে ইন্টাগলিও পদ্ধতি বলা হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইন্টাগলিও পদ্ধতি আবিষ্কার হয়।

Plate: 6.1 রিলিফ পদ্ধতির সবচেয়ে
পুরাতন নিদর্শনস্বরূপ হীরক সূত্রের ছবি

[158] http://www.jaynereidjackson.com/techniques.html

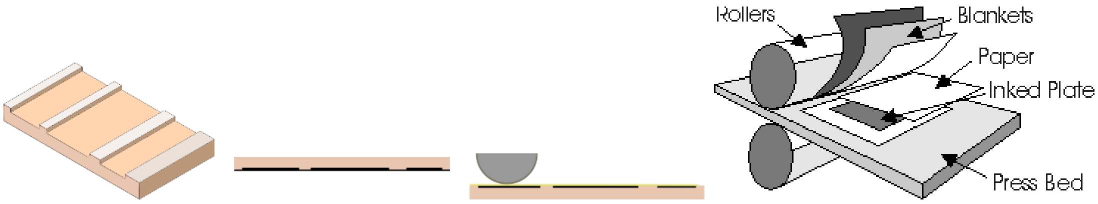

Plate: 6.2 ইন্টাগলিও পদ্ধতির প্লেট, ইন্টাগলিওতে প্লেটের গর্তে ইঙ্ক, ইন্টাগলিও পদ্ধতিতে রোলিং করা

প্লেনোগ্রাফি মাধ্যমের অনেকগুলো শাখা মাধ্যম রয়েছে। লিথোগ্রাফি তার মধ্যে অন্যতম। লিথোগ্রাফি শব্দটি গ্রিক 'to write or draw on stone' থেকে এসছে। আবিষ্কারক আলইস সেনেফেলডার এর নাম রেখেছিলেন ‘কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন’। কিন্তু লিথো নামক স্টোন থেকে প্রিন্ট নেওয়া হয় বলে পরবর্তী সময়ে এটি লিথোগ্রাফি নামে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ‘কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন’ নামকরণটি যেমন প্রযোজ্য বলে মনে হয়, ঠিক তেমনি গ্রহণযোগ্যতা, জনপ্রিয়তা ও প্রয়োজনীয়তার স্বার্থে প্লেনোগ্রাফির বৈচিত্র্যময় অন্য মাধ্যমগুলোর নামের সঙ্গে ‘লিথোগ্রাফি’ শব্দটি যুক্ত হয়ে গেছে অতি সাধারণভাবেই। কারণ প্রিন্টমেকিংয়ে রয়েছে অনেক ধরনের মাধ্যম, যা সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, শিল্পীরা, এমনকি প্রিন্টমেকাররা পর্যন্ত এত নামে জানতে আগ্রহী ছিলেন না। ফলে সহজে যেকোনো মাধ্যম সম্পর্কে বোঝার প্রয়াসেই এরূপ ঘটনাটি অলিখিতভাবে ঘটেছে। মানুষ মৌখিকভাবে মাধ্যমগুলোর সঙ্গে ‘লিথো’ শব্দটি জুড়ে দিয়ে নামকরণে সার্থকতা প্রদান করেছে। অ্যালুমিনিয়াম বা জিংকে প্লেটে এ পদ্ধতিতে শিল্পকর্ম রচনা করা হলে একে অনেকে প্লেটোগ্রাফি বা অ্যালুগ্রাফি, জিংকোগ্রাফি নামে যেমন যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন, অপরপক্ষে কেউ কেউ আবার এ ধরনের সমস্ত মাধ্যমকে সহজ পরিচিতির স্বার্থে প্লেনোগ্রাফি মাধ্যমের প্রকারভেদ বলে প্লেট লিথোগ্রাফি, উড লিথোগ্রাফি, ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি নামকরণই উপযুক্ত বলে মনে করেন। বাংলাদেশে তথা বিশ্ব শিল্পকলায় যেখানে প্রিন্টমেকিংকে একটি স্বতন্ত্র ‘শিল্পভাষা’ হিসেবে গ্রহণের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেখানে নাম নিয়ে বিতর্কে না জড়িয়ে মাধ্যমকে ভাষা হিসেবে প্রচারই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া উচিত বলে প্রিন্টমেকাররা মনে করেন।

ছবি আঁকার জন্য কয়েক রকমের গ্লাসমার্কার কিনতে পাওয়া যায়। ওয়াশ পদ্ধতিতে অনুশীলনের জন্য ভারত থেকে তুষ (পাথরে আঁকার জন্য বিশেষ ধরনের তরল কালি বা ইঙ্ক) কিনে এনে শিক্ষা কার্যক্রম

চালানো হয়। বাজারে যে প্রেস ইঙ্ক পাওয়া যায়, তা আসলে মোটেও লিথাগ্রাফিক ইঙ্ক নয়। বিভিন্ন ধরনের ইমেজের জন্য নানা ধরনের শক্ত ও নরম ইঙ্ক প্রয়োজন। যেমনঃ তুষের ওয়াশ ও ফ্লাট ইমেজের জন্য অপেক্ষাকৃত পাতলা বা তরল ইঙ্ক প্রয়োজন। ইঙ্ককে বা কালারকে নরম করার জন্য ভার্নিশ, ভ্যাসলিন বা গ্লিসারিন ব্যবহার করা যায়। কালারকে শক্ত করার জন্য ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু বিভাগে কখনো এটির ব্যবহার হয়নি। তবে ২০০৪ সালের পর থেকে কালারকে শক্ত করার জন্য বিকল্প হিসেবে মেরিল ট্যালকম পাউডার (গায়ে দেওয়ার পাউডার) ব্যবহার করা হচ্ছে। আবার সব প্রেস ইঙ্কই লিথোগ্রাফির জন্য ভালো নয়। যেমনঃ টোকা কালির ট্যাকি বা আঠালো ভাবটির জন্য ইমেজ তাড়াতাড়ি জড়িয়ে যায়। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে স্টোনে হুগলি কালার ভালো কাজ করে। স্টোন লিথোতে কখনো কখনো কিছু সমস্যা সৃষ্টি করে এর আঠালো (ট্যাকিনেসের) গুণটির কারণে। আর টোকা কালি প্লেট-লিথোগ্রাফিতে তেমন কোনো সমস্যা তৈরি করে না। তাই বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চর্চাটি আঙ্গিকগত দিক দিয়ে বিশ্ব শিল্পকলার সঙ্গে একই রেখায় তাল মিলিয়ে চললেও এর করণ-কৌশলগত বিকল্প চর্চা ভিন্ন ফলাফল বয়ে এনেছে। ফলে এর অতীত ও বর্তমান করণ-কৌশলগত দিকটি লিখিত আকারে থাকা খুবই প্রয়োজন। নিম্নলিখিত উপায়ে সে বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

৬.২ গ্রেইন করা থেকে প্রিন্ট নেয়া পর্যন্ত পদ্ধতি (স্টোন ও প্লেট)

৬.২.১ স্টোন গ্রেইন করার পদ্ধতি

প্লেনোগ্রাফিক প্রসেসে ইমেজ তৈরি করার পূর্বে স্টোন বা প্লেটকে গ্রেইন করা প্রয়োজন। যে আকারের বালি, কার্বোরেন্ডাম অথবা সিলিকন কার্বাইড দিয়ে গ্রেইন করা হবে, প্রিন্ট নেওয়ার পর সে মাপের ডটস দিয়ে সাজানো ইমেজ দেখতে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এক স্কয়ার ইঞ্চিতে ৮০–৩০০ ডটস হতে পারে। বিষয়টি অনেকটা কম্পিউটারের ইমেজ প্রিন্ট নেওয়ার মতো করে ভাবা যেতে পারে। গ্রেইন করার পূর্বে লক্ষণীয় বিষয় ও গ্রেইন করার পদ্ধতি:

Plate: 6.3, Stone carring machine

(ক) ছবি বা ইমেজ তৈরির জন্য যেকোনো একটি স্টোন নির্বাচন করতে হবে। স্টোনে কোনো পূর্বের ইমেজ থাকলে সেই ইমেজ তুলে ফেলার জন্য নিম্নলিখিত দুটি উপায়ে ইমেজ মুছে ফেলতে হবে। তবে এই পদ্ধতিতে যাওয়ার পূর্বে স্টোনের চারদিকটি বিভলিং করে নিলে সবচেয়ে ভালো হয়। কারণ অনেক সময় গ্রেইন যখন প্রায় শেষ পর্যায় তখন কর্নার থেকে এক টুকরো ছোট স্টোন ভেঙে গ্রেইনিংয়ে আঁচড় ফেলে দিতে পারে।

ক.১ সমান সাইজের স্টোন দিয়ে ঘর্ষণ পদ্ধতি

ক.২ ‘S’ প্যাটার্নে ঘর্ষণ পদ্ধতি।

ক.১ সমান সাইজের স্টোন দিয়ে ঘর্ষণ করে গ্রেইন করার পদ্ধতি

ক.১.১ সমান সাইজের স্টোন দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বালু ও পানি দিয়ে একটির উপর অন্যটিকে রেখে এমনভাবে ঘষতে হবে যেন উপরের স্টোনের মধ্যভাগটি নিচের স্টোনের কর্নার ভাগকে প্রতিবার স্পর্শ করে। এভাবে **১০–১৫** মিনিট ঘষলে দেখা যাবে উপরের স্টোনের মধ্যভাগের এবং নিচের স্টোনের কর্নার অংশের ইমেজ প্রায় মুছে গেছে। তবে স্টোনে মাঝেমধ্যে আঙুল দিয়ে একটু পানি ছিটিয়ে দিয়ে ঘষতে হবে, না হলে স্টোন ঘোরাতে খুব অসুবিধা হবে। এই স্টোন ঘষার সময় খেয়াল রাখতে হবে ঘর্ষণের ফলে একধরনের শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে। শব্দটি প্রথম থেকে ঘড়ঘড় শব্দ হয়। ধীরে ধীরে শব্দটি স্মুথ হতে থাকে, বালুকণাগুলো ভেঙে যেতে থাকে। আর সিলিকন কার্বাইড স্টোনের চেয়ে শক্ত বলে, তার সঙ্গে স্টোনের গুঁড়া মিশে এই শব্দের তারতম্য ঘটায়। একসময় একটি আরেকটির গায়ে আটকে ধরতে চাইবে। এ সময়গুলোতে পানি ছিটিয়ে দিলে সাবলীলভাবে আবার ঘোরানো যাবে। এভাবে **১৫** মিনটের দিকে সাউন্ড স্লিপ শব্দ হতে থাকলে বুঝতে হবে স্টোন দুটি পলিশ বা প্লেন সারফেসের কাছাকাছি চলে এসেছে। এ সময় আবার পানি দিয়ে ঘষতে থাকলে একটু পর পরই স্টোন আটকে ধরতে চাইবে। এবার ঘষা বন্ধ করতে হবে, না হলে দুটি স্টোন একে অপরের সঙ্গে আটকে যেতে পারে। তখন স্টোন দুটিকে আর ছোটানো সম্ভব নয়। প্লেইন হওয়ার ফলে স্টোন দুটির মধ্যবর্তী স্থানে বাতাসের অনুপস্থিতি তৈরি হবে। তাই এই পরিস্থিতে আসার পূর্বেই ঘষা বন্ধ করে স্টোন দুটি পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে পরবর্তী পর্বে যেতে হবে।

ক.১.২ এবার উপরের স্টোনকে নিচে এবং নিচের স্টোনকে উপরে দিয়ে ঘষলে আবারও পূর্বের মতো ইমেজ মুছে যাবে। ফলে দুটি স্টোনেরই কর্নার ও মধ্যবর্তী স্থানের ইমেজ মুছে যাবে। এ সময় একধরনের

গ্রেইন হয়ে যায়। অনেকে এ গ্রেইনটিকে গ্রহণ করে স্টোনটিকে ধুয়ে শুকিয়ে নিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করেন। তবে এ সময় কাজ শুরু না করে পরবর্তী পর্যায়ে করা ভালো।

ক.১.৩ স্টোন দুটিকে পরিষ্কার পানি দিয়ে এমনভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে, যাতে এর ভেতর এক টুকরো বালুকণাও না থাকে। এরপর স্লেক স্টোন দিয়ে দুটি স্টোনকেই আড়াআড়ি ও উলম্বভাবে ঘষে সমতল পিচ্ছিল পরিতলে পরিণত করতে হবে। এ জন্য এই প্রক্রিয়াটিকে 'স্টোন-পলিশিং' বলা হয়ে থাকে। 'স্টোন-পলিশিং' করার সময় খেয়াল রাখতে হবে, যেন কোনোরূপ স্টোন কণা না চলে আসে। কণা চলে এলে পলিশ করার সময় স্ক্র্যাচ বা আঁচড়ের দাগ চলে আসবে, যা প্রিন্টেও চলে আসবে। সফলভাবে 'স্টোন-পলিশিং' করার পর পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

ক.১.৪ এবার স্টোনে সিলিকন কার্বাইড বা বালু দিয়ে উপরোক্ত ক.১.১ ও ক ১.২ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রেইন করতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, পলিশিং হওয়ার পূর্বেই গ্রেইন করা বন্ধ করে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এবার এই অবস্থায় স্টোন সেনসিটিভ হয়ে যায়। এ সময় তৈলাক্ত হাত দিয়ে এটিকে ধরা যাবে না। তাই ইংরেজিতে এই অবস্থাকে সেনসিটাইজেশন (Sensitization) বলা হয়।

ক.১.৫ স্টোনটিকে একটা টেবিলে ঢাল করে রেখে শুকানোর পর শিল্পকর্ম আঁকা শুরু করা যাবে। শুকানোর পর কাজ না করলে একটি নিউজপ্রিন্ট কাগজ বা বাটার পেপার দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। তা না হলে ধুলাবালি পড়ে স্টোনের সেনসিটিভিটিকে নষ্ট করে দেয়। ফলে প্রিন্টের ফলাফল ভালো হবে না। অনেক সময় আবার রিসেনসিটিভ করে নিয়ে কাজ করতে হয়। তাতে অবশ্য গ্রেইনের একটু ক্ষতি হয়ে যায়, যা খালি চোখে দেখা যায় না। তাই এত সব জটিলতা এড়ানোর জন্য নিউজপ্রিন্ট কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখাই সবচেয়ে ভালো পন্থা।

ক.২ 's' প্যাটার্নে ঘর্ষণ করে গ্রেইন করার পদ্ধতি

সাধারণত বড় স্টোনে গ্রেইন করার সময় সমান মাপের স্টোন দিয়ে ঘর্ষণ করা সম্ভব নয়। তখন ছোট মাপের একটি স্টোন নিয়ে বড় স্টোনটিকে সবসময় নিচে রেখেই 's' প্যাটার্নে ঘুরিয়ে গ্রেইন করা যায়। ছোট স্টোনেও 's' প্যাটার্নে গ্রেইন করা যায়, তবে সমান সাইজের স্টোন দিয়ে ঘর্ষণ পদ্ধতি সবচেয়ে ভালো। কারণ তাতে স্টোনে ডিপ্রেশন (এক পার্শ্ব ঢাল এবং অন্য পার্শ্ব উচু থাকে এমন) সৃষ্টির প্রবণতা কম। ১৪"–২০" ও ২২" থেকে ২৮" ইঞ্চি স্টোনগুলোতে গ্রেইন করার সময় একই সাইজের স্টোন নিয়ে

গ্রেইন করা বা ঘোরানো প্রায় অসম্ভব। তাই কখনো কখনো লেভিগেটর দিয়েও **‘s’** প্যাটার্নে ঘুরিয়ে গ্রেইন করা যায়।

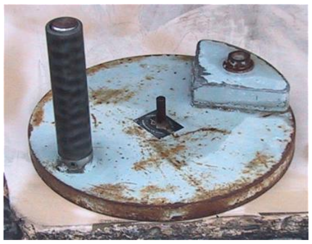

Plate: 6.4, লেভিগেটর (Levigator) দিয়েও ‘s’ প্যাটার্নে ঘুরিয়ে গ্রেইন করা যায়

৬.২.২ গ্রেইন শেষে এর সঠিক পরীক্ষণ পদ্ধতি

(ক) গ্রেইন শেষে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে, যেন কোনো বালুকণা না থাকে। এ সময় স্টোনে একটু পানি থেকেই যায়। সেই পানিতে ফুঁ দিয়ে আলোর বিপরীতে দেখলে দেখা যাবে যে, পুরো স্টোন জুড়ে সিলিকন কার্বাইড বা বালুকণার আকারের ছোট ছোট গর্ত হয়ে গ্রেইন সৃষ্টি হয়েছে। এই সময়টিতে স্টোন সেনসিটিভ হয়ে যায়, তাই হাত দিয়ে টাচ না করাই ভালো। কারণ অনেকের হাতে ঘাম থাকে, যা ইমেজ ধারণ করার জন্য যথেষ্ট।

Plate: 6.5, গ্রেইন শেষে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা

(খ) স্টোনে কোনো ডিপ্রেশন বা উত্তল-অবতল অবস্থা আছে কি না সে বিষয়টি বোঝার জন্য স্টোনের দুই কর্নার বরাবর একটি স্কেল ধরলে দেখা যাবে যে— স্কেলের নিচে ফাঁকা স্থান তৈরি হয়েছে বা হয়নি। এরূপ ফাঁকা অবস্থা থেকে ডিপ্রেশনের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা করা যাবে। যদি ডিপ্রেশন থাকে, তবে তা কোথায় আছে দেখতে হবে। যদি মধ্যস্থানে ডিপ্রেশন থাকে, তাহলে ওই স্টোনের কর্নার ঘষে এর সঙ্গে

সামঞ্জস্যতা সৃষ্টি করতে হবে। অর্থাৎ স্টোনটিকে নিচে রেখে স্টেন গ্রেইন করা পদ্ধতি নং- ক. ১ প্রক্রিয়াটি কয়েকবার করে পুরো স্টোনকে একটা লেভেলে নিয়ে আসা সম্ভব।

Plate: 6.6, স্টোনের ওপর একটি স্কেল ধরে নিচে একটি কাগজ দিয়ে উঁচু-নিচু (ডিপ্রেশন) পরীক্ষা করে নেওয়া

এ সময় কখনো কখনো ঘোস্ট ইমেজের (ভুতুড়ে ইমেজ, পূর্বের চিত্রকে ঘোস্ট ইমেজ বলা হয়) মতো পূর্ববর্তী ইমেজ একটু দেখাও যেতে পারে। সবসময় যে তা প্রিন্টের সময় চলে আসে, তেমনটা নয়। এটি অভিজ্ঞতা দিয়ে শিল্পী বুঝে নিতে পারেন যে কোন ধরনের ইমেজ পরবর্তী সময়ে পুনরায় ঘোস্ট ইমেজ হয়ে বর্তমান ইমেজের সঙ্গে প্রিন্টে আসতে পারে। তাই গ্রেইন করার সময় এগুলো লক্ষ করা উচিত।

৬.২.৩ প্লেটে গ্রেইন করার পদ্ধতি

স্টোন এবং প্লেটের গ্রেইনিংয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। স্টোন ম্যানুয়ালি এবং মেশিন দিয়ে গ্রেইন করা সম্ভব। কিন্তু প্লেটের গ্রেইন মার্বেল গ্রেইন মেশিনের মাধ্যমে করতে হয়। প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

(ক) এবার প্রথমে গ্রেইন মেশিনের বেড থেকে ভাঙা ও ছোট মার্বেলগুলো বেছে সরিয়ে ফেলা দরকার। কারণ গ্রেইনিংয়ের সময় সেগুলো ভেঙে প্লেটে আঁচড় (স্ক্র্যাচ) বা দাগ সৃষ্টি করবে। গ্রেইনিং মেশিন থেকে মার্বেলগুলো সরিয়ে একপাশে রাখতে হবে। এবার প্লেটটিকে এমনভাবে বসাতে হবে যেন, প্লেটের নিচে কোনো বড় বালুকণা না থাকে।

(খ) প্লেটটিকে একটি মেশিনের ওপর থেকে একটি বা দুটি লোহার অ্যাঙ্গেল দিয়ে স্ক্রুর সাহায্যে আটকে দিতে হবে, যেন মেশিন চালু করার পর প্লেটটি একটি স্থানে স্থির থাকে।

(মার্বেলগুলোকে প্লেটের ওপর টেনে এনে বালু বা সিলিকন কার্বাইড ছড়িয়ে দিয়ে পরিমাণমতো পানি দিয়ে মেশিনটি চালু করে দিতে হবে। মাঝেমধ্যে বালু বা সিলিকন কার্বাইড এবং পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। এই প্লেট-লিথোগ্রাফি বা অ্যালুগ্রাফিতে সাধারণত ২২০ গ্রিটের গ্রেইন করা হয়ে থাকে।

(গ) এভাবে ২০ থেকে ২৫ মিনিট পর গ্রেইন সম্পন্ন হয়ে গেলে মার্বেলগুলোকে সরিয়ে প্লেটটিকে খুলে নিয়ে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুতে হবে।

(ঘ) এক বালতি পানিতে দুই থেকে আট-দশ ফোঁটা ফসফরিক এসিড দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে প্লেটটিকে সেই পানি দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধুয়ে দিতে হবে। এ সময় খেয়াল রাখতে হবে, প্লেটে এই মিশ্রিত দ্রবণ এক মিনিটের থেকেও কম সময় রাখতে হবে। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় ‘কাউন্টার এচিং’। প্লেটে কাজ করার পূর্বে এই ‘কাউন্টার এচিং’ অবশ্যই করতে হবে (স্টোনে কাজ করার পূর্বে ‘কাউন্টার এচিং’ করার প্রয়োজন নেই)। এখন যত দ্রুত সম্ভব পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে শুকানোর জন্য একটি টেবিলে রাখতে হবে।

(ঙ) এবার ব্লটিং পেপার বা নিউজপ্রিন্ট কাগজ দিয়ে আলতোভাবে চেপে ধরে পানি শুষে নিতে হবে।

(চ) পাঁচ-দশ মিনিট পর ইমেজ তৈরি করা যাবে।

(ছ) এ সময় ইমেজ না করলে নিউজপ্রিন্ট কাগজ দিয়ে অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে। না হলে ধুলাবালি বা স্কাম পড়ে যাবে।

তবে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, অ্যালুমিনিয়াম ও জিংক প্লেট একসঙ্গে গ্রেইন করা উচিত নয়।[১৫৯]

৬.২.৪ স্টোন ও প্লেটে ইমেজ সৃষ্টি করার পদ্ধতি

অয়েল বা ফ্যাটযুক্ত অনেক ধরনের উপকরণ দিয়ে স্টোন লিথোগ্রাফিতে ইমেজ সৃষ্টি করা সম্ভব। সেগুলো হলো সাধারণত:

(১) কন্টি (২) গ্লাসমার্কার, (৩) তুষ (ফ্যাটযুক্ত বিশেষ ধরনের ইঙ্ক), (৪) অয়েল প্যাস্টেল কালার, (৫) লিপস্টিক, (৬) আই লাইনার, (৭) বলপয়েন্ট কলম, (৮) ফেল্ট পেন, (৯) প্রেস ইঙ্ক, (১০) বিটুমিন (আলকাতরা) ও তারপিনটাইনের দ্রবণ ইত্যাদি।

প্রধানত তিনটি উপায়ে ইমেজ তৈরি করা যায়:

---

[159] GaroZ. Antreasian and Clinton Adams, *The Tamarind Book of Lithography: Art & Techniques*, Los Angeles, June 8, 1970, p., p.131

(ক) সরাসরি অঙ্কন করে ইমেজ সৃষ্টি

ইমেজ তৈরির উপকরণ দিয়ে সরাসরি অঙ্কন করা যেতে পারে। একেক উপকরণের ইমেজ ভিন্নতার ওপর ইমেজের ফলাফল নির্ভরশীল। তবে তুষের সঙ্গে তারপিনটাইন মিশিয়ে ওয়াশ পদ্ধতিতে কাজ করতে গেলে যে ইমেজ দেখতে পাওয়া যায়, তার সমস্তটাই যে প্রিন্টে আসবে তেমনটি নয়।[১৬০] অবার প্লেট ও স্টোনে ফ্লাট ইমেজ তৈরির ক্ষেত্রে এসফালটাম (বিটুমিমিন ও তারপিনটাইন) মিশ্রণ দিয়ে ফ্লাট ইমেজ তৈরি করা সম্ভব।[১৬১] তবে বাংলাদেশে বিটুমিন ও তারপিনটাইনের বদলে বিটুমিন ও বার্জার থিনার ব্যবহার করে সাফল্যজনক ফলাফল পাওয়া গেছে।

(খ) ট্রান্সফার পদ্ধতিতে ইমেজ সৃষ্টি

সদ্য কাগজে প্রিন্ট নেওয়া ইমেজ থেকে বা অন্য কোনো কাগজে অঙ্কিত ইমেজ স্টোনে বা প্লেটে সরাসরি বা নির্দিষ্ট উপায়ে ট্রান্সফার করা হয়। এই ট্রান্সফার করা ইমেজের সঙ্গে আরো অন্য কিছু অঙ্কন করেও ইমেজ সৃষ্টি করা যায়। তবে স্টোন ও প্লেটে ইমেজ ট্রান্সফার (প্রতিস্থাপন) করার পদ্ধতিটি কখনো কখনো একটু ভিন্ন। মূলত বেনজিন, গ্যাসোলিন এবং ল্যাকটোল স্পিরিট দিয়ে ইমেজকে ট্রান্সফার করা যায়।[১৬২] তবে বাংলাদেশে স্টোনে ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে জাইলিন এবং প্লেট-লিথোগ্রাফির ক্ষেত্রে এসিটোন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে শিল্পীরা কয়েকটি কারণে ট্রান্সফার পদ্ধতিতে শিল্পকর্ম রচনা করতে বেশি আগ্রহী।

খ.১ স্টোনের চেয়ে কাগজে আঁকতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন বলে।

খ.২ কাগজে অঙ্কিত চিত্রটি পছন্দসই না হলে ফেলে দেওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে স্টোনকে পুনরায় গ্রেইন করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না।

খ.৩ ইমেজটি স্টোনে বা প্লেটে উল্টো হয়ে ট্রান্সফার হয়। আর স্টোন থেকে কাগজে সোজা হয়ে প্রিন্ট আসে। ফলে শিল্পী তার ইমেজের খুব কাছাকাছি অবস্থান করতে পারেন। উল্টো করে চিন্তা করতে হয় না।

খ.৪ স্ক্র্যাপিং টেকনিকটি স্টোনের গ্রেইনকে ধ্বংস করে, কিন্তু ট্রান্সফার করা ইমেজে গ্রেইনের সে ক্ষতি হয় না।

---

[160] Garo Z. Antreasian, *'The Tamaind Book of Lithography: Art & Techniques'*, Los Angeles, June 8, 1970, p. 131
[161] Garo Z. Antreasian, *ibid.*, p. 141
[162] Garo Z. Antreasian, *ibid.*, , p. 155

খ.৫ তুষের ওয়াশ একই চরিত্র বজায় রেখে স্টোনের তুলনায় ট্রান্সফার কাগজে ভিন্নভাবে শুকায়। তবে খুব শক্ত না হওয়ার পূর্বেই স্টোনে প্রতিস্থাপন (ট্রান্সফার) করা উচিত।

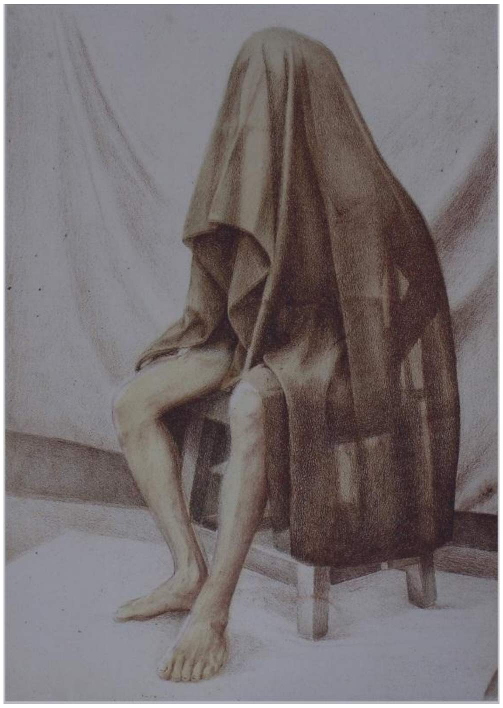

Plate: 6.7, Papri Baroi Ratri, Plate Lithograpghy, 8x12 inch, 2012. First impressiom draw by glass marker. 2nd and other impressions enriched by transfer process of 1st impression

(গ) কাগজে সৃষ্ট ইমেজ থেকে সরাসরি স্টোন ও প্লেটে ইমেজ ট্রান্সফার

বাংলাদেশে মূলত নিম্নোক্ত (গ.১) ও (গ.২) নম্বর উপায়ে ইমেজ ট্রান্সফার (প্রতিস্থাপন) করা হয়ে থাকে।

(গ.১) অন্য স্টোন বা প্লেট থেকে ফাইনাল প্রিন্ট নিয়ে নতুন স্টোন বা প্লেটের ওপর উপুড় করে বসিয়ে চারদিকে স্কচটেপ লাগাতে হবে।

(গ.২) একটি পরিষ্কার নিউজপ্রিন্ট বা কার্টিস পেপারে বেনজিন, নারিকেল তেল, কেরোসিন ইত্যাদির যেকোনো একটি তেলঅথবা জাইলিন বা এসিটোন দ্রুত তুলার সাহায্যে লাগিয়ে ফটোকপিটির ওপর রেখে প্যাকিং ও টিমপ্যান দিয়ে প্রেশারে বেশ কয়েকবার আপ-ডাউন করলে ইমেজ প্রতিস্থাপন হয়ে যাবে। এবার যেকোনো একটি কর্নারের স্কচটেপ খুলে দেখতে হবে ইমেজ হালকা এসেছে, নাকি গাঢ় হয়ে প্রতিস্থাপন হয়েছে। ঠিকমতো প্রতিস্থাপন হলে পেপারটি খুলে ফেলতে হবে। আর না হলে স্কচটেপটি আবার লাগিয়ে দিতে হবে। এবার উপরের নিউজপ্রিন্ট কাগজটি নিয়ে আবার একটু সেই উপকরণ বা এসিটোন লাগিয়ে পুনরায় তাড়াতাড়ি বসিয়ে প্রেশার দিয়ে কয়েকবার আপ-ডাউন করলে সুন্দর ট্রান্সফার পাওয়া সম্ভব।

(গ.৩) ট্রান্সফার কাগজ তৈরি করে তার ওপর ইমেজ অঙ্কন করে সেখান থেকে ইমেজ স্টোনে বা প্লেটে ট্রান্সফার করা যায়। ট্রান্সফার কাগজ তৈরির সাধারণ উপায়টি নিম্নরূপ:

ময়দা বা আটা (Flour) -- ১৮ ভাগ

মিহি দানার দাঁতের প্লাস্টার -- ১২ ভাগ

জিলাটিন (Gelatine) -- ১ ভাগ

মাড় বা কার্বোহাইড্রেট (starch) ------------------------------------- ১ ভাগ

প্লাস্টার ধীরে ধীরে পানিতে দিয়ে নাড়তে হবে। এই তরলকে পাতলা করার জন্য পানি যোগ করতে হবে। আলাদা একটি পাত্রে ময়দা ঠাণ্ডা পানির সঙ্গে মেশাতে হবে এবং চুলায় নিয়ে সিদ্ধ করতে হবে। এখন প্লাস্টার মিশ্রণটি ময়দার দ্রবণে ধীরে ধীরে এই তরল দ্রবণে ঢেলে নাড়তে হবে। মশ্রিত তরলটি খুব ভালোভাবে নরম হয়েছে কি না দেখতে হবে। এখন একটি পাত্রে জিলাটিন ও মাড় বা স্টার্চ পানিতে সিদ্ধ করতে হবে এবং উপরোক্ত দ্রবণে ঢেলে নাড়তে থাকলে কোটিনটি প্রস্তুত হয়ে যাবে। এখন কাগজের ওপর ব্যবহারের পূর্বে একটি জালি কাপড় দিয়ে কোটিনটি ছেঁকে নিতে হবে। একটি নরম ফ্লাট ব্রাশ দিয়ে কাগজের ওপর লাগিয়ে শুকানোর জন্য ঝুলিয়ে রাখতে হবে। এখন একটি পরিষ্কার স্টোনের ওপর রেখে মেশিনে আপ-ডাউন করে পরিতলটি সমান করে নেওয়া হয়। কয়েক ধরনের ট্রান্সফার কাগজ বনানো সম্ভব:

(গ.৩.১) **গ্রেইন ট্রান্সফার কাগজ তৈরি**

এ ধরনের কাগজ ক্রেয়ন ও পেনসিল ড্রইং করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কখনো কখনো চারকোল পেপারেও এ ধরনের কোটিন বা আবরণ দিয়ে ট্রান্সফার কাগজ প্রস্তুত করা হয় ভিন্ন ধরনের টোনাল গুণ পাওয়ার জন্য। অপেক্ষাকৃত বড় গ্রেইন সম্পন্ন কাগজে সাধারণত মোটা আবরণের প্রলেপ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। শিল্পী সেখানে স্ক্র্যাপ করতে পারেন। এ ধরনের কাগজ তৈরিতে ট্রান্সফার পেপার প্রস্তুতের

পক্রিয়াটি নিম্নরূপঃ

ময়দা --- ৯ ভাগ

মিহি দানাযুক্ত দাঁতের প্লাস্টার --------------------------------- ১২ ভাগ

মাড় বা কার্বোহাইড্রেট (starch) -------------------------------- ২ ভাগ

প্রস্তুতকৃত তরলটি স্পঞ্জ বা ফ্লাট ব্রাশ দিয়ে লাগালে চারকোল পেপার ব্যতীত অন্য কাগজে খুব ফাইন গ্রেইন পাওয়া যায় কখনো কখনো পেপারে দুবারও কোটিন দেওয়া হয়।

(গ.৪) **ইন্টাগলিও প্লেট থেকে পেপারে ট্রন্সফার এবং সেখান থেকে স্টোনে ট্রান্সফার**

এ ধরনের কাগজ সাধারণত ইন্টাগলিও প্লেট থেকে প্রিন্ট নিয়ে স্টোনে ট্রান্সফার করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিম্নরূপভাবে কোটিনটি প্রস্তুত করতে হবেঃ

ময়দা --- ১২ ভাগ

মিহি দানার দাঁতের প্লাস্টার ------------------------------------ ১২ ভাগ

মাড় বা কার্বোহাইড্রেট (starch) ----------------------------- ১–২ ভাগ

(গ.৫) ট্রান্সপারেন্ট ট্রান্সফার কাগজ

ট্রেসিং পেপারের মতো একধরনের কাগজ বাজারে পাওয়া যায়, যার একটি পাশ খসখসে অন্য পাশ পিচ্ছিল বা গ্লসি। এই কাগজটিতে ইমেজ ট্রান্সফার করা যায় এবং সেখান থেকেও অন্য প্লেট বা স্টোনে ট্রান্সফার করা সম্ভব। জাপানে এ ধরনের কাগজ মূলত ট্রেস করা এবং ট্রান্সফার করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(ঘ) ট্রেসিং করা

স্টোন ও প্লেট লিথোগ্রাফিতে অনেক সময় ড্রইং করার পূর্বে মূল খসড়া থেকে ড্রইং ট্রেসিং করা হয়। সেই ট্রেসিং করার জন্য কার্বন পেপার, রেড অক্সাইড, ব্লু অক্সাইড ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। কার্বন পেপার ব্যবহার করলে প্রিন্টের সময় ট্রেসিংয়ের সেই লাইনটি চলে আসে বলে অনেকে রেড অক্সাইড জাতীয় ডাস্ট বা গুঁড়া কোনো একটি নিউজপ্রিন্টের এক পার্শ্বে ঝুট কাপড়ের সাহায্যে লাগিয়ে নিয়ে থাকে। এরপর এই কাগজটি ঝাড়া দিয়ে অতিরিক্ত অক্সাইড ফেলে দিয়ে স্টোনের ওপর রেখে তার ওপর মূল ড্রইংয়ের

কোনো কপি রেখে ট্রেসিং করা হয়। ফলে ইমেজকে টোন দিতে সুবিধা হয় এবং প্রিন্টের সময় এই অক্সাইডের দাগ আসে না।

৬.২.৫ প্লেটে ইমেজ তৈরির পর সংশোধন (erase) করার উপায়

কয়েকটি উপকরণ দিয়ে ইমেজ সংশোধন করা সম্ভব। সেই উপাদানগুলো হলো:

(১) টাইপ রাইটার ইরেজার

(২) বেনজিন

(৩) ল্যাকার থিনার: গার্মেন্টেসের কাপড়ের স্পট বা দাগ তুলে আনার জন্য ব্যবহৃত হয়

(৪) এসিটোন ইত্যাদি

(৫) ডিলিটার (প্রেস ইঙ্কের দোকানে পাওয়া যায়) দিয়ে ইমেজ মুছে ফেলা যায় কিন্তু এর পর নতুন ইমেজ সৃষ্টি করা যায় না।

উপরোক্ত উপাদানগুলো দিয়ে ইমেজ সংশোধন করার পর আবার ইমেজ সৃষ্টি করে গামিং করতে হবে। এখন নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী প্রিন্ট নেওয়ার উপায় অনুসরণ করতে হবে।

৬.২.৬ স্টোন ও প্লেট-লিথোতে গাম করার পদ্ধতি

স্টোনে গাম করার পদ্ধতি

একটি পাত্রে পানি নিয়ে তার মধ্যে এরাবিক গাম দিয়ে এক থেকে দুই ঘণ্টা পর হাত দিয়ে কচলে গলিয়ে নিলে ভালো হয়। গামের দ্রবণটি যেন একেবারে পাতলা না হয় (অর্থাৎ স্টোন লিথোর সময় ব্যবহৃত গামের চেয়ে বেশি ঘনত্বসম্পন্ন গাম)। এই আঠালো বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই গামই লিথোগ্রাফিতে নন-ইমেজ অংশতে পাতলা একটা আবরণ (কোটিন, ফিল্ম) হিসেবে কাজ করে। ভিসকোভিটা দিয়ে পুরো স্টোনে গামিং করতে হয়। এমনভাবে গামিং করতে হবে যেন স্টোনে কোনো আঁচড়ের দাগ না থাকে এবং ভিসকোভটাকে চিপড়ানোর সময় কোনোরূপ পরিষ্কার পানি ভিসকোভিটাতে না লাগে। লাগলে গামের পাতলা আবরণটি আরো পাতলা হয়ে যাবে এবং তার কার্য ঠিকমতো করতে পারবে না। পরে ভিসকোভিটা দিয়ে পানি দেওয়া হলে গামটিই স্পঞ্জের মতো ফুলে ওঠে। রোলিং করার সময় নন-ইমেজ অংশটি পানি গ্রহণ করে ফুলে ওঠে। ইঙ্ক বা কালিকে গ্রহণ না করে বর্জন করে। তবে প্লেট-লিথোর সময় যে পরিমাণ ঘন গাম গোলাতে হয়, স্টোন লিথোর সময় তুলনামূলকভাবে একটু পাতলা গাম হলেও সমস্যা হয় না। কারণ পৃথিবীতে যত রকম স্টোন আছে তার মধ্যে একমাত্র লিথো স্টোনই একই সময়ে সমপরিমাণ তেল ও পানি ধারণ করতে পারে।

৬.২.৭ গাম সংরক্ষণ করার পদ্ধতি

এরাবিক গাম একাশিয়া গাছ থেকে নিচে বালুতে পড়ে শক্ত প্রকৃতির নন-ক্রিস্টালাইন কার্বোহাইড্রেডে পরিণত হয়। এটি সাধারণত পানিতে গলে যায় কিন্তু তারপিনটাইন বা অ্যালকোহলে দ্রবীভূত হয় না। এরাবিক গাম দ্রবণ হচ্ছে সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণের মিশ্রণ, যা এরাবিক এসিডে পরিণত হয়। এই দ্রবণটি স্বাদহীন, আম্বার কালার ও মিষ্টি গন্ধযুক্ত।[১৬৩] দ্রবণটি দু-এক দিন পর টক গন্ধযুক্ত হতে থাকে, ফলে এসিডিক হয়ে ওঠে। আরো দু-এক দিন পরে এর গন্ধ নাকে নেওয়া যায় না। তাই এ গামটির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কোনো কোনো প্রিন্টমেকার এই দ্রবণে কয়েক ফোঁটা কার্বোলিক এসিড যুক্ত করে সংরক্ষণ করেন।[১৬৪] মোহাম্মদ কিবরিয়া বলতেন, এই দ্রবণে দু-এক ফোঁটা হারপিক দিয়ে দিলে সেটা বেশ কয়েক দিন ভালো থাকে।[১৬৫] এ ছাড়াও ফিটকিরি অথবা বোরিক এসিড দিয়েও গামকে সংরক্ষণ করা যায়।[১৬৬] আবার এরাবিক গামে ইথানল বা কপার সালফেট দিয়েও অনেকদিন গামকে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।[১৬৭] এরাবিক গামের সাথে তুত মিশিয়ে দিলে পোকা খাবার সম্ভাবনা থাকেনা।[১৬৮]

৬.২.৮ এরাবিক গাম ব্যবহার করার প্রক্রিয়া

(ক) স্টোনের পানি গ্রহণ করে শুষে নেওয়ার ক্ষমতা আছে। সে জন্য ঝুট কাপড়ের চেয়ে ভিসকোভিটা (বিশেষ ধরনের স্পঞ্জ) দিয়ে স্টোনে গামিং করা কার্যত অভিজ্ঞতাসম্পন্নভাবে পরীক্ষিত সাফল্যজনক ফল দিয়ে থাকে।

(খ) গামিং করার পর গরমের দিনে চার থেকে আট ঘণ্টা, আর শীতের দিনে ৮–১২ ঘণ্টা বিশ্রাম (রেস্ট) দেওয়া প্রয়োজন। কোনো কোনো প্রিন্টমেকার এক থেকে চার ঘণ্টা বিশ্রাম (রেস্ট) দিয়েও পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন। তবে সে ক্ষেত্রে প্রিন্টের গুণাগুণের তারতম্য ঘটে থাকে। অভিজ্ঞ প্রিন্টমেকাররা কাজের গুণাগুণের (Sensitivity) ওপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে থাকেন।

(গ) এরপর এচিং করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে প্রিন্টিংয়ে যেতে হবে।

---

[163] Jules Heller, *Print making Today: The planographic process,* 2nd edition, New York, p. 53
[164] Jules Heller, *ibid.*, p. 54
[165] মোহাম্মদ কিবরিয়া, লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত কথোপকথন, ১৭ জানুয়ারি, ২০০৮
[166] অশোক বিশ্বাস, ব্যক্তিগত কথোপকথন, ৪ এপ্রিল, ২০১৭
[167] ঝোটন চন্দ্র রায়, ব্যক্তিগত কথোপকথন, ৪ এপ্রিল, ২০১৭
[168] অশোক বিশ্বাস, তদেব.

প্লেট-লিথোগ্রাফিতে বা অ্যালুগ্রাফিতে এরাবিক গামিং করার পদ্ধতি

প্লেট-লিথোগ্রাফি (প্লেটোগ্রাফি) করার সময় গামটির পানি মিশ্রিত দ্রবণটি স্টোনে ব্যবহৃত দ্রবণের তুলনায় ঘন হলে ভালো হয়। তবে এ ক্ষেত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতাই বলে দেবে কী ধরনের ঘন গাম প্লেট-লিথোগ্রাফির ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য। প্লেটে গাম লাগানোর প্রক্রিয়া:

ক. যেহেতু প্লেট এর পানি শোষণক্ষমতা একেবারেই নেই সে জন্য ভিসকোভিটার পরিবর্তে জলরঙের তুলি দিয়ে অথবা ঝুট কাপড় দিয়ে মোটামুটি আলতোভাবে গামিং করতে হবে। বেশি প্রেশার দিয়ে ডলাডলি করে ইমেজ তুলে না ফেলাই ভালো। এ অবস্থায় চার থেকে আট ঘণ্টা আর শীতের দিনে আট থেকে ১২ ঘণ্টা বিশ্রাম (রেস্ট) দেওয়া প্রয়োজন। প্রিন্ট নেওয়ার পদ্ধতি পরে আলাদা করে লেখা হবে।

খ. চার থেকে আট ঘণ্টা গরমের দিনে আর শীতের দিনে আট থেকে ১২ ঘণ্টা বিশ্রাম দেওয়ার পর গামটি পানির সাহায্যে ভিসকোভিটা দিয়ে ভিজিয়ে যতটা সম্ভব তুলে ফেলে শুধু ঝুট কাপড়ের মাধ্যমে বেশি করে গাম সমস্ত ইমেজ অংশতে লাগাতে হবে। এখন একটি শুকনো ঝুট কাপড়ের বান্ডিল বানিয়ে তা দিয়ে পুরো প্লেটটিকে এমনভাবে মুছতে হবে, যেন পুরো প্লেটটির ওপর একটি পাতলা গামের আবরণ থেকে যায়, যা খালি চোখে দেখা যায় না। তবে এ সময় প্লেটটিকে আলোর বিপরীতে নিয়ে তাকিয়ে দেখতে হবে, যেন কোনোরূপ গামের আঁচড় দেখতে পাওয়া না যায়। আঁচড় দেখা গেলে পানি দিয়ে ধুয়ে এই কার্যটি পুনরায় করতে হবে, তা না হলে পরে ওয়াশ-আউট করার সময় এবং ল্যাকার লাগানোর সময় এই আঁচড়গুলো ইমেজ হিসেবে চলে আসবে এবং ইমেজকে ডিস্টার্ব করবে।

৬.২.৯ স্টোন ও প্লেট-লিথোগ্রাফিতে বাংলাদেশে এচিং থেকে শুরু করে প্রিন্ট নেওয়া পর্যন্ত অনুসৃত ও পরিশীলিত পদ্ধতি

৬.২.৯.১ স্টোন লিথোগ্রাফিতে এচিং থেকে শুরু করে প্রিন্ট বের করে নেওয়া পর্যন্ত পদ্ধতি

এচিং না করেও দক্ষ প্রিন্টমেকাররা শুধু এরাবিক গামের মাধ্যমে চার থেকে ছয়টি প্রিন্ট তুলে আনতে পারেন। তবে এডিশন প্রিন্ট নেওয়ার জন্য এচিং করতেই হবে। তা না হলে আস্তে আস্তে প্রিন্ট জড়িয়ে যাবে। নিম্নে যে পদ্ধতিটি বর্ণনা করা হবে, সেটি রোকনুজ্জামান অনুসৃত ও পরিশীলিত পদ্ধতি, যেটি বাংলাদেশের যেকোনো প্রতিষ্ঠানের স্টোন বা প্লেট লিথোগ্রাফির ক্ষেত্রে সুফল বয়ে এনেছে।

প্রথমে গামিং করা স্টোনটিকে ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি দিয়ে সমস্ত স্টোনকে ভিজিয়ে সেখান থেকে মোটা আস্তরের এরাবিক গাম তুলে ফেলতে হবে। এতে সমস্ত স্টোন বা প্লেট থেকে সব গাম ধুয়ে যায় না, কিছুটা রয়েই যায়।

(ক) একটি কাচের পাত্র বা প্লাস্টিকের পাত্রে এরাবিক গামের দ্রবণে এক-দুই ফোঁটা নাইট্রিক এসিড মিশিয়ে তুলির সাহায্যে পুরো ইমেজ ও নন-ইমেজ অংশে দিতে হবে। এক থেকে চার মিনিট পর পরিষ্কার পানি দিয়ে ভিসকোভিটার সাহায্যে স্টোনটিকে ধুয়ে ফেলতে হবে। তখন আলোর বিপরীতে চোখ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, নন-ইমেজ অংশে বুদ্‌বুদ উঠলে বুঝতে হবে যে— এসিড নন-ইমেজ অংশের গ্রেইনগুলোর সঙ্গে বিক্রিয়া করে তাকে খেয়ে ফেলছে এবং একটি আল্ট্রা ভায়োলেট রে উৎপন্ন করছে, যা খালি চোখে দেখা যায় না। এবার যেসব জায়গাতে (হালকা ইমেজের জায়গা) খুব হালকা ইমেজ আছে এবং সেটা দ্বিতীয়বার এচিং করলে চলে যেতে পারে বলে মনে হয়, সেই জায়গাগুলো বাদে বাকি জায়গাগুলোতে এ রকম করে আরো দু-একবার এচিং করা যেতে পারে। এই সময়ে বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্নভাবে এচিং করে থাকেন। সে পর্যায়গুলো হলোঃ

ক.১ এ অবস্থায় ফ্রেশ এরাবিক গাম ভিসকোভিটা দিয়ে লাগিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এরপর ভিসকোভিটার সাহায্যে স্টোনকে ভিজিয়ে খুব কম কালি দিয়ে (হুগলির ব্ল্যাক ইঙ্ক বা টোকা কালিও হতে পারে) রোলিং করা হয়। এতে হালকা ইমেজগুলো আরো একটু কালি ধারণ করে (কালি রিসিভ করে)। ফলে হালকা ইমেজ প্রিন্টিংয়ের সময় খুব ভালোভাবে চলে আসে। অর্থাৎ হালকা ইমেজটি ওলিও ম্যাঙ্গানিট অব লাইম তৈরি করতে সমর্থ হয়। এ প্রক্রিয়াটি করার কারণ হলো লিথোগ্রাফিতে হালকা ইমেজ ও সবচেয়ে ডার্ক ইমেজ চলে এলে মধ্যম গ্রেডের ইমেজগুলো এমনিতেই প্রিন্টে চলে আসে। সে বিষয়ে চিন্তা করতে হয় না। কিন্তু কিছু হালকা ইমেজ দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলো স্টোনে দেখা যাচ্ছে কিন্তু প্রিন্টে আসবে না। এই ইমেজের জায়গায় এচিং করলে তো তা আরো আসবে না। সে জন্যই এরূপ ক্ষেত্রে ওই সমস্ত ইমেজ অংশতে একবারও এচিং না করে এই রোলিংয়ের পর যখন হালকা ইমেজটি কালি ধারণ করে ওলিও ম্যাঙ্গানিট লাইম তৈরি করবে এবং শক্তিশালী ইমেজে পরিণত হবে তখন একটা হালকা এচিং করে নিলে ইমেজ অংশতে আর স্কাম ধরবে না। এটা গেল হালকা ইমেজকে উন্নত করে তৈরি করে নেওয়ার প্রক্রিয়া। কিন্তু বেশি কালো বা ডেপথের ইমেজ অংশগুলো যেন বেশি জড়িয়ে না যায় সে জন্যও এই এচিংটি প্রয়োজন। তবে এই ব্ল্যাক রোলিংয়ের সময় হালকা ইমেজে কালি ধরাতে গিয়ে যেন গাঢ় অংশে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি কালি ধারণ করে না ফেলে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ক.২ এর পর কেউ কেউ আছেন একবার দ্বিতীয় গ্রেডের ইমেজকে এচিং করে ফ্রেশ পানি দিয়ে ধুয়ে একবার ফ্রেশ গামিং করে কিছুক্ষণ পর আবার এচিং করেন। গ্রেড ক্রম অনুসারে একই পক্রিয়া বারবার করেন।

ক.৩ কেউ কেউ আছেন এই সময় ফ্রেশ গামিং করে শুকিয়েও নেন। তারপর ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি দিয়ে স্টোনকে ভিজিয়ে সুন্দরমতো ব্ল্যাক রোলিং করে প্রিন্ট নেন। এই প্রিন্টকে 'ড্রাইপ্রুফ' প্রিন্ট বলা হয়। এই প্রিন্টে হালকা ইমেজ সুন্দরভাবে চলে আসে। আর ডার্ক ইমেজ আবছা আবছা আসে। এটা দেখে শিল্পী আশ্বস্ত হন যে, তার হালকা ইমেজ বর্তমানে উন্নত পর্যায়ে উন্নিত হলো। এরপর শিল্পী আবার পরিমাণমতো ব্ল্যাক রোল করে (ইমেজ যেমন চান ঠিক তেমন অবস্থায় এলে) ফ্রেশ গামিং করে শুকিয়ে নিয়ে প্রিন্টের জন্য তৈরি হন।

ক.৪ এবার সমস্ত ইমেজ অংশ এচিং করা দরকার। হালকা ইমেজে হালকা (light etching) এচিং এবং গাঢ় অংশ ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী এচিং করা হয়ে থাকে। এরপর পরবর্তী প্রস্তুতি নিয়ে প্রিন্টের দিকে এগিয়ে যান। তবে এ ক্ষেত্রে অনেক লিথোগ্রাফার যেটা করেন, তা হলো— ইমেজের হালকা অংশ 'আন্ডার এচিং' এবং গাঢ় অংশ একটু 'ওভার এচিং' করে থাকেন। কারণ প্রিন্টিংয়ের সময় কয়েকটি প্রিন্ট পরে হালকা ও গাঢ় ইমেজ এমনিতেই প্রেশারে একটু বেশি ইঙ্ক ধারণ করে প্রয়োজনীয় অবস্থাতে চলে আসবে। এভাবে সাফল্যজনকভাবে সবচেয়ে ভালো প্রিন্ট নেওয়া সম্ভব। এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো আন্ডার এচিং করা অংশ একটু বেশি ইঙ্ক ধারণ করলে তার কাঙ্ক্ষিত ফলের দিকেই এগিয়ে যাবে। আবার ওভার এচিং করা অংশের বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য। একটি অংশে যতটুকু এচিং করা প্রয়োজন তার চেয়ে কম এচিং করলে তাকে আন্ডার এচিং বলা হয়। আর প্রয়োজনে তুলনায় বেশি এচিং করলে তাকে ওভার এচিং বলা হয়।

(খ) এবার আবার পরিষ্কার পানি দিয়ে ভিসকোভিটার সাহায্যে পুরো স্টোনকে ধুয়ে ফেলতে হবে। তা না হলে অতিরিক্ত এসিড স্টোনে থেকে গেলে ধীরে ধীরে ইমেজকে এচিং করে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

(গ) এখন পরিষ্কার (ফ্রেশ) এরাবিক গাম ভিসকোভিটার সাহায্যে এমনভাবে লাগাতে হবে যেন লাইটের বিপরীতে কোনো এরাবিক গামের আঁচড়ের দাগ দেখা না যায়। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, গাম লাগানোর পর শুকালে স্টোন দেখে বোঝার উপায় নেই যে, এতে গাম লাগানো হয়েছিল কি না? এমনভাবে গাম লাগানো উচিত হবে এবং গাম শুকানোর ২০ মিনিট পরই ওয়াশ-আউট করার জন্য স্টোন তৈরি হয়ে গেল।

(ঘ) ওয়াশ-আউট করার পদ্ধতি

বাংলাদেশে ওয়াশ-আউট করার জন্য অনুসরিত প্রক্রিয়াটি হলো—

ঘ.১ ঝুট কাপড়ের টুকরো দিয়ে 'বার্জার রবিয়াল্যাক থিনার টি-৬' (তারপিনটাইন বা লিথোটিনের পরিপূরক হিসেবে) এর সাহায্যে ইমেজ ওয়াশ-আউট করতে হবে। এ সময় খেয়াল রাখতে হবে এক ফোঁটা পানিও যেন স্টোনে না পড়ে। এ সময় পানি হলো ইমেজের জন্য ক্ষতিকারক।

ঘ.২ অনেকে ভালো করে ইমেজ ওয়াশ-আউট করেন না, ফলে প্রিন্টিংয়ের সময় অনেক সময় স্কাম (ইমেজ জড়িয়ে যায়) ধরে যায়। তাই ঝুট কাপড় দিয়ে ইমেজ এমনভাবে ওয়াশ-আউট করতে হবে যে স্টোনের কালারটি পরিষ্কার দেখা যায় এবং ইমেজ অংশ অনেকটা নেগেটিভ ইমেজের মতো দেখা যায়। এ অবস্থায় ইমেজের যে হালকা ইমেজ দেখা যায় সেটাকে বলা হয় 'ওলিও ম্যাঙ্গানিট অফ লাইম'।

ঘ.৩ অনেক শিল্পীরা আবার এই সময় বিটুমিন ও তারপিনটাইনের মিশ্রণ (যাকে ওয়াশ-আউট সলিউশন বলা হয়) ছোট ঝুট কাপড়ের সাহায্যে ইমেজ অংশতে লাগিয়ে দেন। তারপর ঝুট কাপড়ের ডাবার বানিয়ে তা দিয়ে ভালো করে মোছেন, ফলে খুব হালকা করে বিটুমিনের আস্তর ইমেজ ও নন-ইমেজ অংশতে লেগে থাকে।

(ঙ) এখন ভিসকোভিটা দিয়ে পানি নিয়ে সমস্ত ইমেজ ধুয়ে দিলে একধরনের কালো পানি উঠে আসবে। এই কালো পানির মধ্যে রয়েছে ময়লা, তারপিনের সঙ্গে মিশ্রিত তেল জাতীয় পদার্থ, বিটুমিন ও এরাবিক গাম— যা ফ্রেঞ্চ চকের সঙ্গে মিশ্রিত কালো পানি আকারে দেখা যাচ্ছে। আর যদি ওয়াশ-আউট সলিউশন বা বিটুমিন ও তারপিনটাইনের মিশ্রণ দ্বারা ওয়াশ-আউট করা হয় তখন সেই ময়লা পানির মধ্যে থাকে গাম অ্যারাবিক, তারপিনের সঙ্গে মিশ্রিত তেল জাতীয় বস্তু ফ্রেঞ্চ চকের সঙ্গে মিশ্রিত বস্তু ও বিটুমিনের সঙ্গে মিশ্রিত তারপিনটাইন জাতীয় বস্তুগুলোর মিশ্রণ, যাকে কালো ময়লার তরল বলা যায়। এভাবে ফ্রেশ পানি দিয়ে বারবার ধুয়ে নিতে হবে, যেন কোনোরূপ কালো পানির ময়লা না থাকে। কারণ কালো পানির ময়লার ভেতরকার বিটুমিন, তারপিন, এরাবিক গাম, কেরোসিন মিশ্রিত আঠালো বস্তুটি প্রিন্টিংয়ের সময় রোলিংয়ের ইঙ্কের সঙ্গে মিশে ইমেজের কিছু কিছু অংশে স্কাম ধরতে সাহায্য করে। তাই এ সময় রোলিংয়ের পূর্বে খুব ভালো করে পানি দিয়ে পরিষ্কার করে স্টোনটি ধুয়ে নিতে হয়।

(চ) এবার ভিসকোভিটা দিয়ে স্টোনকে স্পঞ্জ করে রোলিংয়ের বেডে চলে গিয়ে রোলিং করে আনতে হবে।

(ছ) এবার ভিসকোভিটা থেকে পরিমাণমতো পানি স্টোনে চিপে ফেলে সেই পানির ওপর ভিসকোভিটাটি ফেলে সমস্ত স্টোনকে ভেজাতে হবে। এখনো স্টোনে বেশ পানি দেখতে পাওয়া যাবে। এবার ভিসকোভিটার যেদিক দিয়ে মোছা হয়েছিল সেদিকটার উল্টো দিকটি দিয়ে আবার পুরো স্টোনকে মুছলে

দেখতে পাব যে, সমস্ত স্টোনে আর আগের মতো বেশি পানি নেই। পানির পরিমাণ সমস্ত স্টোনের নন-ইমেজ অংশতে সমানভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। এখন স্টোনটি রোলিং করার জন্য উপযুক্ত হলো। কয়েকবার রোলিং করার পর আবার ভিসকোভিটা দিয়ে সমস্ত স্টোনকে ভিজিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে ইঙ্কের বেডের কাছে।

(জ) আবার রোলিং করে (ছ) নম্বর প্রক্রিয়া পুনরায় করতে হবে। চলে যেতে হবে ইঙ্কের বেডের কাছে।

(ঝ) আবার অর্থাৎ মোট তিনবার রোলিং করার পর এবার ফাইনাল রোলিং (ছ) নম্বর প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। তবে শুধু শেষ রোলিং হওয়ার পর ভিসকোভিটা দিয়ে আর ভেজানোর দরকার নেই। কারণ তাতে হালকা ইমেজগুলো যে পরিমাণ কালার ধারণ করে তা আবার কমে যাবে, যা প্রিন্টিংয়ে চোখে পড়বে।

(ঞ) এবার পেপার স্টোনের ওপর রেখে আট থেকে ১০টি নিউজপ্রিন্ট কাগজ দিয়ে প্যাকিং তৈরি করে কাগজের ওপর রাখতে হবে।

(ট) টিমপ্যানটি কাগজের প্যাকিংয়ের ওপর বসাতে হবে। টিমপ্যানের ওপর যেখানে স্ক্র্যাপার বসানো হবে সেখানে মোবিল ও অয়েল মিশিয়ে কন্নি (স্প্যাচুলা) দিয়ে সেখানে লাগাতে হবে।

(ঠ) এখন অল্প প্রেশার দিয়ে স্ক্র্যাপারটি গ্রিজের ওপর বসিয়ে কয়েকবার আপ-ডাউন করতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে, প্রথমেই যেন বেশি প্রেশার না দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে স্টোন ভেঙে যেতে পারে এবং বেশি প্রেশারে ইমেজ ফ্লাট হয়ে যেতে পারে, যা পরবর্তী সময়ে পূর্বের ইমেজে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

(ড) এভাবে আস্তে আস্তে প্রেশার মোটামুটি পরিমাণমতো বাড়িয়ে একটি প্রিন্ট বের করে আনতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, মোটামুটি প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৬০০০ পাউন্ড থেকে ১০০০০ পাউন্ড প্রেশারের মধ্য দিয়ে একটি ভালো প্রিন্ট বেরিয়ে আসে।[১৬৯]

(ঢ) এখন (ছ) থেকে (ঝ) নম্বর প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে তিন থেকে ছয়টি প্রিন্ট বের করে আনলেই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।

---

[169] Jules Heller, *Printmaking Today: The planographic process*, 2nd edition, New York, p. 65

অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে— এচিং থেকে শুরু করে প্রিন্ট বের করে নেওয়া পর্যন্ত পদ্ধতি

প্রথমে শুকনো কাপড়ের কয়েকটি বান্ডিল বা ডাবার তৈরি করে নিলে ভালো হয়। একটি ডাবার এরাবিক গামিংয়ের জন্য, আরেকটি ল্যাকারের জন্য এবং পরবর্তীটি বিটুমিন বা ওয়াশ-আউট সলিউশন মোছার জন্য।

(ক) গামিং করা প্লেটটি লিথো মেশিনের বেডে নিয়ে আসতে হবে। প্লেটের নিচে প্রেস বেডে একটু পানি দিয়ে প্লেটটিকে আটকে দিতে হবে। তা না হলে পরবর্তী পর্যায়গুলোতে কাজ করার সময় পাতলা প্লেটটি বারবার সরে যাবে। এবার ভিসকোভিটা দিয়ে পানির সাহায্যে প্লেট থেকে গামকে ভিজিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। তবে অনেকের ধারণা, পানি দিলে গামটি সমস্ত প্লেট থেকে ধুয়ে চলে যায়। আসলে গামের মোটা আস্তর ধুয়ে যায়। কিছু না কিছু গাম প্লেটে থেকেই যায়।

(খ) এবার একটি পাত্রে গাম এরাবিক ও ইসি-ফাউন্ট মিশিয়ে ইমেজের বাইরের অংশে (ইমেজ বাদে প্লেটের চারদিকে যে অংশে কাজ করা হয় না, সে অংশে) দিয়ে দুই থেকে চার মিনিট পরে ভিসকোভিটা দিয়ে শুষে নিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে, এই ইসি-ফাউন্ট দ্রবণ যেন ইমেজ অংশতে না ঢোকে। কারণ তা ইমেজকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। অফসেট মেশিনে প্রিন্টিংয়ের সময় স্কাম ধরে গেলে এই ইসি-ফাউন্ট প্রিন্ট ক্লিনার হিসেবে বা আর্দ্রতা তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়। অফসেট মেশিনে ২-৩% ফিল্টার পানির সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। এবার ভিসকোভিটা দিয়ে ফ্রেশ পানির সাহায্যে পুরো প্লেটটিকে (ইমেজ অংশসহ) ধুয়ে ফেললে ইমেজের খুব একটা ক্ষতি হবে না। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলোঃ যে কারণে ফসফোরিক এসিড প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ব্যবহার করলে ডটস আকারে (pit-type corrosion) জড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ কাউন্টার এচিংয়ের মাধ্যমে রিসেনসিটাইজ হয়ে যাবে এবং ইমেজ ধারণ করা আরম্ভ করবে। ঠিক সে কারণেই ইসি-ফাউন্টও প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ব্যবহার করলে এ ধরনের সমস্যা উদ্ভূত হতে পারে।

(গ) প্লেটটিকে একটু শুকিয়ে নিয়ে 'তাপেম'[১৭০] দিয়ে ঝুট কাপড় বা তুলি মাধ্যমে ৪৫ সেকন্ডের মতো সময় ধরে এচিং করে যত দ্রুত সম্ভব ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। কেউ কেউ এ সময় টোনাল গ্রেড অনুযায়ী তাপেমের সঙ্গে এরাবিক গাম মিশিয়ে লাইট ইমেজের বেলায় হালকা এবং ডার্ক ইমেজের বেলায় স্ট্রং এচিং করে থাকেন। এরপর যত দ্রুত সম্ভব ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলেন। প্লেটটিকে পানিশূন্য করে শুকিয়ে নিয়ে ফ্রেশ এরাবিক গাম লাগিয়ে দিয়ে ঝুট কাপড়ের

---

[170] তাপেম=১৫মি.লি. (সিরিঞ্জ দিয়ে পরিমাপ করে) ফসফোরিক এসিড + ১০০ গ্রাম টেনিক এসিড + (৩০০ গ্রাম এরাবিক গাম + ১ লিটার পরিষ্কার পানি)। এই দ্রবণ দিয়ে অ্যালুগ্রাফিতে (অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে) অ্যালুগ্রাফিতে এচিং করা হয়

ডাবার বানিয়ে যত দ্রুত সম্ভব বাফিং (মুছতে থাকে) করতে হবে। দ্রুততার সঙ্গে না করলে গামটি প্রয়োজনের তুলনায় মোটা আস্তর হিসেবে ফিল্ম তৈরি করবে। প্লেট-লিথোর ক্ষেত্রে, এ সময়কার গাম এরাবিক দ্রবণটি ভিসকোভিটার সাহায্যে না লাগানোই ভালো। পাথরের পানি শোষণক্ষমতা আছে বলে ভিসকোভিটা দিয়ে বারবার মুছতে থাকলে পাথর পানি শুষে নেয় এবং পাতলা আবরণ হয়ে গামটি একটি ফিল্মের কাজ করে। সে ক্ষেত্রে প্লেটের পানি শোষণক্ষমতা না থাকার ফলে ভিসকোভিটা দিয়ে গামিং করতে গেলে আঁচড়ের সৃষ্টি হয়। আলোর বিপরীতে এই আঁচড়ের দাগগুলো দেখতে পাওয়া যাবে। এই গামিংয়ের সময় খেয়াল রাখতে হবে—

গ.১ কোনোরূপ পানি যেন সেখানে প্লেটের বাইরে থেকে ইমেজ অংশতে বা প্লেটে না ঢোকে (এই সময় পানি ইমেজের জন্য ক্ষতিকর)।

গ.২ লাইটের বিপরীতে দেখলে এরাবিক গামের যেন কোনো আঁচড় দেখতে পাওয়া না যায়, সে বিষয়টি লক্ষণীয়। যদি কোনো আঁচড় চোখে পড়ে বা পানি ঢুকে পড়ার ফলে আঁচড়ের চিহ্ন পাওয়া যায়, তবে আবার গামিং করতে হবে। তা না হলে পরে ল্যাকার লাগানোর সময় ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ল্যাকার মূলত এরাবিক গামের মোটা আঁচড়ের জায়গাটিতে ঢুকতে পারবে না। ফলে প্রিন্টিংয়ের সময় রোলিং করতে গেলে মোটা আঁচড়ের জায়গায় কালির ইমেজ হালকা আর পাতলা আঁচড়ের জায়গাটিতে ইমেজ গাঢ় আকারে প্রিন্ট হয়ে আসবে।

(ঘ) ফ্যান বা হেয়ার ড্রায়ারের সাহায্যে পুরো প্লেটকে শুকিয়ে নিতে হবে।

(ঙ) ছোট এক টুকরা ঝুট কাপড় দিয়ে বার্জার থিনারের সাহায্যে ইমেজকে ওয়াশ-আউট করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে, কোনোরূপ পানি যেন প্লেটের বাইরে থেকে ইমেজ অংশতে না ঢোকে (এই সময় পানি ইমেজের জন্য ক্ষতিকর)। কাপড় কালো হয়ে গেলে ফ্রেশ কাপড় ব্যবহার করতে হবে, তা না হলে পরবর্তী সময়ে প্রিন্টিংয়ের সময় ইমেজে স্কাম ধরে যেতে পারে।

(চ) ফ্যান বা হেয়ার ড্রায়ারের সাহায্যে পুরো প্লেটকে শুকিয়ে নিতে হবে।

(ছ) এবার ল্যাকার প্লেটে ঢেলে ছোট কাপড়ের সাহায্যে পুরো ইমেজ অংশতে বেশি করে লাগাতে হবে। কাজটি দ্রুত করতে হবে, না হলে ল্যাকার দ্রুত শুকিয়ে যাবে এবং মোটা আস্তর হিসেবে স্তর (লেয়ার) তৈরি করবে। এখন একটি শুকনো কাপড়ের একটি ডাবার দিয়ে দ্রুত ল্যাকার মুছে ফেলতে হবে, নইলে খুব পাতলা আবরণ ইমেজ অংশে ও নন-ইমেজ অংশে লেগে যাবে। এ সময় খেয়াল রাখতে হবে, কোনো প্রকার ভেজা কাপড় বা পানি যেন প্লেটের বাহির থেকে ভেতরে প্রবেশ না করে।

(জ) প্লেটটিকে হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে একটু শুকিয়ে নিতে হবে। এ সময় খেয়াল রাখতে হবে, কোনো প্রকার ভেজা কাপড় বা পানি যেন প্লেটের বাহির থেকে ভেতরে প্রবেশ না করে।

(ঝ) ওয়াশ-আউট সলিউশন (বিটুমিন ও তারপিনটাইনের মিশ্র দ্রবণ) পুরো ইমেজ অংশে (অংশতে) ছড়িয়ে দিয়ে আরেকটি শুকনো কাপড়ের ডাবার দিয়ে বিটুমিনটি প্লেট থেকে মুছে ফেললে ইমেজ ও নন-ইমেজ অংশতে বিটুমিন পাতলা করে লেগে থাকবে। এ সময় খেয়াল রাখতে হবে, কোনো প্রকার ভেজা কাপড় বা পানি যেন প্লেটের বাহির থেকে ভেতর প্রবেশ না করে।

(ঞ) প্লেটটিকে হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে একটু শুকিয়ে নিতে হবে।

(ট) এখন আমরা ভিসকোভিটা দিয়ে প্লেটে পানি দিয়ে পুরো ইমেজকে ভিজিয়ে হাতের তালুকে আলতো করে ঘোরালে নন-ইমেজ অংশ থেকে বিটুমিন, ল্যাকার ও গাম এরাবিক মিশ্রিত একটু আঠালো বস্তু উঠে আসতে থাকবে। ফ্রেশ পানি দিয়ে সে ময়লা দ্রবণকে ধুয়ে ফেলতে হবে। এভাবে বারবার ফ্রেশ পানি দিয়ে ধোয়ার পর পুরো ইমেজ অংশটিকে বাদামি রঙে (ব্রাউন কালারে) দেখতে পাওয়া যাবে। ইমেজটি অনেকটা আগের মতো দেখা যাবে। এখন ফ্রেশ পানি দিয়ে বা কলের নিচে নিয়ে ফ্রেশ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। অনেক সময় ইমেজ না উঠতে থাকলে কলের নিচে নিয়ে অনেকক্ষণ কল ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে কার্যটি সম্পন্ন করা যায়। অবার অনেক সময় রোলিং করতে থাকলে তখনো কিছু বিটুমিন মিশ্রিত ময়লা বস্তু রোলারের কালির সঙ্গে উঠে আসে। সে ক্ষেত্রে রোলারকে আবার পরিষ্কার করে নতুন ইঙ্ক নিয়ে প্রিন্টিংয়ে যাওয়া ভালো।

(ঠ) ইঙ্ক বেডে গিয়ে ইঙ্ক রোলিং করে আনতে হবে (ইঙ্ক তৈরির বিষয়টি আলাদা করে পরে আলোচনা করা হয়েছে)।

(ড) এবার ভিসকোভিটা থেকে পরিমাণমতো পানি প্লেটে চিপড়ে ফেলে সেই পানির ওপর ভিসকোভিটাটি ফেলে সমস্ত প্লেটকে ভেজাতে হবে। এখনো প্লেটে বেশ পানি দেখতে পাওয়া যাবে। এবার ভিসকোভিটার যেদিক দিয়ে মোছা হয়েছিল সেদিকটার উল্টো দিক দিয়ে আবার পুরো প্লেটকে মুছলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, সমস্ত প্লেটে আর আগের মতো বেশি পানি নেই। পানির পরিমাণ সমস্ত প্লেটের নন-ইমেজ অংশতে সমানভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। এখন প্লেটটিতে রোলিং করার জন্য উপযুক্ত হলো। কয়েকবার রোলিং করার পর আবার ভিসকোভিটা দিয়ে সমস্ত প্লেটকে ভিজিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে ইঙ্কের বেডের কাছে।

(ঢ) ইঙ্ক বেডে কয়েকবার রোলিং করার পর আবার ভিসকোভিটা দিয়ে সমস্ত স্টোনকে ভিজিয়ে দিয়ে প্লেটে রোলিং করে চলে যেতে হবে ইঙ্কের বেডের কাছে।

(ণ) আবার রোলিং করে (ঢ) নম্বর প্রক্রিয়া পুনরায় করতে হবে। এরপর চলে যেতে হবে ইঙ্কের বেডের কাছে।

(ত) এভাবে মোট তিনবার বা তার চেয়ে বেশিবার রোলিং করার পর ফাইনাল রোলিং করে করতে হবে। রোলিং শেষ হওয়ার পর ভিসকোভিটা দিয়ে আর ভেজানোর দরকার নেই।

(থ) এবার পেপার প্লেটের ওপর (রেজিস্ট্রেশন চিহ্ন বরাবর) রেখে আট থেকে ১০টি নিউজপ্রিন্ট কাগজ দিয়ে প্যাকিং তৈরি করে কাগজের ওপর রাখতে হবে।

(দ) টিমপ্যানটি কাগজের প্যাকিংয়ের ওপর বসাতে হবে। টিমপ্যানের ওপর মোবিল অয়েল মিশিয়ে কন্নি (স্ক্র্যাপার) দিয়ে যেখানে লিথো মেশিনের স্ক্র্যাপার বসানো হবে সেখানে লাগাতে হবে।

(ধ) এখন অল্প প্রেশার দিয়ে স্ক্র্যাপারটি গ্রিজের ওপর বসিয়ে কয়েকবার আপ-ডাউন করতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে প্রথমেই যেন বেশি প্রেশার না দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে (স্টোন ভেঙে যেতে পারে) বেশি প্রেশারে প্লেটের ইমেজ ফ্লাট হয়ে যেতে পারে, যা পরবর্তী সময়ে পূর্বের ইমেজে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

(ন) এভাবে আস্তে আস্তে প্রেশার মোটামুটি পরিমাণমতো বাড়িয়ে একটি প্রিন্ট বের করতে হবে।

(প) এখন উপরোক্ত প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে পাঁচ থেকে ছয়টি প্রিন্ট বের করে আনলেই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।

৬.৩ স্টোন ও প্লেট-লিথোগ্রাফিতে ব্ল্যাক-রোলিং করার জন্য ইঙ্ক বা কালি তৈরি করার পদ্ধতি

৬.৩.১ স্টোনে ব্ল্যাক রোলিং করার ক্ষেত্রে ইঙ্ক তৈরির পদ্ধতি

(ক) ইমেজ তৈরির পর গামিং করা হয়। এরপর একবার এচিং করে অথবা (অনেকে) এচিং না করেই ভিসকোভিটা দিয়ে পানি দিয়ে ইমেজ ও নন-ইমেজ অংশকে ভিজিয়ে ইঙ্ক বেডে চলে যেতে হবে।

(খ) এবার সরাসরি হুগলি বা টোকা কালি সামান্য পরিমাণে (প্রিন্ট করার সময় যেমন তৈরি কালি নেওয়া হয়, সে রকমটি না নিলেও হয়) নিয়ে ইঙ্ক বেডে রোল করে পরে ইমেজ অংশতে গিয়ে ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রোলিং করলে হালকা ইমেজের অংশটি আরো একটু ইঙ্ক ধরবে এবং ওলিও ম্যাঙ্গানিট অফ লাইম তৈরি করবে। ফলে ফাইনাল এচিংয়ের সময় হালকা ইমেজ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

(গ) এরপর অনেকে বারবার এচিং করে গামিং করেন। এরপর ভিসকোভিটা সাহায্যে পানি দিয়ে রোলিং করেন। এভাবে বারবার এচিং ও রোলিং করে ইমেজকে কাঙ্ক্ষিত সফলতার দিকে নিয়ে যান। এখন পরিষ্কার পানি দিয়ে স্টোনকে ধুয়ে ফেলতে হবে।

(ঘ) ফ্যান বা হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে স্টোনকে শুকিয়ে শুকনো তুলির সাহায্যে ফ্রেঞ্চ চক (৫০% ফ্রেঞ্চ চক +৫০% রেজিন ডাস্ট মিশিয়েও করা যায়) দিয়ে সমস্ত ইমেজের অংশে লাগিয়ে দিতে হয়। এবার ভিসকোভিটা দিয়ে পানি সমস্ত ইমেজে দিতে গেলে পাতলা কালি আর ভিসকোভিটাকে আঁকড়ে ধরবে না। কারণ নরম কালি ফ্রেঞ্চ চক ও রেজিন ডাস্টকে শুষে নিয়েছে। এই রেজিনের গুঁড়াটি পরে বারবার এচিং করার ক্ষেত্রে ইমেজকে রক্ষা করবে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় শক্তিশালী স্ট্রং এসিড দিয়ে এচিং করতে গেলে ইমেজকে আর রক্ষা করা সম্ভবপর হবে না।

(ঙ) এভাবে এচিং করার পর ফ্রেশ গামিং করে ওয়াশ-আউট পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রিন্টিংয়ের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

(চ) এখন ফাইনাল প্রিন্ট নেওয়ার সময় ইমেজ অনুযায়ী ইঙ্ক প্রস্তুত করতে হবে।

চ.১ তুষের ইমেজ হলে ইঙ্ক বেশি শক্ত না করাই ভালো। এ সময় ইঙ্কের সঙ্গে অল্প পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট বা ট্যালকম পাউডার অল্প পরিমাণে মিশিয়ে প্রিন্ট নেওয়া যায়।

চ.২ কন্টি বা গ্লাসমার্কারের ক্ষেত্রে হুগলি বা টোকা ইঙ্কের সঙ্গে পরিমাণমতো ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট বা ট্যালকম পাউডার মিশিয়ে (তুষের ইমেজের জন্য তৈরি কালির থেকে বেশি শক্ত ইঙ্ক তৈরি করতে হবে) কালি তৈরি করে প্রিন্ট নেওয়া যায়।

চ.৩ ফ্লাট ইমেজের প্রিন্ট নেওয়ার জন্য ইঙ্কের সঙ্গে ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট বা ট্যালকম পাউডার না মেশালেও চলে।

৬.৩.২ অ্যালুমিনিয়াম প্লেটের প্রিন্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্ল্যাক-রোলিং করার জন্য ইঙ্ক তৈরির পদ্ধতি

লিথোগ্রাফিক পেনসিলের সকল ধরনের গ্রেড ইমেজ তৈরির সময় মেটাল প্লেটে সন্তোষজনক ফল বয়ে আনে। স্টোনের তুলনায় ভারী হয়ে প্রিন্ট আসে। কারণ প্লেট সাধারণত স্টোনের তুলনায় বেশি ইঙ্ক ধারণের ক্ষমতা রাখে। প্লেটে সচরাচর শক্ত পেনসিল ব্যবহার না করলে ইমেজ ধরে রাখতে পারে না। অনেক সময় এ ধরনের সমস্যা হালকা ইমেজ এচিং করার সময় ৫০% এবং প্রিন্টিংয়ের সময় ৫০% ইঙ্ক চলে যায়। ফলে প্রিন্টে আসে না। প্লেটে ঘটনাটি ঘটে দুটি কারণে: (১) খুব নরম ক্রেয়ন ব্যবহার করলে

এবং (২) দ্রুত টোন দিতে থাকলে পেনসিলে বা ক্রেয়নে সেই প্রেশারের অভাব ঘটে, যেটা ইমেজ ধারণ করার জন্য প্রয়োজন ছিল।[১৭১] তবে বাংলাদেশর প্রিন্টমেকাররা তাদের মতো করে নিম্নলিখিত উপায়ে এই সমস্যা সমাধান করে প্রিন্ট নেওয়ার চর্চা অব্যাহত রেখেছেন।

(ক) ইমেজ তৈরির পর গামিং করা হয়। এরপর একবার তাপেম দিয়ে হালকা এচিং করে অথবা অনেক সময় এচিং না করেই ভিসকোভিটা দিয়ে পানি দিয়ে ইমেজ ও নন-ইমেজ অংশকে ভিজিয়ে ইঙ্ক বেড়ে চলে গিয়ে রোলিং করে ইমেজকে আরেকটু উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া দরকার।

(খ) খ.১ তুষের ইমেজের ক্ষেত্রে

এবার সরাসরি হুগলি বা টোকা কালি সামান্য পরিমাণে (প্রিন্ট করার সময় যেমন তৈরি কালি নেওয়া হয়, সে রকমটি না নিলেও হয়) নিয়ে ইঙ্ক বেড়ে রোল করে পরে ইমেজের অংশে গিয়ে ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রোলিং করলে হালকা ইমেজের অংশে আরো একটু ইঙ্ক ধরবে। প্লেট যেহেতু ওলিও ম্যাঙ্গানিট অফ লাইম তৈরি করতে পারে না সেহেতু একবার রোলিং করে তারপর এচিং পদ্ধতিতে গেলে ভালো। ফলে ফাইনাল এচিংয়ের সময় হালকা ইমেজ নাই হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

(খ.২) কন্টি বা গ্লাসমার্কার ইমেজের ক্ষেত্রে

ইমেজ তৈরির পর গামিং করা হয়। এরপর একবার তাপেম দিয়ে হালকা এচিং করে অথবা অনেক সময় এচিং না করেই ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি দিয়ে ইমেজ ও নন-ইমেজ অংশকে ভিজিয়ে ইঙ্ক বেড়ে চলে যেতে হবে। ইঙ্ক বেড়ে রোল কারর পরে ইমেজ অংশতে গিয়ে ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রোলিং করলে হালকা ইমেজের অংশ আরো একটু ইঙ্ক ধরবে।

(গ) ইমেজকে শুকিয়ে তুলি দিয়ে ফ্রেঞ্চ চক লাগিয়ে ফ্রেশ পানি দিয়ে ভিসকোভিটার সাহায্যে ধুয়ে গামিং করে ৫–১০ মিনিট বিশ্রাম দেওয়া যায়।

(ঘ) এবার তাপেম দিয়ে পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী এচিং করে পরবর্তী প্রসেসে যেতে হবে।

৬.৩.৩ স্টোন বা প্লেট-লিথোর প্রিন্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্ল্যাক-রোলিং করার জন্য ইমেজের পরিপ্রেক্ষিতে ইঙ্ক তৈরির পদ্ধতি

(ক) ইমেজ তৈরির পর যথাযথভাবে গামিং করা হয় ভিসকোভিটা দিয়ে। অনেক সময় আগের দিন গামিং করে থাকলে পরের দিন অরেকবার গামিং করে স্টোন বা প্লেটকে শুকিয়ে নিলে আর কোনো শঙ্কা

---

[171] GaroZ. Antreasian and Clinton Adams, *The Tamarind Book of Lithography: Art & Techniques*, Los Angeles, June 8, 1970, p., p. 140

(রিস্ক) থাকে না। কারণ মাঝেমধ্যেই দেখা যায় যে, একধরনের পোকা ইমেজের ওপর থেকে গামকে খেয়ে যাচ্ছে। (চিত্র. ৬.৮) সে ক্ষেত্রে আবার গামিং না করলে সেই স্থানে রোলিংয়ের সময় স্কাম ধরে যেতে পারে। তবে এরাবিক গামের সাথে তুত মিশিয়ে দিলে পোকা খাবার সম্ভাবনা থাকেনা।

Plate: 6.8 প্লেট পোকায় খেয়ে গেলে এরূপ হয়

(খ) খ.১ তুষের ইমেজের ক্ষেত্রে

প্রথমে একটা লাইট এচিং করে নিয়ে পানি দিয়ে ধুয়ে ফ্রেশ গামিং করে শুকিয়ে নিতে হবে।

খ.২ এবার সরাসরি হুগলি বা টোকা কালি সামান্য পরিমাণে (প্রিন্ট করার সময় যেমন তৈরি কালি নেওয়া হয়, সে রকমটি না নিলেও হয়) নিয়ে ইঙ্ক বেডে রোল করার পর ইমেজ অংশতে গিয়ে ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রোলিং করলে হালকা ইমেজের অংশ আরো একটু ইঙ্ক ধরবে। স্টোন যেহেতু ওলিও ম্যাঙ্গানিট অফ লাইম তৈরি করতে পারে সেহেতু একবার রোলিং করে তারপর এচিং পদ্ধতিতে গেলে ভালো। ফলে হালকা ইমেজ আরো একটু স্ট্রং ইমেজে পরিণত হবে এবং ফাইনাল এচিংয়ের সময় হালকা ইমেজ নাই হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

খ.৩ কন্টি বা গ্লাসমার্কার দিয়ে তৈরি ইমেজের ক্ষেত্রে

ইমেজ তৈরির পর গামিং করা হয়। এরপর একবার নিয়ম অনুযায়ী হালকা এচিং করে অথবা অনেক সময় এচিং না করেই ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি দিয়ে ইমেজ ও নন-ইমেজ অংশকে ভিজিয়ে ইঙ্ক বেডে চলে যেতে হবে। ইঙ্ক বেডে রোল করার পর ইমেজ অংশতে গিয়ে ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি দিয়ে

ভিজিয়ে রোলিং করলে হালকা ইমেজের অংশে আরো একটু ইঙ্ক ধরবে। কেউ কেউ আবার তাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ইঙ্ককে শক্ত করে তৈরি করে নেন।

(গ) ইমেজকে শুকিয়ে তুলি দিয়ে ফ্রেঞ্চ চক লাগিয়ে পরিষ্কার পানি দিয়ে ভিসকোভিটার সাহায্যে ধুয়ে গামিং করে ২০ মিনিট বিশ্রাম দেওয়া যায়।

(ঘ) এবার (নাইট্রিক এসিড ও ফসফোরিক এসিড এরাবিক গামের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে নিয়ম অনুযায়ী) ফাইনাল এচিং করে পরবর্তী প্রক্রিয়াতে যেতে হবে।

(ঙ) ইঙ্ককে পাতলা করার উপায়: ইঙ্ককে পাতলা করার জন্য নারকেল তেল বা কাঁচা লিনসিড মিশানো যেতে পারে। এগুলো ব্যবহার করলে অনেকদিন পর পেপারের পাশে বা লপিছনে লালচে হয়ে যাবে না।

৬.৪ প্রিন্ট নেওয়ার জন্য পেপার সাইজিং করা বা সরাসরি প্রিন্ট নেওয়ার পদ্ধতি

কয়েকটি উপায়ে পেপারে প্রিন্ট নেওয়া হয়:

(ক) কাগজে সরাসরি প্রিন্ট নেওয়ার পদ্ধতি

ক.১ স্টোনে রোলিং করা শেষ হলে সরাসরি নিউজপ্রিন্ট কাগজ প্লেটের ওপর রাখতে হবে। এর ওপর দুটি কার্টিজ পেপার বা সুইচবোর্ড রেখে তার ওপর আবার ৬–১০টি নিউজপ্রিন্ট কাগজ রাখতে হবে। তার ওপর একটি টিমপ্যান বা প্রেসের অ্যালুমিনিয়াম শিট রাখতে হবে।

ক.২ টিমপ্যানের ওপর গ্রিজ ও মোবিল অয়েল দিতে হবে।

ক.৩ স্ক্র্যাপার নামিয়ে প্রিন্ট মেশিনের হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে প্রিন্ট নেওয়া হয়।

(খ) কাগজকে প্রিন্টের আগে ভিজিয়ে প্রিন্ট নেওয়ার পদ্ধতি

খ.১ কোনো কোনো কাগজের ক্ষেত্রে প্রিন্ট নেওয়ার ২০ মিনিট পূর্বে পরিষ্কার ভিসকোভিটা দিয়ে ভিজিয়ে একটির ওপর একটি করে নিউজপ্রিন্ট রাখতে হবে। কাগজগুলোকে একটি পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। এবার স্টোনে রোলিং করে প্রিন্ট নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ.২ কোনো কোনো কাগজ আবার এক ঘণ্টা পূর্বে ভিজিয়ে একটি পলিথিন দিয়ে ঢেকে রেখে স্টোনে রোলিং করে প্রিন্ট নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ.৩ কোনো কোনো কাগজ আগের দিন রাতে ভিজিয়ে একটি পলিথিন দিয়ে ঢেকে চলে যেতে হয়। পরদিন সকালে স্টোনে রোলিং করে প্রিন্ট নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

খ.৪ কোনো কোনো প্রিন্টমেকার আগের রাতে কাগজ ভিজিয়ে রাখে এবং তার এক ঘণ্টা পর শুধু বেডের ওপর রেখে মেশিনকে আপ-ডাউন করে একটির ওপর আরেকটি নিউজপ্রিন্ট কাগজ দিয়ে ঢেকে চলে যান। পরদিন সকালে স্টোনে রোলিং করে প্রিন্ট নেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

৬.৫ স্টোন লিথোগ্রাফির প্রিন্ট নেওয়ার পর স্টোনকে সংরক্ষণ করার পদ্ধতি

স্টোন লিথোগ্রাফিতে প্রিন্ট নেওয়া শেষ হয়ে গেলে পরবর্তী সময়ে আবার প্রিন্ট নেওয়ার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণ করলে ভালা:

৬.৫.১ স্টোন থেকে এক দিন পর আবার প্রিন্ট নেওয়ার পদ্ধতি

(ক) প্রিন্ট নেওয়া শেষ হলে আরেকটি প্রিন্ট নেওয়ার জন্য— পূর্বের প্রথা অনুযায়ী তিনবার রোলিং করতে হবে।

(খ) ফাইনাল রোলিং হয়ে গেলে প্রিন্ট না নিয়ে স্টোনটিকে ফ্যানের বাতাস বা হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে শুকাতে হবে।

(গ) এবার তুলি (পানিতে ভেজা তুলি নয়) দিয়ে সমস্ত ইমেজের অংশে ফ্রেঞ্চ চক ও রেজিন ডাস্টের মিশ্রণ বা শুধু রেজিন ডাস্ট ছড়িয়ে দিতে হবে।

(ঘ) ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি দিয়ে সমস্ত স্টোনকে ধুয়ে দিতে হবে।

(ঙ) ফ্রেশ গামিং করে রাখতে হবে ভিসকোভিটার মাধ্যমে।

(ছ) পরদিন পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে আবার একটি ফ্রেশ গামিং করে শুকাতে হবে।

(জ) একদিন পর পানি দিয়ে ধুয়ে গামিং করে শুকিয়ে ওয়াশ-আউট করে যথা নিয়মে প্রিন্ট নেওয়া যাবে।

৬.৫.২ স্টোন থেকে এক সপ্তাহ বা মাসখানেক পর প্রিন্ট নেওয়ার পদ্ধতি

সাধারণত দু-এক দিনের মধ্যে যেহেতু স্টোনের কালি পুরোপুরি শুকিয়ে যায় না তাই দু-এক দিনের মধ্যে প্রিন্ট নিতে গেলে তেমন একটা অসুবিধায় পড়তে হয় না। সাধারণত (স্টোন থেকে এক দিন পর আবার প্রিন্ট নেওয়ার পদ্ধতি)-র (জ) নং নিয়মে ওয়াশ-আউট করেই বা পূর্বোল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী প্রিন্ট নেওয়া সম্ভব। কিন্তু যদি স্টোনের ইঙ্ক শুকিয়ে যায় তাহলে ওয়াশ-আউটের সময় ইঙ্ক উঠতে চায় না। তাই এ পক্রিয়ায় যাওয়ার পূর্বেই স্টোনটিকে ভালো করে দেখে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে হবে— স্টোনে ইঙ্ক

শুকিয়ে গেছে কি না? যদি শুকিয়ে যায় তাহলে এই স্টোন থেকে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় প্রিন্ট বের করে আনা সম্ভব।

প্রথম পদ্ধতি

(ক) স্টোনটিকে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। অথবা বেশ কিছুক্ষণ একটি পানির বালতিতে চুবিয়ে রাখলে ভালো।

(খ) এবার একটি ফ্রেশ গামিং (গামটি প্রয়োজনের তুলনায় একটু ঘন হলে ভালো হয়) করতে হবে। এই ফ্রেশ গামিংটি দুবার করলে ভালো হয়। এরপর গাম শুকিয়ে নিতে হবে।

(গ) এবার ওয়াশ-আউট করতে হবে। ওয়াশ-আউটের সময় কোনোরূপ পানি যেন স্টোনে না ঢুকে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

(ঘ) এবার যদি কিছু জায়গায় ইমেজ না ওঠে তাহলে ল্যাকার দিয়ে দ্রুত ইমেজ ওঠানো যেতে পারে।

(ঙ) ইমেজ উঠে গেলে স্টোনে দুটি উপায়ে রোল করে পরীক্ষামূলকভাবে দেখা যেতে পারে যে— কোন প্রক্রিয়া ইমেজের জন্য ভালো:

ঙ.১ গামিংয়ের পর স্টোনে কোনোরূপ পানি না দিয়ে রোলিং করে পুরো স্টোনকে কালো করে ফেলতে হবে। ফলে ইমেজ অংশ ও নন-ইমেজ অংশ উভয়ই ইঙ্ক ধারণ লাভ করল।

ঙ.২ এবার ভিসকোভিটা দিয়ে সমস্ত স্টোনে পানি ছিটিয়ে দিয়ে রোলারে ইঙ্ক কম নিয়ে বারবার রোলিং করলে নন-ইমেজ অংশ থেকে ইঙ্ক উঠে আসতে থাকবে। এভাবে বারবার পানি দিয়ে রোল করলে সমস্ত ইঙ্ক নন-ইমেজ অংশ থেকে রোলারে উঠে আসবে। আস্তে আস্তে পূর্বের ইমেজে ফিরে যাওয়া সম্ভব। এরপর একটি এচিং করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে প্রিন্ট করা যেতে পারে। তবে এ সময় একটু খেয়াল রাখতে হবে যে— ইমেজকে পুনরায় পূর্বের অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য রোলারে যে ইঙ্ক উঠে আসছিল তাতে এরাবিক গাম ও ইঙ্কের মিশ্রণ রয়েছে। তাই ফাইনাল প্রিন্ট নেওয়ার পূর্বে ইঙ্ক বেড ও রোলার খুব ভালো করে তারপিনটাইন বা থিনার দিয়ে পরিষ্কার করে নতুন ইঙ্ক বানিয়ে প্রিন্ট নেওয়া ভালো। না হলে পূর্বোল্লিখিত সমস্যার উদ্রেক হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি

(ক) ফাইনাল প্রিন্ট নেওয়ার পর আরেকটি প্রিন্ট নেওয়ার জন্য তিনবার রোলিং করার পর প্রিন্ট না নিয়ে স্টোনকে ফ্যানের বাতাসে শুকিয়ে পুরো স্টোনে ফ্রেঞ্চ চক ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর জলরঙের শুকনো ব্রাশ দিয়ে সমস্ত ইমেজে ফ্রেঞ্চ চক লাগিয়ে দিতে হবে।

(খ) ফ্রেশ গামিং করে রেখে দিতে হবে।

(গ) দু-তিন দিন পর আবার পানি দিয়ে ধুতে হবে।

(ঘ) ফ্রেশ গামিং করে শুকাতে হবে।

(ঙ) নিয়ম অনুযায়ী ওয়াশ-আউট করতে হবে।

(চ) রোলিং করে প্রিন্ট নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অবস্থায় এসে পূর্বের নিয়মমাফিক শুকিয়ে গামিং করে স্টোনকে সংরক্ষণ করা যায়।

এভাবে এই পদ্ধতিতে ইমেজ ও স্টোন উভয়কে সংরক্ষণ করলে সবচেয়ে সফলতা পাওয়া যাবে। তবে এ প্রক্রিয়াতে কয়েকটি সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। সুবিধা হলো— এ প্রক্রিয়াতে ইমেজ ধীরে ধীরে আরো সঠিক অবস্থায় (perfect position) যায়। পরের দিকে প্রিন্ট নিতে গেলে খুব সহজেই প্রিন্ট বের করে নিয়ে আসা যায়। কারণ প্রিন্টমেকার ভালো করেই জানেন যে, প্রথম ফাইনাল প্রিন্টের সময় অনেক বেগ পেতে হয়েছিল একটি ফাইনাল প্রিন্ট বের করে আনতে। আর অসুবিধা হলো পূর্বের ন্যায় ইমেজ আর থাকছে না, সমান্য পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে কয়েকবার এচিং করলে এ পদ্ধতিটি আরো সবচেয়ে ভালো ফলাফল দেবে।

৬.৬ অ্যালুমিনিয়াম প্লেট থেকে প্রিন্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে প্লেট সংরক্ষণ করার পদ্ধতি

৬.৬.১ প্রথম পদ্ধতি: অজিৎ সিল (ভারতীয় শিল্পী) অনুসরিত পদ্ধতি

(ক) প্রিন্ট নেওয়া শেষ হলে বাফিং (ঝুট কাপড় দিয়ে মুছার জন্য একধরণের প্রক্রিয়া) করে একটা ফ্রেশ গামিং করতে হবে। এবার হেয়ার ড্রায়ার বা ফ্যানের সাহায্যে শুকিয়ে নিয়ে বার্জার থিনার দিয়ে ওয়াশ-আউট করতে হবে।

(খ) এবার পানি দিয়ে পুরো প্লেটকে ধুলে প্লেটে যে রঙের আভা থাকে, তা চলে যাবে।

(গ) এবার ভালো করে বাফিং করে (কোনো রকম গামের আঁচড় যেন না থাকে এমনভাবে বাফিং করতে হবে) আবার গামিং করে শুকিয়ে রেখে দিতে হবে। এভাবে প্লেট সংরক্ষণ করলে কয়েক মাস বা বছর পরও পুনরায় প্রিন্ট নেওয়া সম্ভব।

(ঘ) পরবর্তী সময়ে আবার প্রিন্ট নেওয়ার সময় একবার খুব ভালো করে বাফিং করে ফ্রেশ গামিং করে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে এ সময়ও ভালোভাবে বাফিং না করলে অর্থাৎ গামের আঁচড় থেকে গেলে প্রিন্টের সময় সেই আঁচড়গুলো প্রিন্টে চলে আসে এবং শিল্পী ঘাবড়ে যেতে পারেন।

(ঙ) তার পরও যদি আঁচড় চলে আসে তবে প্লেটটিকে আবার ওয়াশ-আউট করে পানি ও ফসফোরিক এসিডের সাহায্যে ধুয়ে ফেলার পর ফ্রেশ পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর একটু গরম পানি দিয়ে ধুয়ে দিয়ে ফ্রেশ গামিং করতে হবে বাফিং করে।

(চ) এবার ওয়াশ-আউট করে প্রিন্ট নিলে আর সেই আঁচড়ের দাগ আসবে না। সেইসঙ্গে সফলভাবে আগের মতো প্রিন্ট নেওয়া সম্ভব।

৬.৬.২ দ্বিতীয় পদ্ধতি: এই অভিসন্দর্ভের লেখক অনুসরিত পদ্ধতি

(ক) প্রিন্ট নেওয়া শেষ হলে প্লেটটিকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন পড়লে প্রিন্ট নেওয়ার মতো রোল করে শুকাতে হবে। এবার ফ্রেঞ্চ চক পুরো প্লেটে ছড়িয়ে দিয়ে ওয়াটার কালারের শুকনো ব্রাশের সাহায্যে সমস্ত ইমেজে লাগিয়ে দিতে হবে। এরপর ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

(খ) ঝুট কাপড় দিয়ে বাফারিং করে (কোনোরূপ গামের আঁচড় যাতে না থাকে) শুকিয়ে প্লেটটিকে রেখে দিতে হবে।

(গ) কয়েক বছর পরও যদি প্রিন্ট নিতে হয়, তখন দেখা যাবে, ইঙ্ক শুকিয়ে গেছে। এবার ঝুট কাপড় দিয়ে (বাফারিং করে) ফ্রেশ গামিং করে প্লেটটিকে শুকাতে হবে। বার্জার থিনার দিয়ে যতটুকু পারা যায় কালি উঠিয়ে নিতে হবে।

(ঘ) এবার নিঃশ্বাস বন্ধ করে ল্যাকার দিয়ে ওয়াশ-আউট করতে গেলে দেখা যাবে পূর্বের ল্যাকারসহ সব কিছু উঠে আসবে। এটিকে 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা পদ্ধতি' নামকরণ করা যেতে পারে।

(ঙ) এখন কাপড় দিয়ে নোংরা কালো রং (ল্যাকারসহ কালি) দ্রুত মুছে ফেলতে হবে। এবার ফ্রেশ ল্যাকার পুরো ইমেজে তাড়াতাড়ি দিয়ে এমনভাবে মুছতে হবে যেন ল্যাকারের কোনো আঁচড় না দেখা যায়। ল্যাকারের আঁচড় দেখা গেলে আবার নতুন করে ল্যাকার দিয়ে খুব ভালো করে ল্যাকার মুছতে হবে।

(চ) এখন আগের মতো বিটুমিন এবং পরবর্তী প্রক্রিয়ায় প্রিন্ট নেওয়া সম্ভব।

৬.৭ লিথোগ্রাফি স্টোনের বৈচিত্র্যময়তা বা স্টোন নির্বাচন

বিভিন্ন উপকরণ, যেমন: গ্লাস, মার্বেল, অনিক্স, স্লেট এবং স্টেইনলেস স্টিলে লিথোগ্রাফির মতো করে প্রিন্ট নেওয়া সম্ভব। কিন্তু কোনো কিছুই ফ্রোনকোনিয়া জেলার (জার্মানির সোলনহফেন শহরের নিকটবর্তী

এলাকা) লাইম স্টোনের মতো শৈল্পিক কার্যক্ষমতা দেখাতে পারেনি। ভূবিজ্ঞানীদের তত্ত্ব মতে, ১৩৬ থেকে ১৯০ মিলিয়ন বছর আগে জুরাসিক পিরিয়ডের মধ্যবর্তী মোজাইক যুগে এই লাইম স্টোনগুলো গঠিত হয়েছিল। প্রতিটি স্টোনই এক একটি ভিন্ন চরিত্রের স্টোন। কারণ তা নির্ভর করবে স্টোনের গাঠনিক ও রাসায়নিক উপাদানের ওপর। অর্থাৎ স্টোনটি কোন ধরনের রং ধারণ করেছে তার ওপর। লিথোগ্রাফি মাধ্যমে সাত ধরনের কালার স্টোন আছে। যেমনঃ Blue Stones, Dark Gray Stones, Medium Gray Stones, Gray Stones, Light Gray Stones, Hard Yellow Stones, Soft Yellow Stones, White Stones. স্টোনগুলোতে অন্তর্বর্তী অণুগুলোর অবস্থান (Lithograpph stone have a close compact, yet porous texture.) ভিন্নতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে নানারূপ টেক্সচার। ভাঙার সময় এই স্টোন চিড় ধরা ফাটলের মতো করে (conchoidal fracture) ভাঙে। অনেক ধরনের লাইম স্টোন লিথোগ্রাফিতে ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে জার্মানির বেভেরিয়া (Bavaria) থেকে আগত লাইম স্টোন ব্যবহারের জন্য সবচেয়ে ভালো বা উপযুক্ত। এই স্টোনগুলোকে কখনো কখনো কেলহেইম স্টোনও (Kellheim stone) বলা হয়ে থাকে। এই স্টোনগুলোর বিশেষ গুণটি (সুপারিয়রিটি) নির্ভর করে সুন্দর এবং সাজানো অণুর গঠনের (moleculer structure ওপর। সেই অনুযায়ী ড্রইং, এচিং এবং প্রিন্টিং অনুসরিত হয়ে থাকে। পরে ঊনবিংশ শতকেই কানাডা, তুর্কি, ইতালি, স্পেন এবং ফ্রান্স থেকেও লিথোগ্রাফি স্টোন উৎপাদন করা আরম্ভ হয়। তবে এগুলো সোলনহফেন স্টোন থেকে নরম এবং সাধারণ ধরনের কেমিক্যাল লিথোগ্রাফির জন্য ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া ব্রেন্ডেন বার্গ, কেন্তুর্কি এবং মিটসেল কাউন্টি, আইওয়া থেকে আগত লিথোগ্রাফি স্টোনও লিথোগ্রাফির জন্য গ্রহণযোগ্য ভূমিকা পালন করে।[১৭২]

জার্মানি থেকে ৮ x ৬ x ২ ইঞ্চি থেকে ৬২ x ৪২ x ৫ ইঞ্চি মাপের অনেকগুলো স্টোন কেটে জাহাজে করে উনিশ শতকে ইউনাইটেড স্টেটে পাঠানো হয় বানিজ্যিক লিথোগ্রাফি প্রিন্ট করার জন্য। ছোট প্রকৃতির স্টোনগুলো মূলত ভিগনেট ড্রইং এবং ইলাস্ট্রেশনে (অলংকরণ) ব্যবহৃত হয়েছে। আর বড় স্টোনগুলো পোস্টার এবং বিলবোর্ড প্রিন্ট করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

একটা সময় শিল্পীরা ১০ x ১২ ইঞ্চি, ১৬ x ২০ ইঞ্চি এবং ১৮ x ২২ ইঞ্চি মাপের স্টোন ব্যবহার করা শুরু করেন। তৎকালীন নিকট বর্তমান সময়ে বড় সাইজের প্রিন্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। এগুলো ছিল

---

[172] Garo Z. Antreasian, *The Tamaind Book of Lithography: Art & Techniques*, Los Angeles, June 8, 1970, p. 263

২০ x ৩০ ইঞ্চি, ২৬ x ৩৬ ইঞ্চি এবং ৩০ x ৪৩ ইঞ্চি মাপের। ধীরে ধীরে স্টোন পাওয়াটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছোট মাপের স্টোন পাওয়াও পরে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের ঢাকা চারুকলার প্রিন্টমেকিং বিভাগে ব্যবহৃত স্টোনগুলো: বড় স্টোন-১৬টি ২৪–১৮ ইঞ্চি, মাঝারি স্টোন-২০টি ২০–১৪ ইঞ্চি, ছোট স্টোন-৫টি ১৮–১২ ইঞ্চি, ছোট স্টোন-১৪টি ১৫–১০ ইঞ্চি, একটি ১২–১২ ইঞ্চি এবং অর্ধ ভঙ্গুর স্টোন ছয়টি। বিভাগে বর্তমানে ২০১৭ সালে মোট ৬২টি (৫৭টি পূর্ণ ও ছয়টি ভঙ্গুর স্টোন) লিথো স্টোন এবং ২০১৬ সাল থেকে তিনটি লিথো প্রেস চালু রয়েছে।

বিকল্প স্টোনের নাম

লিথোগ্রাফি স্টোনের বিকল্প একধরনের স্টোন পাওয়া যায়, যার নাম পেডরারা অনিক্স (Pedrara onyx)। এই স্টোনটি ক্যালকেরিয়াস ধরনের। এর ফলাফল তখন থেকে যদিও তর্কাতিত নয়, তবু মাঝেমধ্যে সুফল বয়ে আনে। সোলনহফেন স্টোনের তুলনায় রয়েছে অল্প পরিমাণ সিলিকা। আবার আয়রন এবং ম্যাঙ্গানিজ রয়েছে অধিক পরিমাণ। দক্ষিণ-পশ্চিম অনিক্স ও মার্বেল কোম্পানি থেকে ইউনাইটেড স্টেটে এটিকে আমদানি করা হয়।[১৭৩]

স্টোনের চরিত্র/বৈশিষ্ট্য

বাজারে প্রাপ্ত সাধারণ পাথরের থেকে সোলন্‌হফেন (Solnhofen stone) স্টোনটি অপেক্ষাকৃত নরম ও অধিক ভঙ্গুর। খুব সহজে ভাঙে বলে সতর্কতার সঙ্গে একে ব্যবহার করা উচিত। স্টোনের গাঠনিক টেক্সচার জটিল পোরাস যুক্ত এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উপরিতলে পানি বা ময়েশ্চার ধরে রাখার ক্ষমতা রয়েছে।

স্টোনগুলো ইয়েলো থেকে ব্ল্যাকিশ-গ্রে কালার ধরনের হয়ে থাকে। ব্ল্যাকিশ কালার থেকে ইয়েলো কালার ক্রমান্বয়ে কঠিনতর থেকে অল্প কঠিন হয়ে থাকে। সাধারণত কঠিন স্টোনগুলোই লিথোগ্রাফি প্রিন্টের জন্য সবচেয়ে ভালো। অনুভূতিশীল আলোছায়া বা জটিল টোনাল কাজের জন্য লাইট গ্রে (হালকা গ্রে) স্টোন ভালো। আর ইয়েলো স্টোনগুলো সাধারণ টোনাল কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

---

[173] Garo Z. Antreasian, *The Tamaind Book of Lithography: Art & Techniques*, Los Angeles, June 8, 1970, p. 267

কিছু স্টোন গঠনের দিক থেকে পারফেক্ট এবং ডিফেক্ট গঠনের হয়ে থাকে। অনেক লাইট কালারের স্টোনে রেড কালারের মার্ক রয়েছে। এই রেড কালারের আয়রন মার্কটি ড্রইংয়ে কোনো ধরনের প্রভাব ফেলবে না। কাজেই এ ধরনের স্টোনগুলোর সবই ব্যবহারযোগ্য। আবার 'চক মার্ক'যুক্ত স্টোনগুলো একধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে। এই সাদা ধরনের চক মার্কযুক্ত অংশটি গ্রেইনিং ও এচিংয়ের সময় অসামঞ্জস্যভাবে গ্রেইন এবং এচিং হয়ে থাকে। এ ধরনের স্টোনে কাজ না করা বা সাধারণ ধরনের কাজের জন্য ব্যবহার করাই ভালো। আবার ফেল্ডস্পার ক্রিস্টাল (feldspar crystal or Quartz crystal) ধরনের ফর্মও স্টোনে দেখা যায়। এই ক্রিস্টাল ধরনের ফর্মের গ্রিজের প্রতি কোনো আকর্ষণ থাকে না এবং প্রিন্টে সাদা স্পট হয়ে আসে। অর্থাৎ এ ধরনের স্টোন ব্যবহারের সময় ক্রিস্টাল মার্কের অংশ বাদ রেখে কাজ করা ভালো। অথবা অন্য স্টোন কাজ করা ভালো।

স্টোনে যে ডিফেক্ট অধিকতর ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় তা হলো টিনি ভেইন (Tiny veins), যাকে হেয়ার লাইন ক্র্যাক (hairline cracks) হিসেবে স্টোনে দেখতে পাওয়া যায়। এই লাইনটি কখনো কখনো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন: প্রিন্টে কখনো সাদা অথবা কালো লাইন হিসেবে আসতে পারে। এই সাদা লাইনটি ইমেজে অনেক সময়ই কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে না।

প্রিন্ট করার সময় এই সমস্ত হেয়ার লাইনযুক্ত স্টোনগুলেকে ন্যূনতম প্রেশারে প্রিন্ট নেওয়া উচিত। না হলে স্টোনে ফাটল ধরে (ক্র্যাক করে) যেতে পারে। এই স্টোনগুলোতে ইমেজ ট্রান্সফার করার সময়ও যতটুকু সম্ভব কম প্রেশার দেওয়া উচিত। কারণ ট্রান্সফার লিথোগ্রাফি প্রসেসে প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই প্রেশারের প্রয়োজন পড়ে।[১৭৪]

৬.৮ স্টোনে এচিংয়ের রাসায়নিক বিক্রিয়া

এরাবিক গামের সঙ্গে নাইট্রিক এসিড মিশ্রিত দ্রবণ দ্বারা স্টোনে এচিং করা হলে কেমিক্যালগুলো নিম্নলিখিত দুটি উপায়ে ইমেজকে প্রতিষ্ঠিত করে:

(ক) কেমিক্যাল কার্যকারিতার ফলে ইমেজের ফ্যাট অংশ ফ্যাটি এসিডে পরিণত হয়; এগুলো স্টোনের ক্যালসিয়ামের সঙ্গে সমন্বিতভাবে অদ্রবীভূত সাবানে পরিণত হয়— যেগুলো প্রচুর পরিমাণে প্রিন্টের কালিকে গ্রহণ করতে পারে।

[174] Garo Z. Antreasian, *The Tamaind Books of Lithography: Art & Techniques*, Los Angeles, June 8, 1970, p. 20

(খ) নন-ইমজ অংশের পরিতলটি পরিবর্তন হয়ে যাবে। স্টোনের ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ক্যালসিয়াম অ্যারাবিনেটে পরিণত হয়ে এরাবিক গামের চরিত্রের কারণে শুকিয়ে গিয়ে একটি ফিল্ম বা পাতলা আবরণ সৃষ্টি করে। যখন স্টোনে ভিসকোভিটা দিয়ে পানি দেওয়া হয়, তখন এই পাতলা আবরণের এরাবিক গামই স্টোনকে ভিজিয়ে রাখে। স্টোনের উপরের পরিতলে অনেক্ষণ পানি ধরে রাখার জন্য এই আবরণটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পরে ওয়াশ-আউটের সময় তারপিনটাইন, লিথোটিন বা ওয়াশ-আউট দ্রবণ ও পানি দিয়ে ধুয়ে দিলে নন-ইমেজ অংশ পরিষ্কার হয়ে যায় এবং ইমেজ অংশে ফটোগ্রাফিক ফিল্মের নেগেটিভের মতো ইমেজ রয়ে যায় বা দেখতে পাওয়া যায়— যাকে ওলিও ম্যাঙ্গানিট অফ লাইম বলা হয়।

৬.৯ মেটাল প্লেটের চরিত্র ও রসায়ন

লিথোগ্রাফি প্রসেসে মেকানিক্যালভাবে জিংক এবং অ্যালুমিনিয়াম প্লেটের ব্যবহার প্রথম থেকেই ছিল। সেনেফেলডার এই জিংকের ব্যবহারের কথা বলেছিলেন ১৮১৮ সালে ইংল্যান্ডের লিথোগ্রাফিগুলোর মাধ্যমে। ১৮৯৫ সালে রোটারি প্রেস আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত প্লেট লিথোগ্রাফি খুব একটা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। এই প্লেট লিথোগ্রাফি ও দ্রুততম রোটারি প্রেসগুলো বাণিজ্যিক কারখানাগুলোতে একধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল ধীর গতিসম্পন্ন ফ্লাট বেড স্টোন লিথোগ্রাফি প্রেসের স্থানে। তখন থেকে মেটাল প্লেট-লিথোগ্রাফি হাতে প্রস্তুত করা শিল্পীদের স্টোন লিথোগ্রাফির থেকে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্লেট-লিথোগ্রাফির পরবর্তী উন্নয়ন— কেমিক্যাল ও পদ্ধতিগুলো অফসেট কারখানাগুলো গ্রহণ করেছিল।[১৭৫]

ফ্রান্স ও ব্রিটেনে এই প্লেট-লিথোগ্রাফি জনপ্রিয়তা পেলেও ১৯৩০ সালের পূর্ব পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে (ইউনাইটেড স্টেটে) এটি কখনো জনপ্রিয়তা পায়নি। গুরুত্বের সঙ্গে ছড়িয়ে না পড়ার বিষয়টি সেই দিকটিকে দিকনির্দেশনা দেয় যে, তখন সেখানে কারিগরি দুর্বলতা ছিল। ১৯৬০ সালের পূর্বেই প্রস্তুত কিছু আমেরিকার মেটাল লিথোগ্রাফি এই বিদেশি লিথোগ্রাফির সঙ্গে তুলনা করা যায়। টেমারিন্ড ইনস্টিটিউটে প্রথম থেকেই ম্যানুয়ালি মেটাল লিথোগ্রাফি ও স্টোন লিথোগ্রাফিকে গুরুত্বের সঙ্গেই বিবেচনা করা হয়েছে।

---

[175] Garo Z. Antreasian, *The Tamaind Books of Lithography: Art & Techniques*, Los Angeles, June 8, 1970, p. 123

মেটাল প্লেটে এচিংয়ের রসায়ন

স্টোন লিথোগ্রাফির স্টোন ও মেটাল প্লেটের মধ্যে মূল পার্থক্যই হলো একটি প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি, আরেকটি কৃত্রিম উপায়ে তৈরি।[১৭৬] ফলে জিংক ও অ্যালুমিনিয়াম প্লেটের ইমেজ স্টোনের ইমেজের মতো দেখতে হলেও ইমেজ ও নন-ইমেজ অংশে ইমেজের উপকরণ ও ডি-সেনসিটাইজিং[১৭৭] উপাদান তাদের কর্তৃত্ব স্টোন অনুরূপভাবে বজায় রাখতে পারে না। কারণ হলো:

(ক) জিংক (Zn) হলো হাইড্রোফোবিক (Hydrophobic: water-repellent/পানি অপ্রিয়) বস্তু।

(খ) অ্যালুমিনিয়াম হলো হাইড্রোফিলিক (Hydrophilic: waterattractive/পানি প্রিয়) বস্তু।

(গ) লিথোগ্রাফি স্টোন (calcareous limestone) মোটামুটি ৯৪%–৯৮% ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ধারণ করে। তার সঙ্গে ২%–৬% অন্যান্য বস্তু নিয়ে সংগঠিত, যেমন: তা হলো সিলিকা, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ এবং অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। এই স্টোন সমপরিমাণ তেল (fat) ও পানি গ্রহণ করতে পারে।

তাই স্টোন এবং মেটাল প্লেটের তুলনা করতে গেলে বলা যায়, জিংক প্লেটে ইমেজ তৈরি করা সহজ। তার সঙ্গে সঙ্গে নন-ইমেজ অংশেও তাড়াতাড়ি স্কাম বা ময়লা ধরে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অপর পক্ষে অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে ইমেজ অংশ উন্নীত করা (ডেভেলপ করা) কঠিন। একমাত্র স্টোনই সমপরিমাণ পানি ও ইঙ্ক ধারণ করতে পারে।

গাম এরাবিক এবং সেলুলোজ গাম (cellulose gum), এ দুই ধরনের গামই ডি-সেনসিটাইজারই হিসেবে মেটাল প্লেটের প্লেনোগ্রাফিক চর্চায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে:

(ক) সেলুলোজ গামকে জিংক প্লেটের জন্য উপযোগী মনে করা হয়। এই গামের (গামের বৃহৎ অণুর গঠন) ময়েশ্চার বা পানি ধারণক্ষমতা এরাবিক গামের চেয়ে বেশি।

(খ) এরাবিক গামটি অ্যালুমিনিয়াম প্লেটের জন্য উপযোগী। অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে সেলুলোজ গাম ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এটির ব্যবহারে প্লেটে একধরনের ডটস (pit-type corrosion) চলে আসে— যা কালিকে ধারণ করে ময়লা তৈরি করে বা স্কাম তৈরি করে।

---

[176] Garo Z. Antreasian, *The Tamaind Book of Lithography: Art & Techniques*, Los Angeles, June 8, 1970, p. 124

[177] ডি-সেনসিটাইজেশন: স্টোনকে গ্রেইন করা পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে ফেলার পর তা সেনসিটিভ বা অনুভূতিশীল হয়ে ওঠে। এরপর স্টোনকে শুকিয়ে নিয়ে কাজ করা হয়। এবার এরাবিক গামের দ্রবণ স্টোনে প্রয়োগ করার পর আর ইমেজ তৈরি করা সম্ভব নয়। স্টোনের এই অবস্থাকে ডি-সেনসিটিভ অবস্থা বলা হয়। এই প্রক্রিয়াকে ডি-সেনসিটাইজেশন বলা হয়।

মেটাল প্লেটে সাধারণ এচিং পদ্ধতি

প্লেট-লিথোগ্রাফিতে কয়েক ধরনের এসিড ব্যবহার করে এচিং করা সম্ভব:

(ক) অ্যামোনিয়াম বাইক্রোমেট

(খ) ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেট

(গ) জিংক নাইট্রেট

(ঘ) অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট

(ঙ) টেনিক এসিড

(চ) ক্রোমো অ্যালাম

তবে এসব এচিং দ্রবণের কার্যকারিতা এখনো পরিষ্কার নয়। এই অপ্রমাণিত তত্ত্বটি এ কথাটিকে ইঙ্গিত করে যে, দ্রবণগুলো একটি শক্তিশালী ফিল্ম বা আবরণ তৈরি করে। এরাবিক গাম এবং ফসফোরিক এসিডের মিশ্রণ দিয়ে এচিং করলে একটি হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং প্লেটের ডি-সেনসিটাইজিং ফিল্ম ধারণ ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়। অ্যামোনিয়াম বাইক্রোমেট এই দ্রবণের সঙ্গে (এই ফসফোরিক এসিডযুক্ত গাম) মেশালে এই গ্যাস নিয়ন্ত্রিত হবে। ফলে বেশি করে বাফিং করলেও প্লেটের উপরিতল ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তা ছাড়া অতিরিক্ত ফসফোরিক এসিডও গ্রহণ করার ক্ষমতা তৈরি হয়।

ফলে **জিংক প্লেটে এচিং পদ্ধতি হলো:**

এরাবিক গাম + ফসফোরিক এসিড + অ্যামোনিয়াম বাইক্রোমেট

প্লেট-লিথোগ্রাফি এচিং করার সাধারণ সূত্র

সূত্র (১): এরাবিক গাম + ইনঅর্গানিক লবণ (নাইট্রেট, ফসফেট, বাইক্রোমেট)।

(নাইট্রেট, ফসফেট, বাইক্রোমেট) = ইনঅর্গানিক লবণ: নেগেটিভ আয়ন ধারণ করে অর্থাৎ OH (hydroxyl group: পানি প্রিয়/hydrophilic)

এরাবিক গাম: এরাবিক গাম হলো হাই মলিকুলার ওয়েট (high molecular weight) + দুর্বল অর্গানিক এসিড (R-COOH/কার্বোক্সিল গ্রুপ)-এর সমন্বয়। খেয়াল রাখতে হবে যে, এরাবিক গাম বাদে অন্য হাইড্রোফিলিক উপাদানগুলোতে (স্টার্চ, ডেক্সট্রিন, মিথাইল সেলুলোজ ইত্যাদিতে) কার্বোক্সিল (-

COOH) গ্রুপ থাকে না। তারা দুর্বল ডি-সেনসিটাইজার হিসেবে কাজ করে। সেইসঙ্গে পানি ধারণ করার জন্য দায়িত্বশীল হয়।

দুর্বল অর্গানিক এসিডঃ সব অর্গানিক এসিডে (-COOH) বর্তমান।

অর্গানিক এসিডঃ এটি প্লেটকে এইচ বা এচিং করে এবং ডি-সেনসিটাইজিং উপাদানকে প্লেটে ধরে রাখার জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে।

অর্থাৎ প্লেটে এচিং করার সময় এরাবিক গাম ব্যবহার করা হয়। এই গামে রয়েছে ইনঅর্গানিক কিছু লবণ। যেমনঃ নাইট্রেট, ফসফেট অথবা বাইক্রোমেটের মতো লবণ। এই লবণগুলো নেগেটিভ আয়ন (-OH/পানি প্রিয়) ধারণ করে বলে এরাই নন-ইমেজ অংশে পানি ধারণ করার জন্য আংশিকভাবে দায়ী থাকে। গাম এরাবিক এবং সেলুলোজ গাম উভয়ের মধ্যেই রয়েছে হাই মলিকুলার ওয়েট ও দুর্বল এসিড। অনেক অর্গানিক এসিডের একটি সাধারণ সূত্র হচ্ছে R-COOH/কার্বোক্সিল গ্রুপ। এই R অক্ষরটি organic radical অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর -COOH-কে কার্বোক্সিল গ্রুপ বলা হয়ে থাকে। এটি সমস্ত অর্গানিক এসিডেই বিদ্যমান। এই তত্ত্বটির মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে, কার্বোক্সিল গ্রুপটি ডি-সেনসিটাইজিং এচিং করতে এবং প্লেটে ওই পানিকে উপরিতলে ধারণ করার জন্য দায়ী থাকে।

এরাবিক গামকে অন্য হাইড্রোফিলিক উপাদানগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে, স্টার্চ, ডেক্সট্রিনস এবং মিথাইল সেলুলোজ কার্বোক্সিল (-COOH) গ্রুপের নয় বলে সচরাচর দুর্বল ডি-সেনসিটাইজার হিসেবে কাজ করে।

সূত্র (২): এরাবিক গাম + ফসফোরিক এসিড = ফ্রি এসিড।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ভালো ডি-সেনসিটাইজার এরাবিক গাম ও সেলুলোজ গাম ফসফোরিক এসিডের সঙ্গে মিশে আরো উপযোগীভাবে কাজ করে। অর্থাৎ ফসফোরিক এসিড এরাবিক গামের লবণ ফর্মকে (সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের লবণকে) ফ্রি এসিড ফর্মে (-COOH) রূপান্তরিত করে, যা ডি-সেনসিটাইজিং উপাদান হিসেবে এরাবিক গামের লবণের চেয়ে বেশি কার্যকরী ডি-সেনসিটাইজার হিসেবে ভূমিকা পালন করবে এবং পানি ধারণ করার জন্যও দায়িত্বশীল হবে। কিন্তু ফসফোরিক এসিড প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ব্যবহার করলে ডটস আকারে (pit-type corrosion) জড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ কাউন্টার এচিংয়ের মাধ্যমে রিসেনসিটাইজ হয়ে যাবে এবং ইমেজ ধারণ করা আরম্ভ করবে। সে কারণে ইসি-ফাউন্টও প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ব্যবহার করলে এ ধরনের সমস্যা উদ্ভূত হতে পারে।

৬.১০ বাংলাদেশ, ভারত ও জাপানে অনুসরিত অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে এচিং পদ্ধতি

সূত্র (৩): তাপেম: এরাবিক গাম + টেনিক এসিড + ফসফোরিক এসিড।

তাপেম = ১৫ মি.লি. (সিরিঞ্জ দিয়ে পরিমাপ করে) ফসফোরিক এসিড + ১০০ গ্রাম টেনিক এসিড + (৩০০ গ্রাম এরাবিক গাম + ১ লিটার পরিষ্কার পানি)। এই দ্রবণ দিয়ে অ্যালুগ্রাফিতে (অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে) এচিং করা হয়।

ভারত ও জাপান থেকে লিথোগ্রাফি এবং প্লেট লিথোগ্রাফি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের পর দেশে ফিরে কামরুজ্জামানের সহযোগিতায় অজিৎ শীলের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা নিয়ে প্লেট লিথোর চর্চা নতুন করে আরম্ভ করা হলো ২০১২ সালে। এই দুই দেশের প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে শুরু হলেও এখানে চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ইসি-ফাউন্টের ব্যবহার সংযোজিত হয়ে পরিশীলিত হয়েছে।

(ক) জাপানে অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে এচিং পদ্ধতি:

ক.১ ইমেজ তৈরির পর কারখানা থেকে প্রস্তুতকৃত একধরনের গাম পুরো ইমেজ জুড়ে জলরঙের তুলি দিয়ে লাগিয়ে বিশ্রামে রাখা হয়।

ক.২ পরদিন ভিসকোভিটার সাহায্যে পরিষ্কার পানি দিয়ে গামটিকে ধুয়ে নতুন করে গামিং করতে হবে— ঝুট কাপড় দিয়ে পূর্বের মতো সাধারণ নিয়মে।

ক.৩ হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে শুকনো ঝুট কাপড় দিয়ে তারপিনের সাহয্যে পূর্বের নিয়মে ওয়াশ-আউট করতে হবে।

ক.৪ পূর্বের নিয়মে ল্যাকার লাগাতে হবে।

ক.৫ পূর্বের নিয়মে এচিং ও প্রিন্ট নিতে হবে।

(খ) ভারত ও বাংলাদেশে অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে এচিং পদ্ধতি

ভারত ও বাংলাদেশে পূর্বোল্লিখিত **সূত্র (৩)** অনুযায়ী অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে— এচিং থেকে শুরু করে প্রিন্ট বের করে নেওয়া পর্যন্ত পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হচ্ছে। তবে এই দুই দেশের মধ্যে ইসি-ফাউন্টের ব্যবহার বাংলাদেশে (২০১২ সাল) শুরু হয়েছে। আর ভারতে ম্যাজিক ফাউন্ট নামে একটি কেমিক্যাল ব্যবহৃত হতো। জাপানে এসিফাউন্ট ব্যবহৃত হয় না।

জিংক প্লেটে এচিং করার সাধারণ সূত্রগুলো

জিংক প্লেটে এচিং করার কয়েকটি প্রসেস রয়েছে। এরাবিক গাম বা সেলুলোজ গামের সঙ্গে অন্য কেমিক্যাল মিশিয়ে সঠিক এসিডিটি তৈরি করে এচিং করা হয়। সব ক্ষেত্রেই এচিং করার পর সেলুলোজ গাম অথবা পিওর এরাবিক গামিং করতে হবে। এটি পানির মতো ডি-সেনসিটাইজ উপাদানকে ধারণ করার জন্য একটি শক্তিশালী পাতলা আবরণ (ফিল্ম) তৈরি করবে।

জিংক প্লেটের জন্য দুই ধরনের গামের দ্রবণ ব্যবহার করা ভালো। আর সেটা হলোঃ এমএস-৪৪৮ হ্যাঙ্কো সেলুলোজ গাম দ্রবণ, পিএইচ ৪.০ থেকে ৪.৫ (দুর্বল এচিং এবং গামিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়)। অন্যটি হলোঃ এমএস-৫৭১ হ্যাঙ্কো সেলুলোজ গাম দ্রবণ (এসিডযুক্ত), পিএইচ ২.৫ (শক্তিশালী এচিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়)। এ দুটি পদ্ধতিই টেমারিন্ড এচিং পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

জিংক প্লেটের জন্য নিম্নরূপে এচিং দ্রবণ তৈরি করা যায়[১৭৮]

সেলুলোজ গাম (প্লেইন) পিএইচ (pH) ৫.৫

সিএমসি (কর্বোক্সি মিথাইল সেলুলোজ) ৭১ (পাউডার ধরনের)----- ২১২ গ্রাম

পানি -- ৪০০০ সিসি

ফনল-- ৭৫ সিসি

দুর্বল এচিংয়ের সময় এই পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। এটি এমএস-৪৪৮ হ্যাঙ্কো পিওর সেলুলোজ গাম দ্রবণের (এসিডযুক্ত) অনুরূপ। এটির প্রয়োগও একই রকম। ফলে বাফিংয়ের মাধ্যমে পাতলা ফিল্ম তৈরি করা হয়।

এরাবিক গাম (এসিডযুক্ত) পিএইচ (pH) ৪.০

এরাবিক গাম --- ১৯ ওজন

টেনিক এসিড--- ২ ওজন

ফসফোরিক এসিড- ৮৫% সিরাপ-সদৃশ------------------------------------- ১০ ড্রপস

এই দ্রবণটির সঙ্গে আরো পিওর এরাবিক গাম বা সেলুলোজ গাম মিশিয়ে দুর্বল এচিং করা যায়। ভারতে সম্ভবত অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে এচিং করার জন্য এই দ্রবণটি তাপেম নামে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

---

[178] Garo Z. Antreasian, *'The Tamaind Book of Lithography: Art & Techniques'*, Los Angeles, June 8, 1970, p. 146-147

সেলুলোজ গাম (এসিডযুক্ত) পিএইচ (pH) ৪.০–৪.৫

সেলুলোজ গাম (প্লেইন) --- পিএইচ ৫.৫

ফসফোরিক এসিড, ৮৫% সিরাপ-সদৃশ

নিম্নমানের পিএইচ ৪.০ অথবা ৪.৫ অল্প পরিমাণ এসিড যোগ করতে হবে

এই দ্রবণটি ট্রান্সফার লিথোগ্রাফিতে মধ্যম ধরনের এচিং এবং দুর্বল এচিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া এটি স্কাম বা ময়লা সরানোর জন্য সাবান হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর সঙ্গে বেশি পরিমাণ এসিড এবং নিম্নমানের পিএইচ থেকে ২.৫ মিশ্রণ করে শক্তিশালী এচিং দ্রবণ তৈরি করা হয়, যা এমএস ৫৭১ হ্যাঙ্কো সেলুলোজ গামের (এসিডযুক্ত) সঙ্গে তুলনীয়।

সবুজ (গ্রিন) এচিং পিএইচ (pH) ৩.০

(গ্রাফিক আর্টস টেকনিক্যাল ফাউন্ডেশন)

পানি	৪০ ওজন
টেনিক এসিড, টেকনিক্যাল গ্রেড	২.৫ ওজন
পটাসিয়াম ক্রমো অ্যালাম	৩.৭৫ ওজন
এরাবিক গামের দ্রবণ	৮০ ওজন

এখানে প্রথমে টেনিক এসিড পানিতে গোলাতে হবে। এরপর দ্রবণটিতে ক্রমো অ্যালাম খুব ভালোভাবে মেশাতে হবে। এখন ফসফোরিক এসিড যোগ করতে হবে। এসিডযুক্ত এরাবিক গাম মেশাতে হবে। এই এচিং দ্রবণটির পিএইচ ৩.০ হতে হবে। যদি এই দ্রবণটি ফাইন ক্রেয়ন অথবা তুষ ওয়াশের এচিংয়ের জন্য শক্তিশালী হয়ে থাকে। তবে এর সঙ্গে পরিমাণমতো আরো এরাবিক গাম মিশিয়ে এচিং করা যেতে পারে। কারণ পটাসিয়াম ক্রমো অ্যালাম আলোর প্রতি সংবেদনশীল। এই দ্রবণটি আম্বার গ্লাসের বোতলে রাখতে হবে (Umber glass bottle)। দ্রবণটি শুকানোর পর খুব তাড়াতাড়ি ডি-সেনসিটাইজিং ফিল্ম বা আবরণ তৈরি করে। কিছুদিন পর দ্রবণটি সবুজ রঙে পরিণত হয়ে যাবে। এটির সবুজ রং কোনো ক্ষতি করবে না বরং আগের মতোই কাজ করবে। এচিংয়ের পর পরিষ্কার গামিং করা উচিত।

হোয়াইট এচিং পিএইচ (pH) ৩.৫ থেকে ৪.৫

অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট -- ৩ ওজন (oZ)

অ্যামোনিয়াম ফসফেট-- ৩ ওজন (oZ)

অ্যামোনিয়াম ফ্লোরাইড --- ০.৫ ওজন (oZ)

<u>ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড -- ০.৫ ওজন (oZ)</u>

অ্যালুমিনিয়াম প্লেটের জন্য নিম্নরূপে এচিং দ্রবণ তৈরি করা যায়

অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে এচিং পদ্ধতি জিংক প্লেটের তুলনায় সহজসাধ্য বিষয়। এই এচিংয়ে ফসফোরিক এসিড ব্যবহৃত হয়। এচিং শেষে অবশ্যই পরিষ্কার এরাবিক গামিং করা করা উচিত। সেলুলোজ গাম ব্যববহার করা উচিত নয়। এতে পিট টাইপ করোশন (pit type corrosion, ডটস আকারের স্কাম বা ময়লা) তৈরি হয়, যা পরে স্কাম হিসেবে বিবেচিত হয়।

এচিং পদ্ধতি হলো

ফসফোরিক এসিড -- ১% ওজন, সি সি

এরাবিক গাম (পিওর) --- ৩২% ওজন, সি সি

ওই দুটি মিশ্রণের ফলে বেশি শক্তিশালী দ্রবণ হয়ে গেলে দুর্বল করার জন্য পরিষ্কার এরাবিক গাম দ্বিগুণ করে অথবা পরিমাণমতো মিশিয়ে দিতে হবে।

<u>Ba # ১১ পিএইচ (pH) ১.৮</u>

ফসফোরিক এসিড, ৮৫% সিরাপি -- ২০ সি সি

অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট -- ১১.৫ গ্রাম

এরাবিক গাম --- ১০০০ সি সি

<u>Ba # ১০ পিএইচ (pH) ২.০</u>

ফসফোরিক এসিড, ৮৫% সিরাপ সদৃশ -------------------------------------- ৩১ সি সি

এরাবিক গাম (14 degree baum) --------------------------------------- ১০০০ সি সি

<u>Ba # ১৩ পিএইচ (pH) ৩.০</u>

ফসফোরিক এসিড, ৮৫% সিরাপ-সদৃশ ------------------------------------ ২ ওজন

<u>এরাবিক গাম (14 degree baum). ------------------------------------- ১ গ্যালন</u>

টেমারিন্ড কর্মশালায় অ্যালুমিনিয়াম প্লেটের জন্য অনুসরিত এচিং দ্রবণটি নিম্নরূপ:

<u>টেমারিন্ড দ্রবণ পিএইচ (pH) ২.৫</u>

ফসফোরিক এসিড, ৮৫% সিরাপ-সদৃশ ------------------------------------ ২ - ০.৫ ওজন

এরাবিক গাম (14 degree baum) --------------------------------------- ০.৭৫ গ্যালন

যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্রবণটির পিএইচের জন্য টেমারিন্ডের মান ২.৫ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সামান্য করে এসিড অথবা গাম যোগ করা যেতে পারে। এটি স্টক দ্রবণ হিসেবে কাজ করবে। এতে এসিড এবং গাম পরিমাণমতো যোগ করে শক্তিশালী ও দুর্বল এচিং দ্রবণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

টেমারিন্ডের কর্মশালায় অ্যালুমিনিয়াম প্লেটের জন্য ব্যবহৃত প্রাপ্ত সুন্দর ফলাফলটি হলো

54 Pro-sol Fountain solution.

এই দ্রবণটি হলো অ্যামোনিয়াম বাইক্রোমেটের এচিং দ্রবণ, যেটি ইমেজের ময়লা (স্কাম) পরিষ্কারক (ডিটারজেন্ট বা সাবান) হিসেবে কাজ করে। (১ ওজন প্রো-সোল, ১ ওজন এরাবিক গাম, ১ গ্যালন পানি)।

৬.১১ ইমেজ সংশোধন করার জন্য কাউন্টার এচিং (counter etching) পদ্ধতি

ইমেজ তৈরি করার পর গামিং করে স্টোনকে ডি-সেনসিটিভ করা হয়। অর্থাৎ এখন নতুন ইমেজ তৈরি করা হলে তা প্রিন্টে আসবে না। কিন্তু এই ডি-সেনসিটিভ অবস্থায় নতুন ইমেজ যোগ করতে হলে প্রথমে স্টোনকে সেনসিটিভ করে তুলতে হবে। অর্থাৎ স্টোনকে আবার গ্রিজ গ্রহণ করার ক্ষমতা তৈরি করে দিতে হবে। এ কাজটি করার জন্য সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি হিসেবে অ্যাসিটিক এসিড ও পানির মিশ্রণ অথবা অ্যালাম (ফিটকারি-আগে সেলুনে আফটার শেভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে) ও পানির মিশ্রণ বা দ্রবণ ব্যবহার হয়ে থাকে। ইমেজ সম্পূর্ণ করার জন্য প্রক্রিয়াটি বারবার ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক পিনাকি বড়ুয়া এই পদ্ধতিতে ইমেজ সম্পন্ন করে শিল্পকর্ম রচনা করতেন।

এসিটিক এসিড দিয়ে কাউন্টার-এইচ পদ্ধতি

গ্লাসিয়াল এসিটিক এসিড ---------------------------- ১ ভাগ

পানি--- ৯ ভাগ।[১৭৯]

অ্যালাম দিয়ে কাউন্টার-এইচ পদ্ধতি

পাউডার পটাস অ্যালাম (ফিটকারি)-------------------------পরিমাণমতো/ ইচ্ছামতো

পানি --- পরিমাণমতো/ ইচ্ছামতো

এই উভয় ধরনের দ্রবণ খুব ভালো কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। তবে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বাংলাদেশে স্টোনের কাউন্টার এচিং করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ ও ভারতে অনুসরিত কাউন্টার এচিং করার পদ্ধতিটি নিম্নরূপ

(ক) দু-একটি প্রিন্ট নেওয়ার পর কাউন্টার এচিংয়ের প্রয়োজন হলে ভালো করে রোলিং করে রেজিন ডাস্ট ও ফ্রেঞ্চ চক মিশ্রণ ইমেজের ওপর ছিটিয়ে দিয়ে তুলির সাহায্যে দিয়ে সমস্ত অংশে লাগিয়ে দিতে হবে। হাত দিয়ে না লাগানোই ভালো।

(খ) পুরো ইমেজ অংশে এই অ্যালাম পানির দ্রবণ দু-তিন মিনিট রাখলে দেখা যাবে বুদ্‌বুদ্‌ উঠছে। আঙুল দিলে প্রথমে পিচ্ছিল মনে হবে। হাত দিয়ে একটু আলতোভাবে ডলতে থাকলে কিছুটা খসখসে অনুভূতির সৃষ্টি হবে। বুঝতে হবে এরাবিক গামকে এই দ্রবণ নিরপেক্ষতা দান করেছে। অর্থাৎ স্টোনের ওপর থেকে গামের পাতলা কোটিন বা প্রলেপকে সরিয়ে দিয়ে সেনসিটিভ করে তুলেছে। এখন পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে আবার ইমেজ সংযুক্ত করা সম্ভব।

(গ) আবার পূর্বের নিয়ম অনুসারে ফ্রেঞ্চ চক দিয়ে গামিং করতে হবে। প্রয়োজন অনুপাতে এচিং করে প্রিন্ট নেওয়ার দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

ইমেজ মুছে ফেলার উপায়

কার্বোলিক এসিড দিয়ে কাউন্টার-এচিং

কার্বোলিক এসিড (ফেনল) ---------------------------------- ১ ভাগ

গ্যাসোলিন--- ১ ভাগ

---

[179] Garo Z. Antreasian, *'The Tamaind Book of Lithography: Art & Techniques'*, Los Angeles, June 8, 1970, p. 102

১ ভাগ কার্বোলিক এসিড ও ১ ভাগ গ্যাসোলিনের মিশ্রণ লিথোগ্রাফি স্টোনের তৈরি ইমেজের ওপর দিলে সেই ইমেজ মুছে যাবে। এতে দুটি বিষয় ঘটে: এক ফেনল বা কার্বোলিক এসিড গ্রিজকে গলিয়ে তুলে ফেলার জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন দ্রবণ হিসেবে কাজ করে। আর গ্যাসোলিন এই ফেনলকে পোরাস স্টোনের গভিরে গিয়ে গ্রীজ্‌কে গলিয়ে তুলে ফেলতে সাহায্য করে।[১৮০] এই সময়ে স্টোনটি আবার রিসেনসিটিভ হয়ে ওঠে। ফলে আবার নতুন করে ইমেজকে ধরে রাখার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়।

৬.১২ প্রিন্টকে সংরক্ষণ করে স্টোরে রাখা

এডিশন প্রিন্ট নেওয়ার পর সেগুলোকে সংরক্ষণের জন্য ড্রয়ারে রাখা হয়। এই সময় কিছু বিষয় লক্ষ রাখা প্রয়োজন:

(ক) কিছু শিল্পী প্রিন্ট নেওয়ার পর শুকানোর জন্য র‍্যাক ব্যবহার করেন, কেউ আবার ঝুলিয়ে রাখেন। পরদিন সংরক্ষণ করে বাটার কাগজ দিয়ে সংরক্ষণ করে ড্রয়ারে রাখেন। কাঠ এবং মেটালে উপযুক্ত কেবিনেট বা ড্রয়ার বানানো যায়।[১৮১]

(খ) এডিশন প্রিন্ট নেয়ার সময় প্রতিটি প্রিন্টের মাঝখানে শিল্পীরা একটি করে নিউজপ্রিন্ট কাগজ রেখে চাপা দিয়ে রাখেন। এবার সংরক্ষণ করে ড্রয়ারে রাখার পূর্বে নিউজপ্রিন্ট কাগজগুলো সরিয়ে ফেলে বাটার পেপার বা ফয়েল কাগজ দিয়ে রাখতে হবে। কারণ নিউজপ্রিন্ট কাগজের সালফার প্রিন্টের ওপর ইফেক্ট সৃষ্টি করে।[১৮২] যেমন: অনেক সময় প্রিন্টকে লালচে করে এবং একধরনের ডটস সৃষ্টি করে। বাটার কাগজ ব্যবহার করে এই সমস্যা থেকে প্রিন্টকে রক্ষা করা সম্ভব। কারণ বাটার পেপার জাতীয় পেপার প্রিন্টের মধ্যে বাতাস ঢুকতে দেয় না এবং ময়েশ্চার ধারণ করে না। কিন্তু নিউজপ্রিন্ট পেপার ময়েশ্চার ধারণ করে এবং নিজেও অনেক দিন পর লালচে হয়ে যায়।

(গ) সঠিক উপায়ে যত্ন করে না রাখলে প্রিন্ট সহজে ড্যামেজ হয়ে যায়। প্রিন্টগুলোকে ডাস্ট, অধিক তাপমাত্রা অথবা ভেজা আবহাওয়া এবং অধিক এক্সপোজসম্পন্ন আলো, বিশেষ করে সরাসরি সূর্যের আলো থেকে দূরে রাখা ভালো। তা না হলে অতিরিক্ত আলোতে প্রিন্টের কালার জ্বলে গিয়ে ফ্যাকাশে রূপ ধারণ করবে।

---

[180] Garo Z. Antreasian, *'The Tamaind Book of Lithography: Art y& Techniques'*, Los Angeles, June 8, 1970, p. 398

[181] Garo Z. Antreasian, *ibid.*, p. 118

[182] Garo Z. Antreasian, *ibid.*, p. 117

(ঘ) যারা সবসময় প্রিন্ট করেন তারা একটি নির্দিষ্ট মাপের কাজ করতে পারেন। সেইসঙ্গে কাজগুলোকে সোলান্ডার বক্স (Solander box), ককশিটের বাক্স বা অগভীর ড্রয়ারে সংরক্ষণ করে রাখা ভালো। খোলা ড্রয়ার কখনো প্রিন্ট সংরক্ষণের জন্য ভালো নয়। এতে প্রিন্টে শুধু ডাস্টই পড়ে না, ডাস্টের আঁচড়ও পড়ে। সেইসঙ্গে অপূরণীয় ড্যামেজ সৃষ্টি হয়।

৬.১৩ স্টোন বা প্লেট-লিথোগ্রাফিতে ফ্লাট কালারের প্রিন্ট নেওয়ার পদ্ধতি

স্টোন ও প্লেট-লিথোগ্রাফিতে কয়েকটি উপায়ে ফ্লাট প্রিন্ট নেওয়া যায়:

(ক) একটি গ্রেইন করা স্টোন বা প্লেটের ওপর সরাসরি ফ্লাট ইমেজ তৈরি করা।

(খ) ইমেজ ট্রান্সফার করে সেই ইমেজটিকে ফ্লাট ইমেজে পরিণত করা।

(ক) একটি গ্রেইন করা স্টোন বা প্লেটের ওপর সরাসরি ফ্লাট ইমেজ তৈরি করা

ক.১ একটি গ্রেইন করা স্টোন বা প্লেট নিতে হবে।

ক.২ স্টোন বা প্লেটের চার দিকের নন-ইমেজ অংশে এরাবিক গাম তুলির সাহায্যে লাগিয়ে ফ্যান বা হেয়ার ড্রায়ার মেশিন দিয়ে শুকিয়ে ফেলতে হবে। কয়েকটি কেমিক্যাল দিয়ে ফ্লাট ইমেজ তৈরি করা যায়। বিটুমিন, ল্যাকার এবং শ্যালাক (গালা)। তবে ল্যাকার লাগিয়ে ইমেজ সৃষ্টির পর আবার একটু বিটুমিন দ্রবণ লাগিয়ে দিলে প্রিন্টি নেওয়ার সময় রোলিং করতে গেলে ইমেজ অংশ তাড়াতাড়ি ইঙ্ক ধারণ করে। তাই এ সময় কেউ কেউ বিটুমিন দ্রবণ লাগিয়ে পরবর্তী পর্বে যান।

ক.২.১ বিটুমিন ও তারপিনটাইনের দ্রবণ (ওয়াশ-আউট সলিউশন) ঝুট কাপড়ের টুকরো দিয়ে পুরো ইমেজ অংশে লাগিয়ে দিতে হবে। এবার বিটুমিন শুকিয়ে যাওয়ার আগে দ্রুত ঝুট কাপড় দিয়ে (ড্যাবার বানিয়ে) এমনভাবে মুছতে হবে, যেন পুরো ইমেজ অংশে বিটুমিনের পাতলা আবরণ তৈরি হয়। খেয়াল রাখতে হবে, যেন কোনোরূপ বিটুমিনের আঁচড় না থাকে। থাকলে এই প্রক্রিয়াটি পুনরায় করতে হবে। তা না হলে ফ্লাট ইমেজ প্রিন্টের সময় ওই আঁচড়গুলো প্রিন্টে চলে আসবে।

ক.২.২ বিটুমিন দ্রবণ না দিয়ে সরাসরি ঝুট কাপড়ের টুকরো দিয়ে পুরো ইমেজ অংশ জুড়ে ল্যাকার লাগিয়ে দিতে হবে। ল্যাকার শুকিয়ে যাওয়ার আগেই দ্রুত ঝুট কাপড় দিয়ে (ড্যাবার বানিয়ে) এমনভাবে মুছতে হবে, যেন পুরো ইমেজ অংশে ল্যাকারের পাতলা আবরণ তৈরি হয়। খেয়াল রাখতে হবে, কোনোরূপ ল্যাকারের আঁচড় যেন না পড়ে। থাকলে এই প্রক্রিয়াটি পুনরায় করতে হবে। তা না হলে ফ্লাট ইমেজ প্রিন্টের সময় ওই আঁচড়গুলো প্রিন্টে চলে আসবে।

ক.২.৩ বিটুমিন দ্রবণ না দিয়ে সরাসরি ঝুট কাপড়ের টুকরো দিয়ে পুরো ইমেজ অংশ জুড়ে শ্যালাক (শ্যালাক +স্পিরিট) লাগিয়ে দিতে হবে। শ্যালাক ও স্পিরিটের দ্রবণটি যেন খুব ঘন না হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখা প্রয়োজন। প্রক্রিয়াটি হলো: একটি গেঞ্জির লম্বা ঝুট কাপড় শ্যালাকে ডুবিয়ে নিয়ে দুই হাত দিয়ে দুই দিকে ধরে টেনে লম্বা করে স্টোন বা প্লেটের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে স্ক্র্যাপিং প্রসেসের মতো করে একবারে লাগাতে হবে। এটি দ্বিতীয়বার লাগাতে গেলে ইমেজের প্রিন্ট মোটা হয়ে আসবে। তাই খেয়াল রাখতে হবে, যেন কোনোরূপ আঁচড় না পড়ে। আঁচড় থাকলে এই প্রক্রিয়াটি পুনরায় আর করা যাবে না। আর এই প্রক্রিয়াতে ফ্লাট ইমেজ ভালো আসে না। তাই এ প্রক্রিয়াতে সাধারণত লিথোগ্রাফাররা ফ্লাট ইমেজ তৈরি করেন না। এটি শুধু রিভার্স প্রসেসের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক.৩ ফ্লাট ইমেজের বাইরের অংশে ভিসকোভিটা দিয়ে পানির সাহায্যে আঙুল দিয়ে খুব আলতোভাবে (সফটভাবে) ডলতে থাকলে বিটুমিন বা ল্যাকারসহ গাম উঠে আসবে। বিটুমিন বা ল্যাকার নন-ইমেজ অংশ থেকে উঠে গেলে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি মুছে ফেলতে হবে। এবার ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে তাপেম (এচিং সলিউশন: টেনিক এসিড + এরাবিক গাম দ্রবণ + ফসফোরিক এসিড) তুলির সাহায্যে নন-ইমেজ অংশে লাগিয়ে দিয়ে ৪৫ সেকেন্ড (তুলিটি দিয়ে দ্রুত নাড়িয়ে) রেখে এচিংটি করে নিতে হবে।

ক.৪ এবার পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে হেয়ার ড্রায়ারের সাহায্যে শুকিয়ে নিতে হবে। পরিষ্কার গামিং করে হেয়ার ড্রায়ারের সাহায্যে শুকিয়ে নিতে হবে।

ক.৫ তারপিনটাইন দিয়ে ঝুট কাপড়ের সাহায্যে ইমেজ অংশ থেকে বিটুমিন উঠিয়ে ফেলে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে ফেলতে হবে।

ক.৬ ভিসকোভিটা দিয়ে পানি ছড়িয়ে আঙুলের সাহায্যে আলতোভাবে ডলে বিটুমিন উঠিয়ে পরিষ্কার পানি দিয়ে ইমেজ অংশ থেকে এই বিটুমিন ও এরাবিক গাম মিশ্রিত ময়লাগুলো স্টোন বা প্লেট থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। অথবা প্লেট বা স্টোনকে গ্রেইনিং বেডে নিয়ে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়ে এলে সবচেয়ে ভালো। এবার ভিসকোভিটা দিয়ে পানি দিয়ে ইঙ্ক বেড থেকে রোলিং করে প্রিন্টিংয়ে যেতে হবে।

(খ) একটি ইমেজের প্রিন্ট নেওয়ার পর সেই ইমেজটিকে ফ্লাট ইমেজে পরিণত করা

খ.১ ইমেজটির প্রিন্ট নেওয়ার পর ফাইনাল প্রিন্ট নেওয়ার মতো করে রোল করে হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে শুধু ফ্রেঞ্চ চক শুকনো তুলির সাহায্যে লাগাতে হবে। হাত দিয়ে ফ্রেঞ্চ চক না লাগানো ভালো, কারণ নন-ইমেজ অংশে ইঙ্ক ধরে যেতে পারে। এবার ভিসকোভিটা দিয়ে ফ্রেঞ্চ চক ধুয়ে ফেললে ইমেজ অংশ আর ভিসকোভিটাকে আটকে ধরবে না।

খ.২ গ্রেইনিং বেডে নিয়ে অ্যালাম ওয়াটার (ফিটকারি + পানি= দ্রবণ) দিয়ে ভিজিয়ে রাখলে একটু পরে সাদা বুদ্‌বুদ্‌ দেখতে পাওয়া যাবে। ৫−১০ মিনিট রাখার পর আঙুল দিয়ে ডললে প্রথমে একটু পিচ্ছিল মনে হবে। তারপর একটু পরে খসখসে মনে হবে। তখন বুঝতে হবে এরাবিক গাম নিউট্রালাইজ বা নিরপেক্ষ হয়ে গেছে। এবার পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে দিলে স্টোন বা প্লেটটি রিসেনসিটিভ হয়ে উঠবে।

খ.৩ এবার পুরো ইমেজ অংশ ও নন-ইমেজ অংশে বিটুমিনের দ্রবণ লাগিয়ে দিয়ে ঝুট কাপড়ের সাহায্যে পূর্বের ইমেজ তুলে ফেলতে হবে। এখন নতুন করে অরেকবার বিটুমিনের দ্রবণ দিয়ে ঝুট কাপড়ের ড্যাবার বানিয়ে দ্রুত পুরো ইমেজকে ফ্লাট পরিতলে পরিণত করা যায়। খেয়াল রাখতে হবে, যেন কোথাও কোনো আঁচড় না থাকে।

খ.৪ ভিসকোভিটা দিয়ে পানি স্টোন বা প্লেটে ছড়িয়ে দিয়ে আঙুল দিয়ে আলতোভাবে ডলে ময়লা (বিটুমিন ও এরাবিক গাম মিশ্রিত ময়লা) তুলে ফেলতে হবে।

খ.৫ পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে এচিং করে (পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতিতে এচিং করে) প্রিন্টিংয়ের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

(গ) ইমেজ ট্রান্সফার করে সেই ইমেজটিকে ফ্লাট ইমেজে পরিণত করা

গ.১ একটি ফাইনাল প্রিন্ট নেওয়ার পর সেই প্রিন্টটিকে অন্য একটি গ্রেইন করা প্লেটে উপুড় করে বসিয়ে চারদিকে স্কচটেপ লাগিয়ে দিতে হবে। বিশেষ দ্রষ্টব্য হলো, ট্রান্সফার পদ্ধতিটিও একবার পড়ে নিতে হবে। অথবা কয়েকটি উপায়ের সাহায্যে ট্রান্সফার করা যেতে পারে:

গ.১.১ মেশিনের বেডে নিয়ে প্রয়োজন অনুপাতে চাপ (প্রেশার দিয়ে) প্রয়োগ করে প্রিন্ট নেওয়ার মতো করে পেপার প্যাকিং ও টিমপ্যান দিয়ে হুইলটি ঘুরিয়ে কয়েকবার আপ-ডাউন করলে প্রিন্ট ট্রান্সফার বা প্রতিস্থাপন হয়ে যাবে।

গ.১.২ অথবা প্রিন্টটির উল্টো দিকে জাইলিন, এসিটোন বা বেনজিন দিয়ে প্লেটে উল্টো করে বসিয়ে টেপ মেরে প্রিন্ট নেওয়ার মতো করে পেপার প্যাকিং ও টিমপ্যান দিয়ে হুইলটি ঘুরিয়ে কয়েকবার আপ-ডাউন করলে প্রিন্ট ট্রান্সফার বা প্রতিস্থাপন হয়ে যাবে।

গ.১.৩ একটি ফাইনাল প্রিন্ট নিতে হবে। প্রিন্টটিকে অন্য একটি গ্রেইন করা প্লেটে উপুড় করে বসিয়ে চারদিকে স্কচটেপ লাগিয়ে দিতে হবে। এবার অন্য একটি কাগজে (কার্টিজ পেপার/নিজপ্রিন্ট পেপারে) তুলা দিয়ে জাইলিন, এসিটোন বা বেনজিন লাগিয়ে দ্রুত প্রিন্টটির ওপর রেখে পেপার প্যাকিং ও টিমপ্যান বসিয়ে মেশিনের হুইলটি ঘুরিয়ে কয়েকবার আপ-ডাউন করলে প্রিন্ট ট্রান্সফার বা প্রতিস্থাপন হয়ে যাবে।

গ.২ এবার এক কর্নারের টেপ খুলে দেখতে হবে প্রতিস্থাপনটি ঠিক হয়েছে কি না? না হলে আরো কয়েকবার একটু প্রেশার বাড়িয়ে আপ-ডাউন করতে হবে। অথবা আবার একটু প্রয়োগ করে তুলা দিয়ে জাইলিন, এসিটোন বা বেনজিন লাগিয়ে দ্রুত প্রিন্টটির ওপর রেখে পেপার প্যাকিং ও টিমপ্যান বসিয়ে মেশিনের হুইলটি ঘুরিয়ে কয়েকবার আপ-ডাউন করলে প্রিন্ট ট্রান্সফার বা প্রতিস্থাপন হয়ে যাবে।

গ.৩ স্টোন বা প্লেটের চার দিকের নন-ইমেজ অংশে এরাবিক গাম তুলির সাহায্যে লাগিয়ে ফ্যান বা হেয়ার ড্রায়ার মেশিন দিয়ে শুকিয়ে ফেলতে হবে। কয়েকটি কেমিক্যাল দিয়ে ফ্লাট ইমেজ তৈরি করা যায়। যেমনঃ বিটুমিন, ল্যাকার এবং শ্যালাক (গালা)। তবে ল্যাকার লাগিয়ে ইমেজ সৃষ্টির পর আবার একটু বিটুমিন দ্রবণ লাগিয়ে দিলে প্রিন্ট নেওয়ার সময় রোলিং করতে গেলে ইমেজ অংশ তাড়াতাড়ি ইঙ্ক ধারণ করে। তাই এ সময় কেউ কেউ বিটুমিন দ্রবণ লাগিয়ে পরবর্তী পর্বে যান।

গ.৩.১ বিটুমিন ও তারপিনটাইনের দ্রবণ (ওয়াশ-আউট সলিউশন) ঝুট কাপড়ের টুকরো দিয়ে পুরো ইমেজ অংশে লাগিয়ে দিতে হবে। এবার বিটুমিন শুকিয়ে যাওয়ার আগে দ্রুত ঝুট কাপড় দিয়ে (ড্যাবার বানিয়ে) এমনভাবে মুছতে হবে, যেন পুরো ইমেজ অংশে বিটুমিনের পাতলা আবরণ তৈরি হয়। খেয়াল রাখতে হবে, যেন কোনোরূপ বিটুমিনের আঁচড় না থাকে। থাকলে এই প্রক্রিয়াটি পুনরায় করতে হবে। তা না হলে ফ্লাট ইমেজ প্রিন্টের সময় ওই আঁচড়গুলো প্রিন্টে চলে আসবে।

গ.৩.২ বিটুমিন দ্রবণ না দিয়ে সরাসরি ঝুট কাপড়ের টুকরো দিয়ে পুরো ইমেজ অংশ জুড়ে ল্যাকার লাগিয়ে দিতে হবে। ল্যাকার শুকিয়ে যাওয়ার আগেই দ্রুত ঝুট কাপড় দিয়ে (ড্যাবার বানিয়ে) এমনভাবে মুছতে হবে, যেন পুরো ইমেজ অংশে ল্যাকারের পাতলা আবরণ তৈরি হয়। খেয়াল রাখতে হবে, যেন

কোনোরূপ ল্যাকারের আঁচড় না পড়ে। থাকলে এই প্রক্রিয়াটি পুনরায় করতে হবে। তা না হলে ফ্লাট ইমেজ প্রিন্টের সময় ওই আঁচড়গুলো প্রিন্টে চলে আসবে।

গ.৩.৩ বিটুমিন দ্রবণ না দিয়ে সরাসরি ঝুট কাপড়ের টুকরো দিয়ে পুরো ইমেজ অংশ জুড়ে শ্যালাক (শ্যালাক +স্পিরিট) লাগিয়ে দিতে হবে। শ্যালাক ও স্পিরিটের দ্রবণটি যেন খুব ঘন না হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখা প্রয়োজন। প্রক্রিয়াটি হলো: একটি গেঞ্জির লম্বা ঝুট কাপড় শ্যালাকে ডুবিয়ে নিয়ে দুই হাত দিয়ে দুই দিকে ধরে টেনে লম্বা করে স্টোন বা প্লেটের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে স্ক্র্যাপিং প্রসেসের মতো করে একবারে লাগাতে হবে। এটি দ্বিতীয়বার লাগাতে গেলে ইমেজের প্রিন্ট মোটা হয়ে আসবে। তাই খেয়াল রাখতে হবে, যেন কোনোরূপ আঁচড় না পড়ে। আঁচড় থাকলে এই প্রক্রিয়াটি পুনরায় আর করা যাবে না। তাই এ প্রক্রিয়াতে সাধারণত লিথোগ্রাফাররা ফ্লাট ইমেজ তৈরি করেন না। এটি শুধু রিভার্স প্রসেসের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(ঘ) ফ্লাট ইমেজের বাইরের অংশে ভিসকোভিটা দিয়ে পানির সাহায্যে আঙুল দিয়ে খুব আলতোভাবে ডলতে থাকলে বিটুমিন বা ল্যাকারসহ গাম উঠে আসবে। বিটুমিন বা ল্যাকার নন-ইমেজ অংশ থেকে উঠে গেলে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি মুছে ফেলতে হবে। এবার ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে তাপেম (এচিং সলিউশন: টেনিক এসিড + অ্যারাবিক গাম দ্রবণ + ফসফোরিক এসিড) তুলির সাহায্যে নন-ইমেজ অংশে লাগিয়ে দিয়ে ৪৫ সেকেন্ড (তুলিটি দিয়ে দ্রুত নাড়িয়ে) রেখে এচিংটি করে নিতে হবে।

(ঙ) এচিং করার পর পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে গামিং করে শুকিয়ে নিতে হবে।

(চ) ওয়াশ-আউট করে প্রিন্টিংয়ের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

৬.১৪ বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চর্চাতে নতুনত্ব

বাংলাদেশের ঢাকা চারুকলার চারুশিল্প শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত লিথোগ্রাফি চর্চা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে করণ-কৌশলগত নানারূপ পরিশীলতার ছাপ সৃষ্টি হয়েছে। সেই বিষয়টিও গবেষণায় উঠে আসা প্রয়োজন। তাই শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত সময়কালকে দুটি ভাগে ভাগ করে (শুরু থেকে ২০০৪ পর্যন্ত এবং ২০০৪ থেকে ২০০১৬ পর্যন্ত) এর করণ-কৌশল আলোচনা করা যেতে পারে:

৬.১৪.১ (ক) ২০০৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি প্রিন্ট নেওয়ার পদ্ধতি

ক.১ স্টোন গ্রেইন করা হয় সমান সাইজের স্টোন দিয়ে ঘর্ষণ পদ্ধতিতে। বড় স্টোনগুলো 'S' প্যাটার্নে ঘষে গ্রেইন করা হতো। এ সময় কখনো সিলিকন কার্বাইড দিয়ে গ্রেইন করা হয়নি, বালু দিয়ে করা হয়েছে। তখন বাজারে হয়তো সিলিকন কার্বাইড পাওয়া যেত না। তাই গ্রেইনগুলো বর্তমান সময়ের কাজগুলোর গ্রেইন থেকে অপেক্ষাকৃত বড় ধরনের ছিল। (চিত্র. ৬.৯)

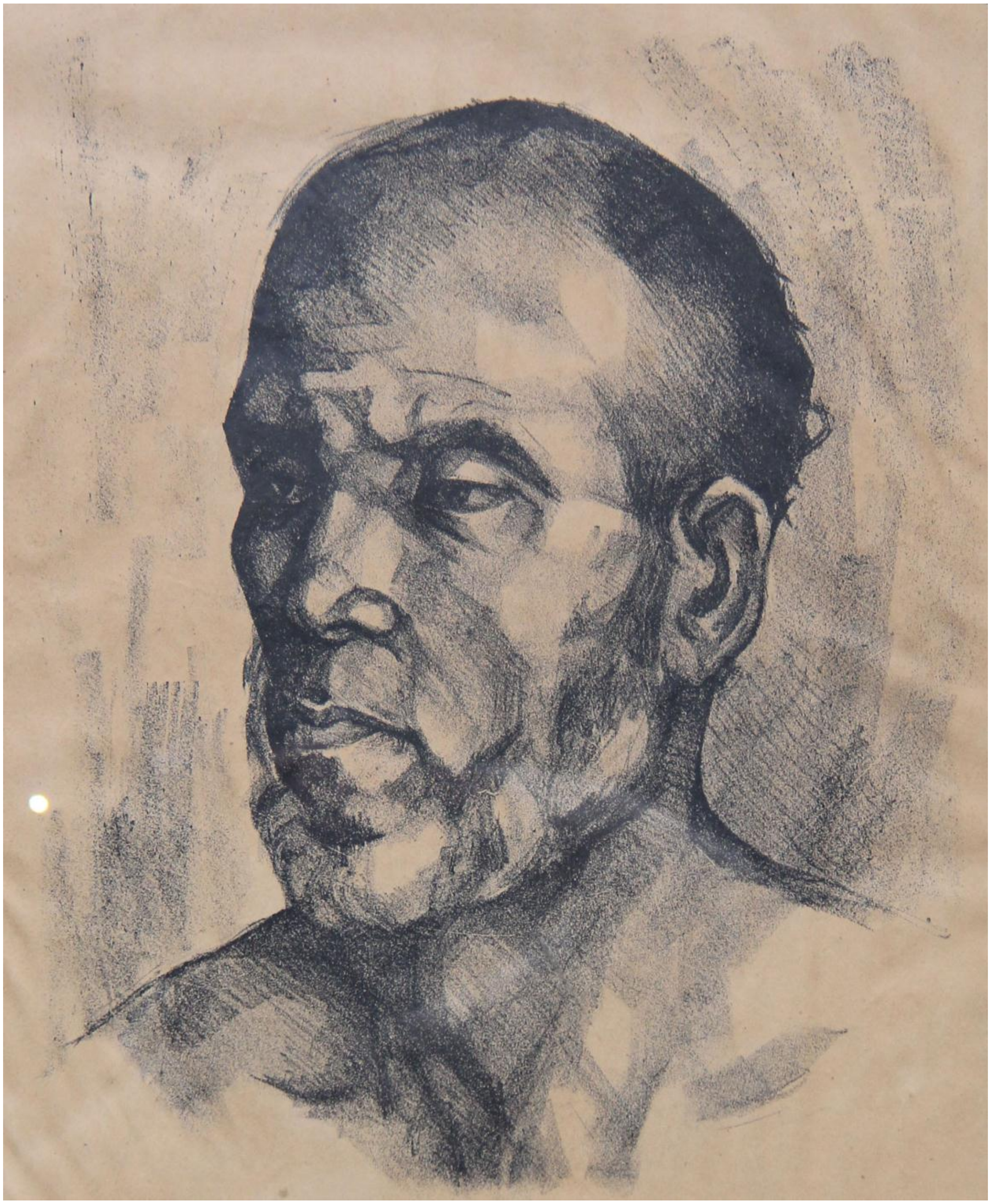

Plate. 6.9 Ashish Sen Gupto, Litho, 19x14 inch, may be 1960 -1965, Its grain were created by sand.

ক.২ ইমেজ সৃষ্টি করা হতো।

ক.৩ পরিষ্কার এরাবিক গামের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা নাইট্রিক এসিড মিশ্রণ ঘটিয়ে পুরো স্টোনে হাত দিয়ে লাগিয়ে বিশ্রামে রাখা হতো এক রাত। এ ধরনের এচিংকে লোকাল এচিং বলা হয়। গ্রেইন বড় হলে এরূপ প্রিন্টে তেমন সমস্যা হয় না। তবে তাড়াতাড়ি জড়িয়ে আসতে থাকে। ইমেজ অনেকটা ফ্লাট হয়ে আসে। মিহি গ্রেইন বা ২৮০ গ্রিটের গ্রেইন এবং সঙ্গে টোনাল কাজ বেশি হলে এ ধরনের কাজে লোকাল এচিং ভালো ফল বয়ে আনে না।

বর্তমান ২০০৪ সালের পর থেকে এখানে লোকাল এচিং পদ্ধতি বাদ দিয়ে স্টেপ বাই স্টেপ এচিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ হালকা, মধ্যম ও গাঢ় ইমেজের জন্য আলাদা ধরনের এচিং করা শুরু হলো ব্যাপকভাবে। আট থেকে ১২ ঘণ্টা বিশ্রাম দেওয়ার পর স্টোনে তারপিনটাইন ঢেলে ঝুট কাপড় দিয়ে আলতোভবে ডলে ইমেজ ওয়াশ-আউট করার চেষ্টা করা হতো। এই ওয়াশ-আউটের সময় তারপিনটাইনের সঙ্গে অল্প পানিও মিশিয়ে দিয়ে ইমেজকে তুলে ফেলা হতো। কিন্তু বর্তমান সময়ে ওয়াশ-আউট করার সময় পানি দেওয়া হয় না। কারণ তারপিনের সঙ্গে কেরোসিনজাতীয় তেলের মিশ্রণ ঘটিয়ে থাকে বলে পরবর্তী সময়ে রোলিংয়ের সময় ময়লা (স্কাম) ধরে যায়। আর প্লেট-লিথোগ্রাফির ওয়াশ-আউটের সময় মতো পানি দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। আবার ২০০৪ সালের দিকে লক্ষ্য করা হলো যে, তারপিনটাইনে কেরোসিনের পরিমাণ এতটাই বাড়িয়ে দিয়েছে যে, ইমেজ বারবার জড়িয়ে যাচ্ছে। তখন নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেল, বাজারে প্রাপ্ত বার্জার থিনার তারপিনটাইনের বিকল্প হিসেবে বেশ ভালো কাজ করছে। তখন (২০০৪ সাল) থেকে বর্তমান ২০১৬ সাল পর্যন্ত স্টোন ও প্লেট-লিথোগ্রাফিতে ওয়াশ-আউট করার জন্য বার্জার থিনারই ব্যবহৃত হচ্ছে।

ক.৪ ওয়াশ-আউট শেষে পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলা হতো।

ক.৫ বালতিতে পানি নিয়ে একটি কাপড়ের টুকরো ভিজিয়ে স্টোনে পানি দিয়ে ভিসকোভিটার বিকল্প হিসেবে কাজটি করা হয়।

ক.৬ সরাসরি হুগলি কালার ব্যবহার করা হতো। শক্ত ইঙ্ক প্রয়োজন হলে পুরনো ইঙ্ক ভালো করে স্প্যাচুলার মাধ্যমে ডাবারিং করে ব্যবহার হতো। ২০০৪ সালের পর থেকে ইঙ্ককে শক্ত করার জন্য ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেটের বিকল্প হিসেবে ট্যালকম পাউডার ব্যবহার শুরু হয়ে ২০০৬ সাল পর্যন্ত চলছে। এই ট্যালকম পাউডার মিশ্রিত কালারের স্তরে ভবিষ্যতে ফাটল তেরি হতে পারে এবং ছবির ডেপথের অভাব দেখা যেতে পারে, যা বর্তমান পর্যন্ত লক্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। তবে প্লেট-লিথোগ্রাফি চর্চা আরম্ভ

হওয়াতে প্রিন্টের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত পাতলা ইঙ্ক প্রয়োজন পড়েছে। ফলে স্বভাবতই ট্যালকম পাউডারের ব্যবহার দ্রুতই কমে এসেছে। একেবারে নাই বললেই চলে। তাই ক্ষতিকর দিকটি থেকে বাংলাদেশ এমনিতেই পরিত্রাণ লাভ করেছে।

ক.৭ বালতিতে পানি নিয়ে একটি কাপড়ের টুকরো ভিজিয়ে স্টোনে পানি দিয়ে ভিসকোভিটার বিকল্প হিসেবে কাজটি করা হয়। ভিসকোভিটার ন্যায় কাপড় প্রয়োজন অনুপাতে পানি শুষে নিতে পারে না। তাই প্রয়োজনের তুলনায় স্টোনে পানির পরিণাম বেশি থাকার কারণে হালকা ইমেজগুলো প্রিন্টে আসে না। ২০০৪ সালের পর থেকে বাংলাদেশের বাজার থেকে এই ভিসকোভিটা খুঁজে বের করা হলো। ফলে স্টোনে পানি এবং তেলের পরিমাণের সঠিক সামঞ্জস্য আনা সম্ভব হলো।

৬.১৪.১ (খ) উড লিথোগ্রাফিতে— ইমেজ তৈরি থেকে প্রিন্ট নেওয়া পর্যন্ত পদ্ধতি

যে কারণে প্লেটে করা প্লেনোগ্রাফিক প্রসেস 'প্লেট-লিথোগ্রাফি' নামে পরিচিতি লাভ করে, কাঠের ওপর সৃষ্ট প্লেনোগ্রাফিক প্রসেসও ঠিক সে কারণে 'উড লিথোগ্রাফি' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। কয়েকটি উপকরণ দিয়ে এ মাধ্যমে কাজ করা সম্ভব:

খ.১ গ্লাসমার্কার

খ.২ তুষ (লিথোগ্রাফিক ইঙ্ক)

খ.৩ প্রেস ইঙ্ক ইত্যাদি।

খ.১ গ্লাসমার্কার দিয়ে উড লিথোগ্রাফিতে অঙ্কন পদ্ধতি

খ.১.১ যেকোনো একটি প্লাইউড পরিতলে গ্লাসমার্কার দিয়ে ইমেজ তৈরি করে ভিসকোভিটা দিয়ে গামিং করে একটু শুকিয়ে নিতে হবে।

খ.১.২ ভিসকোভিটা দিয়ে প্লেটটিকে ভিজিয়ে ব্ল্যাক রোলিং করতে হবে। রোলিং করার সময় খুব প্রেশার না দিয়ে আলতোভাবে উডকাট রোলার দিয়ে রোল করতে হবে। লক্ষণীয় যে— এই প্রক্রিয়াতে ওয়াশ-আউট করার প্রয়োজন পড়ে না। জাপানিজ শিল্পী কুনিকো সাতাকি (উড লিথোগ্রাফির আবিষ্কারক) ম্যাজিক ইঙ্ক নামক একধরনের গ্লাসমার্কার দিয়ে কাজ করেন। এই ম্যাজিক ইঙ্ক আঠালো ধরণের এবং শুকিয়ে গেলে ওয়াশ-আউট করার প্রয়োজন পড়ে না। এর আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে রোলিং করার সময় রোলারের সঙ্গে ইঙ্ক উঠে আসে না। আর বাংলাদেশে প্রাপ্ত গ্লাসমার্কারগুলোর সবচেয়ে খারাপ দিক হলো

এটি রোলিংয়ের সময় ইমেজ পরিতল থেকে রোলারে উঠে আসে। ইঙ্কের আঠালো ভাবের অভাবের কারণে কাঠকে বেশিক্ষণ আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে না। ফলে বেশি এডিশন নেওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

খ.১.৩ রোলিং শেষে এচিং মেশিনে প্রিন্ট নেওয়া যেতে পারে।

খ.২ তুষ দিয়ে উড লিথোগ্রাফিতে অঙ্কন পদ্ধতি

খ.২.১ যেকোনো একটি প্লাইউড পরিতলে তুষ দিয়ে ইমেজ তৈরি করে শুকিয়ে নিয়ে ভিসকোভিটা দিয়ে গামিং করে একটু শুকিয়ে নিতে হবে।

খ.২.২ ভিসকোভিটা দিয়ে প্লেটটিকে ভিজিয়ে ব্ল্যাক রোলিং করতে হবে। রোলিং করার সময় খুব প্রেশার না দিয়ে আলতোভাবে উডকাট রোলার দিয়ে রোল করতে হবে। লক্ষণীয় যে— এই প্রক্রিয়াতে ওয়াশ-আউট করার প্রয়োজন পড়ে না। জাপানিজ শিল্পী কুনিকো সাতাকি (উড লিথোগ্রাফির আবিষ্কারক) ম্যাজিক ইঙ্ক নামক একধরনের গ্লাসমার্কার দিয়ে কাজ করেন। এই ম্যাজিক ইঙ্ক আঠালো ধরনের এবং শুকিয়ে গেলে ওয়াশ-আউট করার প্রয়োজন পড়ে না। এর আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে রোলিং করার সময় রোলারের সঙ্গে ইঙ্ক উঠে আসে না। আর বাংলাদেশে প্রাপ্ত গ্লাসমার্কারগুলোর সবচেয়ে খারাপ দিক হলো এটি রোলিংয়ের সময় ইমেজ পরিতল থেকে রোলারে উঠে আসে। ইঙ্কের আঠালো ভাবের অভাবের কারণে কাঠকে বেশিক্ষণ আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে না। ফলে বেশি এডিশন নেওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

খ.২.৩ রোলিং শেষে এচিং মেশিনে প্রিন্ট নেওয়া যেতে পারে।

খ.৩ প্রেস ইঙ্ক দিয়ে উড লিথোগ্রাফিতে অঙ্কন পদ্ধতি

গ্লাসমার্কার ব্যবহারে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এমন ধরনের ইঙ্ক ব্যবহার করা যেতে পারে, যা তুষের মতো পাতলা এবং রোলিংয়ের সময় উঠে আসবে না। ফলে বিকল্প হিসেবে প্রেস ইঙ্ক ব্যবহার যেতে পারে। প্রেস ইঙ্কের আঠালো ভাবটি এত বেশি যে, তুলি বা ব্রাশ দিয়ে কাজ করা কঠিন। তাই এই প্রেস ইঙ্কের সঙ্গে তারপিন পরিমাণমতো মিশিয়ে পাতলা করে তুলি বা হকিয়ার ব্রাশ ব্যবহার করে ইমেজ তৈরি করা সম্ভব। তবে ইঙ্ক আবার প্রয়োজনের তুলনায় পাতলা করলে রোলিংয়ের সময় ইমেজ তার কালি ধারণক্ষমতা হারাবে।

খ.৩.১ একটি প্লাই বোর্ডের ওপর প্রেস ইঙ্ক দিয়ে ইমেজ তৈরি করতে হবে।

খ.৩.২ পরিষ্কার এরাবিক গাম দিয়ে গামিং করতে হবে।

খ.৩.৩ ১০ মিনিট পর ভিসকোভিটা দিয়ে ভিজিয়ে উডকাট রোলারের সাহায্যে খুব আলতোভাবে রোলিং করতে হবে। আপের দিকে রোলিং করলে ইমেজ অংশ বেশি এবং নন-ইমেজ অংশ কম কালি ধারণ করবে। আর ডাউনের দিকে রোলিং করলে নন-ইমেজ অংশের অতিরিক্ত কালার রোলারে চলে আসবে।

খ.৩.৪ উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় রোলিং করার পর এচিং মেশিনে প্রিন্ট নেওয়া যেতে পারে। পেপারটিকে একটু ভিজিয়ে নিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

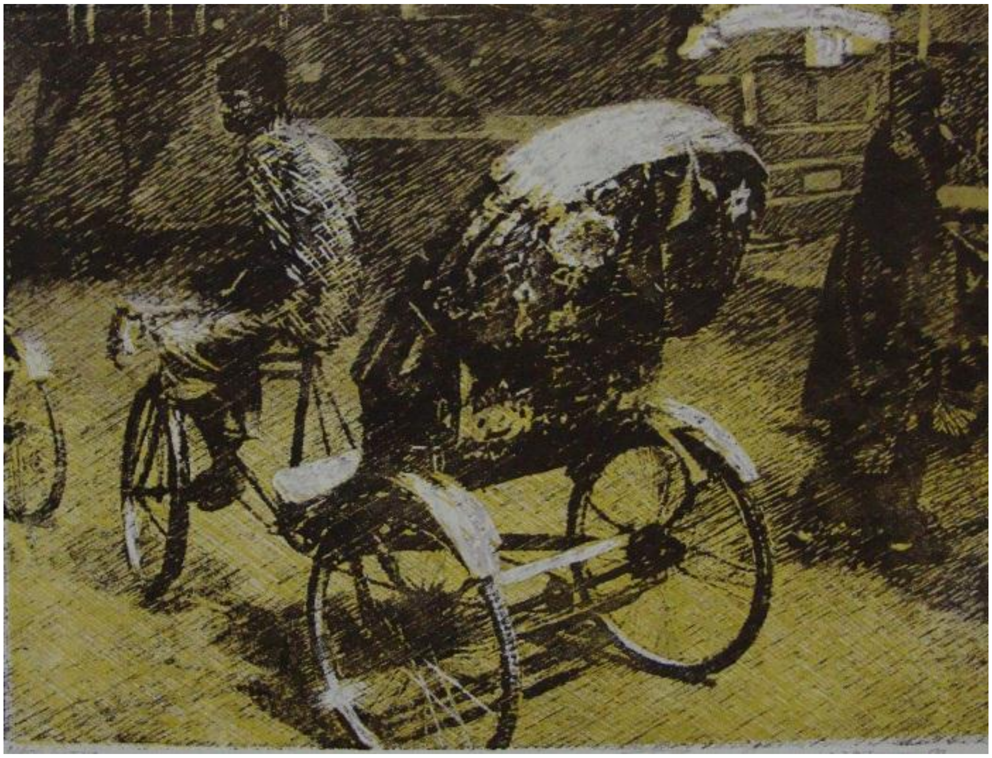

Plate : 6.10, Rokonuzzaman, Imagination, Wood lithography, Wood cut, 26.5x20 cm, 2009.

খ.৪ উড লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে প্রিন্ট নেওয়ার সুবিধা

খ.৪.১ এই পদ্ধতিতে প্রিন্ট নিলে পুরো ইমেজ জুড়ে একটা হালকা টিন্ট কালার চলে আসে। ছবির হাইলাইটের অংশটিতে সাদা কাগজের কালার প্রয়োজন হলে, সে ক্ষেত্রে প্রিন্ট নেওয়ার পূর্বে একটি ছোট্ট ঝুট কাপড় দিয়ে হাইলাইটের অংশটি মুছে প্রিন্ট নিতে হবে। তাহলেই একমাত্র সাদা হাইলাইট পাওয়া সম্ভব।

খ.৪.২ যে কালারের ইমেজ প্রয়োজন সেই কালার বানিয়ে তা দিয়ে অঙ্কন করলে এবং রোলিং করেও প্রিন্ট নেওয়া সম্ভব।

খ.৪.৩ ইমেজ প্রিন্ট নেওয়ার পর ইমেজের কিছু অংশ ব্লেড দিয়ে চেঁছে আবার ইমেজ তৈরি করে অনুরূপ প্রক্রিয়ায় প্রিন্ট নেওয়া সম্ভব।

খ.৪.৪ হুগলি ইঙ্ক যতটা সফলভাবে এই ইমেজ তৈরিতে সাহায্য করেছে সেনেফেলডারের লিথোগ্রাফিক ইঙ্কও এতটা সফল হবে না। কারণ লিথোগ্রাফিক ইঙ্ক খুব শক্ত হয়, প্রেস ইঙ্কের মতো পাতলা হয় না। ফলে এই পাতলা ইঙ্ক কাঠকে খুব সহজেই আঁকড়ে ধরে থাকে, রোলিংয়ের সময় উঠে যায় না। কাজেই বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বিকল্প ও নিজস্ব পদ্ধতি হিসেবে এটি গ্রহণ করা যেতে পারে।

খ.৪.৫ বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই প্রসেসে লিথো মেশিনে প্রিন্ট নেওয়ার পদ্ধতিটি একটু পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ বিষয়। তবে ওয়াশ-আউট করে প্রিন্ট নেওয়া হলেও অন্য ধরনের অনুভূতিশীল ভালো ফল পাওয়া সম্ভব।

৬.১৪.৩ (গ) বলপয়েন্ট স্টোন লিথোগ্রাফি

লিথোগ্রাফিতে কন্টি, গ্লাসমার্কার বা তুষ মাধ্যমে লাইন দিতে গেলে সরু লাইন ব্যবহার করা যায় না, লাইনটি একটু মোটা হয়ে প্রিন্টে আসে। তাই ছোট ধরনের ইমেজ তৈরির সময় এই বলপয়েন্ট লিথোগ্রাফি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চর্চাতে এটি ২০০৪ সালের পর পরিচিত হয়।

Plate: 6.11, Kamruzzaman, Ball point Lithograpgy, 2009, ?

গ.১ বলপয়েন্ট লিথোগ্রাফিতে গ্রেইনিং থেকে প্রিন্ট বের করে নিয়ে আসা পর্যন্ত পদ্ধতি

গ.১.১ 'বলপয়েন্ট স্টোন লিথোগ্রাফি'তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্টোনের গ্রেইন। কন্টিতে কাজ করার মতো করে গ্রেইন করলে ইমেজ তৈরির সময় বলপয়েন্ট কলমের বল আটকে যাবে, ইমেজ সাবলীলভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। তাই পূর্বোল্লিখিত স্টোন গ্রেইন করার যথাযথ নিয়ম পালন করে এসে শেষের দিকে একটু পলিশ অবস্থায় গ্রেইন করা বন্ধ করতে হবে। আবার যেন পুরো পলিশও না হয়ে যায়, এমন গ্রেইনই এ পদ্ধতির জন্য সবচেয়ে ভালো।

গ.১.২ পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে স্টোনটিকে একটু ঢালু অংশে রাখলে পানি গড়িয়ে পড়বে এবং তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে।

গ.১.৩ ইমেজটি সাবলীলভাবে আঁকতে হবে।

গ.১.৪ ইঙ্ক বেড়ে গিয়ে পাতলা প্রেস ইঙ্ক রোল করে আনতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, রোলে যেন খুব অল্প পরিমাণ রং ধারণ করে। বেশি হলে ইমেজ জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

গ.১.৫ ইমেজকে অঙ্কনের পর দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে গামিং করলে ভালো। তা না হলে কলমের ইঙ্ক বেশি শুকিয়ে গেলে রোলিংয়ের সময় ইঙ্ককে গ্রহণ নাও করতে পারে।

গ.১.৬ খুব ভালো করে গামিং করার দরকার নেই। কোনো রকমে গামিং করে, শুকাতে না দিয়ে এ অবস্থাতেই ভিসকোভিটা দিয়ে স্টোনকে ভিজিয়ে রোলিং করতে হবে। অর্থাৎ এই কলমের ইঙ্কের সঙ্গে আরো একটু প্রেস ইঙ্ক ঢুকিয়ে দেওয়া হলো ওলিও ম্যাঙ্গানিট অব লাইম তৈরির জন্য।

গ.১.৭ ইমেজ ঠিকমতো ডেভেলপ করলে রোলিং বন্ধ করতে হবে। এবার ভিসকোভিটা দিয়ে নন-ইমেজ অংশ থেকে স্কাম সরাতে হবে।

গ.১.৮ হেয়ার ড্রায়ার বা ফ্যানের বাতাসে শুকাতে হবে।

গ.১.৯ ফ্রেঞ্চ চক ইমেজের ওপর ছিটিয়ে দিয়ে তুলির মাধ্যমে সমস্ত অংশে লাগাতে হবে।

গ.১.১০ ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি দিয়ে স্টোনের ইমেজ ও নন-ইমেজ অংশ থেকে ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে।

গ.১.১১ এবার পরিষ্কার গামিং করতে হবে সঠিক নিয়মে।

গ.১.১২ কিছুক্ষণ (২০ মিনিট) বিশ্রামের পর এচিং করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, এই ইমেজের জন্য খুব হালকা এচিংয়ের (mild etching) প্রয়োজন হয়।

গ.১.১৩ এচিং করার পর পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে নিয়ে পরিষ্কার গামিং করা প্রয়োজন।

গ.১.১৪ সঠিক নিয়মে ওয়াশ-আউট করে বিটুমিনের দ্রবণ লাগিয়ে দিলে ভালো।

গ.১.১৫ পূর্বোল্লিখিত নিয়মে প্রিন্ট নিতে হবে।

গ.১.১৬ শুধু ইঙ্ক তৈরির ক্ষেত্রে— প্রেসের পাতলা ইঙ্ক ব্যবহার করে সহজেই প্রিন্ট বের করে আনা সম্ভব।

৬.১৪.৪ (ঘ) প্লেট-লিথোগ্রাফিতে নতুন ধরনের ফ্লাট ইমেজ সৃষ্টি

কয়েকটি উপায়ে প্লেট-লিথোগ্রাফিতে ফ্লাট ইমেজ সৃষ্টি করা যায়।

(ঘ.১) প্লেটের প্রথম ইম্প্রেশন নেওয়ার পর ইমেজকে ভালো করে রোলিং করতে হবে। প্লেটটিকে শুকিয়ে নিয়ে ফ্রেঞ্চ চক লাগিয়ে দিয়ে ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। এখন ফিটকিরি বা অ্যালাম পানি দিয়ে ধুয়ে প্লেটকে রিসেনসিটিভ করে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুতে হবে। প্লেট শুকিয়ে নিয়ে পুরো প্লেট জুড়ে ল্যাকার লাগিয়ে দিলে পুরো ইমেজ ও নন-ইমেজ অংশ ফ্লাট ইমেজে পরিণত হয়। তবে এ প্রক্রিয়ায় খুব ভালো ফল পাওয়া যায় না।

(ঘ.২) প্লেটের প্রথম ইম্প্রেশন নেওয়ার পর ইমেজকে ভালো করে রোলিং করতে হবে। প্লেটটিকে শুকিয়ে নিয়ে ফ্রেঞ্চ চক লাগিয়ে দিয়ে ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। এবার গরম পানি দিয়ে ধুয়ে দিলে প্লেটটি কিছুটা রিসেনসিটিভ হয়ে উঠবে। ফলে সেই অংশে অবার ইমেজ তৈরি বা ফ্লাট করার জন্য ল্যাকার লাগিয়ে দিয়ে ইমেজ সৃষ্টি করা যায়। এ প্রক্রিয়াতেও খুব সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় না।

(ঘ.৩) বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রিন্টমেকিং বিভাগে ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসের ২৭, ২৮, ২৯ তারিখে ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালা থেকে প্লেট-লিথোগ্রাফি (পানিযুক্ত) ও ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফির সমন্বিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফ্লাট কালারে প্রিন্ট নেওয়ার আরেকটি পদ্ধতি বের হয়ে আসে। উক্ত সময়ে একটি প্লেট-লিথোর ওপর ওয়াটারলেস লিথোর প্রক্রিয়া যেভাবে প্রয়োগ করা হয়, তা হলো নিম্নরূপ:

(ঘ.৩.১) প্লেট-লিথোতে প্রিন্ট নেওয়া একটি প্লেট পরিষ্কার গামিং করা হলো।

(ঘ.৩.২) এবার ঝুট কাপড়ের টুকরোতে এসিটোন নিয়ে প্লেটে প্রয়োগ করা হলে ল্যাকার উঠে গেল এবং এরাবিক গামের সঙ্গে কোনো বিক্রিয়া করল না।

(ঘ.৩.৩) এরাবিক গাম যেহেতু ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি বা অ্যালুগ্রাফিতে মূল ভূমিকা পালন করে, তাই মিথাইল সেলিসিলেট দিয়ে এরাবিক গামকে তুলে নিয়ে প্লেটকে আবার রিসেনসিটিভ করে তোলা হয় এবং ইমেজ অংশও আরো একটু সেনসিটিভ হয়ে ওঠে।

(ঘ.৩.৪) এবার প্লেটের এই নন-ইমেজ অংশকে তরল সাবান দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

(ঘ.৩.৫) ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে ব্ল্যাক-রোলিং করলে ইমেজ ও নন-ইমেজ অংশ উভয়ই ইঙ্ক ধারণ করে ফ্লাট ইমেজে পরিণত হবে।

৬.১৪.৫ (ঙ) প্লেট-লিথোগ্রাফির সঙ্গে ওয়াটারলেস প্লেট-লিথোগ্রাফির সংমিশ্রণ

প্লেট-লিথোগ্রাফিতে পানি ব্যবহার করা হয়। আর ওয়াটারলেস প্লেট-লিথোগ্রাফিতে পানি ব্যবহার করা হয় না। ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসের ১৭–২৩ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা চারুকলার প্রিন্টমেকিং বিভাগে মালয়েশিয়ার শিল্পী রহমান মোহাম্মেদ ওয়াটারলেস লিথো কর্মশালা পরিচালনা করেন। সে সময়টিতে রোকনুজ্জামান পানি ব্যবহৃত প্লেট-লিথোগ্রাফির সঙ্গে ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফির সংমিশ্রণ ঘটাবার চেষ্টা করেছেন। উক্ত পরীক্ষা থেকে বের হয়ে আসে পানিযুক্ত প্লেট-লিথোগ্রাফির ফ্লাট ইমেজ নেওয়ার পদ্ধতি। পদ্ধতিটি নিম্নরূপ:

(ঙ.১) একটি প্লেট-লিথোগ্রাফির প্রিন্ট নেওয়ার পর পুরো প্লেট জুড়ে গামিং করে হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে শুকাতে হবে।

(ঙ.২) এখন ল্যাকার দিয়ে ইমেজ অংশ থেকে ইঙ্কসহ পুরনো ল্যাকার উঠিয়ে নতুন ল্যাকার লাগাতে হবে।

(ঙ.৩) এসিটোন দিয়ে ল্যাকার তুলে ফেলতে হবে। এই এসিটোন বা ল্যাকার এরাবিক গামের সঙ্গে কোনো বিক্রিয়া করে না।

(ঙ.৪) এরাবিক গাম যেহেতু ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি বা অ্যালুগ্রাফিতে মূল ভূমিকা পালন করে, তাই মিথাইল সেলিসিলেট দিয়ে এরাবিক গাম তুলে নিয়ে প্লেটকে আবার রিসেনসিটিভ করে তোলা হয় এবং ইমেজ অংশও আরো একটু সেনসিটিভ হয়ে ওঠে।

(ঙ.৫) এবার প্লেটের এই নন-ইমেজ অংশকে তরল সাবান দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

(ঙ.৬) ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে ব্ল্যাক-রোলিং করলে ইমেজ ও নন-ইমেজ অংশ উভয়ই ইঙ্ক ধারণ করে ফ্লাট ইমেজে পরিণত হবে।

৬.১৪.৬ (চ) অ্যালুমিনিয়াম প্লেট-লিথোগ্রাফিতে 'ইরেজ করে ইমেজ সৃষ্টি' পদ্ধতিতে ইমেজ সৃষ্টি

স্টোন লিথোগ্রাফিতে কোনো ইমেজ সৃষ্টি করে তার ওপর স্ক্র্যাচ করার পর এচিং করে একধরনের ইমেজ সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু সে ইমেজ গামিং করে সৃষ্ট ইমেজ থেকে ভিন্ন। কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম প্লেট-লিথোগ্রাফিতে ইমেজ সৃষ্টি করে স্ক্র্যাচ করা যায় না। কিন্তু গবেষক গবেষণা করতে গিয়ে আরেক ধরনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, যেখানে ইমেজ তৈরির খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেই ইমেজকে পরিবর্তন করা সম্ভব এবং কিছু জায়গা ইরেজ করে ফেলা সম্ভব।

গ্লাসমার্কার ও ক্রেয়নের ইফেক্টের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সে বিষয়টি দৃশ্যত ফটোগ্রাফি করে এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করে দেখানো হয়েছে। এই গ্লাসমার্কারের ইফেক্ট নিয়ে সম্ভবত আজ পর্যন্ত কোনো গবেষণাপত্র লিখিত আকারে প্রকাশিত হয়নি। গ্লাসমার্কারের ইফেক্ট নিয়ে এ বিষয়ে ভবিষ্যতে লেখার প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। কারণ গ্লাসমার্কারের সূক্ষ্ম টোন অনেকটা রাবিং ইঙ্কের ইফেক্টের মতো মনে হলেও বাস্তবিক তা ভিন্ন। তাই গবেষক গবেষণাটি করতে গিয়ে এ বিষয়টি সাহিত্য পর্যালোচনার আওতায় নিয়ে এসেছেন। গবেষণার মধ্যবর্তী সময়ে আরেকটি বিষয় বের হয়ে এসেছে। তা হলো প্লেট লিথোতে গ্লাসমার্কার দিয়ে দ্রুত ফ্লাট ইমেজের কাছাকাছি গিয়ে তার ওপর গ্লাসমার্কার দিয়ে খুব শীঘ্রই প্রেশার দিয়ে ইমেজকে মুছে পাখির মতো কিছু ইমেজ সৃষ্টি করা যায়, যা কখনো অঙ্কন করে আঁকা কঠিন বিষয় এবং অঙ্কন অনুরূপ হবে না। সেইসঙ্গে প্লেটের সেই পাখির ইমেজ থেকে উঠে যাওয়া মোমের জায়গাটিতে প্রিন্টিংয়ের সময় ইমেজ জড়িয়ে যাবে না। অথচ অন্য যেকোনো সাধারণ ইমেজ তৈরির সময় একবার ইমেজ তৈরি করলে সেটিকে মোছা বা ইরেজ করা সম্ভব নয়, অন্তত প্লেট-লিথোগ্রাফির তৈরি ক্ষেত্রে। তাই এই আবিষ্কারটিকে আরেকটি নামকরণও করা যায়। তা হলো, ইরেজ করে ইমেজ তৈরি।

(চ.১) ইমেজ থেকে 'ইরেজ করে ইমেজ সৃষ্টি' করার পদ্ধতি

(চ.১.১) প্রথমে একটি তৈরি প্লেটে গ্লাসমার্কার দিয়ে দ্রুত (অঙ্কিত পাখির অংশ ভুলে গিয়ে পুরো ইমেজ জুড়ে পাখির অংশ বাদে বাকি অংশের মতো করে ইমেজ সৃষ্টি করা হলো) ইমেজ সৃষ্টি করা হলো।

(চ.১.২) এবার দ্রুত গ্লাসমার্কার দিয়ে প্রেশার দিয়ে ইমেজের অংশ থেকে মোম তুলে পাখির ইমেজ সৃষ্টি করা হলো।

(চ.১.৩) গামিং করে পরবর্তী নিয়ম অনুসারে প্রিন্টিংয়ের দিকে এগিয়ে অনুরূপ প্রিন্ট নেওয়া সম্ভব।

Plate, 6.14 Rokonuzzaman, Plate lithography, 2011, 18x6 cm,
অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে দ্রুত ইমেজ এঁকে গ্লাসমার্কার দিয়ে প্রেশারের
মাধ্যমে পাখির ইমেজ সৃষ্টি– 'ইরেজ করে ইমেজ সৃষ্টি'

চ.২ ইমেজ থেকে 'ইরেজ করে ইমেজ সৃষ্টি' তৈরির পদ্ধতির সুবিধা

(চ.২.১) এ পদ্ধতি দিয়েই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইমেজ সৃষ্টি করে ছবি আঁকা সম্ভব।

(চ.২.২) প্লেট-লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে ইমেজ সৃষ্টি করে তাকে পরিবর্তন করা যায় না। শুধু খুব অল্প সময়ের মধ্যে এমনভাবে ইমেজ সৃষ্টি করা করা হয়, যাতে পূর্বক্ত ইমেজের অস্তিত্ব স্থায়িত্ব পায় না। আর পরে তাপেম দিয়ে এচিং করলেই সুন্দর পরবর্তী ইমেজকে পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী ইমেজ ঘোস্ট ইমেজ হিসেবেও আবির্ভূত হয় না। অথচ কোনো ইমেজ সৃষ্টির অনেকক্ষণ পরে এ কাজটি করতে গেলে ভালো ফল পাওয়া যায় না আর স্ক্র্যাচ তো সম্ভবই নয়। তারপর ডিলিটার দিয়ে ইমেজকে মুছে এচিং করে প্রিন্ট নিলেও কয়েকটি প্রিন্ট পরে পূর্ববর্তী ইমেজ আবার ঘোস্ট ইমেজ হিসেবে পুনরায় আবির্ভূত হয়।

৬.১৪.৭ (ছ) ওয়াশ-আউট দ্রবণ (সলিউশন) সৃষ্টি ও এর ব্যবহার

২০০৪ সালের পর থেকে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিতে কিছু টেকনিকগত পরিবর্তন এসেছে, যেগুলো পূর্বে কখনো লিখিতভাবে প্রকাশ করা হয়নি। তেমনই একটি নতুন ধরনের দ্রবণ এ দেশের লিথোগ্রাফি চর্চায় প্রচলিত, যাকে 'ওয়াশ-আউট সলিউশন' বলা হয়। টেমারিন্ড ইনস্টিটিউটে এটি 'লিথোটিন' নামে পরিচিত। ভারতে তারপিনটাইনের সঙ্গে বিটুমিন মিশিয়ে একধরনের দ্রবণ তৈরি করে ওয়াশ-আউট সলিউশন হিসেবে ব্যবহার করা হতো। বাংলাদেশেও ২০০৪ সালের আগ পর্যন্ত তারপিনটাইন ব্যবহার করেই এটি প্রস্তুত করা হতো। কিন্তু এরপর থেকে বাংলাদেশে 'বার্জার রবিয়াল্যাক থিনার টি-৬'-এর সঙ্গে

বিটুমিন মিশিয়ে ওয়াশ-আউট দ্রবণ (সলিউশন) তৈরি করে ব্যবহার করা হচ্ছে। সাহিত্য পর্যালোচনায় এ বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৬.১৪.৮ (জ) স্টোন লিথোগ্রাফিতে ইন্টাগলিও মেথডের মাধ্যমে ইমেজ তৈরি করার পদ্ধতি

অনেকে লিথোগ্রাফি মাধ্যমে এচিং পদ্ধতির কথা শুনলেই অবাক হন। কিন্তু বিষয়টি নিম্নরূপভাবে ঘটানো সম্ভব:

(জ.১) গ্রেইন করা সেনসিটিভ স্টোনে একবার তুষ মাধ্যমে ওয়াশ দিয়ে শুকানো হলো। এবার এই ইমেজের ওপর আবার তুষ দিয়ে ওয়াশ দেওয়া হলো এবং শুকানো হলো।

(জ.২) এভাবে বারবার ওয়াশ দিয়ে শুকিয়ে ইমেজকে ফ্লাট ইমেজে পরিণত করে শুকাতে হবে। কোনো কোনো শিল্পী ওয়াশ পদ্ধতিতে ইমেজ তৈরি না করে শুধু ব্ল্যাক রোলিং করে প্রথমে ফ্লাট ইমেজ তৈরি করেন।

(জ.৩) এখন নাইট্রিক এসিড ভিসকোভিটা দিয়ে নিয়ে সরাসরি ইমেজের ওপর নিয়ে আলতোভাবে মুছতে থাকলে ফেনা উঠবে এবং জালের মতো টেক্সচার বের হয়ে আসবে। বেশি এচিং করলে আবার এই টেক্সচার উধাও হয়ে যাবে। তাই পরিমাণমতো এচিং করার পর পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। তবে এই প্রক্রিয়ার সময় সাবধানে সরাসরি নাইট্রিক এসিড ব্যবহার করা উচিত। এক কর্নার হাত দিয়ে ধরলে অন্য কর্নারে এসিড নিতে হয়। প্রয়োজনে হ্যান্ড গ্লাভস পরে নিতে হবে। কাজ করার সময় অন্য একটি ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি দিয়ে মুছে এচিংকে কন্ট্রোলে রাখতে হয়। আসলে এই পদ্ধতিটি মাস্টার লিথোগ্রাফারদের জন্য প্রযোজ্য। এসিড দিয়ে এচিং করে ইমেজ প্রস্তুত করা হয় বলে এই পদ্ধতিকে ইন্টাগলিও মেথড বলা হয়ে থাকে। টেমারিন্ডের গ্রন্থে এটিকে এসিড-টিন্ট পদ্ধতি নামে পরিচিতি দেয়া হয়েছে।[১৮৩] শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে উৎসাহিত না করাই ভালো।

(জ.৪) এচিং শেষে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

(জ.৫) পরিষ্কার গামিং করে শুকাতে হবে।

(জ.৬) ওয়াশ-আউট করে প্রিন্ট নিতে হবে।

---

[183] GaroZ. Antreasian and Clinton Adams, *'The Tamarind Book of Lithography: Art & Techniques'* New York, p. 379

Plate, 6.15 Rokonuzzaman, Plate lithography, 46x60 cm, (Detailed photo)

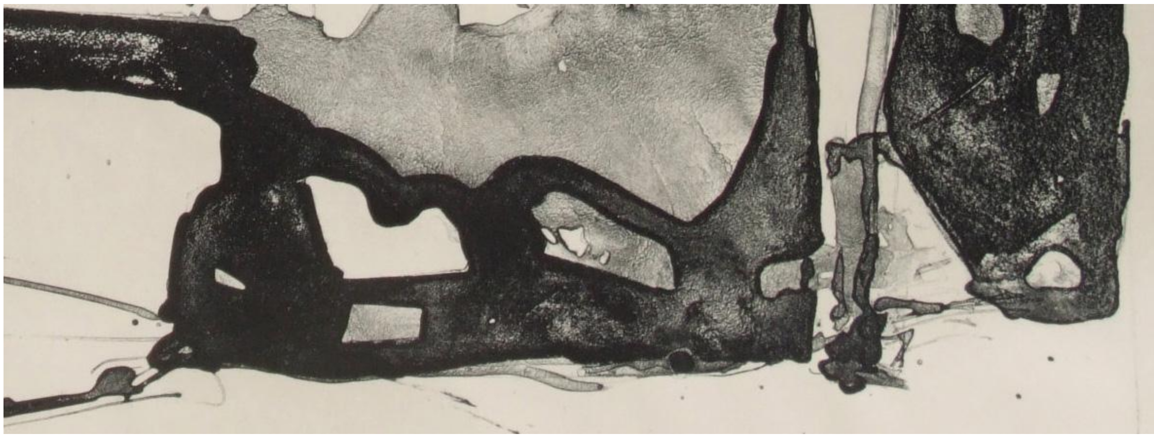

Plate, 6.16 (Detailed photo)

৬.১৫ লিথোগ্রাফি মাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য মাধ্যম ও কৌশল

৬.১৫.১ (ক) ওয়াটারলেস অ্যালুগ্রাফি বা ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি

২০১৬ সালের নভেম্বর মাসের ১৭–২৩ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা চারুকলার প্রিন্টমেকিং বিভাগে মালয়েশিয়ার শিল্পী রহমান মোহাম্মেদ ওয়াটারলেস লিথো কর্মশালা পরিচালনা করেন। নিম্নলিখিত সহজ উপায়ে ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি করা সম্ভব:

ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফিতে গ্রেইন করার পদ্ধতি

দুটি উপায়ে গ্রেইন করা যায়:

(ক) শিরীষ কাগজ বা এম.আর.আই পেপার দিয়ে অ্যালুমিনিয়াম প্লেটকে ঘষে গ্রেইন করা যায়।

(খ) বল গ্রেইন পদ্ধতিতে গ্রেইন করা যায়।

Plate, 6.17, Asmita Alam Shammi,
Waterless lithography, 2016, ?

ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফিতে ইমেজ তৈরি করার পদ্ধতি

মূলত মনে রাখতে হবে, এরাবিক গাম স্টোন লিথোগ্রাফিতে যে কাজটি করে থাকে, অর্থাৎ পানিকে ধারণ করে ইঙ্ককে রিজেক্ট করে; ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফিতে গাম তার বিপরীত কাজটি করে থাকে, অর্থাৎ ইঙ্ককে ধারণ করে। তাই যেসব ইঙ্কে এরাবিক গাম জাতীয় পদার্থ আছে, সেসব ইঙ্ক দিয়ে ইমেজ তৈরি করা সম্ভব। বেশ কয়েক ধরনের উপকরণ দিয়ে ইমেজ তৈরি করা যায়:

(ক) জেরক্স টোনার বা ফটোকপি টোনারের সঙ্গে ইথানল, পানি, তারপিন থিনার, সোপ বা তরল সাবান ইত্যাদি মিশিয়ে বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট সম্পন্ন ইমেজ তৈরি করা যায়।

(খ) গ্লাসমার্কার, ফেল্ট পেন, জলরং ইত্যাদি দিয়েও ইমেজ তৈরি করা যায়।

(গ) জলরঙে এরাবিক গাম থাকে বলে জলরং দিয়েও ইমেজ সৃষ্টি করা যায়। তবে ফ্লাট ইমেজ তৈরির জন্যই এই জলরং ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মূলত অ্যালুগ্রাফিতে এরাবিক গাম যে কাজ করে, ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফিতে ঠিক তার বিপরীত ঘটনাটি ঘটিয়ে থাকে।

ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফিতে প্রিন্ট তৈরি করার পদ্ধতি

(ক) ইমেজ তৈরির পর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ড্রায়ার দিয়ে হিট করে ইমেজকে ফিক্স করতে হবে।

(খ) একটি মিনারেল ওয়াটারের বোতলে সিলিকন + থিনার (বার্জার কোম্পানির থিনার) মিশিয়ে আইসক্রিমের, The Tamarind Book of Lithography কাঠি দিয়ে নাড়তে থাকলে সিলিকনটি তরল হয়ে যাবে। এমনভাবে পরিমাণ মতো তরলে পরিণত করতে হবে, যেন যেকোনো কার্ড দিয়ে সহজে পুরো প্লেটে সিলিকন লাগানো সম্ভব হয়। এবার সিলিকনটি লাগিয়ে তাড়াতাড়ি করে ঝুট কাপড় দিয়ে ডাবার বানিয়ে প্লেট-লিথোগ্রাফির অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে মুছতে হবে— যেন পাতলা আবরণ হিসেবে প্লেটে লেগে থাকে। ড্রায়ারটি দিয়ে হিট করে সিলিকনটি শুকিয়ে ফিক্স করতে হবে। না হলে এক রাত বিশ্রাম দিতে হবে। এই দ্রবণটি দ্রুত শুকিয়ে যায় বলে অন্য একটি বোতল ব্যবহার করতে হবে দ্বিতীয়বার ব্যবহার করার জন্য। কখনো কখনো আরেকবার সিলিকন লাগিয়ে ড্রায়ার দিয়ে শুকালে প্রিন্টের সময় নন-ইমেজ অংশে একদম সাদা পরিতল পাওয়া সম্ভব। কারণ অনেক সময় নন-ইমেজ অংশ প্রিন্টে পুরোপুরি সাদা আসে না। তাই এ দ্বিতীয় উপায়টি অবলম্বন করা ভালো। তবে বোতলের গলানো সিলিকন শক্ত হয়ে গেলে টান দিয়ে তুলে ফেলে নতুন করে সিলিকনের তরলটি আবার তৈরি করে ব্যবহার করা উচিত। আরেকটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সাদা রঙের টুথপেস্ট (কোলগেট টুথপেস্ট) দিয়ে সিলিকন দ্রবীভূত হয়ে যায়। এখান থেকেও নতুন কিছু আবিষ্কার করা সম্ভব।

(গ) এখন পাঁচ মিনিট ড্রায়ার দিয়ে হিট করে শুকাতে হবে।

(ঘ) ঝুট কাপড়ের সাহায্যে মিথাইল সেলিসাইলেট (Methyl salicylate ep) দিয়ে ওয়াশ-আউট করতে হবে। এই তরলটি আসলে ইমেজ অংশ থেকে ইমেজকে উঠিয়ে পুনরায় রিসেনসিটিভ করে তোলে। তাই

বলা যায়, এই পর্যায়ে ইমেজকে পরিবর্তন করে পুনরায় আবার সিলিকন তরলটি লাগিয়ে অন্য ধরনের ইমেজ প্রিন্ট করা সম্ভব।

(ঙ) ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফিতে প্রিন্ট তৈরি করার পদ্ধতি:

(ঙ.১) প্রেস ইঙ্ক + ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট।

(ঙ.২) প্রেস ইঙ্ক+ট্যালকম পাউডার। তবে মনে রাখতে হবে যে, ট্যালকম পাউডার ব্যবহার করলে ভবিষ্যতে রং ফ্যাকাশে বা জ্বলে যেতে পারে।

(ঙ.৩) রাবার দিয়ে তৈরি ইঙ্কের মাধ্যমে সবচেয়ে ভালো প্রিন্ট হবে।

(চ) এবার উডকাট বা লিথোগ্রাফির রোলার দিয়ে রোলিং করে লিথোপ্রেস ও এচিং প্রেসে প্রিন্ট নেওয়া যেতে পারে। তবে মনে রাখা ভালো— এই রোলিং করার সময় যে বেডের ওপর রেখে রোলিং করা হয় বা হবে, সেটি সিলিকন তরলযুক্ত পাতলা প্রলেপ দেওয়া প্লাইবোর্ড পরিতল হলে রোলিংয়ের সময় বেডে কোনো ইঙ্ক লেগে যাবে না। এ রকম একটি বোর্ড সব সময়ের জন্য প্রস্তুত করে রাখালে পরবর্তী সময়েও ব্যবহার করতে পারবে। এই অংশ থেকে এটি মনে হচ্ছে যে, উড পরিতলেও ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি করা সম্ভব।

ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফিতে ইমেজকে ফটোকপি বা জেরক্স করে ট্রান্সফার করার পদ্ধতি

নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ফটোকপির ইমেজ ট্রান্সফার করা সম্ভব:

(১) বল গ্রেইন বা শিরীষ কাগজ দিয়ে ম্যানুয়ালি হাতে তৈরি প্লেট তৈরি করতে হবে।

(২) ঝুট কাপড় দিয়ে পুরো প্লেট জুড়ে মিথাইল সেলিসাইলেট (Methyl salicylate) লাগিয়ে দিতে হবে। একটি কাপড়ের ড্যাবার বানিয়ে ভালো করে গাম লাগানোর মতো করে মুছতে হবে।

(৩) ফটোকপিটি প্লেটের ওপর রেখে তার ওপর আরেকটি মিথাইল সেলিসাইলেটযুক্ত কাগজ রাখতে হবে। নিয়মকানুন অনুসরণ করে প্রিন্ট নিতে হবে।

৬.১৫.২ (খ) স্টোন লিথোগ্রাফিতে রিভার্স ও রি-রিভার্স পদ্ধতি

যেকোনো ইমেজের প্রিন্ট সঠিক উপায়ে নেওয়ার পর যদি পরবর্তী ইম্প্রেশনে সেই ইমেজের রিভার্স ইমেজ (বিপরীত খালি অংশের প্রিন্ট) প্রিন্ট নেওয়ার প্রয়োজন পড়লে তখন নিম্নলিখিত উপায়ে ইমেজের রিভার্স প্রিন্ট নেওয়া সম্ভব:

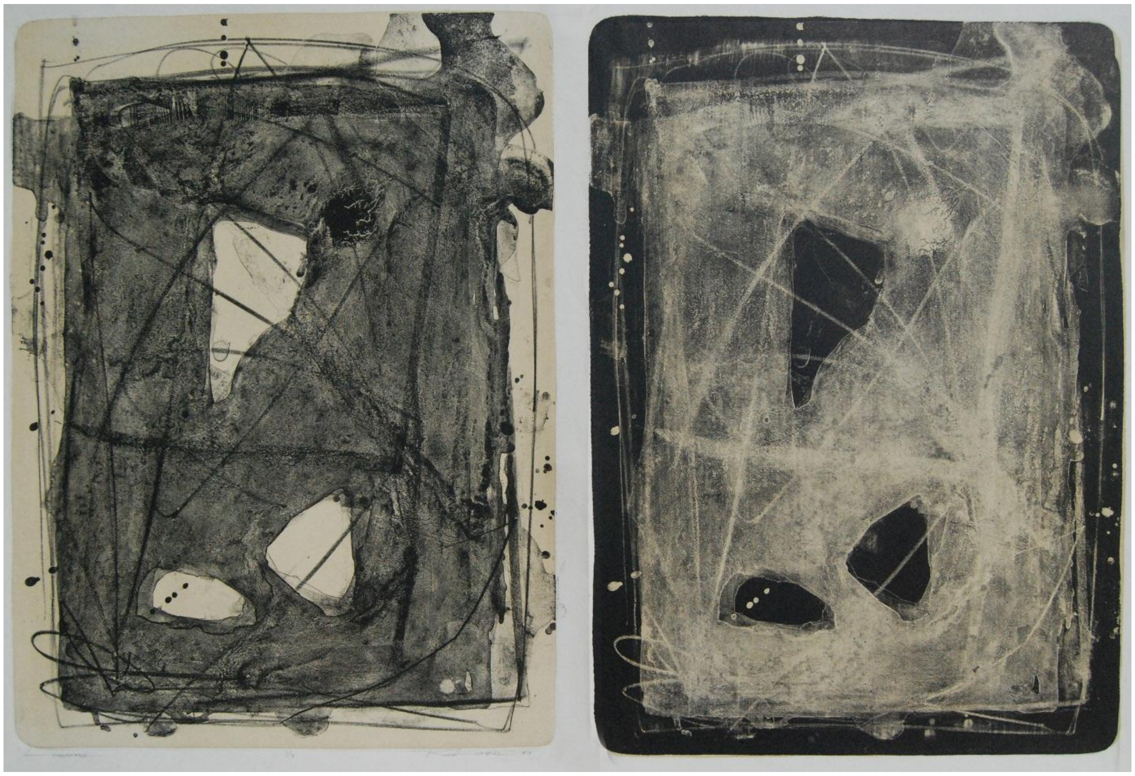

Plate. 6.18, Rokonuzzaman, Non-objective World 2, Revers method lithography on stone lithography, 2008. 46x60 cm.

(খ.১) প্রথমে ইমেজকে প্রিন্ট নেওয়ার মতো করে রোলিং করতে হবে। এখন প্রিন্ট না নিয়ে ভিসকোভিটা দিয়ে পানি ছিটিয়ে স্পঞ্জ করে নন-ইমেজ অংশ থেকে স্কাম বা ময়লা সরিয়ে ফেলতে হবে। এই কাজটি না করলে পরবর্তী সময়ে এই স্কামেরও রিভার্স হয়ে যাবে, যা ইমেজ হিসেবে ছিল না।

(খ.২) এবার ভালো করে হেয়ার ড্রায়ার বা ফ্যান ছেড়ে শুকাতে হবে।

(খ.৩) ফ্রেঞ্চ চক ইমেজ অংশের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে শুকনো জলরং ব্রাশের মাধ্যমে ভালোভাবে সমস্ত ইমেজ অংশে লাগিয়ে দিতে হবে।

(খ.৪) ভিসকোভিটা দিয়ে পুরো ইমেজকে পানির সাহায্যে ধুয়ে ফেলতে হবে।

(খ.৫) গ্রেইনিং বেডে নিয়ে যেতে হবে।

(খ.৬) নির্দিষ্ট পরিমাণ কাউন্টার এচিং বা রিসেনসিটিভ করতে হবে। অর্থাৎ অ্যালাম (ফিটকিরি) ও পানি মিশ্রিত দ্রবণের মাধ্যমে স্টোনকে রিসেনসিটিভ করে তুলতে হবে। স্টোনে এই দ্রবণটি দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে সাদা ফেনা বা বাবলের মতো বুদ্‌বুদ উঠতে থাকবে। হাত দিয়ে স্পর্শ করলে একটু পিচ্ছিল মনে হবে। অর্থাৎ দ্রবণটি এরাবিক গামকে নিউট্রাল অবস্থায় নিয়ে এসে গামের ডি-সেনসিটাইজ পাতলা

আবরণকে ধ্বংস করে, আবার রিসেনসিটাইজ অবস্থায় নিয়ে আসে। এভাবে পাঁচ থেকে ১০ মিনিট রেখে আঙুল দিয়ে আলতোভাবে ডলতে থাকলে, এবার খসখসে অনুভব করা যাবে। এবার পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে আরেকবার অ্যালাম পানি দিয়ে এই প্রক্রিয়াটি করলে আর কোনো রিস্ক থাকবে না।

(খ.৭) পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে স্টোনকে শুকাতে হবে।

(খ.৮) এই অবস্থায় দুটি উপায়ে রিভার্স প্রসেসের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়:

(খ.৮.১) শ্যালাক বা গালা ও স্পিরিটের একটি দ্রবণ তৈরি করা হয়। একটি চিকন লম্বা পরিষ্কার ঝুট কাপড় এই শ্যালাকে চুবিয়ে নিয়ে দুই হাত দিয়ে লম্বা করে টেনে পুরো স্টোন জুড়ে এক সাইড থেকে অন্য সাইড বরাবর পাতলা করে লাগাতে হবে। মোটা করে লাগালে প্রিন্টের সময় কোথাও মোটা কোথাও চিকন হয়ে ইমেজ আসবে। তাই একবারে যত পাতলা করে লাগানো যায়, তত ভালো।

(খ.৮.২) শ্যালাকের পরিবর্তে ল্যাকারও ব্যবহার করা যেতে পারে। স্টোনে ব্যবহার করতে গিয়ে কোনো কোনো সময় ইমেজের অংশ থেকে ল্যাকার উঠতে চায় না। তখন লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) দিয়ে ডলে ওঠাতে হয়। তবে মনে রাখতে হবে, ল্যাকারের ব্যবহার প্লেটে যতটা সাবলীল, স্টোনের ক্ষেত্রে তা অনেক সময় নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে। তাই শ্যালাক পদ্ধতিই স্টোনের জন্য সবচেয়ে ভালো।

(খ.৯) এবার শুকিয়ে নিতে হবে।

(খ.১০) গালা শুকানোর পর তারপিন দিয়ে ইমেজ তুলে ফেলতে হবে। তারপিনে অনেক সময় ভালো কাজ হয় না। তখন ঝুট কাপড়ে প্যাট্রল লাগিয়ে ডলতে থাকলে ইমেজ অংশ থেকে ইমেজ উঠে আসতে থাকবে। এখানে লক্ষ রাখতে হবে যে, ফ্রেঞ্চ চক লাগানোর (৩ নম্বর প্রসেসের পর পরই), অর্থাৎ ইঙ্ক রোলিং করার পর যত তাড়াতাড়ি এই পদ্ধতিতে যাওয়া যায়, ততই ভালো। কারণ ইঙ্ক শুকিয়ে গেলে গালা লাগানোর পর তারপিনটাইন বা প্যাট্রল দিয়ে ইমেজ তুলতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই খুব কষ্ট হয়। তবে এ ক্ষেত্রে প্যাট্রল ব্যবহার করা সবচেয়ে নিরাপদ।

(খ.১১) এখন ইমেজ অংশকে নাইট্রিক এসিড এবং এরাবিক গামের দ্রবণ দিয়ে মধ্যম ধরনের এচিং করে ওলিও মেঙ্গানিট অফ লাইমকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

(খ.১২) এবার পরিষ্কার এরাবিক গামিং করলে ইমেজ অংশে গাম ঢুকে যাবে।

(খ.১৩) শুকানোর পর ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি দিয়ে রোলিং করলে শ্যালাক বা গালার অংশই ইঙ্ক ধারণ করবে।

(খ.১৪) রেজিস্ট্রেশন অনুসরণ করে প্রিন্ট নিলে পূর্ববর্তী ইম্প্রেশনের রিভার্স ইমেজ প্রিন্ট হয়ে আসবে।

৬.১৫.৩ (গ) স্টোন লিথোগ্রাফিতে রি-রিভার্স পদ্ধতি

এই রিভার্স ইমেজকে আবার পূর্বের ইমেজে ফিরিয়ে নেওয়ার পদ্ধতিকেই রি-রিভার্স পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে। নিম্নলিখিত উপায়ে রিভার্স অবস্থা থেকে ইমেজ তার পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে আসতে পারে:

Re-revers image 17x5 cm.

Revers image 17x5 cm.

Plate. 6.19, Rokonuzzaman, Non-objective World-20, Re- Revers method lithography on stone lithography, 2017. 17x5 cm.

(গ.১) রিভার্স ইমেজের প্রিন্ট নেওয়ার পর ফাইনাল প্রিন্ট নেওয়ার মতো করে রোলিং করতে হবে।

(গ.২) এখন প্রিন্ট না নিয়ে ভিসকোভিটা দিয়ে পানি ছিটিয়ে স্পঞ্জ করে নন-ইমেজ অংশ থেকে স্কাম বা ময়লা সরিয়ে ফেলতে হবে।

(গ.৩) এবার ভালো করে হেয়ার ড্রায়ার বা ফ্যান ছেড়ে শুকাতে হবে।

(গ.৪) ফ্রেঞ্চ চক ইমেজ অংশের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে শুকনো জলরং ব্রাশের মাধ্যমে ভালোভাবে সমস্ত স্টোনে লাগিয়ে দিতে হবে।

(গ.৫) ভিসকোভিটা দিয়ে পুরো ইমেজকে পানির সাহায্যে ধুয়ে ফেলতে হবে।

(গ.৬) গ্রেইনিং বেড়ে নিয়ে যেতে হবে।

(গ.৭) নির্দিষ্ট পরিমাণ কাউন্টার এচিং বা রিসেনসিটিভ করতে হবে। অর্থাৎ অ্যালাম (ফিটকিরি) ও পানি মিশ্রিত দ্রবণের মাধ্যমে স্টোনকে রিসেনসিটিভ করে তুলতে হবে।

(গ.৮) পুরো স্টোনকে ব্ল্যাক-রোলিং করে ফ্লাট ব্ল্যাক কালার করতে হবে।

(গ.৯) এবার স্পিরিট দিয়ে ডলতে থাকলে গালার অংশ থেকে গালা ও কালি উঠে আসবে।

(গ.১০) গালা উঠে যাওয়ার পর সেই অংশকে এচিং করে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার গামিং করতে হবে।

(গ.১১) ওয়াশ-আউট করে প্রিন্ট নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবেই রি-রিভার্স ইমেজ সৃষ্টির মধ্য দিয় প্রথম ইমেজে ফেরত যাওয়া সম্ভব।

৬.১৫.৪ (ঘ) ফটো লিথোগ্রাফি

ফটো লিথোগ্রাফি কয়েকভাবে করা যেতে পারে:

(ঘ.১) বাজারের প্রেসগুলো থেকে সংগৃহীত অফসেট প্লেটে সরাসরি ফটো সেনসিটিভ ইমালশন লাগিয়ে ফটো ইমেজ তৈরি করা।

(ঘ.২) গ্রাইন্ডিং মেশিনে গ্রেইন করা এবং ম্যানুয়ালি ইমালশন তৈরি করে প্লেটে লাগিয়ে কাজ করা।

(ঘ.১) প্রেস থেকে প্লেটে সরাসরি ফটো সেনসিটিভ ইমালশন লাগানো পদ্ধতি

(ঘ.১.১) প্রেস থেকে প্লেটে সরাসরি ফটো সেনসিটিভ ইমালশন লাগিয়ে ডার্করুম থেকে প্যাকেট করে নিয়ে আসতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, কোনোরূপ আলো যেন ঢুকে না যায়।

(ঘ.১.২) এবার যেকোনো ইমেজের নেগেটিভ নিয়ে একটি কাচের ওপর স্কচটেপ দিয়ে আটকিয়ে দিতে হবে। ডার্করুমে নিয়ে প্লেটটি বের করে তার ওপর কাচটি রাখতে হবে।

(ঘ.১.৩) এখন প্লেটের নিচে সমান সাইজের আরেকটি প্লেট দিয়ে চেপে ধরে চারদিকে চারটি বোর্ড ক্লিপ দিয়ে আটকে দিতে হবে। এবার ইমেজসহ কাচটিকে উল্টো করে ধরে ডার্করুম থেকে তাড়াতাড়ি বের

হয়ে রোদে নিয়ে রোদের দিকে মুখ করে এক মিনিট এক্সপোজ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, বেশিক্ষণ এক্সপোজ করলে ইমেজ জ্বলে যাবে। আর সূর্য যে অ্যাঙ্গেলে আলো দিচ্ছে, সে অ্যাঙ্গেলে এক্সপোজ করতে হবে। অল্প আলো থাকলে দুই-তিন মিনিট এক্সপোজ করা হয়।

(ঘ.১.৪) এবার রুমে নিয়ে গিয়ে একটি ট্রেতে বাজার থেকে ক্রয় করা ডেভেলপারের মধ্যে রেখে ট্রেটিকে হাত দিয়ে দোলালে ইমেজটি ধীরে ধীরে দেখতে পাওয়া যাবে। এ সময় অবশ্যই হ্যান্ড গ্লাভস পরে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, অতিরিক্ত সময় ডেভেলপারের মধ্যে প্লেট থাকলে ইমেজ সাদা হয়ে যাবে। তাই কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পানি দিয়ে প্লেটটি ধুয়ে ফেলতে হবে।

(ঘ.১.৫) অনেক সময় দেখা যায়, ইমেজের বাইরে কিছু অপ্রয়োজনীয় ইমেজ চলে আসে। সাবধানে তুলা দিয়ে ডেভেলপারের মাধ্যমে সেগুলোকে ডিলিট করে দিতে হবে। ডেভেলপার স্ট্রং থাকে বলে পানির সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা ভালো। এই প্রক্রিয়ায় কাজ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে, ডেভেলপার যেন কোনো অবস্থাতেই ইমেজ অংশের ভেতরে ঢুকতে না পারে। ঢুকে গেলে ইমেজকে ডিলিট করে ফেলবে। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলতে হবে।

(ঘ.১.৬) এখন এরাবিক গামিং করে প্লেটটিকে শুকাতে হবে। গামিংটি ঝুট কাপড় দিয়ে করা ভালো। তা না হলে ভিসকোভিটার আঁচড়ের দাগ প্রিন্টে চলে আসে।

(ঘ.১.৭) এবার ভিসকোভিটা দিয়ে পানির সাহায্যে স্পঞ্জ করে রোলিং করে প্রিন্ট নিতে হবে। প্রিন্ট নেওয়ার সময় অনেক সময় ইমেজের বাইরে অপ্রয়োজনীয় ইমেজ চলে আসতে পারে। সেটা ডিলিটার বা ডেভেলপার দিয়ে সাবধানে তুলির সাহায্যে ডিলিট করার সময় পানি দিয়ে ধুয়ে গামিং করে শুকিয়ে রোলিং করে প্রিন্টিংয়ের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

(ঘ.১.৮) প্লেট সংরক্ষণ

(ঘ.১.৮.১) প্রিন্ট নেওয়া শেষ হলে ফ্রেশ গামিং করতে হবে। গামিংটা বাফিং করে অর্থাৎ ঝুট কাপড় দিয়ে করলে ভালো হয়। কারণ ভিসকোভিটা দিয়ে করলে ওয়াশ-আউটের সময় আঁচড় অনুযায়ী ওয়াশ-আউট হবে।

(ঘ. ১.৮.২) ওয়াশ-আউট করার পরও দেখা যাবে পুরো প্লেটে কালারের আভা লেগে আছে। এবার ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি দিয়ে স্পঞ্জ করলে রঙের আভা চলে যাবে।

(ঘ. ১.৮.৩) ঝুট কাপড়ের সাহায্যে এমনভাবে ফ্রেশ গামিং করতে হবে যেন লাইটের বিপরীতে দেখলে কোনো এরাবিক গামের আঁচড় দেখা না যায়। এভাবে প্লেটটিকে সংরক্ষণ করে অনেক দিন পর আবার প্রিন্ট নেওয়া যাবে। তবে প্রিন্ট নেওয়ার পূর্বে আবার ফ্রেশ গামিং করে রোলিং করা ভালা।

(ঘ.২) গ্রাইন্ডিং মেশিনে গ্রেইন করা এবং ম্যানুয়ালি ইমালশন তৈরি করে প্লেটে লাগিয়ে কাজ করার পদ্ধতি

যে ইমালশনটি ম্যানুয়াল ফটো লিথোগ্রাফির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় বাংলাদেশের বাজারে এটি ‘কোটিন’ নামে পরিচিত। কোটিনটি পানির সাহায্যে বানানো হলেও পানিই এর শত্রুতে পরিণত হয়।

কোটিন তিন রকম করে তৈরি করা হয়:

(ক) মোটা কোটিন

(খ) মিডিয়াম কোটিন

(গ) পাতলা কোটিন।

মোটা ও পাতলা বোঝার উপায় হচ্ছে এর ঘনত্ব, যেমনটা এরাবিক গামের দ্রবণ ঘন বা পাতলা তা বোঝা যায়। তবে ক্রিয়েটিভ কাজের জন্য মিডিয়াম ও পাতলা কোটিন ব্যবহার করা উচিত।

ম্যানুয়ালি কোটিনটি তৈরি করার জন্য কয়েকটি উপাদান প্রয়োজন

(১) বাইক্রোমেট: রোদ হলো বাইক্রোমেটের শত্রু। এটিকে সবসময় ঢেকে অন্ধকার স্থানে রাখতে হয়। রংটি দেখতে ফ্লোরোসেন্ট কমলা ধরনের হয়।

(২) লাইকার (অ্যামোঃ) গ্যাস: দুই–তিন ফোঁটা দিলে ইমালশনটি শক্ত হবে এবং দ্রুত শুকাবে।

(৩) এরাবিক গাম (ডাস্ট এরাবিক গাম)।

অন্য আরো কিছু কেমিক্যাল কাজ করার সময় প্রয়োজন হবে:

(১) লিকুইড ক্যালসিয়াম: এটি পানি দিয়ে গোলাতে হয়।

(২) ল্যাট্রিক (স্পিরিটের মতো): লেখা জাতীয় ইমেজকে পরিষ্কার করে।

(৩) আয়রন: (তালমিসরি বা সন্ধব লবণের মতো) কাজ শেষ হলে লেখার ওপর দিলে লেখাটার কোনো সমস্যা হবে না। এই পর্বে আয়রন ও ক্যালসিয়াম (দেখতে সাগু দানার মতো) (আয়রন + ক্যালসিয়ামের আলাদা মিশ্রণ) মিশ্রণ না দিলে লেখাটি দেখা যাবে না।

(৪) বাংলা কালি (হুগলি কালি ইত্যাদি)

(৫) চক পাউডার (ফ্রেঞ্চ চক)

(৬) কেরোসিন

(৭) দুটি সমান সাইজের কাচ এক্সপোজ করার জন্য দরকার হবে

(৮) নেগেটিভ/এক্সপোজ করার শিট।

কোটিন প্রস্তুতকরণ: (কোটিনটির স্থায়িত্বকাল ১−১.৫ মাস বা তারও বেশি।)

(১) প্রথমে এরাবিক গাম ২৫০ গ্রাম + ৫০০ গ্রাম পানি দিয়ে হাতের সাহায্যে কচলে কচলে গোলাতে হবে। ২৫০ গ্রাম এরাবিক গাম গোলানো হলো।

(২) গামের দ্রবণটি মার্কিন কাপড় দিয়ে কয়েকবার এমনভাবে ছেকে নিতে হবে, যেন এর ভেতর কোনো দানা না থাকে। দানা থাকলে প্লেটে কোটিনটি মারার সময় সমস্যা সৃষ্টি করবে।

(৩) এবার এই দ্রবণের মধ্যে দুই চা চামচ বাইক্রোমেট দিয়ে ভালো করে মিক্স করতে হবে। শরবত বানানোর মতো করে গ্লাস থেকে অন্য গ্লাসে ঢেলে বারবার এ প্রক্রিয়াটির মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

(৪) এখন ২−৮ ফোঁটা লাইকার গ্যাস দিয়ে পূর্বের প্রক্রিয়ার মতো শরবত বানানোর মতো করে এক গ্লাস থেকে অন্য গ্লাসে ঢেলে মিক্স করতে হবে।

(ঘ.৩) কাজ করা এবং সতর্ক থাকা

(১) প্লেটে ঢালার পূর্বে দেখতে হবে যেন কোটিনের ওপর কোনো ফেনা না থাকে। ফেনা থাকলে তা আগে ফেলে দিতে হবে।

(২) কয়েকবার ছেকে নেওয়ার পর প্লেটে ঢালতে হয়।

(৩) প্লেটে দেওয়ার পর প্লেটটি শুকিয়ে নিতে হবে হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক্সপোজ করতে হবে।

(৪) ১/২/৩ মিনিট এক্সপোজ করতে হবে।

(৫) এবার হ্যান্ডগ্লাভস পরে [ক্যালসিয়ামটা (দুই পাউন্ড বা প্রায় ৪৮০ গ্রাম) (ক্যালসিয়াম + ৪৮০ মি.লি. পানি + ৮০ মি.লি. ল্যাট্রিক দিয়ে)] একটি দ্রবণ তৈরি করে হাত দিয়ে কম্বলের সাহায্যে ডলতে হবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত ইমেজটা পরিষ্কার দেখা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত ডলতে হবে।

(৬) এখন শুকানোর আগেই [উপরোক্ত এই দ্রবণটি গ্লাসে অল্প পরিমাণে ঢেলে তার সঙ্গে খুবই অল্প পরিমাণ আয়রন + ক্যালসিয়াম মিশিয়ে আলাদা করে আরেকটি দ্রবণ তৈরি করে] মিশ্রণটি দিয়ে

অনুরূপভাবে হাত দিয়ে কম্বলের সাহায্যে ডলতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, কম্বলে যেন বালু না থাকে। তাহলে প্লেটে আঁচড় (স্ক্র্যাচ) পড়ে যাবে।

(৭) এবার ফ্রেশ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে রাখতে হবে।

(৮) ইমেজের চারপাশে যদি ময়লা থাকে তাহলে কোটিন দিয়ে মুছে ফেলা যাবে।

(৯) এখন ল্যাকার লাগিয়ে হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে শুকাতে হবে।

(১০) এখন বাংলা কালি + কেরোসিন দিয়ে বিটুমিনের মতো একটি দ্রবণ তৈরি করে কম্বল দিয়ে লাগাতে হবে। অথবা এর বিকল্প হিসেবে (বিটুমিন + তারপিনের) দ্রবণ দিয়েও পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে, লিথোগ্রাফি প্রক্রিয়াতেও ব্যবহৃত হয়েছে।

(১১) এরপর ভেজা থাকতে থাকতে চক পাউডার হাত দিয়ে লাগাতে হবে। তারপর সালফার + সমপরিমাণ পানি প্লেটে দিয়ে হ্যান্ডগ্লাভস পরে নিয়ে ব্রাশ দিয়ে ঘষে ডলে তুলতে হবে।

(১২) ফ্রেশ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

(১৩) এখন রোলারের সাহায্যে রোল করে প্রিন্ট নিতে হবে।

৬.১৬ লিথোগ্রাফি থেকে উদ্ভূত বিশেষ ধরনের মাধ্যম

লিথোগ্রাফি থেকে অনেক ধরনের নতুন মাধ্যমের জন্ম হয়েছে। যেগুলো শুধু শিল্পীর অভিব্যক্তায়নের মাধ্যম হিসেবেই নয়, ভবিষ্যতে নিজস্ব শিল্পভাষা হওয়ার দাবি নিয়ে উপস্থাপিত হবে। সেগুলো হলোঃ

(ক) গাম প্রিন্ট

(খ) ওয়াটার বেইজ অয়েলি মিডিয়াম

(গ) সায়ানোটাইপ (Cyanotype)

৬.১৬.১ (ক) গাম প্রিন্ট

গাম প্রিন্ট করার পদ্ধতিটি নিম্নরূপে সম্পন্ন করা যেতে পারেঃ

সূত্রঃ এরাবিক গাম + ডাইক্রোমেট দ্রবণ + কালার (পিগমেন্ট, পোস্টার কালার)

কয়েকটি পদক্ষেপ অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে হবেঃ

(১) কাগজকে প্রিন্টের জন্য উপযোগী করা (পেপার সাইজিং)।

(২) কাগজে জিলাটিন দ্রবণ লাগানো।

(৩) গাম, ড্রাইক্রোমেট ও কালার মিশ্রিত দ্রবণ লাগানো।

(৪) এক্সপোজ করা।

(৫) পানিতে ওয়াশ করা।

প্রথমে কয়েকটি দ্রবণ প্রস্তুত করতে হবে

(ক) এরাবিক গামের একটি দ্রবণ তৈরি করতে হবে।

(খ) ডাইক্রোমেট দ্রবণ তৈরি করতে হবে। সাধারণত অ্যামোনিয়াম বা পটাসিয়ামের দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

(গ) কালার (পোস্টার কালার/ওয়াটার কালার)। ৫ মি.লি. এরাবিক গাম দ্রবণ + কালারসহ ডাইক্রোমেট দ্রবণ।

(ঘ) জিলাটিন দ্রবণ তৈরি।

(ক) এরাবিক গামের একটি দ্রবণ তৈরি

(ক.১) ১০০ গ্রাম এরাবিক গাম বা গাম একাশিয়ার সঙ্গে ১০০ মি.লি. পানি (ডিস্টিল ওয়াটার) পানি মিশিয়ে একটি দ্রবণ তৈরি করতে হবে।

(খ) ডাইক্রোমেট দ্রবণ তৈরি

(খ.১) আরেকটি পাত্রে ৩০ গ্রাম পটাসিয়াম ডাইক্রোমেটের সঙ্গে ৯০ মি.লি. পানি মিশিয়ে একটি দবণ তৈরি করতে হবে।

(খ.২) ২৯% অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেটের সঙ্গে ১০০ মি.লি. পানি মিশিয়ে আরেকটি দ্রবণ তৈরি করতে হবে।

(খ.৩) ১৩% বা ১৩ গ্রাম পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট + ১০ মি.লি. গরম পানি মিশ্রিত দ্রবণ।

(গ) কালার (পোস্টার কালার/ওয়াটার কালার)

৫ মি.লি. এরাবিক গাম দ্রবণ + কালারসহ ডাইক্রোমেট দ্রবণ। প্রাথমিকভাবে চর্চার জন্য ক্যাডমিয়াম ইয়েলো, কোবাল্ট ব্লু, আল্ট্রা মেরিন ব্লু, আর্থ পিগমেন্ট (রঙিন মাটির গুঁড়া), ল্যাম্প ব্ল্যাক, প্রুসিয়ান ব্লুর সঙ্গে বার্ন্ট সিয়ানার মিশ্রণ ব্যবহৃত হতে পারে।

(ঘ) জিলাটিন দ্রবণ তৈরিঃ ২০ মি.লি. জিলাটিন + ২০০ মি.লি. পানি।

কাগজকে প্রিন্টের জন্য উপযোগী করা (পেপার সাইজিং)

(১) একটি পেপার ভেজানোর ট্রেতে ৩৬০ জি.এস.এম ধরনের মোটা কাগজ নিয়ে পানিতে ভেজাতে হবে ২৫ মিনিট।

(২) কাগজটিকে উঠিয়ে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

(৩) কাগজ শুকানোর পর (এচিং করার সময় কাগজ যেমন করে শুকানো হয় ঠিক তেমন করে শুকানো প্রয়োজন) জিলাটিন ও পানি মিশ্রিত গ্লু বা আঠা জলরঙের ব্রাশ দিয়ে কাগজের এপিঠ-ওপিঠ লাগাতে হবে (অনেকটা ক্যানভাসে কোড দেওয়ার মতো করে)। পরে এই জিলাটিনের ওপরই কালারকে ধারণ করানো হয়।

(৪) এবার ডার্করুমে গিয়ে উপরোক্ত ক, খ, গ নম্বর সমন্বিত দ্রবণটি ব্রাশের সাহায্যে লাগাতে হবে।

(৫) হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে শুকাতে হবে।

(৬) এখন নেগেটিভ দিয়ে এক্সপোজ করতে হবে। সূর্যের আলোতে এক্সপোজ করলে সর্বোচ্চ চার মিনিট এক্সপোজ করা যাবে। আর ইউ.ভি লাইটে এক্সপোজ করার ক্ষেত্রে আট থেকে ১০ মিনিট এক্সপোজ করা যায়।

(৭) এবার পানিতে খুব আলতোভাবে ধুতে হবে। ট্রেটিকে নাড়িয়ে বা নরম ব্রাশ দিয়ে আলতোভাবে নাড়িয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। তাহলে ইমেজ অংশ থেকে কালার উঠে আসবে। অর্থাৎ নেগেটিভের রিভার্স ইমেজ প্রিন্ট হিসেবে পাওয়া যাবে।

(৮) প্রিন্টটিকে শুকাতে হবে।

গাম প্রিন্টে কাগজে একাধিক ইম্প্রেশনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, একই কাগজে একাধিক ইম্প্রেশনে যাওয়ার জন্য দুটি ইম্প্রেশনের পর আবার একবার জিলাটিন দ্রবণ কাগজে লাগিয়ে নিলে সেই কাগজের ইমেজ ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৬.১৬.২ (খ) ওয়াটার বেইজ অয়েলি মিডিয়াম

তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী (১৯৯৭ সাল) থাকা অবস্থা থেকে শেখ মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান (বর্তমান গবেষক) জলরং চর্চার সময় এর মধ্যে তুষ মিশিয়ে ওয়াশ দেওয়ার চেষ্টা করতেন। তুষ দিয়ে যারা লিথোগ্রাফি

করেন তারা জানেন, পাথরে বা পানিতে এই তুষ কী পরিমাণ দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করে। একে আয়ত্তে আনা যে কতটা কষ্টসাধ্য বিষয়, সে বিষয়টি না বললেই নয়। তাকে আবার জলরঙের মতো কঠিন মাধ্যমে ব্যবহারের দুঃসাহস সম্ভবত খুব কম মানুষই করেছেন। সে কাজটি করতে গিয়ে তিনি সাফল্যব্যঞ্জক দিকনির্দেশনা পেলেন। তিনি জলরঙে অ্যাকুয়াটিন্টের ভেলভিটি ইফেক্ট আনতে চাইতেন। সেটি এই মাধ্যমে আনা দুষ্কর বলে এর সঙ্গে তুষ মেশাতেন। এরপর তিনি শুধু তুষ দিয়ে সাদা-কালো জলরং করা আরম্ভ করলেন। সেইসঙ্গে ভেলভিটি ইফেক্টটিও চলে এলো। সফলভাবে স্বচ্ছ (ট্রান্সপারেন্ট) ও অস্বচ্ছ (ওপেক) এই উভয় গুণের সমন্বয়ে ইমেজ তৈরি করতে পারলেন। এরপর ২০১১ সালের দিকে তুষের সঙ্গে পোস্টার কালার বা জলরং মিশিয়ে সফল হলেন। যেহেতু এর পিগমেন্ট হলো অয়েল বেইজ কালার এবং পানিতে দ্রবীভূত হয়, সে কারণে তিনি এ মাধ্যমটির নাম রাখলেন 'ওয়াটার বেইজ অয়েলি মিডিয়াম'। তখন থেকে তিনি তার চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। এই মাধ্যমটি ইংলিশ ওয়াটার কালার মাধ্যম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। একমাত্র চর্চাকারী হিসেবে নিজস্ব কতগুলো কলাকৌশল তিনি সৃষ্টি করেছেন। এর সুবিধা-অসুবিধাগুলো নিম্নে লেখার প্রয়াস পেয়েছেন।

মাধ্যমটি ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাজনক দিক

(১) এই মাধ্যমে পানি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে মেশাতে হবে। জলরঙে যেমন ভারী ওয়াশের ওপর পাতলা ওয়াশ অনেক সময় ইমেজকে ক্ষতি করে, এ মাধ্যমে তেমনটি ঘটে না। তবে একটি ওয়াশ না শুকানো পর্যন্ত অন্য ওয়াশ আরম্ভ করা সাধারণত উচিত নয়।

(২) কোন ধরনের বিষয়বস্তু নিলে এই মাধ্যমে কাজ করতে সুবিধা হয় তা আবিষ্কার করা বা বুঝতে পারা। যেমন: ট্রান্সপারেন্ট এবং ফ্লাট ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে অঙ্কন করতে গেলে সেই ফ্লাট পরিতলে অসম্ভব সুন্দর ভেলভেটি ইফেক্ট আনা অতি সহজেই সম্ভব। এক ওয়াশ শুকিয়ে যাওয়ার পর আর এক ওয়াশ একের পর এক দিলেই সেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে পৌঁছনো যায়।

(৩) ডিটেইল কাজ করার নির্দিষ্ট উপায় বের করা।

(৪) এই পদ্ধতিতে কাজ করতে গেলে তার ওপর উডকাট মাধ্যমে একটা ইম্প্রেশন নেওয়া যেতে পারে।

(৫) উডকাট মাধ্যমের ওপর সচরাচর জল বসে না। কিন্তু এই মাধ্যম দিয়ে উডকাটের অয়েল বেইজ মাধ্যমের উপর আবার ওয়াশ দেওয়া সম্ভব। সেইসাথে ডার্ক থেকে লাইটে এবং লাইট থেকে ডার্কে ওয়াশ দেয়া যায়, যার ফলাফল অন্যান্য জলরং মাধ্যম থেকে ভিন্ন।

(৬) এই মাধ্যমের সঙ্গে জলরং বা পোস্টার কালার মিশিয়েও আরেক ধরনের রঙিন চিত্র চর্চা করা সম্ভব।

(৭) রঙিন কালারে কাজ করার সময় লাইট থেকে ডার্কে এবং ডার্ক থেকে লাইটে আসা যায় অনায়াসে। তার ফলাফল ও অন্যান্য মাধ্যম থেকে ভিন্ন।

Plate : 6.20, Rokonuzzaman, Water base oily medium, 2010, 19x16 cm.

Plate : 6.21, Rokonuzzaman, Water base oily medium, 2010, 41x27 cm.

Plate: 6.22, Rokonuzzaman, Water base oily medium, 2010, 2010, 41x27 cm.

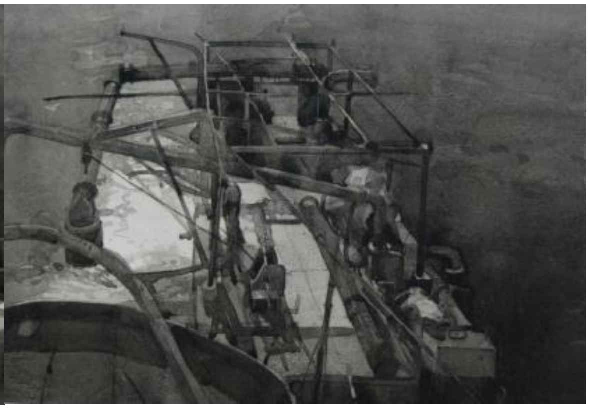

Plate : 6.23, Rokonuzzaman, Water base oily medium, 2010, 2010, 41x27 cm.

Plate. 6.24, Rokonuzzaman, Water base oily medium, 2010,

Plate. 6.25, Rokonuzzaman, Water base oily medium, (Study), 2010, 41x27 cm.

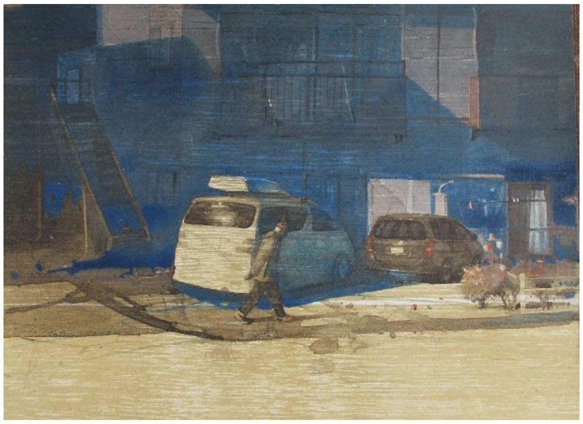

Plate. 6.27, Rokonuzzaman, Water base oily medium, 2014 (dark to light image is possible), 41x27 cm.

Plate. 6.28, Rokonuzzaman, Water base oily medium, 2014 (dark to light image is possible) 41x27 cm.

Plate. 6.29, Rokonuzzaman, Water base oily medium, 2014 (Tusch velbetty effect image is possible)

Plate, 6.30, Rokonuzzaman, Water base oily medium, 2014 (dar to light image is possible), 41x27 cm.

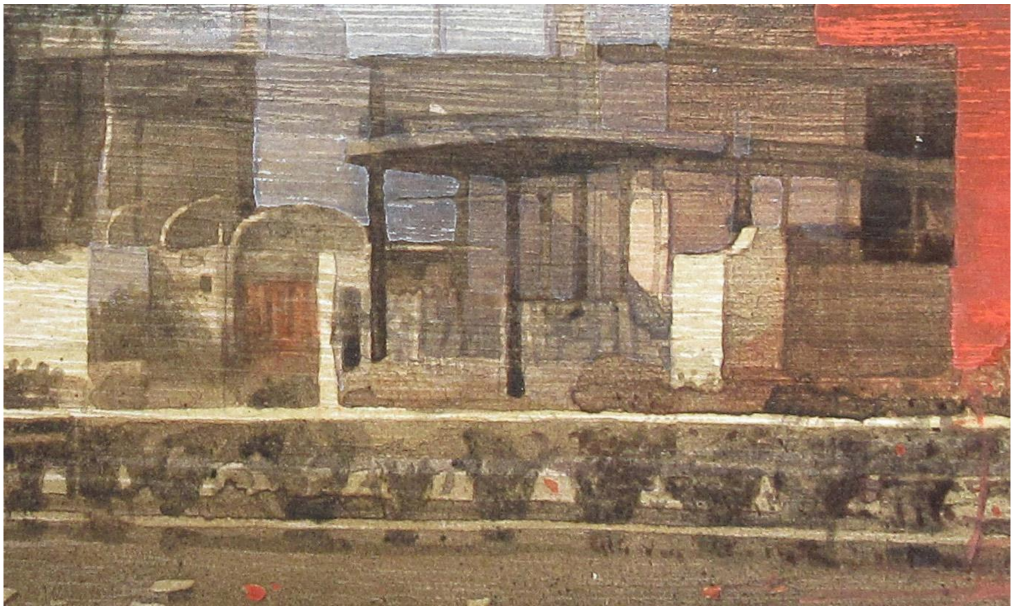

Plate. 6.31, Rokonuzzaman, Water base oily medium, woocut , 2014 (Tusch tranceparency and close up photogrphy)

ইঙ্ক প্রস্তুতকরণ থেকে চিত্রকর্ম রচনার পদ্ধতি

(ক) প্রথমে লিথোগ্রাফির তুষ পানি দিয়ে গোলাতে হবে। দুটি উপায়ে তুষ গোলানো যায়: (১) গরম পানি দিয়ে ঘন করে গোলাতে হবে। অথবা (২) একটি বাটিতে অল্প পানি নিয়ে আঙুল দিয়ে ডলে তুষ গোলানো সম্ভব।

(খ) রং বেশি পরিমাণে তুলিতে নিয়ে কাগজে আলতোভাবে ওয়াশ দিতে হবে।

(গ) ওয়াশ দেওয়ার পর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এই প্রথম ওয়াশকে শুকাতে দিতে হবে।

(ঘ) পরিমাণমতো শুকিয়ে গেলে এবার দ্বিতীয় ওয়াশ দিতে হবে এবং শুকাতে হবে।

(ঘ) এভাবে একের পর এক অনেকগুলো ওয়াশ দিয়ে অথবা অল্প কয়েক ওয়াশে কাজটি সম্পন্ন করা যায়।

৬.১৬.৩ (গ) সায়ানোটাইপ (Cyanotype)

১৮৪২ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ স্যার জন হার্সেল (Sir John Frederick William John Herschel, 1792-1871) সায়ানোটাইপ (Cyanotype) আবিষ্কার করেন। যেটা একধরনের ফটোগ্রাফিক প্রিন্টিং প্রসেসের মধ্য দিয়ে নীল রঙের প্রিন্ট বের হয়ে আসে। সাশ্রয়ী বলে বিংশ শতকে ইঞ্জিনিয়াররা তাদের ড্রইংয়ের কপি করার জন্য এটি ব্যবহার করতেন। এটিকে তারা ব্লুপ্রিন্ট (blueprints) বলে পরিচয় করিয়ে দেন। প্রসেসটিতে দুটি কেমিক্যাল ব্যবহার করা হতো: (১) ammonium iron(III) citrate এবং (২) potassium ferricyanide.

প্রসেস

(১) ২৫ গ্রাম ফেরিক অ্যামোনিয়াম সাইট্রেট (Ferric ammonium citrate) (গ্রিন)

(২) ১০ গ্রাম পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইড (Potassium Ferricyanide)

(৩) পানি (সম্ভব হলে ডিস্টিল্ড পানি ব্যবহার করা ভালো)

(ক) ঃ (খ) = ১ ঃ ১ = (গ)

(ক) দ্রবণ (ক) তৈরি করা হয়: ২৫ গ্রাম ফেরিক অ্যামোনিয়াম সাইট্রেটের (গ্রিন) সঙ্গে ১০০ মি.লি. পানি মেশাতে হবে।

(খ) দ্রবণ (খ) তৈরি করা হয়: ১০ গ্রাম পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইডের সঙ্গে ১০০ মি.লি. পানি মেশাতে হবে।

উদাহরণ: ১০ মি.লি. (ক) + ১০ মি.লি. (খ) = গ

এবার (গ) দ্রবণটি ডার্করুমে নিয়ে কাগজের ওপর লাগিয়ে যেকোনো ইমেজের নেগেটিভ বা ট্রেসিং পেপারে তৈরি ইমেজ কাগজটির ওপর রাখতে হবে। উপরে ও নিচে দুটি কাচ দিয়ে ক্লিপের সাহায্যে দিয়ে আটকে দিতে হবে। এবার এক্সপোজ করতে হবে নিচের যেকোনো একটি উপায়ে:

(১) সূর্যের আলোতে: ২০ মিনিট এক্সপোজ করতে হবে।

(২) ইউ.ভি লাইটে: ২৬ মিনিট এক্সপোজ করতে হবে।

এবার কলের নিচে বা ট্রেতে পানি রেখে আস্তে আস্তে নাড়তে থাকলে নীল অথবা ব্রাউন ধরনের প্রিন্ট বের হয়ে আসবে।

Plate. 6.32, সায়ানোটাইপ প্রিন্ট, সায়ানোটাইপ প্রিন্ট (ড্রইং), ১৯৩৬

লিথোগ্রাফির কিছু উপকরণ, করণ-কৌশল ও সমস্যা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

সিলিকন কার্বাইড

লিথোগ্রাফি স্টোনে আজকাল যে প্রধান শক্ত পদার্থগুলো (যেমন: কার্বোরেন্ডাম কণা) গ্রেইন করার জন্য ব্যবহৃত হয় তা হলো: সিলিকন কার্বাইড ও বালুকণা। স্টোনে সাধারণত তিন ধরনের গ্রেইন করা হয়: কোর্স, মিডিয়াম ও ফাইন গ্রেইন। কার্বোরেন্ডামের ১০০ গ্রিট, ১৮০ গ্রিট ও ২২০ গ্রিট— এই তিন ধরনের সাইজের কণা দিয়ে তিন ধরনের গ্রেইন করা হয়। তবে বাংলাদেশে বর্তমানে ৩২০ গ্রিটের সিলিকন কার্বাইডও পাওয়া যাচ্ছে। এই ১০০ গ্রিটের কণাটি (অপেক্ষাকৃত বড় কণা বলে) সাধারণত পূর্বের ইমেজকে তাড়াতাড়ি ঘষে তুলে ফেলতে ব্যবহৃত হয়। আনুপাতিক হারে ১৮০ গ্রিটকে ব্যবহার করে

কাজ করা যেতে পারে। ২২০ গ্রিটের অণু দিয়ে করা গ্রেইনিংটি প্রয়োজনের তুলনায় সফল ফলাফল বয়ে আনে। তবে এই ফাইন গ্রেইন করার সময় কোনোরূপ আঁচড় ছাড়া গ্রেইন করতে পারাটা খুবই কষ্টসাধ্য ও বিচক্ষণ কাজ বলে প্রতীয়মান। তাই ৩২০ গ্রিটের অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড পাউডার (চশমার কাচ ঘষার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে) দিয়ে ফাইন গ্রেইনটি করা হয়ে থাকে।

গাম

এরাবিক গাম ছাড়াও অনেক ধরনের গাম পৃথিবীতে রয়েছে। যেমনঃ Tragacanth, Cherry gum, Larch gum, Mesquite gum, Carboxymethyl cellulose (CMC), Dextrines, Alginates, Oxidized starches, Polyvinyl pyrolidone এবং Polyvinyl alcohol ইত্যাদি। তার মধ্যে বেশ কয়েক ধরনের গাম লিথোগ্রাফিতে কাজে লাগে। নিচে কয়েক ধরনের গাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলোঃ

এরাবিক গাম

এরাবিক গাম একাশিয়া গাছ থেকে নিচে পড়া শক্ত প্রকৃতির নন-ক্রিস্টালাইন কার্বোহাইড্রেট। একে ভারতে গদের আঠাও বলা হয় এবং খাবার লাড্ডুকে শক্ত করার জন্য অল্প পরিমাণে এরাবিক গাম বা গদের আঠা মেশানো হয়।[১৮৪] এরাবিক গামের এই একাশিয়া গাছ আফ্রিকা, আরব, সেনেগাল, মিশর, ইন্ডিয়া এবং সুদানের মাটিতে ভালো জন্মে। আজকাল অধিকতর এরাবিক গাম সুদান থেকেই আসে।[১৮৫] এটি সাধারণত পানিতে গলে যায় কিন্তু তারপিনটাইন বা অ্যালকোহলে দ্রবীভূত হয় না। এরাবিক গাম দ্রবণ হচ্ছে সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণের মিশ্রণ, যা এরাবিক এসিডে পরিণত হয়। এই দ্রবণটি স্বাদহীন, আম্বার কালার ও মিষ্টি গন্ধযুক্ত।[১৮৬] দ্রবণটি দু-এক দিন পর টক গন্ধযুক্ত হতে থাকে, ফলে এসিডিক হয়ে ওঠে। আরো দু-এক দিন পরে এর গন্ধ নাকে নেওয়া যায় না। তাই এ গামটির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কোনো কোনো প্রিন্টমেকার এই দ্রবণে কয়েক ফোঁটা কার্বোলিক এসিড যুক্ত করে সংরক্ষণ করেন। বাণিজ্যিকভাবে তৈরি ১৪ ডিগ্রি বাম সমৃদ্ধ মেসকুইট গামও (mesquite gum) এ প্রক্রিয়াতে খুব সুন্দর কাজ করে। গামটি অন্যান্য গামের তুলনায় কম চটচটে বা আঠালো (viscous)

---

[184] অশোক বিশ্বাস, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ২৬ জানুয়ারি, ২০১৭

[185] GaroZ. Antreasian and Clinton Adams, *The Tamarind Book of Lithography: Art & Techniques*, Los Angeles, June 8, 1970, p., p. 280

[186] Jules Heller, *Print making Today: The planographic process,* edition, p. 53

এবং দ্রুত শুকায়। ফলে চিকন, তীক্ষ্ণ ও কন্টুর লাইন অঙ্কন সহজ হয়। সেলুলোজ গামও ভালো কাজ করে থাকে।

এরাবিক গামকে কাউন্টার এচিং দ্রবণ দ্বারা মোছা বা রাসায়নিকভাবে দ্রবীভূত করে দূর করা যেতে পারে। তাতে গাম পুরোপুরি তার কার্যকারিতা হারায় না। আবার পিউমিক পাউডার (pumice powder) দিয়ে পলিশ করে অথবা ব্লেড দিয়ে স্ক্যাচ করেও এই গামকে মুছে ফেলা যেতে পারে।[১৮৭]

সেলুলোজ গাম

স্টোনে সেলুলোজ গাম গ্রহণযোগ্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু অজানা কারণেই এটি এরাবিক গামের থেকে কম সফল ভূমিকা পালন করে। বেসিক সেলুলোজ রিং কাঠামোর সাইড চেইনকে উন্নত করে কাবোক্সি মিথাইল সেলুলোজে পরিণত করে। যদিও বেসিক সেলুলোজ পানিতে দ্রবীভূত হয় না। সেলুলোজ গাম পাউডার বা তরল আকারে এসিডযুক্তভাবে পাওয়া যায়। [১৮৮]

হাইড্রো গাম এবং লোভিস গাম

হাইড্রো গাম একটি প্রাকৃতিক উপাদান, যা মেসকুইট গাছ থেকে উৎপন্ন হয়। ডি-সেনসিটাইজার হিসেবে এই গাম যখন অন্য দুটি গামের থেকে অপেক্ষাকৃত কম সফল, তখন সস্তা বলে অফসেট কারখানায় ফাউন্টেন সলিউশন (কাউন্টার এচিং করার দ্রবণ) হিসেবে এটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। এর পাতলা আবরণ তৈরি ও নন-ভিসকাস অবস্থাসম্পন্ন গুণাগুণের জন্য এটি চিকন লাইন সৃষ্টি করতে পারে। এয়ার ব্রাশের মাধ্যমেও এটি ব্যবহার করে তীক্ষ্ণ ডটস পাওয়া যেতে পারে।

লোভিস গাম পুরোপুরি কম ভিসকোসিটিসম্পন্ন সিনথেটিক উপাদান হিসেবে প্রস্তুত হয়ে অফসেট প্রিন্টিংয়ে ব্যবহার হয়ে থাকে।

এসিটিক এসিড (গ্লাসিয়াল)

বাতাসের উপস্থিতিতে কাঠকে হিট করে চোলাই করা (ডিস্টিল) একধরনের গ্যাসই হলো এসিটিক এসিড। এই নির্জল (এনহাইড্রাস) এসিটিক এসিড ১১৮.১ ডিগ্রিতে সিদ্ধ হয়ে ফুটন্ত তরলে পরিণত হয়। ১৬.৬ ডিগ্রিতে এটি বরফে পরিণত হয়। এ জন্য এই পিওর এসিটিক এসিডকে সাধারণত গ্লাসিয়াল

[187] GaroZ. Antreasian and Clinton Adams, *The Tamarind Book of Lithography: Art & Techniques*, Los Angeles, June 8, 1970, p., p. 280

[188] GaroZ. Antreasian and Clinton Adams, *The Tamarind Book of Lithography: Art & Techniques*, Los Angeles, June 8, 1970, p., p. 282

এসিটিক এসিড বলা হয়। পানি মিশ্রিত এসিটিক এসিড দ্রবণকে কাউন্টার এচিং বলা হয়। স্টোন ও প্লেট-লিথোগ্রাফিতে পরিতলকে পুনরায় সেনসিটিভ (রিসেনসিটিভ) করে তোলার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১৮৯]

ট্রেসিং করা

স্টোন ও প্লেট-লিথোগ্রাফিতে অনেক সময় ড্রইং করার পূর্বে মূল খসড়া থেকে ড্রইং ট্রেসিং করা হয়। সেই ট্রেসিং করার জন্য কার্বন পেপার, রেড অক্সাইড, ব্লু অক্সাইড ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। কার্বন পেপার ব্যবহার করলে প্রিন্টের সময় সেই লাইটটি চলে আসে বলে রেড অক্সাইড জাতীয় ডাস্ট বা গুঁড়ার কোনো একটি নিউজপ্রিন্টের এক পাশে ঝুট কাপড়ের সাহায্যে লাগিয়ে নিতে হয়। এরপর এই কাগজটি ঝাড়া দিয়ে অতিরিক্ত গুঁড়া ফেলে স্টোনের ওপর রেখে তার ওপর মূল ড্রইংয়ের কোনো কপি রেখে ট্রেসিং করা হয়। ফলে ইমেজকে টোন দিতে সুবিধা হয় এবং প্রিন্টের সময় অ্যান্টি-অক্সাইডের দাগ আসে না।

ক্রেয়ন

ক্রেয়ন তৈরির সাধারণ সূত্র হচ্ছে:[১৯০]

১) ৪ ভাগ মোম + ৬ ভাগ সাবান + ২ ভাগ ল্যাম্প ব্ল্যাক (চিমনির কালি)

২) ৪ ভাগ মোম + ৫ ভাগ সাবান + ৩ ভাগ ল্যাম্প ব্ল্যাক (চিমনির কালি) + ২ ভাগ ট্যালো + ৪ ভাগ গালা (shellac)-এ।

গ্লাসমার্কার:

ডায়মন্ডের চায়না মার্কার 'গ্রিজ পেনসিল' হিসেবে পরিচিত। পোরাস (porous) তল (যেমনঃ স্টোন), কাঠ কাপড়ের মতো সকল ধরনের পিচ্ছিল পরিতল, যেমন: গ্লেজ পটারি, গ্লাস, পলিশ স্টোন, প্লাস্টিক, মেটাল, রাবার ইত্যাদিতে অস্বচ্ছ (opaque) ভাবে বিভিন্ন রঙের এই পেনসিল দিয়ে অঙ্কন করা যায়, যা পানি প্রতিরোধ্য (ওয়াটার রেজিস্ট) এবং পিচ্ছিল বা অকোষী তল থেকে (non-porous finishes) তাড়াতাড়ি মুছে ফেলা যায়। পেনসিলটি নন-টক্সিক (non-toxic) মোম দিয়ে তৈরি ক্রেয়নের মতো; কিন্তু তার চেয়ে শক্ত।

---

[189] GaroZ. Antreasian and Clinton Adams, *'The Tamarind Book of Lithography: Art & Techniques'* New York, p. 283

[190] Jules Heller, *Todays Print making, The planographic process,* 2nd edition, New York, p. 51

Plate. 6.33, বাংলাদেশের বাজার থেকে সংগৃহীত গ্লাসমার্কার

Plate.6.34, Rokonuzzaman, Stone lithography, Lithographic tusch wash,

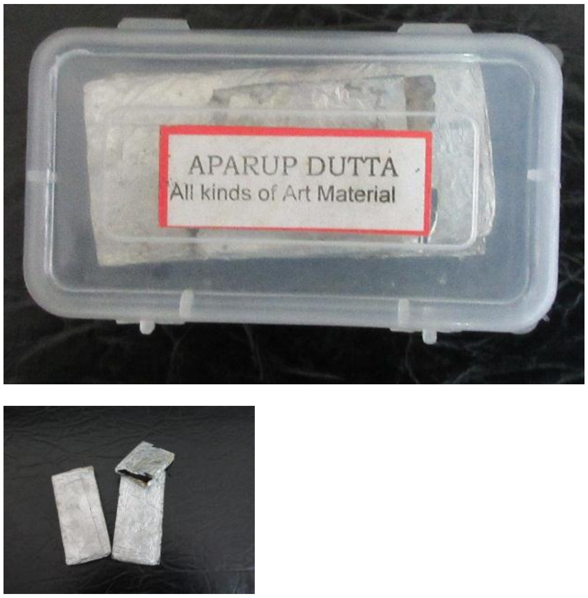

Plate.6.35, Softchoklate shape tusch.

তুষ

লিথোগ্রাফিক তুষ ক্রেয়নের মতো একধরনের উপাদান বা উপকরণ, যা গ্রিজকে ধারণ করে। কিন্তু এটিকে ব্রাশ বা কলমের মতো করে সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। ইন্ডিয়ান ইঙ্ক বা অন্য ওয়াশ পদ্ধতির মতো তুষ দিয়ে ফ্লাট, গাঢ় (রিচ) কালো লাইন সৃষ্টি করা যায়। এটিকে তরল (liquid tusch) ও নরম চকলেটের (stick tusch) আকারে পাওয়া যায়। তুষ ওয়াশের ড্রাই ব্রাশ ইফেক্টও সফলভাবে প্রিন্টে চলে আসে। কিছু শিল্পী এই তুষের ইফেক্টের জন্য স্টোনে মিহি গ্রেইন করে থাকেন। এই তরল তুষটি ব্যবহারের পূর্বে ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিতে হয়। পাতলা লিথোটিন, গ্যাসোলিন অথবা ডিস্টিল্ড পানির সঙ্গে তুষের মিশ্রণ ঘটিয়েও ইমেজ তৈরি করা সম্ভব। তুষের সঙ্গে নানা উপাদানের মিশ্রণে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ফল পাওয়া যায়। পাতলা না করে ঘন তরল তুষ সরাসরি ব্যবহার করে সলিড ব্ল্যাক সৃষ্টি করা

যায়। আবার বিটুমিন ও তারপিনটাইনের দ্রবণের সঙ্গে একে মিশিয়েও রিচ ব্ল্যাক প্রিন্টে আনা সম্ভব। ক্রেয়ন এবং তুষ একসঙ্গে ব্যবহার করেও ইমেজ তৈরি করা যায়।

লিথোটিন (Lithotine)

দ্য গ্রাফিক আর্টস টেকনিক্যাল ফাউন্ডেশন ১৯৩৩ সালে তারপিনটাইনের বদলে ব্যবহারের জন্য বিকল্প হিসেবে 'লিথোটিন' তৈরি করে, কারণ তারপিনটাইন স্কিনে একধরনের অস্বস্তিতা (ইরিটেশন) সৃষ্টি করে এবং শুষ্ক ফাটল (ক্র্যাক) সৃষ্টি করে। পাইন তেলের সঙ্গে অল্প পরিমাণ তিসির তেল (ক্যাস্টর অয়েল, castor oil) এবং তার সঙ্গে অনেক পরিমাণ ডিস্টিল পেট্রোলিয়াম (যেমনঃ বেনজিন বা মিনারেল স্পিরিট) দ্রবণের সঙ্গে এস্টার গাম (ester gum) মিশ্রিত দ্রবণই লিথোটিন নামে পরিচিত। পাইন তেল ও ডিস্টিল পেট্রোলিয়াম তাইপিনটাইনের মতো দ্রবীভূত করার ক্ষমতা রয়েছে এবং তিসির তেল ও এস্টার গাম আঠালো অবস্থায় অনুদ্বায়ী বস্তু হয়ে পড়ে থাকে, যখন দ্রবণটি উড়ে যেতে থাকে। এই পড়ে থাকা অবশিষ্টাংশটি পানিকে প্রতিহত করে বা পরিত্যাগ করে এবং তেলকে গ্রহণ করে এবং সেইসঙ্গে শুকিয়ে যায় না। সর্বোপরি লিথোটিনের সুপারিয়র ক্ষমতার জন্য সকল
লিথোগ্রাফি প্রক্রিয়াতে লিথোটিন ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে।[১৯১] শুধু লিথোটিন দিয়েও একটি পূর্ণ ইমেজ তৈরি করা যায়। তবে বাংলাদেশে শুরু থেকে তারপিনটাইন ব্যবহার করা হচ্ছে। এই তারপিনটাইনের সঙ্গে কেরোসিন তেল মিশে থাকে বলে প্রিন্টিংয়ে বেশ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। পরে বাজারে প্রাপ্ত অনেকগুলো তেলজাতীয় পদার্থ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। নিরীক্ষণে দেখা যায়, ২০০৪ সাল থেকে বর্তমান ২০১৬ সাল পর্যন্ত বার্জার থিনার সাফল্যজনক ফল দিয়ে আসছে।

বার্জার রবিয়াল্যাক থিনার-৬ (Berger Robbialac, Thinner T-6)

'বার্জার রবিয়াল্যাক থিনার টি-৬' অর্গানিক দ্রবণের একটি মিশ্রণ, যা রবিয়াল্যাক সিনথেটিক এনামেল, ঝিলিক সিনথেটিক এনামেল, JIE, BIE, সিবোর্ন এনামেল, মেরিন এনামেল, সাধারণ প্রাইমারসহ সকল অ্যালকিড রেজিনে তৈরি যেকোনো রং পাতলা করার কাজে ব্যবহার করা হয়। এই থিনার টি-৬ সঠিকভাবে ব্যবহার করলে রং প্রয়োগে ভালো ফল এবং দীর্ঘস্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়। সব ধরনের ব্যবহার্য যন্ত্রাংশ পরিষ্কার করতে এই থিনার টি-৬ অনন্য।[১৯২]

---

[191] GaroZ. Antreasian and Clinton Adams, *'The Tamarind Book of Lithography: Art & Techniques'* New York, p. 288

[192] বার্জার থিনারের বোতলের গায়ে লিখিত অংশ থেকে উপস্থাপিত

স্ক্র্যাচিং ও স্ক্র্যাপিং পদ্ধতি (Technique)

লিথোগ্রাফি মাধ্যমে মেশিনের ওপর থেকে একটি স্ক্র্যাপার টিমপ্যানের ওপর পরে চাপ দিয়ে কাঁচিয়ে নিয়ে পেপারে ইঙ্ককে প্রতিস্থাপন করে। এই প্রক্রিয়াকে স্ক্যাপিং প্রসেস বলা হয়। আর স্টোনে একটি কালোইমজে তৈরি কওে সেখান থেকে ব্লেডেন মাধ্যমে স্ক্র্যাচ করলে এক ধরণের লাইন প্রিন্টে পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়াটিকে স্ক্র্যাচিং প্রসেস বলা হয়।

স্টোন ও প্লেট-লিথোগ্রাফিতে ইমেজে অনেক সময় সাদা লাইন বা ফর্মের প্রয়োজন হয়। এই সাদা লাইন কয়েকটি পদ্ধতিতে সৃষ্টি করা যায়ঃ

Plate.6.36, Shanchita Biswas, Plate lithography, 2016, গাম দিয়ে তুলির সাহায্যে লাইন বা ফর্ম অঙ্কন পদ্ধতি।

Plate.6.37, Rokonuzzaman, Stone Lithography, Scraching process by razor blade. 2003,

(ক) এরাবিক গাম দিয়ে তুলির সাহায্যে লাইন বা ফর্ম অঙ্কন পদ্ধতি

একটি স্টোনে ইমেজ তৈরির পূর্বে তুলির সাহায্যে এরাবিক গাম দিয়ে কিছু লাইন অঙ্কন করা হলো। গামটি শুকিয়ে গেলে স্টোনে ব্ল্যাক রোলিং করে পুরো স্টোনকে কালো করে ফেলতে হবে। এবার ভিসকোভিটার সাহায্যে পানি দিয়ে আবার রোলিং করতে থাকলে, এরাবিক গামের স্থান থেকে ইঙ্ক রোলারে উঠে আসবে। তখন সাদা লাইনগুলো দেখতে পাওয়া যাবে। এখন সঠিক উপায়ে এচিং করে প্রিন্টের পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ধরণের পদ্ধতিকে গাম রেজিস্ট পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে। (চিত্র. ৬.৩৫)

(খ) স্টিলের নিডিল, রেজার ব্লেড বা হন্স চক (Scotch hones) দিয়ে স্ক্র্যাচিং পদ্ধতি (Scraching or scraping process)

অনেক সময় ইমেজ তৈরির পর ইমেজে কোথাও হাইলাইট বা মিডিল টোন সৃষ্টি করা প্রয়োজন হয়। তখন নিডিল বা ব্লেডের সাহায্যে স্ক্র্যাচ করে হাইলাইট বা মিডিল টোন বের করতে হবে। স্ক্র্যাচিংয়ের অন্য উপকরণগুলো হতে পারে স্যান্ড পেপার (শিরীষ কাগজ), স্টিল উল, তীক্ষ্ণ ছুরি ইত্যাদি। এবার প্রয়োজনমতো এচিং (মধ্যম ধরনের এচিং) করে সঠিক উপায়ে প্রিন্ট নিতে হবে। তবে এটা সবসময় মনে রাখতে হবে, খুব গভীর করে স্ক্র্যাচ করা ঠিক হবে না। গভীর করে স্ক্র্যাচ করলে এচিংয়ের সময় আরো গভীরতাসম্পন্ন লাইনে পরিণত হবে। ফলে পরবর্তী ইমেজ তৈরির পূর্বে গ্রেইন করার সময় এই পুরো তলটিই ঘষে ফেলে দিতে হবে, না হলে প্রিন্টের সময় এই লাইনটি সাদা অথবা কালো লাইন হয়ে প্রিন্ট হয়ে আসবে, যা কাম্য ছিল না। আবার কয়েক ধরনের হন্স চক পাওয়া যায়। যেমনঃ শক্ত, নরম ও মাঝারি ধরনের হন্স চক পাওয়া যায়। এই শক্ত চক দিয়ে ইমেজকে একেবারে ঘষে তুলে ফেলা যায়। অবার মাঝারি বা নরম ধরনের চক দিয়ে গাঢ় ইমেজকে ঘষে অপেক্ষাকৃত হালকা (মিডিল টোনে) ইমেজে পরিণত করা সম্ভব। এরপর একটু এচিং করে গামিং করে প্রিন্টিং প্রসেসের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। (চিত্র ৬.৩৬)

(গ) রিসেনসিটাইজিং বা কাউন্টার এচিং (resensitizing or counter etching)

স্টোনের ডি-সেনসিটিভিটিকে সরিয়ে (*To Reopen the Stone and Add Work*) দিয়ে সেনসিটিভি করে অবার ইমেজ তৈরি করার প্রক্রিয়াকে রিসেনসিটাইজিং বা কাউন্টার এচিং বলা হয়। কয়েকটি উপায়ে স্টোনকে পুনরায় সেনসিটিভ করে তোলা সম্ভবঃ

(ক) প্রথমে পুরো ইমেজ অংশে ফ্রেঞ্চ চক ছিটিয়ে দিতে হবে। ভিসকোভিটার সহায্যে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এবার এক (১) ভাগ গ্লাসিয়াল এসিটিক এসিড, ৬ থেকে ৩০ ভাগ পানির সঙ্গে মিশিয়ে পুরো স্টোনে এক থেকে দেড় মিনিট ছড়িয়ে দিয়ে রাখতে হবে। এখন পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে শুকাবার পর আবার ইমেজ তৈরি করতে পারা যাবে। তবে এই দ্রবণটি ব্যহারের সময় উপরোক্ত উপায়ে দুর্বল ও শক্তিশালী এ দুই ধরনের দ্রবণ বানিয়ে প্রয়োজন অনুসারে স্টোনকে রিসেনসিটিভ করে তোলা যায়।

(খ) ফিটকারি (পটাস অ্যালাম বা potassium aluminium alum) গুঁড়া করে একটি পরিষ্কার বোতলে পানির মধ্যে দিয়ে ঝাঁকিয়ে ঘণ্টাখানেক রেখে দিলে একটি দ্রবণ তৈরি হবে। ফ্রেঞ্চ দেওয়া ইমেজকে সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। এবার অ্যালাম ওয়াটার পুরো পাথরে ছড়িয়ে দিয়ে রাখলে

কিছুক্ষণের মধ্যে ফেনার মতো বুদ্‌বুদ উঠতে থাকবে। বোঝা যাচ্ছে যে এরাবিক গামের ডিসেনসিটাইজিং উপাদানকে উঠিয়ে ফেলে সেনসিটিভ করে তুলছে। এখন আঙুল দিয়ে একটু পরখ করলে পিচ্ছিল মনে হবে। এটি স্টোনে পাঁচ মিনিট রেখে দিতে হবে। এবার স্টোন থেকে পানি দিয়ে ধুয়ে প্রয়োজনে আরো পাঁচ-দশ মিনিট আরেকবার এই দ্রবণ দিলে পুরো সেনসিটিভ হয়ে যাবে। এবার পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে নিয়ে পুনরায় আবার ইমেজ অঙ্কন করা সম্ভব। কাজ শেষে ফ্রেশ গামিং করে প্রয়োজনমতো এচিং করে প্রিন্টের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে এই অ্যালাম পানি দিয়ে বেশিক্ষণ রাখলে স্টোনের অনুভূতিশীল হালকা ইমেজগুলো চলে যেতে পারে, সেদিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

ইঙ্ক তৈরিতে চকের বেশি ব্যবহারে উদ্ভূত সমস্যা

লিথোগ্রাফিক প্রিন্ট নেওয়ার সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট ব্যবহার করলে তার সঙ্গে একটু ভার্নিশ দেওয়া দরকার। প্রতিটি ইঙ্কই একটি ব্যালান্স অনুসরণ করে তৈরি। তখন সেখানে অতিরিক্ত ম্যাগনেসিয়াম মেশালে ব্যালান্সের ঘাটতি ঘটতে পারে। তখন সেটি একটি চকি আবরণে পরিণত হয়। এই আবরণটি ভবিষ্যতে ক্র্যাক করতে পারে। এমনকি অল্প পরিমাণে মেশালেও খুব ভালো করে মেশাতে হবে।[১৯৩]

অতিরিক্ত টিন্ট কালার ব্যবহারে উদ্ভূত সমস্যা ও সমাধান

কখনো কখনো অতিরিক্ত টিন্ট ব্যবহারে একধরনের স্কাম (একধরনের ডটস অকৃতির কালার) সৃষ্টি হয়। নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায়ে এই সমস্যা থেকে মাঝেমধ্যে বাংলাদেশি শিল্পীরা পরিত্রাণ পেলেও তা টেমরিন্ডের গ্রন্থে উল্লেখিত সমাধানের সঙ্গে মিল রয়েছে, যা এখানে চর্চার ফলস্বরূপই বের হয়ে এসেছে।

(ক) টিন্টি দিয়ে প্রিন্ট নিতে গেলে কয়েকটি প্রিন্ট নেওয়ার পর একটি সমস্যা সৃষ্টি হয়। প্রিন্টে একধরনের স্কাম বা ডটস চলে আসে। প্রিন্টটি নেওয়ার পর রোলিং না করে এরাবিক গাম হাতে লাগিয়ে আলতোভাবে ডলতে থাকলে স্কাম অনেকটা সরে যায়। এবার একবার ফ্রেশ গামিং করে নিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। এখন ভিসকোভিটা দিয়ে পানি ছিটিয়ে স্পঞ্জ করার পর রোলিং করলে অনেক সময় আগের মতো ভালো প্রিন্ট আসে। এই পদ্ধতিটি স্টোন ও প্লেট উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। বাংলাদেশে এই পদ্ধতিটি অনুসরিত হচ্ছে, যা অনেক সময় অনেক চর্চাবিদ অস্বীকার করেন বলে টেমারিন্ড গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

---

[193] GaroZ. Antreasian and Clinton Adams, *'The Tamarind Book of Lithography: Art & Techniques'* New York, p. 318

(খ) প্রিন্ট নেওয়ার পর একবার রোলিং করে গামিং করতে হবে। এবার পুনরায় ওয়াশ-আউট করে প্রিন্ট নিতে হবে।

(গ) প্রিন্ট নেওয়ার পর একবার রোলিং এবং এচিং করে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুতে হবে। এবার এরাবিক গাম হাতে লাগিয়ে ইমেজ অংশে আলতো করে ডলতে থাকলে ইমেজ থেকে স্কাম অনেকটা সরে যায়। এবার পরিষ্কার গামিং করে ইঙ্ক বেড়ে গিয়ে পূর্বের ইঙ্ক পরিবর্তন করে নতুন ইঙ্ক তৈরি করতে হবে। তাতে অবশ্য কখনো কখনো ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট যোগ করে একটু শক্ত ইঙ্ক বানিয়ে নিতে হয়। এখন ওয়াশ-আউট না করে শুধু ভিসকোভিটা দিয়ে ইমেজকে ভিজিয়ে রোলিং করে প্রিন্ট নিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

রোলিং করার সময় অতিরিক্ত কালার ব্যবহারে উদ্ভূত সমস্যা ও সমাধান

মূলত যে ইমেজ স্টোনে বা প্লেটে আঁকা হয়েছে, ঠিক সে রকম কালারের ডেপথসহ প্রিন্ট আসে না। কারণ ইমেজ তৈরি করা হয়েছে তুষ বা কন্টি দিয়ে। এদের কালার ডেপথ এবং প্রিন্ট নেওয়ার ইঙ্কের কালার ডেপথ এক নয়। এ বিষয়টি প্রিন্টার ও শিল্পী উভয়কে মেনে নিতে হবে। তবে অনেক সময় দেখা যায়, রোলিং করতে করতে বা রোলারে একটু ইঙ্ক বেশি হলে প্রয়োজনের তুলনায় প্রিন্ট বেশি কালো হতে আরম্ভ করে। এ সময় কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করা ভালোঃ

(ক) ঠিক এই মুহূর্তে পরবর্তী প্রিন্টের রোলিং করার সময় ইঙ্ক বেড থেকে স্প্যাচুলা দিয়ে কালির পরিমাণ কমিয়ে এনে রোলিং করলে এ সমস্যা থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব।

(খ) কখনো কখনো পরবর্তী প্রিন্টের রোলিংয়ের পূর্বে গাম হাতের তালুতে লাগিয়ে একটু আলতোভাবে ডলতে থাকলে স্কাম সরে যায়। এ অবস্থায় একবার গামিং করে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে নিতে হবে। বেশি বিশ্রাম না দিয়ে শুকাবার পরই ভিসকোভিটা দিয়ে ভিজিয়ে রোলিং করে পুনরায় পূর্বের মতো প্রিন্ট করা যায়।

(গ) কোনো কোনো শিল্পী একটু জড়িয়ে যাওয়া প্রিন্ট নেওয়ার পর একবার তুলনামূলক খুব কম শক্তিশালী একটি এচিং করেন। আবার লেবু চিপে (সাইট্রিক এসিড) ইমেজে দিয়ে হাত দিয়ে হালকা করে ডলে দিলে স্কামটি চলে যায়। আবার কেউ কেউ সরাসরি রোলিং করে, কেউ আবার একটা ফ্রেশ গামিং করে শুকিয়ে ভিসকোভিটার সাহায্যে পরিমাণমতো পানি দিয়ে রোলিং করে প্রিন্ট নিয়ে থাকেন।

এই অধ্যায়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে লিথোগ্রাফির অতীত ও বর্তমান চর্চার করণ-কৌশলের চলমান ও নতুন প্রক্রিয়াগুলো গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এর প্রতিটি ধাপ

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্পষ্ট লিখিত আকারে তুলে ধরা হয়েছে, যা থেকে এ দেশে লিথোচর্চার সঙ্গে অন্য দেশের পার্থক্য সহজেই নিরূপণ করা সম্ভবপর হয়েছে। লিথোগ্রাফি, প্লেট-লিথোগ্রাফি (প্লেটোগ্রাফি), ওয়াটারলেস লিথোগ্রাফি ইত্যাদি পদ্ধতির কৌশল বিস্তারিতভাবে লিখিত হয়েছে। করণ-কৌশলের মধ্যে রয়েছেঃ (ক) ইমেজ তৈরিতে কন্টি বা ক্রেয়নের ব্যবহার, (খ) ইরেজ করে ইমেজ সৃষ্টি পদ্ধতি, (গ) ইমেজ তৈরিতে বলপয়েন্ট কলম ব্যবহার, (ঘ) ফ্লাট ইমেজ সৃষ্টিতে প্লেট-লিথোগ্রাফি ব্যবহার, (ঙ) ওয়াশ-আউট দ্রবণ (সলিউশন) সৃষ্টি, (চ) ইন্টাগলিও পদ্ধতি প্রভৃতিতে ইমেজ সৃষ্টির উপায় বর্ণনা করা হয়েছে। মাধ্যম হিসেবে যে নতুন মাধ্যম পাওয়া গেল, সেগুলো যেমনঃ (ক) উড লিথোগ্রাফি পদ্ধতি (Planography on Wood surface), (খ) বলপয়েন্ট লিথোগ্রাফি, (গ) ওয়াটার বেইজ অয়েলি মিডিয়াম (Water base Oily Medium), (ঙ) প্লেট-লিথোগ্রাফির সঙ্গে ওয়াটারলেস লিথোর সংমিশ্রণ পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করে ইমেজ সৃষ্টি পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

৭. সপ্তম অধ্যায়

লিথোর বর্তমান অবস্থা, সম্ভাব্যতা ও নান্দনিকতার ছাপ নিয়ে আলোচনা

৭.১ বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির নন্দনতাত্ত্বিক দিক

বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চিত্রগুলোর নন্দনতাত্ত্বিক বিচারবিশ্লেষণের জন্য প্রথমত ছবিগুলো যে অনুকরণ নয়, তা- প্রমাণ করেছি। দ্বিতীয়ত ছবিগুলোতে ফর্ম কী ভূমিকা পালন করছে সেটা সম্পর্কে ধারণা নেওয়া প্রয়োজন। ফর্ম হিসেবে যদি ছবির উপযোগিতা প্রমাণ করা যায় তাহলে এ দেশের লিথোগ্রাফিগুলোকে শিল্প হিসেবে মেনে নিতে দ্বিমত হওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া বাংলাদেশের অতীত লিথোগ্রাফিগুলোকে শুধু অনুশীলনধর্মী মনে না করে— অনুকরণ হিসেবে ধরে নিয়ে কোন কোন ধরনের অনুকরণকে শিল্প হিসেবে বিচেনা করা যেতে পারে— সেভাবে আলোচনা করেও এর যৌক্তিকতা প্রমাণ করা যেতে পারে। পরবর্তী বিষয় হচ্ছে— মডার্ন, পোস্টমডার্ন, পোস্ট- পোস্টমডার্ন ও মেটা-মডার্ন শিল্পান্দোলনে শিল্পগুলোর ভূমিকা আছে কি নেই, থাকলে কীভাবে আছে, আর না থাকলে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়। আর বাংলাদেশের বর্তমান লিথোগ্রাফির সঙ্গে টেমারিন্ড লিথোগ্রাফিগুলোর চর্চাগত দিকটি নিয়েও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষার প্রথম দিককার (১৯৪৯−১৯৯০) লিথোগ্রাফিগুলোকে শুধু অনুশীলনধর্মী বলে বিবেচনা করলে ভুল হবে না, তবে Melvin Rader-এর মতো করে নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে এর আসল গুণ বিচার করা সম্ভব। কারণ 'Esthetics is the Philosopy of art And beauty.' Rader আরো মনে করেন— শিল্প সম্পর্কে বিভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে যুক্ত ধারণাগুলো হচ্ছে— play[194], ভ্রম (illusion), (অনুকরণ) imitation, সৌন্দর্য (beauty), (আবেগের প্রকাশ) emotional expression, কল্পনা (imagination), intuition (স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান), আকাঙ্ক্ষা পূরণ (wish-fulfillment), আনন্দ

---

[194] যখন একটি শিশু আরেকটি শিশুর সঙ্গে কথা বলে, তারা কোন ভাষায় কথা বলে তা আমাদের জানা নেই। অথচ তারা একে অপরকে এমনভাবে ডাকে যে তারা নিজেরা যোগাযোগ করতে পারে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না। এখন এ ধরনের খেলাকে সেল্ফ ডিসেপশন (self-deception) বলা যেতে পারে। আর যদি কোনো খেলোয়াড় খেলতে নামে এবং সে তার Id-এর জায়গা থেকে হিংসাত্মক গুণ নিয়ে কল্পনার সাহায্যে স্থির করে যে, সে কীভাবে খেলাটি খেলবে। এমন কল্পনায় অন্যের ক্ষতি করা (যেমন ফাউল করতে পারবে না, ইত্যাদি) চলে না। কাজেই সচেতনভাবে সে কল্পনার সাহায্যে স্থির করে—যা সে বাস্তবে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে কিন্তু পূর্ণতা আনতে পারে না। এমন খেলাকে আমরা কন্ডিশন অফ দ্য কনশাস সেল্ফ-ডিসেপশন বলতে পারি। কিন্তু শিল্প সৃষ্টি এমন ধরনের একটি খেলা, যা conscious self-deception-এর ওপর নির্ভর না করেই শিল্প সৃষ্টি করতে পারে। এমন এক অবস্থার ওপর নির্ভর করে যে, শিল্পী তা করতে গিয়ে sence of values-এর এমন একটি পর্যায়ের চর্চা করে থাকেন—যাকে বলা যেতে পারে মূল্যবোধ (sence of values)=the morality=refining situation of beauty, truth and goodness.

(pleasure), কলাকৌশল (technique), (ইন্দ্রিয়জ বাহ্যিক রূপ) sensuous surface, অর্থ (meaning), ফর্ম (form), কার্য (function), empathy (সহানুভূতি), abstraction, esthetic distance এবং (isolation) বিচ্ছিন্ন। প্রথম দৃষ্টিতে, এই ধারণাগুলো মতামতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ভুল সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করতে পারে। সতর্কভাবে অনুশীলন করলে এই দ্বিমতগুলোর অবাস্তবতা বের হয়ে আসবে অর্থাৎ এর সঠিক মূল্যায়ন করতে পারা সম্ভব হবে। যেমনঃ 'কল্পনা', 'ফর্ম', 'অর্থ','দূরত্ব' এবং 'বিচ্ছিন্ন'— এই পরিলেখগুলো বিষয়ের নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ দিক ও ভিন্ন বিষয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেয়। কিছু পরিলেখ প্রাথমিকভাবে শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে কাজ করছে ('কল্পনা'), অন্যরা শিল্পবস্তু (আর্ট অবজেক্ট, যেমনঃ ফর্ম') এবং আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশনের (যেমন 'অর্থ', 'দূরত্ব' এবং 'বিচ্ছিন্ন') সঙ্গে কাজ করে।[১৯৫] *An Introduction to Aesthetics* (London, 1950)-এ Professor E. F. Carritt সর্বকালের চল্লিশজন নন্দনতাত্ত্বিকের (এসথেটিশিয়ান-এনসাইন্ট এবং মডার্ন) সমন্বিত মতামতের সাহায্যে সবসময়ের জন্য শিল্পকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেন যে— শিল্প একটি সৃজনশীল পদ্ধতি (ক্রিয়েটিভ প্রসেস) যা মুড, ফিলিং অথবা স্পিরিটের অভিব্যক্তি। এ ধরনের শিল্প পুরোপুরি ফরমাল অথবা পুরো নন্দনতাত্ত্বিক জগতে (এসথেকিট ফিল্ডে) ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত বা সজ্ঞায়িত যেকোনো রকম বর্ণনাধর্মী বিষয়, ফর্ম বা থিউরির থেকে অভিব্যক্তিময়।[১৯৬] এই কথাগুলোর মধ্যে যেন সফিউদ্দীনের অনুরণন শুনতে পাওয়া যায়।

৭.১.১ ট্র্যাডিশনাল নন্দনতত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি

৭.১.১.১ বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিতে ইমিটেশন ও ফর্মের ভূমিকা

বাংলাদেশের ছবিগুলোর মধ্যেও অনুকরণ (imitatation) ও ফর্ম নন্দনতত্ত্বের তত্ত্বগত ইতিহাসে অভিব্যক্তায়নের ক্ষেত্রে একই ভূমিকা পালন করছে। কারণ ছবি আঁকার সময় অনুকরণকে অঙ্কন করা যায় না, আঁকতে হলে ফর্ম বা রূপ হিসেবে অঙ্কন করতে হয়। প্লেটো ও অ্যারিস্টটল, উভয়ই যেমন বলেন— অনুকরণ এক দিক থেকে অভিব্যক্তায়নহীন অনুকরণ (অভিব্যক্তায়নহীন প্রতিলিপিকরণ) (non-

---

195 Melvin Rader, *A Modern book of Esthetics*: *The meaning of Art*, Third Edition, p.2,
Many unnecessary disputes, as Morris Weitz has suggested, can be avoided if esthetic labels are not pasted in one piece on the whole body of art, but rather are applied separately to the various constituents of the creative process, the esthetic artifact, and the esthetic experience, [Cf. Pholosophy of the Arts (Harvard University Press, Cambridge1959) p. 2]

196 Melvin Rader, ibid. p. 16, Art as a creative process, is the expression of mood, feeling, or spirit. That art is expressive rather than merely formal or descriptive is about as well established as any fact in the whole field of esthetics

expressive copying)।[১৯৭] তিনি অনেক জায়গায় শৈল্পিক অনুপ্রেরণার অস্তিত্ব (আর্টিস্টিক ইন্সপাইরেশনের একজিসটেন্স) ও মূল্যায়নকে (ভ্যালুকে) গুরুত্ব দিয়েছেন (he recognizes the existence and value of artistic inspiration). বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিগুলো (বিশেষ করে একাডেমিকভাবে চর্চিত লিথোগ্রাফি) যদি শৈল্পিক অনুপ্রেরণার অস্তিত্ব ও ভ্যালুকে (মোরালিটি = বিউটি + ট্রুথ+ গুডনেস = সেনস আফ ভ্যালু) গুরুত্ব দিয়ে সৃষ্টি করা হয় তাহলে Laws, Phaedrus, Symposium এবং Ion, অনুসারে— সরাসরি দেখা পিওর শাশ্বত (pure eternal forms) ফর্মের বিউটি, ট্রুথ ও গুডনেস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অঙ্কিত হলে উচ্চমার্গীয় শিল্প হিসেবে পরিগণিত হবে। আবার প্রকৃত শিল্পী যদি ছবিগুলোকে অনুকরণও করে থাকেন তা অনুকরণ না হয়ে শিল্প হবে। কারণ প্রকৃত শিল্পী অনুকরণের চেয়ে রিয়ালিটি আবিষ্কারে বেশি আগ্রহী। এখানে শুধু একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, লিথোগ্রাফিগুলো যারা করেছিলেন তারা প্রকৃত শিল্পী ছিলেন কি না? এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গবেষণা হতে পারে বিধায় ধারণাগতভাবে (হাইপোথিটেক্যালি) এটা অন্তত বলা যেতে পারে যে, নানা যুগের কিছু না কিছু শিল্পী তো নিশ্চয়ই বর্তমানের বিখ্যাত শিল্পী এবং তাদের কোনো না কোনো ছবি তো নিশ্চয়ই শিল্প হয়ে উঠেছে।

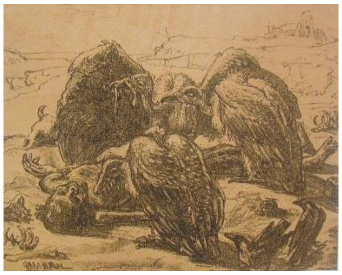

Plate: 7.1 Kamrul hasan, lithography, collected from Kolkata govt art college, Moinul Abedin, Moniruzzaman.

Plate:7.2 Nasir Biswas, Still life, 1964 (probabely), lithography, 24x18 inch, collected from Department of Printmaking, D.U.

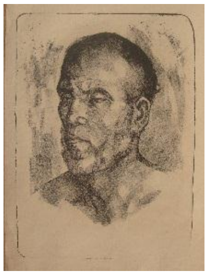

Plate:7.3 Ashish Sen Gupto, Lithography, 19x14 inch, may be 1960 or 1961, collected from D.P.T, D.U.

ধরা যাক, একজন লোক গ্রাম থেকে এসে পুরনো ঢাকার বাড়িতে ভাড়া থাকছেন। চাকরির ফাঁকে অবসর পান না বেড়ানোর জন্য। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে জানালা খুলে যে আঞ্চলিক ভাষার অকথ্য গালাগাল শোনেন, তাতে ধীরে ধীরে তিনি মানসিক দুর্দশাগ্রস্ত (ডিস্যাটিসফিকশনে) হবেন। ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। কিন্তু অফিস থেকে ফিরে যদি ঘরে ঢুকে দেয়ালে একটি অনুকরণে করা ভূদৃশ্য (ল্যান্ডস্কেপ) পেইন্টিংও দেখতে পান তাহলে তিনি কল্পনার মাধ্যমে ছবির ভেতর দিয়ে বেড়িয়ে আসতে পারবেন। তার মনে একধরনের তৃপ্ততা তৈরি হবে। এভাবে একজন মানুষ শিল্পের বিউটি, ট্রুথ ও গুডনেস দ্বারা উপকৃত হতে পারেন।

---

[197] Melvin Rader, *A Modern book of Esthetics*: *The meaning of Art*, Third Edition, p. xvi

Plate: 7.4 Rashid, lithography, Size-26x36 cm, Year- 9-12-1952, collection from Department of Printmaking, D.U.

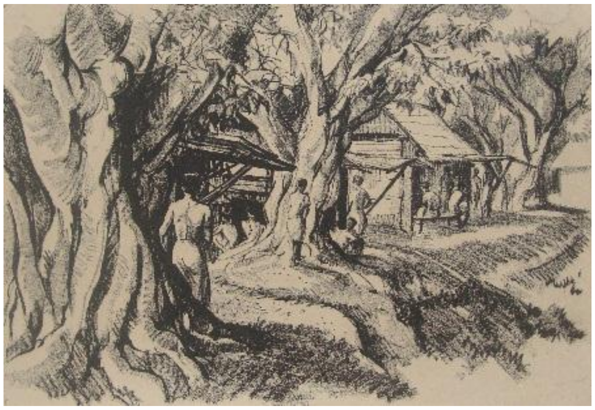

Plate:7.5 Paresh Kumar Maiti, lithography, Bazar, 1960, collection from Department of Printmaking, D.U.

Plate:7.6 Ranjit Neogi, Lithography, A road of Sherpur Town, Size-46x62 cm, Year-1963, collection from Department of Printmaking, D.U.

Plate: 7.7 K. Mahmud, lithography, Size-31x46 cm, Year-1982, collection from Department of Printmaking, D.U.

৭.১.১.২ (খ) কবিতা, নাটক ও সংগীতের ক্ষেত্রে অনুকরণের (ইমিটেশনের) ভূমিকা এবং শিল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা খোঁজা

Poetics-এ অ্যারিস্টটল উল্লেখ করেন, রিয়ালিটিকে কপি করা হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি দিকনির্দেশনা দেন যে, মানুষের জীবন ও প্রকৃতি অনুপ্রেরণার অভিব্যক্তায়ন অনুযায়ী কাজ করে।[১৯৮] যেমন উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে বলা যায়ঃ বাংলাদেশের ষাট ও সত্তরের দশকে অঙ্কিত কিছু লিথোগ্রাফিতে তাদের তৎকালীন জীবন ও প্রকৃতি অনুপ্রেরণার অভিব্যক্তায়নে অভিব্যক্ত হতে দেখা যায়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, চার অক্ষরের 'স্বাধীনতা' শব্দটি স্পষ্টভাবে ব্যানারে লিখে শিল্পীদের মধ্য থেকে বের হওয়া প্রথম যে মিছিলটি হয়েছিল তাতে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্বয়ং নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু শিল্পীর শৈল্পিক মাধ্যমগুলোর মধ্যে লিথোগ্রাফি মাধ্যমে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রামের এই চিত্রগুলোর মাধ্যমে ১৪

[198] Melvin Rader, *A Modern book of Esthetics: The meaning of Art*, 3rd Edition, p. xvi

মার্চ ১৯৭১ সালে। সেই সময়ে মানুষের জীবন ও প্রকৃতি তাদের অনুপ্রেরণার অভিব্যক্তি অনুযায়ী কাজ করছিল বলেই তারা এ ধরনের ছবি আঁকার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

ট্র্যাজিক ক্যারেক্টার 'অনুকরণ' করা হয়, তারা যেমন আছে তেমন করে নয়, তারা যেমন 'হওয়া উচিত', (ought to be) তেমন করে। নাটকের এই যে 'probable impossibilities to possible improbabilities'-এর কথা বলা হচ্ছে; সফিউদ্দীন-কিবরিয়ারাও শিক্ষার্থীদের লিথো করার সময় যে স্কেচ করতে বলতেন তার দার্শনিক রূপকল্পটিও ছিল অনুরূপ।

Plate:7.8 Abdus Samad, lithograpgy, 3rd year, 1965, collection from Department of Printmaking, D.U.

Plate: 7.9 S.A.Q. Mainuddin, Media-litho, 1965, Size-26x38 cm, Year-1965, roll-3, collection from Department of Printmaking, D.U.

Plate: 7.10 Rasid Chowdhury, Collected from Mukti Judho Jadughar: Portfolio-1971.

এভাবে ট্র্যাডিশনাল নন্দনতত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিগুলোকে যাচাই করে এর শিল্পমান সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে। মিউজিকের মতো বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিগুলোর হারমোনিও হবে শিল্পীর আত্মার বহিঃপ্রকাশ, যা সময়কালকেও প্রকাশ করবে।

৭.২ আধুনিক নন্দনতত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি

উপরোক্ত প্রাচীন তত্ত্ববিদদের আধুনিক শব্দের ব্যবহার এবং তাদের অনুকরণ তত্ত্বটি আবার অভিব্যক্তিক তত্ত্বের (এক্সপ্রেশনিস্ট থিসিসের) বিরোধিতা করে না। তারা সম্ভবত সন্দেহমুক্তভাবেই স্বীকার করেন যে, 'the artist present his *evaluative* interpretation of reality, and thereby is expressing his thought and feeling.' শিল্পী বাস্তবতা (রিয়ালিটি) সম্পর্কে তার মূল্যায়নকে উপস্থাপন করেন এবং সেই সূত্রে তিনি তার চিন্তা এবং অনুভূতিকে ব্যক্ত করেন।'[১৯৯] যা বাংলাদেশের শিল্পীদের লিথোগ্রাফির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন মোহাম্মদ কিবরিয়া, রফিকুন্ নবীসহ অনেক শিল্পীর বর্তমান লিথোগ্রাফিগুলোর কথা ভাবা যেতে পারে। এর মধ্যে শিল্পী শিশির কুমার ভট্টাচার্য্যের 'এই লাশ মাটির নিচে থাকবে না বেরিয়ে আসবে' নামক লিথোগ্রাফি ছবিটির নাম না উল্লেখ করলেই নয়।

[199] Melvin Rader, *A Modern book of Esthetics*, Third Edition, p. xvi

Plate: 7.11 Md. Kibria, Lithography (Last work on Litho stone), Printed by Rokonuzzaman, Colllection from Cosmos Gallery, 15x 10.5 inch, 2008.

Plate: 7.12 Ashoke Karmaker, Lithography, 1994, Colllection from Department of Printmaking, D.U

Plate: 7.13 Md. Kikria, Lithography, Composition: Blue, Green and Red, 60x46 cm, 1976.

Plate: 7.14 Bijan Choudhury, Lithography, Railway life, 18x14 inch, 1954 or 1955, Department of Printmaking, D.U

একজন ছাত্র চারুকলায় ভর্তির পর থেকে প্রকৃতিকে অনুশীলন করতে থাকে, যা তার শিক্ষাজীবনের শুরুতে গঠনমূলক হিসেবে কাজ করে। ধীরে ধীরে তার আত্মা বা হার্ট এমনভাবে গড়ে ওঠে যে, বস্তুকে বা প্রকৃতিকে তার পরিপ্রেক্ষিত, ঐক্য (ইউনিটি) ও আধ্যাত্মিক সংবদ্ধতা অনুযায়ী একত্রে দেখতে শেখায়। ধীরে ধীরে ইনটিউটিভ সেন্স অফ অর্ডার দ্বারা দৃশ্যটিকে কল্পনা করতে শেখে। এ দুটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে

যতক্ষণ পর্যন্ত না (intuitive sense of order) সে তার অনুভূতির কাছাকাছি পৌঁছায় ততক্ষণ পর্যন্ত কাজটি চলতে থাকে এবং হারমোনি তার সত্তার (ইন্সটিংক্টের) দ্বিতীয় চরিত্র হয়ে দাঁড়ায়, যেটা দেখতে অনেকটা তার সত্তার মতো বলা যায়। সফিউদ্দীন এই হারমোনির কথা সবসময় শিক্ষার্থীদের বলতেন। এভাবেই ট্র্যাডিশনাল নন্দনতত্ত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিগুলোকে শিল্প হিসেবে বিচার করে ট্র্যাডিশনাল থেকে মডার্ন ফর্মালিস্টিক তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার সুযোগ রয়েছে। আবার এর সঙ্গে আধুনিক শিল্পী মাতিসের বক্তব্যেরও মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

মাতিস নিজে বলেন, তার কাজে যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি তার সঠিক 'অনুভূতিকে' প্রকাশ করতে পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাজের প্রক্রিয়াটি হচ্ছে কালারের সঙ্গে কালারের, শেপের সঙ্গে শেপ এবং কালারের সঙ্গে শেপের একধরনের কন্টিনিউয়াস অ্যাডজাস্টমেন্ট। যেই তার অনুভূতিটি প্রকাশিত করা হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে পেইন্টিংটি শেষ হয়ে গেল। সংক্ষিপ্তাকারে তিনি এক্সপ্রেশনিজমের বিষয়টি এভাবে দেখেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত আমি কী? সর্বোপরি, অভিব্যক্তি... আমি জীবন সম্পর্কে আমার অনুভূত অনুভূতি এবং সেটাকে অভিব্যক্ত করার উপায়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে অপারগ... সবকিছুই এর একটি অংশ হিসেবে কাজ করছে।[২০০] কান্টকে যেহেতু ট্র্যাডিশনাল ও মডার্ন নন্দনতত্ত্বের মধ্যকার সেতু হিসেবে ধরা হয়, তাই তার ফর্মালিস্ট তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেখারও সুযোগ রয়েছে। কান্টের আবিষ্কৃত তত্ত্বানুযায়ী, বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিগুলোর ডিজাইনে সৌন্দর্যের সারাংশ হচ্ছে— সে নিজে নিজেই উপলব্ধিবোধ জাগ্রত করে। সেখানে আমাদের মনে ছন্দায়িত খেলা হয়, সেন্স, অনুভূতি, কল্পনা এবং আন্ডারস্টান্ডিংয়ের (Art appreciation & Art criticism) ডাইনামিক ভারসাম্যাবস্থাকে অনুরূপ করে ফুটিয়ে তোলে এবং শিল্প সৃষ্টির দ্বারা অনুপ্রাণিত।

Plate: 7.15 Zainul abedin, Portrait (from Shantiniketan), Lithography on thick paper, 1975,

Plate:7.16 HaamiduzzamanKhan, Lithography, Colllection from Department of Printmaking, D.U,

Plate: 7.17 Abdus Sattar, litho, 2008, Colllection from Department of Printmaking, D.U

Plate: 7.18 Abdus Shakur Shah, lithography, Face, 2008, 30x27 cm. Colllection from Dpt. D.U

[200] Helen Gardner, *Art Through the Ages*, The twentieth century, eighth edition, p. 892;
In Robert Goldwater and Marco Treves, eds., Artiston Art (New York: Pantheon, 1945), pp. 409-10

এই হারমোনিয়াস স্টেটকে অবশ্যই এক দিক থেকে শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তখন এই ফর্ম অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত উভয় দিক দিয়ে কাজের ডিজাইন ও মনের হারমোনি এবং ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির মাধ্যমে ফর্মকে বুঝতে পারা যায়। জিনিয়াস ও ট্যালেন্টরা '*Geist* - ~soul or ~spirit'-এর দ্বারা সুন্দর শিল্পকর্ম তৈরি করেন।[২০১] যেটা এমনই একটি ধারণ করার প্রকোষ্ঠ (ফ্যাকাল্টি) এবং 'esthetic ideas'-কে অভিব্যক্ত করে। এ ধরনের আইডিয়া বিজ্ঞানের ধারণার মতো অসামান্যতা ও অন্তর্নিহিত অর্থ আছে, যা সঠিক অর্থ তৈরি করতে পারে না। তারা এমন ইল্যুশন ও গুরুত্বপূর্ণ (অনন্ত) অস্তিত্বকে প্রকাশ করে, যেটা প্রতিটি মহৎ শিল্পকর্মকে চরিত্রময়তা দান করে এবং ফর্মকে রহস্যপূর্ণ গভীরতা (মিস্টিরিয়াস[২০২] ডেপথ) প্রদান করে। [২০৩]

এখন এই তত্ত্বটিকে ফর্মালিস্ট তত্ত্ব বলা যেতে পারে। এদিক থেকেও বিচার করলে বাংলাদেশের বর্তমান পর্যন্ত সমস্ত লিথোগ্রাফি (বর্তমান ও অতীত) পর্যালোচনামূলকভাবে ফর্মালিস্ট তত্ত্ব মেনেই কাজ করছে। ফর্মালিস্ট তত্ত্বটি অভিব্যক্তিক তত্ত্ব থেকে খুব বেশি দূরত্বের নয়। পুরোপুরি অনুকরণ হিসেবে নয়, অভিব্যক্তিক অনুকরণ হিসেবে; পুরোপুরি ফর্ম হিসেবে না করে অভিব্যক্তিক ফর্ম হিসেবে— যার রয়েছে শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রাসঙ্গিকতা। এ বিষয়টির পরিচিতিটা আধুনিক নন্দনতত্ত্বের কেন্দ্র হিসেবে গঠিত হয়।[২০৪] এভাবে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিও আধুনিক নন্দনতত্ত্বের কেন্দ্র হিসেবে গৃহীত হতে পারে বলে যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

---

[201] Melvin Rader, *A Modern book of Esthetics*, Third Edition, p. xvii,
Kant discovered the essence of beauty in design enjoyed simply for itself. There is harmonious play of our faculties–a dynamic equilibrium of sense, feeling, imagination, and understanding–which corresponds to, and is stimulated by the work of art. This harmonious state must be communicable, for one mark of art is its sharability. Thus form is both outward and inward–the design of the work and the harmony of the mind and the sensuous medium is vehicle for the communication of form, in this twofold sense. Gennius, the talent that creates beautiful works of art, is characterized in addition by *Geist*–'soul' or 'spirit'–which is the faculty of conceiving and expressing 'esthetic ideas'. Such ideas, unlike the concepts of science, have a profoundity and connotativeness that can not be put into definite meanings. They provide the elusive and inexhaustible significance that characterizes every great work of art and that gives such mystrerious depth to form. Now this theory, although it may be called formalist, is no farery form the doctorine of expression.

[202] মো. আব্দুল হালিম 'দার্শনিক প্রবন্ধাবলী', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৩৮
Mystrious: 'রহস্যপূর্ণ' শব্দটির বেলায় আইনস্টাইন বলেন: 'রহস্যপূর্ণ' হচ্ছে রহস্যপূর্ণ। এটি সকল সত্যিকার শিল্প ও বিজ্ঞানের উৎস। যার নিকট এই আবেগ এক আগন্তুক, যিনি বিস্ময়বোধে থমকে দাঁড়ান না এবং যিনি ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধায় আবিষ্ট হন না, তিনি মৃতব্য, তার চক্ষু মদ্রিত...সচেতন জীবনের রহস্য অনুধ্যান করা আমার জন্য যথেষ্ট, যা অনন্তকালব্যাপী নিজেকে চিরস্থায়ী করে যাচ্ছে, জগৎ গঠনের (structructure of the universe) রহস্য সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করাও আমার জন্য যথেষ্ট, যা আমরা অস্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারি এবং প্রয়াস চালাই বিনীতভাবে প্রকৃতিতে প্রকাশিত বুদ্ধির (intelligence) ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকে উপলব্ধি করতে।'

[203] Melvin Rader, *A Modern book of Esthetics*, Third Edition, p. xvii

[204] Melvin Rader, *ibd*. P.xvii (Melvin Rader, 'A Modern book of Esthetics' The meaning of Art, Third Edition, p. xvii

Plate: 7.19 Rafiqun Nabi, lithography, The Crows, 2014, 15.5x 21.25 inch, Colllection from Department of Printmaking, D.U

Plate: 7.20 Shahabuddin, 27x22 inch, ?

Plate:7.21 Aritra (Children), Printed by Rokonuzzaman, 2008, 30x27 cm, Colllection from Department of Printmaking, D.U

৭.২.১ আধুনিক নন্দনতত্ত্বের গভীরে গিয়ে শিল্পী ও দার্শনিকদের চিন্তার ক্ষেত্রটি খুঁজে বের করার চেষ্টা

ট্র্যাডিশনাল নন্দনতত্ত্বের পর মডার্ন নন্দনতত্ত্বের দুটি ভাগ হলো (অবয়ববাদ) স্ট্রাকচারালিজম ও পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম। স্ট্রাকচারালিজম হচ্ছে কোনো বাক্যের গ্রামার ঠিক না থাকলে তার সঠিক অর্থ বোঝা সম্ভব নয়। তাই এদের মতামত হলো, বাক্যে গ্রামার থাকতেই হবে। যেমন: কিউবিজম থেকে শুরু করে অ্যাবস্ট্রাকশন ইত্যাদি। আর পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম হচ্ছে স্ট্রাকচারালিজমের পরবর্তী অবস্থা। এর আরেকটি ভাগ হচ্ছে ডিকনস্ট্রাকশন— এটি একটি রাজনৈতিক প্রবণতা (পলিটিক্যাল অ্যাটিচুয়েড), কারণ সমাজতন্ত্রের (কমিউনিজমের) পর মানুষকে ঠকিয়ে নেতারা সব সম্পদ হাতিয়ে নিচ্ছিল। তখন ব্যাংক-বিমা, স্কুল-কলেজ, লাইব্রেরি, গ্রামার— এমনকি সমস্ত পুরাতনকে ভেঙে নতুনকে জায়গা করে দিতে চেয়েছিল। যেমন: দাদা ইজম, ফিউচারিজম এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত পরবর্তী শিল্পধারাগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু শিল্পের পোস্টমডার্নিজম বা তার পরবর্তী ধারায় অনেক সময়ই নন্দনতত্ত্বকে অস্বীকার করেও কাজ করা হয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, বর্তমান সময়ে নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা প্রশ্নের সম্মুখীন। অন্য ধরনের প্রবণতাই নাম বিশেষে ভিন্ন ধরনের নন্দনতত্ত্বের জন্ম দিয়েছে।

এ সমস্ত বিষয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় আলোচনার প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে বাংলাদেশের অতীত ও বর্তমান লিথোগ্রাফিগুলোতে মডার্নিজম, পোস্টমডার্নিজম ও তার পরবর্তী ধারাগুলোর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে লিথোগ্রাফিকে নিয়ে কাজ করার উপায় বের করা যেতে পারে। এরই ধারাবাহিকতায় মডার্নিজম ও তৎপরবর্তী আন্দোলনগুলো সম্পর্কে একটু বোধগম্য আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

শিল্পী চিন্তা করে কাজ করতে পারেন এবং কাজ করতে করতে বা কাজের শেষেও চিন্তা করতে পারেন। তবে প্রথমেই বুঝতে হবে যে মডার্নিজম ও মডার্ন আর্ট এক কথা নয়। দর্শনে ও শিল্পে এর চিন্তাগত কিছু

মিল ও অমিল আছে। এদের উভয়ের মধ্যে মাধ্যমগত (একটি লিটারেচার মাধ্যম আরেকটি ভিজ্যুয়াল আর্ট মাধ্যম) ভিন্নতার কারণে কিছু সাদৃশ্য ও কার্যক্রমের বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। কারণ মডার্নিজমের লিটারারি দর্শন, দর্শনশাস্ত্রের দর্শন বা অন্যদের কিছু পরিলেখ শিল্পের বেলায় যেমন প্রযোজ্য, তেমনি কিছু পরিলেখ আবার প্রযোজ্য নয় বা ভিন্ন নামে পরিচিত। সেইসঙ্গে শিল্পের আধুনিক সময়ের কিছু পরিলেখ— যেমন কোলাজ, ব্রিকোলাজ, অ্যাসেমব্লেগ, অ্যাপ্রোপিয়েশন ইত্যাদির প্রত্যেকটি যেমন কোলাজের সঙ্গে সম্পর্কিত, তেমনি মডার্ন থেকে পোস্টমডার্ন ও তার পরবর্তী সময়ের আগমনে অগবেষণামূলক বিষয়বস্তুগুলো নিয়ে গবেষণায় সঠিক অর্থ নির্দিষ্টায়নের জন্য যে ধরনের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণের প্রয়োজন পড়েছে— সে বিষয়গুলো না বুঝলে ট্র্যাডিশনাল থেকে মডার্ন, মডার্ন থেকে পোস্টমডার্ন, পোস্ট-পোস্টমডার্ন ও মেটা মডার্নিজম ইত্যাদিতে পৌঁছানোর পথটিকে বোঝা সহজবোধ্য হবে না। সে জন্য এক দিক থেকে দর্শনশাস্ত্রে ও শিল্পে— মডার্ন, পোস্টমডার্ন দর্শন ও তার পরবর্তী চিন্তাগুলোর ভূমিকাটি বোঝার জন্য এর ক্রমনিক ধারাটি অবশ্যই লিথোগ্রাফি চর্চার বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনার প্রশ্নে সংক্ষেপে আলেচনার দাবি রাখে। সেইসঙ্গে একটি বস্তুর রিয়ালিটি আবিষ্কারেঃ একজন সত্যিকার শিল্পী যা অনুকরণ করছেন— সেটাকে অনুকরণ না মনে করে শিল্প মনে করা হলে বস্তুর রিয়ালিটি আবিষ্কারে প্রি-সক্রেটিস সময়কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত দার্শনিকরা এবং শিল্পীরা কীভাবে কাজ করে গেছেন তার একটি ছক তৈরি করা যেতে পারে। তাহলেও পুরো বিষয়টির পথপরিক্রমাটি সহজবোধ্য হবে। ফলে বাংলাদেশের শিল্পীদের করণীয় বিষয়টি সম্পর্কেও একটা প্রচ্ছন্ন সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে, যা বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

মডার্ন বা আধুনিক শব্দটি পশ্চিমে প্রথম ব্যবহৃত হয়। তবে পূর্ব ও পশ্চিমের দর্শনে শব্দটি সম্পর্কে আজও পরিষ্কার ধারণা মেলে না বিধায় যেকোনো একটি দিকনির্দেশনাকে আলোচনা করে বিষয়ের সামগ্রিকতায় যাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। পশ্চিমা দর্শনশাস্ত্রের মডার্ন, পোস্টমডার্ন দর্শনচিন্তার সঙ্গে চারুশিল্পের দর্শনের সম্পর্ক অন্বেষণ করা প্রয়োজন। এই অন্বেষণটা করার পূর্বে ‘কনটেম্পর‍্যারি’ (সাম্প্রতিক শিল্পকলা) এবং মডার্ন ও পোস্টমডার্নের সম্পর্কটা জানা দরকার। নিশ্চয়ই একে অপরের থেকে বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে কাজ করছে। ‘কনটেম্পর‍্যারি’ (contemporary) হচ্ছে বৃহদাকার পরিলেখ। পোস্টমডার্ন বিষয়বস্তুগুলো (postmodern objects) সমসাময়িক আন্দোলনের একটি ‘উপধারা’কে

উপস্থাপন করে। পোস্টমডার্ন শিল্পকেও আধুনিক শিল্পের একটি বিশেষ ধাপ (ফেজ) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[২০৫]

৭.২.১.১ আধুনিক দর্শনের ব্যাপকতা ও চারুশিল্পে আধুনিকতা

শিল্পের ইতিহাসে ‘মডার্ন’ পরিলেখটি প্রগাঢ়ভাবে ব্যবহৃত হয় ১৮৬০ দশক থেকে ১৯৭০ দশক সময় পর্যন্ত এবং ওই যুগের শৈলী ও আদর্শকে বিবৃত করতে। প্রি-মডার্ন পিরিয়ডের প্রাথমিক জ্ঞানতত্ত্ব অনুযায়ী সময়টি (প্রি-মডার্ন পিরিয়ড) কর্তৃত্বব্যঞ্জকতার ওপর নির্ভরশীল ছিল। প্রি-মডার্ন সময়ে বিশ্বাস করা হতো যে, Ultimate Truth-কে সরাসরি (ডাইরেক্ট) আবিষ্কারের মাধ্যমে জানা যেতে পারে। এই ডাইরেক্ট আবিষ্কার হচ্ছে সাধারণভাবে God or a god থেকে এসেছে। চার্চ হচ্ছে জ্ঞানের ধারক ও ইন্টারপ্রেটর হিসেবে কাজ করেছে।[২০৬] মডার্নিজমের বুদ্ধিবৃত্তিক রহস্যগুলো রেনেসাঁস সময় থেকে শিক্ষাদান পদ্ধতির মাধ্যমে নাগরিকত্ব ও পৌর অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ট্র্যাডিশনাল তাত্ত্বিকদের তত্ত্বগত দর্শন ও মানবতাবাদীদের উচ্চারিত পুনর্জাগরিত মূল বক্তব্য হলো— man, rather than God, is the measure of all things. এখনো পর্যন্ত, শিক্ষার এ ধরনের ভূমিকা পশ্চিমা আধুনিক চিন্তার মূল হিসেবে অবস্থান করছে। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে প্রায় ১৪০৫ বছর পর আবার ‘মানুষ নিজেই সবকিছুর মাপকাঠি’র (man is the measure of all things) পুনর্জাগরণ ঘটে। এই কথাগুলো বর্তমান সময় পর্যন্ত বারবার পুনরুচ্চারিত হতে দেখা যায়। পরবর্তী সময়ে এই দর্শনের প্রভাব পড়ে ১৮ শতকে: একটি নতুন ও মোটামুটি বসবাসযোগ্য সমাজ সৃষ্টি করার জন্য প্রথম পরীক্ষা হিসেবে নেওয়া হয়েছিল। সাহিত্য বিচারেলি (লিটারালি) এটি নতুন বিশ্ব এবং নতুন আদর্শের কথা বলে। যেগুলো প্রথম ১৭৭৬ সালে নতুনভাবে প্রকাশিত হয়েছিল *Declaration of Independence* of the newly founded United

[205] Arthur C. Danto, *After the End of Art: Contemporary Art and the Pale of History*; Clement Greenberg: Modernism and Postmodernism, 1979. Retrieved June 26, 2007; 'Postmodern art', 'Wikipedia, the free encyclopedia', 21 January 2016, https://en.wikipedia.org/wiki/Postmodern_art; 'Postmodern art', ART AND WRITERS, 22nd March, 2014, http://literatureandwriters.info/2014/03/22/postmodern-art/
Arthur Danto যুক্তি দ্বারা উপস্থাপন করেন যে, 'contemporary' হচ্ছে বৃহৎ পরিলেখ (broader term) এবং ওই পোস্টমডার্ন বিষয়বস্তুলো সাম্প্রতিক আন্দোলনগুলোর একটি উপধারাকে ('subsector') উপস্থাপন করে। পোস্টমডার্ন কিছু শিল্পী মডার্ন আর্ট থেকে এর নির্দিষ্ট দূরত্ব তৈরি করেছেন এবং সেখানে কোনটা 'late-modern' ও কোনটা ‘পোস্টমডার্ন’ তার ভেতর কোনো ঐকমত্য নেই। মডার্নিজমের পুরনো আইডিয়াগুলোকে পরিত্যাগ করে আধুনিক নন্দনতত্ত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত (modern aesthetic re-established) হয়েছে। পেইন্টিংয়ে পোস্টমডার্নিজম রিপ্রেজেন্টেশনকে পুনরায় পরিচয় করিয়ে দেয়। ট্র্যাডিশনাল কৌশল (টেকনিক) ও সাবজেক্ট ম্যাটার আবার শিল্পে ফিরে আসে। এমনকি এটা যুক্তি দ্বারা উপস্থাপন করে– ওই আজকে যেটাকে পোস্টমডার্ন বলা হয় তা এবং লেটেস্ট আভান্ট গ্রেডিজমকেও মডার্ন আর্ট হিসেবে শ্রেণিবিভাগ (classified) করে ধরে নেওয়া উচিত।

[206] “Premodernism, Modernism, & Postmodernism: (An Overview, ©2005-2008, Louis Hoffman, Ph.D.)”, http://www.postmodernpsychology.com/philosophical_systems/overview.htm, 31.12.2015.

States-এ। অর্থাৎ এটা রেনেসাঁসেরই আরো সংগঠিত রূপ বলা যায়।[২০৭] মডার্নিজমের রহস্যাবৃত চিন্তার গভীরতার যোগসূত্রগুলো শুধু রেনেসাঁসে নয় বরং তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বস্তুবাদ, ভাববাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। বৃহৎভাবে মডার্নিজম হলো ফর্মাল ও স্টাইলিস্টিক টার্ম। পরিলেখটি সাধারণভাবে সেসব শিল্পকর্মের সঙ্গে সংযুক্ত— যেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে উৎসাহব্যঞ্জকতার (স্পিরিটের) মাধ্যমে অতীত ট্র্যাডিশন থেকে অলাদা হয়েছে।[২০৮] শিল্প ইতিহাসবিদগণ মডার্ন পেইন্টিং বলতে বোঝাতে চেয়েছেন যে— মডার্ন পেইন্টাররা প্রাথমিকভাবে শিল্পে কালার, শেপ এবং লাইনের গুণাগুণের নিয়মতান্ত্রিক ব্যবহারের ওপর অধিক মনোযোগী ছিলেন; একটা সময় পরে চিহ্নিত হলো যে, দ্বিমাত্রিকতার (ফ্লাটনেসের) দিকে বেশি মনোযোগ তৈরি হয়েছে এবং বিষয়বস্তুর প্রতি গুরুত্ব দ্রুত কমে এসেছে। যেমনঃ ইম্প্রেশনিজম, ফভইজম থেকে বেশি শুরু হয়েছিল বলে ধরা যায়।[২০৯] নিচের (৭.২২-৭.৩১) নং চিত্রের সারিতে ‘পিকনিক’ বিষয়কে অবলম্বন করে বিভিন্ন সময় বা ইজমের মাধ্যমে মডার্নিজমের ফর্মাল এবং স্পেসের ফ্লাটনেসের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অগ্রযাত্রাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

Plate: 7.22 Edouard Manet, Oil on canvas, Luncheon on the Grass, 1863, 81.9 × 104.5 inch.

---

207 মো. আব্দুল হালিম, ‘দার্শনিক প্রবন্ধাবলি’, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৬
অর্থাৎ এটা (জ্ঞানালোক যুগ) সেই ভাবধারাকে সুস্পষ্টরূপ দান করে, যাকে রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণ কর্তৃক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই যুগে বিভিন্ন ভাবধারা সংবলিত দার্শনিকবৃন্দের দ্বারা এই আন্দোলন প্রতিফলিত হয় এবং তারা সাধারণ শিক্ষা, অধিক জনপ্রিয় দর্শন, অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞান, পবিত্র গ্রন্থের সমালোচনা, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় অনুপ্রেরণা দান করেন। দার্শনিক লক, বার্কলে এবং হিউম এই যুগের দার্শনিক।

208 Gombrich 1958, p. 419.

209 Christopher L. C. E. Witcombe, “The Roots of Modernism”, 'Art history resources', 24 October, 1995, http://arthistoryresources.net/modernism/roots.html

Plate: 7.23 Giorgione, The Tempest (c. 1508). Gallerie dell'Accademia, Venice, Italy.

Plate: 7.24 The Pastoral Concert ca. 1510, by Giorgione or Titian, has been cited as an inspiration for Manet's painting.

Plate: 7.25 Antoine Watteau, La Partie Carrée, c. 1713

Plate: 7.26 Claude Monet, Le Déjeuner sur l'herbe, 1865-1866, Musée d'Orsay, Paris.

Plate: 7.27 James Tissot, La Partie Carrée, 1870.

Plate: 7.28 Edouard Manet, Luncheon on the Grass, Oil on canvas-(81.9×104.5 in), 1863

Plate: 7.29 Paul Cézanne, Le Déjeuner sur l'herbe, 1876-1877, Musée de l'Orangerie

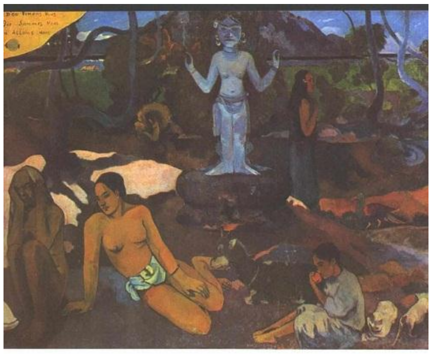

Plate: 7.30 Paul Gauguin, Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?, 1897. (detail).

Plate: 7.31 Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, 1907, MoMA

৭.২.১.২ শিল্পীদের চিন্তাগত প্রকৃতি

শিল্পীদের বেলায় দেখা যায়, শিল্পীদের মধ্যে এক শ্রেণির মানুষ অতিন্দ্রিয়তার ওপর নির্ভর করে ছবি আঁকেন এবং অন্য শ্রেণির শিল্পীরা বস্তুবাদী চিন্তাবিদ হিসেবে ছবি এঁকে যাচ্ছেন। আধুনিক শিল্পীদের

চিন্তাগুলো বস্তুবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, ভাববাদ ও বাস্তবভাববাদের সঙ্গে সংযুক্ত। মডার্ন আর্টে শিল্পীদের এই অনুভূতি ডাবল মাইন্ডনেস বা ছায়ার ছায়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। পোস্টমডার্ন ও তৎপরবর্তী শিল্পীরা এই ছায়ার ছায়া থেকে সরে এসেছেন। মডার্নিজমের প্রতি প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বা এর অগবেষণামূলক বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করতে গিয়ে কখনো বিদ্রুপাত্মক বা অবিদ্রুপাত্মক খেলা খেলেছেন। প্রয়োজনে কনভেনশনাল উপায়কে আবার গ্রহণ করেছেন ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে পুনরায় পরিচিত হয়েছেন রিপ্রেজেন্টেশনাল শিল্পের মাধ্যমে। হাই আর্ট ও লো-আর্টর সঙ্গে দূরত্ব ঘুচিয়ে ফেলেছেন। এ সমস্ত খেলাই চলছে রিয়ালিটিকে পুনঃপরীক্ষণ ও আবিষ্কারের জন্য। এভাবে পরবর্তী ধারাগুলো পূর্ববর্তী ধারাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এগিয়েছে।

শিল্পীদের অনুভূতি বা কল্পনার জগৎটি যেন ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তূপে পরিণত না হয় (অ্যাবস্ট্রাকশনের কল্পনাটির কথা বলা যেতে পারে) সেদিক দিয়ে মডার্নিজমের চেয়ে পোস্টমডার্নিজম ও তার পরবর্তী ধারাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, বিশেষ করে লিটারারি ক্রিটিসিজমের সাহায্যে অগবেষণামূলক বিষয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করার মতো প্রবণতাকে (skeptical) অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে। এটি আবার জ্ঞানতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতাবাদের (সায়েন্টিফিক ইম্প্রেসিসিজমে) সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে এটিও সত্য যে, শিল্পী মন্ময় ভাববাদ ও বাস্তব ভাববাদের বশবর্তী হয়ে অতিপ্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে যা আঁকেন তার সায়েন্সের কনসেপ্টের মতো অসামান্যতা ও অন্তর্নিহিত অর্থ আছে, যা সঠিক অর্থ তৈরি করতে পারে না। তারা এমন ইলুশন ও অনন্ত অস্তিত্বকে প্রকাশ করেন যেটা প্রতিটি মহৎ শিল্পকর্মকে চরিত্রময়তা দান করে এবং ফর্মকে খুব মিস্টিরিয়াস ডেপথ দেয়।[২১০] যেমন বারোক সময়ের ক্লাসিক্যাল শিল্পকর্মগুলোর কথা বলা যায়।

কারণ একটি বিষয় না উল্লেখ করলেই নয় যে, দার্শনিকরা যেমন বস্তুর রিয়ালিটি উদ্ভাবনে এক দিক থেকে অতি বা অতিপ্রাকৃতিক অস্তিত্বের নেগেটিভ প্রভাব থেকে সাবধান থাকতে বলেছেন, তেমনি এই অতিপ্রাকৃতিক অস্তিত্বের পজিটিভ ব্যবহারও শিল্পী ও দার্শনিক উভয়ের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে। তাই জগৎ আজ এত উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে। যেমন দেকার্তের (১৫৯৬–১৬৫০ খ্রি.) কথা বলা যেতে পারে। তিনি

---

[210] কান্ট (Kant Immanuel, ১৭২৮–১৮০৪) আবিষ্কার করলেন যে, ডিজাইনে সৌন্দর্যের সারাংশ হচ্ছে সে নিজে নিজেই উপলব্ধিবোধ জাগ্রত করে। সেখানে আমাদের মনে ছন্দায়িত খেলা হয় (ফ্যাকাল্টিতে হারমোনিয়াস প্লে হয়)—সেন্স, ফিলিং, ইমাজিনেশন এবং আন্ডারস্টান্ডিংয়ের (আর্ট এফপ্রসিয়েশন ও আর্ট ক্রিটিসজম) ডাইনামিক ভারসাম্যাবস্থাকে অনুরূপ করে ফুটিয়ে তোলে এবং এটি ওয়ার্ক অফ আর্ট দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই হারমোনিয়াস স্টেট অবশ্যই একদিক থেকে বুঝতে পারা যায় এমন (কমিউনিকেবল) শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তখন এই ফর্ম অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত (ইনওয়ার্ড ও আউট ওয়ার্ড) এই উভয় দিক দিয়ে কাজের (ওয়ার্কের) ডিজাইন ও মনের হারমোনি এবং ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির মাধ্যমে ফর্মকে কমিউনিকেট করতে পারে। জিনিয়াস, টেলেন্টরা '*Geist*- ~soul or ~spirit'-এর দ্বারা সুন্দর শিল্পকর্ম তৈরি করেন।[২১০] যেটা এমনই একটি ধারণ করার ফ্যাকাল্টি এবং 'esthetic ideas'কে অভিব্যক্ত করে। এ ধরনের আইডিয়ার সায়েন্সের কনসেপ্টের মতো অসামান্যতা ও অন্তর্নিহিত অর্থ আছে, যা সঠিক অর্থ (ডেফিনিট মিনিং) তৈরি করতে পারে না। তারা এমন ইলুশন ও অনন্ত অস্তিত্বকে (সিগনেফিকেন্ট প্রভাইড) প্রকাশ করে, যেটা প্রতিটি মহৎ শিল্পকর্মকে চরিত্রময়তা দান করে (এভরি গ্রেট ওয়ার্ক অফ আর্টকে ক্যারেক্টারাইজ করে) এবং ফর্মকে খুব মিস্ট্রিয়াস ডেপথ প্রদান করে।

বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। বস্তুর গতির প্রশ্নে বলেন, ঈশ্বর গতি ও স্থিতি উভয়ই বস্তুর মধ্যে তৈরি করেন এবং গতি ও স্থিতির অপরিবর্তনীয়তা তিনি রক্ষা করেন। মানুষের দেহ ও মন পাইনিয়াল গ্লান্ড নামক একটি তন্ত্রীর মাধ্যমে মিলিত হয়ে দেহ ও মন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে সম্পর্কিত। বাস্তবে পাইনিয়াল গ্লান্ড বলে কিছু নেই। কিন্তু জ্ঞানলাভের প্রশ্নে তিনি সন্দেহবাদের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন— এমন একটি ভিত্তি থেকে শুরু করতে হবে, যা সর্বপ্রকার সন্দেহের ঊর্ধ্বে। তাই তিনি সন্দেহবাদ পোষণ করতে করতে 'আমার অস্তিত্ব সন্দেহের ঊর্ধ্বে'— এই সিদ্ধান্তে আসেন। নিজের অস্তিত্ব সন্দেহাতীত, এই সূত্রকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করে আমরা জগতের সুনিশ্চিত জ্ঞানমণ্ডল আবার তৈরি করতে পারি বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বটি সাধারণ র‌্যাশনালিজম বা যুক্তিতত্ত্ব নামে পরিচিত। এক দিক থেকে বস্তুবাদী মত দ্বারা তিনি যেমন গোঁড়ামির বেড়াজাল ভেঙে চিন্তার মুক্তিকে সাহায্য করেছেন, তেমনি অপর দিকে অতিপ্রাকৃতিক অস্তিত্বে জ্ঞানের মূল স্থাপন করে তিনি ইউরোপের আধুনিক দর্শনে ভাববাদী ধারারও প্রবর্তন করেন।' অর্থাৎ মন্ময় ও বাস্তব ভাববাদের ধন্যাত্মক যৌক্তিকতা অনুমেয়।[২১১] (ভাবার্থ, দর্শন কোষ, সরদার ফজলুল করিম, পৃ. ১৩১)। ফলে শিল্পীদেরও মন্ময় ভাববাদ ও বাস্তব ভাববাদের সমন্বিত প্রয়াসে সৃষ্ট শিল্পকর্মেরও একটি ধন্যাত্মক প্রভাব রয়েছে। যেমন বাংলাদেশে শিল্পী শহীদ কবির স্পষ্টতই বলেন— ছবি আকার পূর্বে ক্যানভাসের সামনে বসে ধ্যান করেন, তার পর ওনার মধ্য দিয়ে ওনাকে দিয়ে অন্য কেউ কাজ করিয়ে নেন। আধুনিক সময়ে এসেও একধরনের শিল্পীরা অতিপ্রাকৃতিক অস্তিতের (বিধাতা প্রদত্ত অভিজ্ঞতা) ওপর নির্ভর করে আজও কাজ করছেন। সেইসঙ্গে কম্পোজিশন ও ছবি শেষ হওয়ার ক্ষেত্রে যুক্তির অবতারণা করেন। ফলে বিধিপ্রদত্ত ভাব + যুক্তি (বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতাবাদ) = বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদ। এভাবে অভিজ্ঞতাবাদ বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদে পরিণত হয়েছে।

Plate: 7.32 Shahid Kabir, Plate Litho, 27x33 cm, 2015, Collection-F.F.A, D.U.

211 সরদার ফজলুল করিম, 'দর্শন কোষ' প্রথম সং ২০০২, পৃ. ১৩১

চেতনাসহ বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যকার অন্তর্নিহিত সংযোগসূত্র প্রকাশে এই বস্তুবাদ ব্যর্থ হয়। কারণ বস্তু নিয়ত বিবর্তিত হচ্ছে। বস্তুর বিবর্তনে চেতনার উদ্ভব ঘটেছে, তেমনি চেতনার শক্তি বস্তুর বিবর্তনে এবং বস্তুর বৈচিত্র্যের বৃদ্ধিতে এক মাধ্যমের ভূমিকা পালন করে। বস্তুর বিকাশের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তুলনামূলকভাবে সহজ থেকে জটিলতা প্রাপ্তি। বস্তুর বিকাশ যত জটিল, তত বিচিত্র তার প্রকাশ এবং তাদের মধ্যকার অভ্যন্তরিক সম্পর্ক। বস্তুর বিকাশের চরম পর্যায়ে চেতনাসম্পন্ন মানুষের উদ্ভব ঘটেছে। চেতনা বস্তুর বিকাশের ফল হলেও চেতনা ও বস্তুর চরিত্র এত পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয় যে, এই বিরোধিতার ভিত্তিতে ভাববাদী দার্শনিকগণ চেতনাকে বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং বস্তুর চেয়েও আদি এবং মূল সত্তা বলে দাবি করেন।[২১২] কিন্তু অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বস্তুবাদী দার্শনিক ডিডেরট, হেলভেটিয়াস, হলবাক এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার প্রয়াস পান। এর পরবর্তী পর্যায়ে জার্মান দার্শনিক ফয়েরবাকের[২১৩] মধ্যে আমরা নৃতাত্ত্বিক বস্তুবাদের বিকাশ দেখি। মানুষের জ্ঞান ও চেতনা কেবল ব্যক্তিক নয়, ফয়েরবাক মনে করতেন জ্ঞান এবং জ্ঞাতা, বিষয় ও বিষয়ীর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতেই জ্ঞানের উদ্ভব। দেকার্তে যেমন ভাবতেন: বস্তু ও মন পাইনিয়াল গ্লান্ডের মাধ্যমে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্রে আবদ্ধ। তার সঙ্গে মিল রয়েছে। কাজেই জ্ঞান হচ্ছে সামাজিক প্রক্রিয়া।[২১৪] বস্তুবাদের পূর্ণতর বৈজ্ঞানিক বিকাশ ঘটেছে ঊনবিংশ শতকের কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিক অ্যাঙ্গেলস[২১৫] এবং লেনিনের দার্শনিক চিন্তাধারায়। অ্যাঙ্গেলস তার ‘অ্যান্টিডুরিং’ নামক বইয়ে ডুরিং নামক সমকালীন এক লেখক

---

[212] সরদার ফজলুল করিম, ‘দর্শন কোষ’, প্রথম সং, প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২৭৯

[213] তদেব. পৃ.১৭০,

ফয়েরবাক: জন্ম ১৮০৪–৭২, তিনি ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশের বিশ্লেষণ করে ভাববাদের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক প্রমাণ করেন। হেগেলের দ্বান্দ্বিকতার মূল চরিত্র যে ভাববাদ তাও ফয়েরবাক বিশ্লেষণ করে দেখান। জ্ঞানতত্ত্বে তিনি অজ্ঞেয়বাদের বিরোধিতা করেন। জ্ঞানের উৎস হচ্ছে অভিজ্ঞতা এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে মনের ভূমিকা অস্বীকার করেননি। মানুষের জ্ঞান ও চেতনা কেবল ব্যক্তিক নয়, ফয়েরবাক মনে করতেন জ্ঞান এবং জ্ঞাতা, বিষয় ও বিষয়ীর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতেই জ্ঞানের উদ্ভব। (দেকার্তে যেমন ভাবতেন: বস্তু ও মন পাইনিয়াল গ্লান্ডের মাধ্যমে পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সূত্রে আবদ্ধ। তার সঙ্গে মিল রয়েছে।) কাজেই জ্ঞান হচ্ছে সামাজিক প্রক্রিয়া। কিন্তু মার্কস এবং অ্যাঙ্গেলসের মতে ফয়েরবাক উনিশ শতকের বস্তুবাদীদের পথিকৃৎ হলেও তাঁর চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতা ছিল। ইতিহাস ও সমাজের মধ্যে তিনি যেমন ধর্মের উৎপত্তি নির্দেশ করে সমাজবিজ্ঞানীর ভূমিকা পালন করেছেন, তেমনি আবার ধর্মকে মানুষের অচেতন আত্মচেতনার প্রকাশ বা নিজের চরিত্রের বাস্তব রূপায়ণ বলে তিনি ধর্মের ভাববাদী ব্যাখ্যার রহস্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছেন। মানুষের নীতিবোধকেও তাই তিনি বাস্তব পরিবেশ ও সমাজনির্দিষ্ট বিষয়ের চেয়ে মানুষের চিরন্তন সুখান্বেষী স্বভাবের প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ফয়েরবাক নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের সাক্ষাৎ পূর্বগামীদের অন্যতম ছিলেন।

[214] সরদার ফজলুল করিম, ‘দর্শন কোষ’, প্রথম সং, প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০২, পৃ.১৭০

[215] সরদার ফজলুল করিম, তদেব. পৃ.৫৮,

অ্যাঙ্গেলসের অ্যান্টিডুরিং সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে, কারণ অ্যাঙ্গেলস তার ‘অ্যান্টিডুরিং’ নামক বইয়ে ডুরিং নামক সমকালীন এক লেখক মার্কসবাদের ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন। সেখানে ভুল ব্যাখ্যার সমালোচনা হিসেবে ১৮৭৬ সালে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। মার্কসবাদের তিনটি মূল দিকের ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে গিয়ে তৃতীয় ভাগে তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করেন এবং কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তার পার্থক্য নির্দিষ্ট করে দেন। সমাজতন্ত্রে এবং সাম্যবাদে দ্রব্যের উৎপাদন এবং বণ্টন কী রূপ গ্রহণ করবে, পরিবারের কী রূপান্তর ঘটা সম্ভব, শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে পুনর্গঠিত হবে, শহর ও গ্রামের মধ্যকার বিরোধ কীভাবে বিলুপ্ত হবে, দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের পার্থক্য নির্ধারিত হবে।—সমাজতান্ত্রিক সমাজের ইত্যাকার সমস্যারও অ্যাঙ্গেলস আলোচনা করেন এবং তা সমাধানের সূত্র ব্যাখ্যা করেন।

মার্কসবাদের ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন। সেখানে ভুল ব্যাখ্যার সমালোচনা হিসেবে ১৮৭৬ সালে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। মার্কসবাদের তিনটি মূল দিকের ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে গিয়ে তৃতীয় ভাগে তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করেন এবং কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তার পার্থক্য নির্দিষ্ট করে দেন। সমাজতন্ত্রে এবং সাম্যবাদে দ্রব্যের উৎপাদন এবং বণ্টন কী রূপ গ্রহণ করবে, পরিবারের কী রূপান্তর ঘটা সম্ভব, শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে পুনর্গঠিত হবে, শহর ও গ্রামের মধ্যকার বিরোধ কীভাবে বিলুপ্ত হবে, দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের পার্থক্য নির্ধারিত হবে— সমাজতান্ত্রিক সমাজের ইত্যাকার সমস্যারও অ্যাঙ্গেলস আলোচনা করেন এবং তা সমাধানের সূত্র ব্যাখ্যা করেন।[২১৬] প্রাচীন বস্তুবাদের প্রকৃতিগত স্বাভাবিক, হেগেলের দ্বন্দ্বের তত্ত্ব এবং মনুষ্যসমাজের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। মার্কসীয় বস্তুবাদ[২১৭] বর্তমান বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের হাতে নতুনতর সংগতিপূর্ণ মানুষ্যসমাজ তৈরির প্রধান হাতিয়ার। বস্তুত দর্শনের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত যেখানে ভাববাদের প্রাধান্য ছিল, সেখানে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে দ্বন্দ্বমূলক বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের (এর ব্যাখ্যাটা প্রয়োজন) প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে।[২১৮] তবে চেতনাসহ বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যকার অন্তর্নিহিত সংযোগসূত্র প্রকাশে এই বস্তুবাদ এখনো পর্যন্ত সামগ্রিকতার সমাধান দিতে এগিয়েছে বটে, কিন্তু পুরোপুরি সক্ষম হয়নি। কারণ 'কেউ কেউ অনুমান বা বিমূর্ত ধারণাকে ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ হয়ে জন্মগত বা বিধিদত্ত ভাবেরও আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।'[২১৯] আবার শিল্পীদের বেলায় দেখা যায়, শিল্পীদের মধ্যে এক শ্রেণির মানুষ অতীন্দ্রিয়তার ওপর নির্ভর করে ছবি আঁকেন এবং অন্য শ্রেণি বস্তুবাদী চিন্তাবিদ হিসেবে ছবি এঁকে যাচ্ছেন।

বাস্তবতার সামগ্রিকতা সম্পর্কে পল ক্লির বক্তব্য হচ্ছে—

---

216 সরদার ফজলুল করিম, তদেব. পৃ.৫৮,

217 সরদার ফজলুল করিম, 'দর্শন কোষ', প্রথম সং, প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৫৮
মার্কসিস দর্শন ও মার্কস ইজম এক জিনিস নয়। মার্কসইজম হলো মার্ক, অ্যাঙ্গেলস, লেলিন ও স্ট্যালিনের দর্শনের প্রয়োগ এবং এর ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতে তার সমাধানকল্প। তাই মার্কসিজমকে বিজ্ঞান বলা হয়। মার্কসই প্রথম দার্শনিক যিনি বলেন: অ্যাবসলিউট ট্রু বলে কিছু নেই। অ্যাঙ্গেলস মার্কস থেকে নিয়ে বলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাস্তবমূলক সমাধান করতে হবে। হেগেলের দর্শনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারা দ্বান্দিক জড়বাদ বা বস্তুবাদ: শিল্পবিপ্লব থেকে উদ্ভূত সমাজসংগ্রাম থেকে দ্বান্দিক জড়বাদ বা বস্তুবাদের উদ্ভব। কার্ল মার্কস জন্ম : ১৮১৮–১৮৮৩, দ্বান্দিক বস্তুবাদের জন্মদাতা। মার্কসের প্রকল্প তাত্ত্বিক নয়—এটা অত্যন্ত বাস্তব, মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন ও সম্পদ কাঠামোর পরিবর্তনে সহায়ক। মার্কস একজন কঠোর জড়বাদী। তার দর্শন বাস্তব ও জীবনমুখী, বঞ্চিত-শোষিত ও বিত্তহীন শ্রেণির জন্য। মার্কস ও অ্যাঙ্গেলসের মতবাদের সম্প্রসারিত ও বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন লেলিন, স্ট্যালিন, ক্রুশেচভ ও মাও সে তুং।

218 সরদার ফজলুল করিম, তদেব. পৃ. ২৭৫, ২৭৬

219 তদেব. পৃ. ১৫৪

> We used to represent things visible on earth…. Now we reveal the reality of visible things, and thereby express the belief that visible reality is merely an isolated phenomenon latently outnumbered by other realities. Things take on a broader and more varied meaning, often in seeming contradiction to the rational experience of yesterday….In the end, a formal cosmos will be created out of purely abstract elements of form quite independent of their configuration as objects, beings, or abstract things like letters or numbers.[220]

এর সঙ্গে মিল রয়েছে হেগেলের সামগ্রিকতার। আর সেটি হলো: কোনো কিছুর তাৎপর্য বিচ্ছিন্নভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সবকিছু নিয়ে সমগ্র এবং সমগ্রের মধ্যে সবকিছু। কিন্তু এই সমগ্র ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। এই সমগ্র ব্যক্তির কেবল বুদ্ধি, যুক্তি ও মন দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে। এই সমগ্র কোনো বিশেষ বস্তু নয়। আবার কোনো বিশেষ বস্তু এই সমগ্রের বাইরেও নয়। এই সমগ্র কোনো ব্যক্তির মনের কল্পনাও নয়। এখানে বলা যায়—তাহলে শিল্পীর কল্পনা ও সামগ্রিকতাকে কতটা প্রকাশ করতে পারেন আবার ব্যক্তি মন ছাড়া এ সমগ্রের উপলব্ধি করতেও অক্ষম। হেগেল সমগ্রের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ককে দ্বন্দ্বমূলক বললেও সমগ্রকে যেহেতু তিনি বস্তু বলতেও অস্বীকার করেছেন এবং তাকে ব্যক্তিক মনের বাইরের অস্তিত্ব বলে বর্ণনা করেছেন— এ কারণে হেগেলের ভাববাদকে বাস্তবভাববাদ বলে অভিহিত করা হয়। ভাববাদী দর্শনের সাম্প্রতিক ইতিহাসে যে সমস্ত নতুনতর তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তার মধ্যে পজিটিভিজম বা দৃষ্টসত্তাবাদ, নিওরিয়ালিজম বা নব্য বাস্তববাদ, এক্সিটেনশালিজম বা অস্তিত্ববাদ, জীবনের দর্শনবাদ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।[২২১] কাজেই এটি যুক্তিযুক্ত যে, আধুনিক শিল্পীদের চিন্তাগুলো ভাববাদ ও বাস্তব ভাববাদের সঙ্গে সংযুক্ত। কিছু শল্পী আবার আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী। যার চিন্তা সহজ কথায় বলতে গেলে, মানুষ গড়ের কাছ থেকে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে তার মাধ্যমে বস্তু বা কোনো কিছু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে— এমন ভাববাদী অভিজ্ঞতাবাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রয়েছে বলে মনে হতে পারে। অন্যদিকে মন যেহেতু সব কিছুকে ভেঙেচুড়ে অন্যভাবে ভাবতে পারে, তাই মনের এ ক্ষমতাকে গ্রহণ করে এ দুটির সমন্বয়ে বস্তু বা অবস্তু সম্পর্কে শিল্পীও জ্ঞান লাভ করেন। ফলে শিল্পীর চিন্তা বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলা যায়। তা না হলে জগতের জ্ঞানমণ্ডল ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তূপে পরিণত হতো। ১৮ শতকে এনলাইটমেন্ট দেখলে যে যুক্তির মানবতাবাদী বিশ্বাস, জ্ঞানীয় পরিপক্বতা

---

[220]. Helen Gardner, *Art Through the Ages*, The twentieth century, eighth edition, p. 889; In Magrgaret Miller, ed., Paul Klee (New York: Museum of Modern Art, 1946), p. 13

[221] সরদার ফজলুল করিম, 'দর্শন কোষ', প্রথম সং, প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২০৭–২০৮

(ইন্টেলেকচুয়াল ম্যাচিউরিটি) মানুষের প্রাথমিক অনুসরণযোগ্য আদর্শ ছিল, যুক্তির মাধ্যমে মন জ্ঞানালোকে আলোকিত হয় এবং আলোকিত মনের জন্য পুরো একটি নতুন বিশ্ব উন্মোচিত হয়।
কাজেই এক দিক থেকে শিল্পীর সৃষ্ট বাস্তবতাকে বাস্তব ভাববাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত বলে ধরে নেওয়া যায়। আবার জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে মডার্নিজমের পরবর্তী চিন্তাধারার সঙ্গেও সম্পৃক্ত। তার প্রমাণ হচ্ছে— আজকের বহির্বিশ্বের শিল্পকলার সঙ্গে দর্শনের সম্পর্কটি সুস্পষ্ট। সেই সূত্র ধরে বাংলাদেশের শিল্পকলায়ও এর স্রোত বহমান। তাই এ দেশের লিথোগ্রাফিতে এর কোনো চিত্ররূপ পাওয়া যায় কি না, সে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে নিম্নরূপ উপায়ে যৌক্তিতাকে অবলম্বন করে ভাবা যেতেই পারে।

৭.৩ বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিগুলোকে পোস্টমডার্ন শিল্প বা এর অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিতকরণ

বাংলাদেশের কিছু শিল্প যদি পোস্টমডার্ন গুণাগুণসম্পন্ন হয়ে থাকে, সেগুলোকে যে যুক্তির অবতারণায় পোস্টমডার্ন শিল্প বলা হচ্ছে, সেটা খুঁজে বের করে এর সঙ্গে লিথোগ্রাফিগুলোর কী ধরনের সাদৃশ্য কিংবা সম্ভাবনা রয়েছে তা অনুসন্ধান করা যেতেই পারে। নিম্নলিখিত কয়েকটি গুণাগুণের ওপর নির্ভর করে এ দেশের লিথোগ্রাফিতে পোস্টমডার্ন চরিত্রের উপস্থিতি সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারেঃ

(ক) বিশ্ব শিল্পকলার মতো বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির ক্ষেত্রেও শিল্পীরা মডার্নিজমের double-mindedness (ছায়ার ছায়া) থেকে বের হয়ে এসেছেন।

(ক.১) J. M. Thompson তার *The Hibbert Journal* (বছরে চারটি দার্শনিক রিভিউ বের হয়)-এ বলেনঃ ধর্মীয় সমালোচনায় বিশ্বাস ও প্রবণতার পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে পোস্টমডার্নিজম ছায়ার ছায়া (double-mindedness) থেকে বের হয়ে এসেছে একে সমালোচনার মধ্য দিয়ে। পোস্টমডার্নিজম এমন ধরনের ধারণা পোষণ করে যে— সকল উন্নততর মনোভাব ও ভঙ্গি অস্থায়ী ও অসচেতন। সেইসঙ্গে বিরোধিতা, বিদ্রুপাত্মক, হাস্যরসিকতা হচ্ছে একমাত্র অবস্থান, যাকে সমালোচনা অথবা পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে বিনাশ করা সম্ভব নয়। 'Pluralism and diversity'[222] গুলো হচ্ছে পোস্টমডার্নিজমকে সংজ্ঞায়িত করার বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্য বিশেষ নিবন্ধ রচনা করা।

---

[222] Pluralism: একটি কমন সিভিলাইজেশনের মধ্যবর্তী সমাজের একটি অবস্থা বা ক্ষেত্র, যার ভেতরকার বিভিন্ন যেমন নৃতাত্ত্বিক, জাতিসংক্রান্ত (সম্প্রদায়), ধর্মীয় অথবা সোশ্যাল গ্রুপের সদস্যরা একটি স্বায়ত্তশাসন (অটোনোমাস/স্বায়ত্তশাসিত-autonomous) অংশগ্রহণ মেইন্টেন্যান্স করে এবং তাদের ট্র্যাডিশনাল সংস্কৃতি অথবা বিশেষ ইচ্ছার উন্নতির ক্ষেত্রেও সেটা মেনে কাজ করা হয়। (a state of society in which members of diverse ethnic, religious or social groups maintain an autonomous participation in and development of their traditional culture or special interest, within the confines of a common civilisation.)

(ক.২) নির্দিষ্টভাবে মডার্ন ধারাগুলো সাধারণভাবে উল্লেখ করে— ফর্মের বিশুদ্ধতা, মাধ্যমের গুরুত্ব, শিল্পের জন্য শিল্পী, যথার্থতা বা সত্যতা, সর্বজনীনতা, মৌলিকতা বা অভিনবত্বকে এবং বৈপ্লবিক ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা বা ঝোঁক ইত্যাদি এভান্টগ্রেডকে। যাই হোক, আপাতবিরোধী হলেও সত্য (paradox-আপাতবিরোধী হলেও সত্য) হচ্ছে— সম্ভবত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মডার্নিস্ট আইডিয়ার বিরুদ্ধে পোস্টমডার্নিজমের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা। আপাতবিরোধী হলেও সত্যিকার মডার্নিস্ট কর্মপ্রচেষ্টা বা উদ্যোগের কেন্দ্রটা মেনেটের দ্বারা পরিচিত হয়েছিল। মেনেটের ব্যতিক্রমী উপস্থাপিত শিল্প (রিপ্রেজেন্টশনাল আর্ট) ধারণাগত বাস্তবতা (রিয়ালিটির) থেকে বের হয়ে নকশার উপস্থাপন, অ্যাবস্ট্র্যাকশন ও রিয়ালিটির প্রতি গুরুত্ব এনেছিল। এই 'আপাতবিরোধী হলেও সত্য' বিষয়টির ব্যাপারে কনসেপচুয়াল শিল্পীরা পূর্ববর্তী শিল্পী মেনেট থেকে হাইলি উদ্দীপিত হয়েছিল। বাংলাদেশের শিল্পীরাও এই সীমানাবহির্ভূত শিল্পচর্চা করেননি।

(ক.৩) তা ছাড়া ১৯৭১ সালে দি ইনস্টিটিউট অব কনটেম্পর‍্যারি আর্ট, লন্ডনে মেল বোঁচার (Mel Bochner) শিল্প সম্পর্কিত ভাষণে বলেনঃ শিল্পে 'পোস্টমডার্নিজম' শুরু হয়েছিল জেসপার জোনস (Jasper Johns) থেকে— 'যিনি প্রথম সেন্স-ডাটা ও সিঙ্গুলার পয়েন্ট অফ ভিউকে পরিত্যাগ করে তার শিল্প রচনা করেছেন এবং শিল্পকে সমালোচনামূলক অনুসন্ধান (critical investigstion) হিসেবে গ্রহণ করেছেন।'[২২৩] তেমনি বাংলাদেশের বর্তমান কিছু লিথোগ্রাফিতেও 'সিঙ্গুলার পয়েন্ট অফ ভিউ'কে পরিত্যাগ করে সমালোচনামূলক অনুসন্ধান শুরু হয়েছে।

Plate:7.33 Jasper Johns, Graphite wash, metallic pigment, pencil, and pastel on paper, Watchman, 38x26 inch, 1966

Plate: 7.34 Jasper Johns, lithography, Watchman, 34x23 inch, 1967

Plate: 7.35 Palsh Baran Biswas, lithography & woodcut, 2013, 28x90 cm.

---

[223] "Postmodernism", 'Wikipedia, the free encyclopedia', https://en.wikipedia.org/wiki/Postmodernism, 10 September 2015

(ক.৪) Peter Drucker (November 19, 1909–November 11, 2005)[224] মতামত দেন (সাজেস্ট করেন) যে, পোস্টমডার্ন বিশ্বের দিকে প্রতিস্থাপনটি ঘটে ১৯৩৭ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে। তিনি এটিকে 'nameless era' নামকরণ করেছেন। কনসেপচুয়াল বিশ্বে প্রতিস্থাপন করার মাধ্যমে চরিত্রায়ণ করেছেন। আর প্রতিস্থাপনটা হয়েছে যান্ত্রিক (মেকানিক্যাল) কারণের চেয়ে প্যাটার্ন পারপাস ও প্রসেসের ওপর নির্ভর করে, যেটা চারটি রিয়ালিটির মাধ্যমে আউটলাইন করা হয়ঃ শিক্ষিত সমাজের উত্থান, ইন্টারন্যাশনাল উন্নয়নের গুরুত্ব, জাতীয় স্টেটকে প্রত্যাখ্যান, নন-ওয়েস্টার্ন কালচারের অস্তিত্ব ভেঙে পড়া।[২২৫] এই শিক্ষিত সমাজের উত্থান, ইন্টারন্যাশনাল উন্নয়নের গুরুত্ব বিষয়টি বাংলাদেশের প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের দর্শণেও লক্ষণীয়। কারণ সফিউদ্দীন আহমেদের মতো শিল্পীরা যে কারণে কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে 'ওয়েস্টার্ন পেইন্টিং' বিষয়ে পড়াশোনা করেছিলেন, তার সঙ্গে যেমন বিষয়টি জড়িত, তেমনি নবীনদের বেলায়ও বিষয়টি প্রযোজ্য। সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে বাংলাদেশের বর্তমান বেশ কিছু লিথোগ্রাফিতেও আন্তর্জাতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনুধাবিত হয়েছে।

Plate:7.36 Kamruzzaman, Lithography, Restoration-3, 2016, 90x78 cm

[224] Peter Drucker {November 19, 1909–November 11, 2005) was an Austrian-born American management consultant, educator, and author, whose writings contributed to the philosophical and practical foundations of the modern business corporation. He was also a leader in the development of management education, he invented the concept known as management by objectives and self-control, and he has been described as 'the founder of modern management'.}, https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker

[225] The emergence of Educated Society, the importance of international development, the decline of the nation state, and the collapse of the viability of non-Western cultures.

(ক.৫) পোস্টমডার্ন শিল্পের একটি চরিত্র হচ্ছে— ইন্ডাস্ট্রিয়াল যন্ত্রপাতি ও পপ সংস্কৃতির ইমেজের ব্যবহার দ্বারা হাই ও লো সংস্কৃতির দূরত্ব ঘোচানো হয়েছে। শিল্পের লো ফর্মের ব্যবহারগুলো আধুনিকতার পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি অংশ হিসেবে ভালোভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন নথিভুক্ত করা হয়েছিল Kirk Varnedoe and Adam Gopnikএর ১৯৯০–৯১-এর প্রদর্শনীতে *High and Low: Popular Culture and Modern Art* –এ, যেটি New York's Museum of Modern Art-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, প্রদর্শনীটি ছিল সর্বজনীন, an exhibition that was universally panned [বিস্তারিত আলোচনা করেছেন] at the time as the only event that could bring Douglas Crimp and Hilton Kramer together in a chorus of scorn [অবজ্ঞা (N), ঘৃণা করা]। পোস্টমডার্নকে একটি উপায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়— যার ভেতর দিয়ে এই অনুভূতি তৈরি করে যে, ফাইন বা হাই আর্ট এবং যেটাকে সাধারণভাবে বা অগভীর (low or kitsch) আর্ট হিসেবে দেখা হয়— সেই দূরত্বকে মুছে দেয়। যখন হাই ও লো আর্টের সঙ্গে এই 'blurring' অথবা 'fusing'-এর কনসেপ্টটি নিয়ে মডার্ন সময়ে নিরীক্ষা শুরু হয়, এটা সবসময়ের জন্য পোস্টমডার্ন যুগে আবির্ভাব ঘটেছে। পোস্টমডার্নিজম তার শৈল্পিক পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক, অগভীর এবং নন্দনতাত্ত্বিক সাধারণ কর্মশালার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে এবং অতীত পিরিয়ড থেকে স্টাইল নিয়েছে, যেমনঃ গোথিজম, রেনেসাঁস এবং বারোক থেকে নেওয়া হয়েছে।[২২৬] বাংলাদেশের নবীন শিল্পীদের বেশির ভাগ কাজেই সেই গুণাবলির উপস্থিতিকে জানান দেয়।

উপরোক্ত গুণাবলি বাংলাদেশের শিল্পীদের শিল্পকর্মেও লক্ষণীয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের নবীন শিল্পীদের কাজগুলো ডাবল মাইন্ডনেসের সঙ্গে যতটুকু না সংযুক্ত, তার চেয়ে বেশি পরিচালিত হচ্ছে মডার্ন ট্রেন্ডগুলোকে (ফর্মের বিশুদ্ধতা, মাধ্যমের গুরুত্ব, শিল্পের জন্য শিল্পী, যথার্থতা বা সত্যতা, সর্বজনীনতা, মৌলিকতা বা অভিনবত্বকে এবং বৈপ্লবিক ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা বা ঝোঁক ইত্যাদি এভান্টগ্রেডকে) অস্বীকার করে।

(খ)

(খ.১) যে চরিত্রগুলো শিল্পকে postmodern হিসেবে তৈরি হতে সাহায্য করেছে সেই চরিত্রগুলো ব্রিকোলাজের (bricolage, French for 'DIY' or 'do-it-yourself projects') সঙ্গে সম্পর্কিত বা

---

[226] Wikipedia, the free encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Postmodern_art,_16 March 2017, at 15:08

সংযুক্ত, সেইসঙ্গে আধুনিক সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অতীতের বিষয় ও শৈলির পুনর্ব্যবহারযোগ্য (recycling), শব্দকে শৈল্পিক উপকরণের (এলিমেন্টের) কেন্দ্র হিসেবে শব্দের ব্যবহার করা— যেটা প্রয়োগবাদ ও বিশ্লেষণী দর্শনে দেখতে পাওয়া যায় এবং কোলাজ, সরলীকরণ (simplification) ও appropriation-এর সঙ্গে সম্পর্কিত।[২২৭]

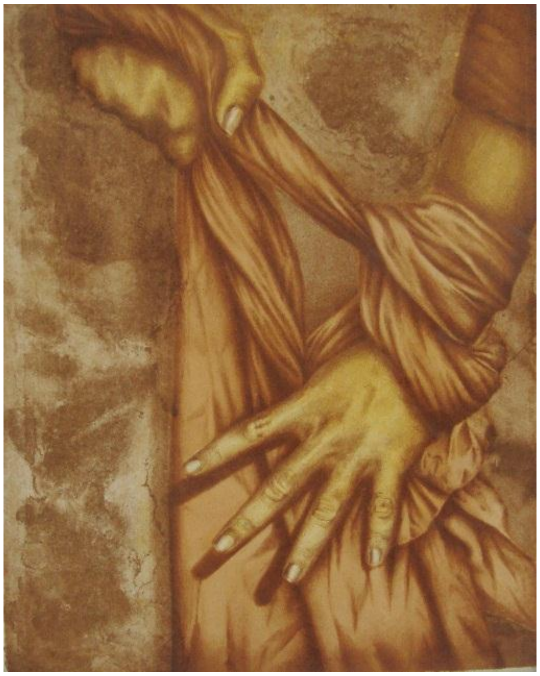

Plate: 7.37 Rashida Akter (Boby), Lithography,

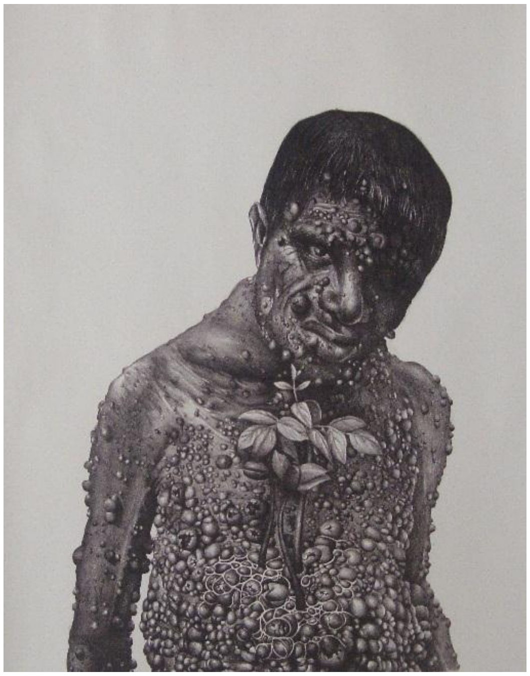

Plate: 7.38 Papri baroi Ratri, litho, 15x12inch, 2016

বাংলাদেশের প্রবীণ থেকে নবীন শিল্পীদের শিল্পকর্মে বিষয়টির ছাপ সুস্পষ্ট। নবীন শিল্পীদের কাজগুলো যেমন bricolage (French for 'DIY' or 'do-it-yourself projects')-এর সঙ্গে সম্পর্কিত, তেমনি প্রবীণ শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়ার কাজকেও বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কিছু কাজ অন্তত ব্রিকোলাজ এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনের সঙ্গে সংযুক্তিকতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সাবজেক্টিভিটি, নন-অবজেক্টিভিটি এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনের সংজ্ঞা মতে, কোনো সাবজেক্ট দেখে অঙ্কন করলে তাকে সাবজেক্টিভ কাজ বলা হয়। কোনো বিষয়ে পূর্ব ধারণা না নিয়ে ক্যানভাসে অঙ্কন শুরু করে অবচেতন মন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করলে ছবিটি নিজে যা প্রকাশ করবে, সে ধরনের শিল্পকে নন-অবজেক্টিভ শিল্প বলা হয়ে থাকে। আর পোস্টমডার্ন সময়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে, শিল্পকর্মটি 'একটি রিয়েল অবজেক্টের অথবা একটি একজিসটেন্ট ওয়ার্ক অফ আর্ট-এর ওপরও (একটি ওয়ার্ক অফ আর্টকে ছাড়িয়ে) একটি স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম'

[227] "Postmodern art", 'Wikipedia, the free encyclopedia', https://en.wikipedia.org/wiki/Postmodern_art; "Art and Writers", 'Wikipedia, the free encyclopedia' http://literatureandwriters.info/2014/03/22

হিসেবে পরিগণিত হয় ('the taking over, into a work of art, of a real object or even an existing work of art.')। টেট গ্যালারি এই চর্চাকে চিহ্নিত করেছিল কিউবিজম ও দাদাইজমে ফেরত গিয়ে, চালু রেখেছিল ১৯৪০-এর দশকের সুরিয়ালিজম এবং ১৯৫০-এর দশকের পপ আর্ট পর্যন্ত। এটা আবার গুরুত্বসহকারে ফেরত এসেছিল ১৯৮০-র দশকের Neo-Geo[228] শিল্পীদের মধ্য দিয়ে। এই অর্থে মো. কিবরিয়ার কিছু শিল্প তো নিশ্চয়ই এর মানসম্পন্ন গুণাগুণ বহন করে চলছে। যেমনঃ তার মেনেনজাইটিস অসুস্থতার মধ্যবর্তী সময়ে তিনি যে ঘোরের মধ্যে ছিলেন, সেখান থেকে জীবনে ফিরে এসে যে ছবিগুলো এঁকেছিলেন তা যেমন অ্যাবস্ট্র্যাক্ট, নন-অবজেক্টিভ গুণসম্পন্ন, তেমনি তার কাজকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনের সঙ্গেও সম্পর্কিত করে পোস্টমডার্ন বলে আখ্যায়িত করা যায়। কারণ বিংশ শতকের শুরুর দিকে পিকাসো, জর্জেস ব্রাক তাদের কাজে অবজেক্টকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করেছিলেন একটি নন-আর্ট পরিপ্রেক্ষিত (non-art context) থেকে। ১৯১২ সালে পিকাসো ক্যানভাসে এক টুকরো ওয়েল ক্লথ পেস্ট করেছিলেন। পরবর্তী কম্পোজিশন যেমনঃ গিটার, নিউজ পেপার, গ্লাস এবং বোতল (১৯১৩)— যেটাতে পিকাসো সংবাদপত্রের কেটে রাখা নিউজ পেপারের অংশ ব্যবহার করেছিলেন ফর্ম সৃষ্টি করার জন্য, এটা সিনথেটিক কিউবিজম *(synthetic cubism)* নামে পরিচিতি লাভ করে। দুজন শিল্পীই তাদের ক্যানভাসে ভবিষ্যৎ 'real world' সম্পর্কে অস্তিত্ব (signification) ও শৈল্পিক উপস্থাপনার (artistic representation) ক্ষেত্রে একত্রীভূত হয়েছিলেন খোলা আলোচনার মাধ্যমে।

মার্সেল দুসঁপের (Marcel Duchamp) আমানতটির (appropriation) সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ready-made কনসেপ্টের মাধ্যমে, যেটাতে ‘ইন্ডাস্ট্রিয়ালি উৎপন্ন ব্যবহারযোগ্য অবজেক্ট বা বস্তু... পুরোপুরিভাবে শিল্পের মর্যাদা অর্জন করেছিল নির্বাচন পদ্ধতি ও উপস্থাপনের (process of selection and presentation) মাধ্যমে’[3] 'industrially produced utilitarian

---

[228] Neo-Geo: Neo-minimalism হচ্ছে বিংশ শতাব্দী এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রাথম দিককার একটি অনিয়তাকার (amorphous) বা নির্দিষ্ট আকারশূন্য শিল্পান্দোলন। এটাকে অল্টার্নেটিভভাবে 'neo-geometric' or 'neo-geo' art বলা হয়। এর সঙ্গে সংযুক্ত অন্য টার্মগুলো হচ্ছেঃ Neo-Conceptualism, Neo-Futurism, Neo-Op, Neo-Pop, New Abstraction, Poptometry, Post-Abstractionism, Simulationism, and Smart Art. ইত্যাদি।

'Postmodern art'-এর ক্ষেত্রগুলো বর্ণিত বা বিবৃত হয়েছে neo-minimalism (and related terms) হিসেবে যা সাধারণভাবে 'reevaluation of earlier art forms.' এর সঙ্গে ইনভলভ বা নিযুক্ত। এর বিভিন্ন রকম টাইটেল দিকনির্দেশনা দেয় যে, মুভমেন্টটি বিংশ শতাব্দীর মধ্য এবং শেষ দিক থেকে শুরু হয়ে Minimalist art, Abstract Expressionism and its offshoots, plus Pop Art, Op Art এবং শিল্পন্নোয়নের অন্যান্য threadsগুলো পর্যন্ত বিস্তৃত।

Contemporary যেসব শিল্পীর এই টার্মের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে অথবা যাদের কাজ এগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত তারা হলেন Peter Halleyসহ Philip Taafe, Lorenzo Belenguer, Ashley Bickerton, Jerry Brown, David Burdeny, Catharine Burgess, Marjan Eggermont, Paul Kuhn, Eve Leader, Daniel Ong, Tanya Rusnak, Peter Schuyff, Laurel Smith, Christopher Willard and Tim Zuck. Richard Serra-এর steel sculpturesগুলো 'austere neo-Minimalism...' হিসেবে বিবৃত।

objects…achieve the status of art merely through the process of selection and presentation.'[229]

কিবরিয়াও তেমনি মৃত্যুর পূর্বে হসপিটালে শুয়ে ছাদ থেকে নিচে পড়া রঙের চলটা ব্যবহার করে শিল্প রচনা করেছেন নির্বাচন পদ্ধতি ও উপস্থাপনের মাধ্যমে। শোনা যায়, সেই শিল্পকর্মটি তিনি সেই হসপিটালের ডাক্তারকে উপহার দিয়েছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই অবজেক্টকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করেছিলেন একটি ‘নন-আর্ট’ পরিপ্রেক্ষিত থেকে। ফলে কাজগুলো নন-অবজেক্টিভিটির গণ্ডি পেরিয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনের (appropriation) সঙ্গে সংযুক্ত বলে শিল্পবোদ্ধারা একমত হবেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

মার্সেল দুসঁপের ১৯১৭ সালে Society of Independent Artists exhibition-এ একটি রেডিমেড উপস্থাপন করেছিলেন ছদ্মনাম ‘আর. মুট’ ব্যবহার করে।[২৩০] *Fountain* নামকরণে চীনামাটির তৈরি ইউরেনালের একটু ওপরের দিকে এই সাইনটি করা। কাজটি যাকে জাহির করে তা হলো— চারুশিল্পের ঐতিহ্যগত অনুভূতির (ফাইন আর্টের ট্র্যাডিশনাল পারসেপশন) প্রতি, মালিকানা (ওনারশিপ), মৌলিকতা (অরিজিনালিটি) ও কুম্ভিলতার প্রতি একটি সরাসরি চ্যালেঞ্জ এবং পরবর্তীকালে এক্সিবিশন কমিটির দ্বারা রিজেক্ট হয়েছিল। মার্সেল দুসঁপের পাবলিকলি রক্ষিত ‘ফাউন্টেন’, দাবি করেঃ

> ‘দুয়ের মধ্যে মি. মুট তার নিজ হাতে তৈরি ফাউন্টেনসহ গুরুত্বপূর্ণ, না হয় নয়। তিনি এটিকে CHOSE করেছেন এবং জীবনের সাধারণ ব্যবহারিক বস্তু (অর্ডিনারি আর্টিকেল বা বস্তু) নিয়ে প্রদর্শনীতে উপস্থাপন করেছেন। ফলে নতুন নাম ও পয়েন্ট অফ ভিউয়ের অধীনে যখন চলে আসে, তখন এর ব্যবহারের গুরুত্ব (সিগনিফিকেনস) অপ্রকট বা লীন হয়েছে। অর্থাৎ এর সাধারণ তাৎপর্যতা থেকে নতুন নামকরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি (পয়েন্ট অফ ভিউ) তৈরির কারণে এর তাৎপর্য বেড়ে যায় এবং অবেজেক্টের জন্য একটি নতুন চিন্তা তৈরি করে।’[২৩১]

(খ.২) খুব সাম্প্রতিক সময়ে, Walter Truett Anderson পোস্টমডার্নিজমকে বর্ণনা করেন বিশ্বের চারটির যেকোনো একটি টাইপোলজিক্যাল ভিউ হিসেবে, যেটা তিনি চিহ্নিত (আইডেন্টিফাই) করেন, তা হলো— হয় এটা (১) Postmodern-ironist— যেটাতে দেখা যায় ‘সত্য’ সামাজিকভাবে গঠিত (which sees truth as socially constructed), (২) Scientific-rational— মেথোডিক্যাল ও

---

229 Dietmar Elger, *Dadaism*, Koln: Taschen, pp. 80; 'Wikipedia, the free encyclopedia', https://en.wikipedia.org/wiki/Appropriation_(art)

230 Pierre Cabanne, and Snowdon, P. (1997). Duchamp & Co. Paris: Terrail, pp. 114; 'Wikipedia, the free encyclopedia', https://en.wikipedia.org/wiki/Appropriation_(art)

231 S. Plant (1992), “The most radical gesture: The Situationist International in a postmodern age.”, London and New York: Routledge, pp.44, https://en.wikipedia.org/wiki/Appropriation_(art)

ডিসিপ্লিন ইনকোয়ারির মাধ্যমে সত্যকে পাওয়া যায়, (৩) Social-traditional— যে সত্যটা আমেরিকান ও ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশনের ঐতিহ্যের (হেরিটেজের) মধ্যে পাওয়া যায় অথবা (৪) Neo-romantic— নেচারের মধ্যে হারমোনির অবস্থান অথবা ইনার সেল্ফের স্পিরিচুয়াল এক্সপ্লোরেশনের মাধ্যমে সত্যকে পাওয়া যায়।[২৩২] এই (৪) নম্বরের সঙ্গে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির চর্চাটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে এ দেশের লিথোগ্রাফিকে পোস্টমডার্ন বলে চিহ্নিত করা সম্ভব। যেমন: মোহাম্মদ কিবরিয়া, মো. রফিকুন্ নবী, মনিরুল ইসলামসহ বেশ কিছু শিল্পীর শিল্পকর্মের মধ্যে নেচারে হারমোনির অবস্থান অথবা ইনার সেল্ফের স্পিরিচুয়াল এক্সপ্লোরেশনের উপস্থাপন শিল্পমাধ্যমকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে।

(খ.৩) বিংশ শতকের প্রভাবশালী মহিলা শিল্পীরা পোস্টমডার্ন শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলেন তখন থেকে, যখন থেকে তাত্ত্বিক দিক দিয়ে (থিউরিটিক্যালি) স্পষ্টভাবে উচ্চারিত তাদের কাজ ফ্রেঞ্চ সাইকোঅ্যানালাইসিস (French psychoanalysis)[২৩৩] ও ফেমিনিস্ট তত্ত্বের (Feminist Theory) থেকে এসেছিল, যেটা জোরালোভাবে পোস্টমডার্ন দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।[২৩৪] বাংলাদেশের বর্তমান প্রিন্টমেকিংয়ের মহিলা শিল্পীদের অনেকের মধ্যে যাদের শিল্পকর্ম পোস্টমডার্নিজমের উক্ত যৌক্তিকতার সঙ্গে সংযুক্ত তাদের মধ্যে রোকেয়া সুলতানা, লালা রুখ সেলিমের মোরগ নামক লিথোগ্রাফি (সম্ভবত), জয়া শাহরীন হক, আসমিতা আলমসহ নবীনদের মধ্যে রাশিদা আক্তার, পাপড়ি বাড়ৈ রাত্রী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। সত্তরের দশকের শেষের দিকে দারা বিরবাউম (Dara Birnbaum[২৩৫] জ. ১৯৪৬) যেমন তার ফেমিনিস্ট শিল্পকর্মগুলোকে তৈরি করেছেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনের (appropriation) মাধ্যমে।[২৩৬] ১৯৭৮–১৯৭৯ সালে তিনি প্রথম প্রডিউস করেন। *Technology/Transformation: Wonder Woman*-এ ব্যবহার করেছেন ভিডিও ক্লিপ, যেটা *Wonder Woman* টেলিভিশন সিরিজ থেকে নেওয়া।[9] The first attempt to translate Wonder Woman to the small screen occurred in 1967.

বাংলাদেশের মহিলা শিল্পীদের শিল্পকর্মের মধ্যেও পোস্টমডার্ন চিন্তাধারার সূত্র নিম্নলিখিত উপায়ে খুঁজে পাওয়া সম্ভব:

---

[232] Plant, S. (1992). The most radical gesture: The Situationist International in a postmodern age. London and New York: Routledge, pp.44, https://en.wikipedia.org/wiki/Appropriation_(art)
[233] *Ibid.*
[234] *Ibid.*
[235] *Ibid.*
[236] John C. Welchman, *"art After Appropriation Essays on Art in the 1990s"*, (2013). Routledge. pp. 33, https://en.wikipedia.org/wiki/Appropriation_(art)

বাংলাদেশের মহিলা বেশ কয়েকজন পোস্টমডার্ন শিল্পীর মধ্যে

রোকেয়া সুলতানা

তার বাসে চড়া বা রিকশায় বাচ্চাকে নিয়ে স্কুলে যাওয়ার মতো বিষয়ভিত্তিক এচিংগুলোতে ফেমিনিস্ট গুণ বিদ্যমান। এগুলোতে একজন নারী তার সামাজিক অবস্থান ও মানুষ হিসেবে তার অস্তিত্ব এবং বিশেষ কোনো গুণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার চেষ্টা করেছেন। তবে ২০১২ সালে আঁকা অফসেট লিথোগ্রাফিতে ফেমিনিস্ট গুণ লক্ষণীয়।

দিলারা বেগম জলি (Dilara Begum Jolly)

একজন ছাপচিত্র শিল্পী, পেইন্টার, ভাস্কর, স্থাপনাশিল্পী দিলারা বেগম জলির মেয়েদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব বিষয়ক ফেমিনিস্ট পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট কাজগুলোর জন্য পরিচিত।[২৩৭] একটি স্বাক্ষাৎকারে বলেন, সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করার ক্ষেত্রে তাঁর মা ছিলেন প্রথম উৎসাহদাতা। উনার মা বলতেন, ‘women should become educated, and to achieve a voice of their own they need to be economically self-sufficient.’।[২৩৮] নব্বইয়ের দশকে দশম শ্রেনিতে পাঠ্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ‘লাল সালু’ উপন্যাসের ভিন্নধর্মী নারী জমিলার চরিত্র থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি লিথোচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। তাঁর ফেমিনিস্ট কাজের অন্যতম লিথোচিত্র হিসেবে এটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই কাজে নারীজীবনের রূঢ় বাস্তবতার চিত্রটির মধ্য দিয়ে তাঁর মনের ভেতর বয়ে যাওয়া সময়ের ছাপকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন।

Plate:7.39 Rokeya Sultana, Lithography, Face, 2012, 16x11 inch

Plate: 7.40 Dilara Begum Jolly, Lithography, Lal Shalu, Litho, 12x16 inch, 199.1

---

237 “Jolly's artworks focus on garment workers", ‘*Dhaka* Tribune. 21 August 2014.*”,* http://archive.dhakatribune.com/entertainment/2014/aug/21/jolly%E2%80%99s-artworks-focus-garment-workers,

238 Mustafa Zaman, "Performing the self", Depart Mag. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 8 March 2015

শিল্পী জয়া শাহরীন হক

জয়া শাহরীন হকের প্রথম দিককার কিছু রিপিটেশনধর্মী কাজ পরবর্তী সময়ে একটু হলেও ফেমিনিস্ট গুণাগুণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রতিক্রিয়াশীলতা ও ঘুরে দাঁড়ানোর যে প্রবণতার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন তার মধ্য দিয়ে কিছু ফেমিনিস্ট গুণও লক্ষ্য করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থাকাকালে প্রথমাবস্থায় তিন অনুভব করছিলেন, এখানে বেশির ভাগ মেয়ে তাদের কর্তব্যের উদাসীনতায় মত্ত। নারী ও মানুষ এই দ্বৈত সত্তাই তার কাজের মধ্যে এনে দিয়েছে ফেমিনিস্ট গুণ। তিনি বলেন,

> 'আমি ভাবছি চারুকলার মেয়েরা ওপেন কাজ করতে পারে। আমি যার কাছেই সাহায্যের জন্য যাই সেই সুযোগটা নিতে চায়। এই যে স্ট্রাগল, এই যে যন্ত্রণা, বাসায় গিয়ে রাতের বেলার কষ্ট, এখন মনে হলে আমার কেমন লাগে। আমার প্রথম এক্সিবিশনটা শুধু একটা সাধারণ এক্সিবিশন ছিল না। ঠিক এটা তার একটা উত্তর ছিল। কাকে দিয়েছি জানি না, আমি আমাকেই দিয়েছি।'

এরপর 'ফেসেস অ্যারাউন্ড মি' সিরিজ ছবিগুলোর মধ্যে সে ধরনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ গুণ লক্ষণীয়। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে রিপিটেশন। সব মিলিয়ে যেন সে রকম আবহই সৃষ্টি করে।

(গ) পোস্টমডার্ন আর্ট হলো শিল্পান্দোলনগুলোর একটি কাঠামো (body), যেটা মডার্নিজমের কিছু বিষয়ের সঙ্গে বিরোধিতা করে জ্ঞান অন্বেষণ করছিল অথবা যেটা এসেছিল মডার্নিজমের দ্বিতীয় দফার ফলাফল হিসেবে। সাধারণভাবে, যেমন ইন্টারমিডিয়া, ইনস্টলেশন আর্ট, কনসেপচুয়াল আর্ট এবং মাল্টিমিডিয়া, ভিডিওর বিশেষ কিছু ইনভলভমেন্ট— যেগুলোকে পোস্টমডার্ন হিসেবে বিবৃত (বা বর্ণিত) করা হচ্ছে।[২৩৯] বিভিন্ন ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন শিল্পচর্চার (inter-disciplinary art activities) মাধ্যমে ফ্লাক্সাস (Fluxus) শিল্পী Dick Higgins ইন্টারমিডিয়া পরিলেখটি ব্যবহার করেছেন ষাটের দশকের মধ্যবর্তী সময়ে।[২৪০] ড্রইং এবং কবিতার মধ্যে সম্পর্ক অথবা পেইন্টিং বা থিয়েটারের মধ্যে সংযোগ 'intermedia' হিসেবে বর্ণিত হতে পারে। পুনঃকৃত অকারেন্স বা একই ধরনের ঘটনার ফলে পুরনো রীতির মধ্যে আবার নতুন রীতি তৈরি হয়ে নিজস্ব নামে উন্নীত হয়। এই নতুন রকমের রীতির সঙ্গে আরেক রীতির সম্পর্ক ডেভেলপ করেছে নিজ নামে। যেমনঃ ভিজ্যুয়াল পয়েট্রি অথবা পারফরমেন্স আর্ট (visual poetry or performance art)। এখানে উল্লেখ্য যে, বেঙ্গলের আর্ট লাউঞ্জে ২০১৪ সালের

---

[239] https://en.wikipedia.org/wiki/Postmodern_art

[240] Dick Hggins, 'Intermedia', re-published in Leonardo, vol 34, 2001, p49-54, with an Appendix by Hannah Higgins; Hannah B Higgins, 'The Computational Word Works of Eric Andersen and Dick Higgins' in H. Higgins, & D. Kahn (Eds.), Mainframe experimentalism: Early digital computing in the experimental arts, p.283, https://en.wikipedia.org/wiki/Intermedia

২৫ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত প্রদর্শনীতে হুইটনি পরিচালিত 'Urban Experience' নাম কর্মশালাটি বাংলাদেশে তদ্রুপ একটি কর্মশালার প্রত্যক্ষ উদাহরণ হিসেবে আসতে পারে। অনেকের মধ্যে প্লেনোগ্রাফিক প্রসেসে করা শেখ মোহাম্মদ রোকনুজ্জামানের কাজটিকে ইন্টারমিডিয়া শিল্পকর্ম হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্য শিল্পীদের মধ্যে রশিদ আমিন, জাফর ইকবাল, আব্দুস সালাম, ড. নিহার রঞ্জন সিংহ, কামরুজ্জামান, নিত্যানন্দ গাইনসহ আরো বেশ কয়েজন শিল্পী ও শিক্ষার্থী সে কর্মশালায় অংশ নিয়েছিলেন।

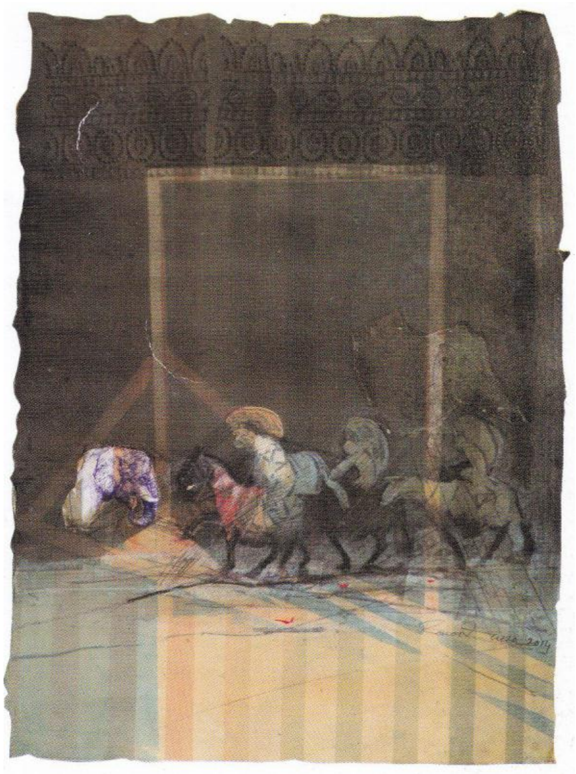

Plate: 7.41 Rokonuzzaman, Planographic process on Acrylic sheet, 2014, 28x21 inch (aprox)

এবার পোস্ট-পোস্টমডার্নিজম, পোস্ট-মিলেনিয়ালিজম ও মেটামডার্নিজম সম্পর্কে সাধারণ ধারণা থাকলে বুঝতে পারা যাবে যে লিটারারি দর্শন কীভাবে এগিয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় রিয়েলিটি সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন সাধারণ ধারণা থেকে শিল্পী ও দর্শনের সম্পর্ক নির্ণয় করেও শিল্পীরা কিছু চিন্তা করতে পারেন।

যেমন: ১৯৯৯ সালে রাশিয়ান পোস্টমডার্নিজমের (Russian postmodernism) ওপর লেখা বইয়ে রাশিয়ান-আমেরিকান Slavist Mikhail Epstein সাজেস্ট করেন যে, পোস্টমডার্নিজম '[..] বিরাট হিস্টোরিক্যাল ফরমেশনের একটি অংশ', 'is […] part of a much larger historical formation',

যাকে তিনি postmodernity' বলছেন।[২৪১] অ্যাপস্টেইন বিশ্বাস করতেন, পোস্টমডার্ন নন্দনতত্ত্ব এমনও হতে পারে— নতুনত্ব তৈরি ও অবিদ্রুপাত্মক (non-ironic) ধরনের কবিতা হিসেবে বের হয়ে আসার জন্য পুরো কনভেনশনালও হতে পারে। যাকে তিনি বর্ণনা করেছেন 'trans-' শব্দটি ব্যবহার করেঃ 'পোস্টমডার্নিজম' নামকরণে ব্যবহৃত নতুন দশককে কনিসিডারেশন করে 'trans' শব্দটি বের হয়ে আসে। বিংশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে 'post' শব্দটির আন্ডারে ডেভেলপ করে যেটা modernity হলো 'truth' and 'objectivity', 'soul' and 'subjectivity', 'utopia' and 'ideality', 'primary origin' and 'originality', 'sincerity' and 'sentimentality'-এর মতো এ ধরনের কনসেপ্ট মৃত বলে ইঙ্গিত করেন। এই কনসেপ্টগুলো আবার 'reborn' করেছেন 'trans-subjectivity', 'trans-idealism', 'trans-utopianism', 'trans-originality', 'trans-lyricism', 'trans-sentimentality' ইত্যাদি শব্দগুলোর মাধ্যমে।

Plate: 7.42 rokonuzzaman, Lithograph and Offset Print, Projection of the artist inspiration, 2006, 59x 11 inch

উপরোক্ত যৌক্তিকতায় বাংলাদেশের ছাপচিত্রকর, গবেষক এবং শিল্পী শেখ মোহাম্মদ রোকনুজ্জামানের ‘Projection of the artist inspiration’ এবং ‘এ জার্নি ফ্রম ওয়ান রিয়ালিটি টু এনাদার’ সিরিজের লিথোগ্রাফিগুলো অবিদ্রুপাত্মক ও কনভেনশনাল ধরনের মিশ্রণে অঙ্কিত বলে এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে একে ‘ট্রান্স অবজেক্টিভিটি’-র আওতাভুক্ত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। নিম্নোক্ত লিথোগ্রাফি চিত্রে শিল্পী প্রথমে একটি অফসেট প্রিন্টের ছবিকে অবজেক্ট হিসেবে নিয়ে কাজ করেছেন। তারপর ট্রান্সফার পদ্ধতিতে এবং হাতে কাজ করে অনেকগুলো ইম্প্রেশনের মাধ্যমে ফর্মের বিবর্তনটি অঙ্কন করেছেন। পরিশেষে ছবির ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার সংযোগ সৃষ্টির জন্য শেষ ইম্প্রেশনে পুরো ইমেজের ওপর একটি লিখিত ভাষায় ছবির ভাবটি লিখেছেন। এভাবে তিনি শিল্পের ভাষার গভীরে গিয়ে তার গণ্ডিকে পেরিয়ে অরেকটি মাধ্যমের (সাহিত্য মাধ্যম) সঙ্গে যুক্ত করে মনের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন অনুভূতিকে মুখ্য করে।

---

[241] Mikhail Epstein, Genis, Alexander; Vladiv-Glover, Slobodanka, *Russian Postmodernism. New Perspectives on Post-Soviet Culture*, Berghahn Books, New York, 1999, p. 467; https://en.wikipedia.org/wiki/Post-postmodernism, collected date from net is 11/12/2015

৭.৪ বাংলাদেশের শিল্পে সম্ভাবনামূলক দিকনির্দেশনা

বাংলাদেশের শিল্পীরা যদি লিথোগ্রাফি করে যেতেন, তাহলে তাদের কাজের মধ্যে এমন গুণের সমাহার ঘটত, যা তাদের পেইন্টিংয়ে বর্তমান। সেই ধরনের কিছু গুণ বহির্বিশ্বের শিল্পীদের অঙ্কিত লিথোগ্রাফির মধ্যে বিদ্যমান, যা থেকে বাংলাদেশের শিল্পীদের একধরনের অভিজ্ঞতা হবে। আবার পেইন্টিংয়ের বিকল্প না বলে লিথোগ্রাফির মাধ্যমে বা কখনো লিথোগ্রাফির ওপর পেইন্টিং করে শিল্পী তার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করতে পারেন। এ বিষয়গুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

কামরুল হাসানের শিল্পে লোক ঐতিহ্যপ্রিয়তার পরও নিজস্ব শিল্পরীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ

লোককলার ঐতিহ্যের ব্যবহারের তিনটি উৎসবিন্দুকে মনে রেখে তার শিল্পে স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে— লোককলা থেকে বিষয় ও শৈলীগত উপাদান গ্রহণ করলেও তার শিল্প লোককলা দ্বারা পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি। তিনি এক মুহূর্তের জন্য ভুলে জাননি যে, তিনি একজন আধুনিক শিল্পী, লোকশিল্পী নন। তাই তার কাজে লোকজ শিল্পকলা ও পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এদের সমন্বয়ের ফলেই কামরুল হাসানের শিল্পাদর্শে এসেছে স্বতন্ত্রতা। লোকশিল্প থেকে দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলেও তিনি তার শিল্পে ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে চেয়েছেন পাশ্চাত্যের বিশেষ করে কিউবিস্ট ধারাকে একাত্ম করে। ছবিতে পটচিত্রীদের মতো রং ব্যবহারে টোনাল ভেরিয়েশন ব্যবহার না করে সমতলীয় পদ্ধতিতে (ফ্লাট রং প্রয়োগ পদ্ধতি) রং প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু এই সমতল আর লোকশিল্পীদের সমতলের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। তা হলো কামরুল হাসান তার চিত্রে একই সমতলে পাশ্চাত্য শিল্পীদের মতো, বিশেষ করে হেনরি মাতিসের মতো করে পাশাপাশি অনেকগুলো সমতলীয় রং প্রয়োগের মাধ্যমে ছবিতে স্পেস তৈরি করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কারণ মাতিসের মতো করে সমতল পদ্ধতিতে রং ব্যবহারে উৎসাহী হয়েছিলেন। এর মধ্য দিয়ে ত্রিমাত্রিক আবহ সৃষ্টিরও চেষ্টা করেছেন। ড্রইংয়ের ক্ষেত্রে পটুয়ারা মুখের পার্শ্ব দৃশ্যই বেশি আঁকতেন। কিন্তু কামরুল হাসান লোকশিল্পীদের এই ভঙ্গিটির সঙ্গে এমনভাবে লাইন ব্যবহার করেছেন যে, দ্বিমাত্রিকতার পাশাপাশি ছবিতে ত্রিমাত্রিকতা ও ভলিউমও সৃষ্টি হয়। বিশেষত পাবলো পিকাসোর (১৮৮১–১৯৭৩) প্রভাব এ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। অর্থাৎ লোকধারার স্বতঃস্ফূর্ত রেখার সঙ্গে কিউবিস্ট রীতির বিশুদ্ধ জ্যামিতিক রেখার সমন্বয়ের ইচ্ছা বা প্রয়াসটিকে অব্যাহত রেখে একটি স্বতন্ত্র চিত্ররীতি সৃষ্টিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।[২৪২] পটচিত্রে

---

[242] সৈয়দ আজিজুল হক, 'কামরুল হাসান', বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, জুন ২০০৩, পৃ. ২৩–২৪; সৈয়দ আজিজুল হক, 'চারু ও কারুকলা', বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ২৮৫–৯৭

আলংকারিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কিন্তু আধুনিক শিল্পী হিসেবে কামরুল হাসান চিত্রকে বাস্তবতার বাইরে গিয়ে আলংকারিক করে তোলেননি।

Plate: 7.43 Quamrul Hasan, After Bath, litho1958.

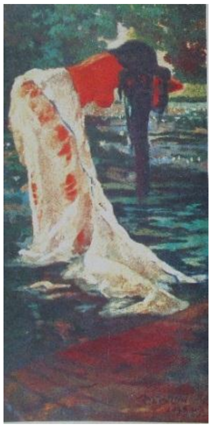

Plate: 7.44 Quamrul Hasan, Bathing, oil, 1966, 150x75 cm.

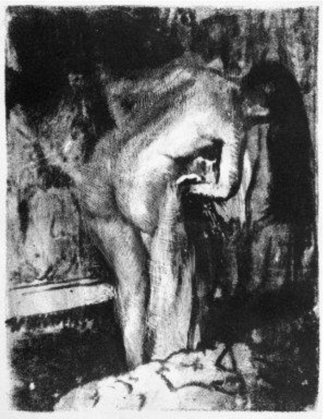

Plate: 7.45 Edgar Degas, Lithograph and crayon on stiff wove paper, 11x8 inch.

Plate: 7.46 Kamrul Hasan, Roster-2, Oil, 61x61 cm, 1977.

Plate: 7.47 Kamrul Hasan, Sketch, The country today is in the hands of global scoundrel, 1988.

সম্ভাবনা

এই লিথোগ্রাফি ‘স্নান’ নারী চিত্রের পরে যেহেতু স্নান তেলরঙের চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে, সেহেতু এর গ্রাফিক গুণটিও পরবর্তী তেলরঙে পরিলক্ষিত হবে। চিত্রটি দেখলে সফিউদ্দীন আহমেদের সাদাকালো অ্যাকোয়াটিন্ট ও দেগাসের লিথোগ্রাফির কথা মনে পড়ে যায়। এরপর সত্তর ও আশির দশকে যখন তার চিত্র আরো পরিশিলীত হলো তখন তিনি আর বেশি লিথোগ্রাফি করেননি। আশির দশকে আঁকা চিত্রে

পূর্ববর্তী তিন দশকের সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা সার্থকতার চূড়া স্পর্শ করে। অসংখ্য ড্রইংয়ের মাধ্যমে সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনা উপস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন। লোকজ ও আধুনিক কিউবিস্ট রীতির সমন্বয় সাধন করে রোমান্টিকতা, নিসর্গ ও নারীর একাত্মতা সৃষ্টি ইত্যাদির গতি একটু মন্থর করে সারবস্তুকে নিজ শিল্পে অঙ্গীকার করা, অশুভ শক্তির প্রতীকায়ন এবং জনজীবন, নিসর্গ ও জীবজন্তুকে চিত্রে একাকার করে উপস্থাপনের মাধ্যমে তার শিল্পবোধ যে মোহনায় মিলিত হয়েছে লিথোগ্রাফি মাধ্যম তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তার নায়র (১৯৭৫), মোরগ-২ (তেলরং, ১৯৭৭), কম্পোজিশন (তেলরং ১৯৭৭), পাখি (তেলরং, ১৯৭৮), জলকেলি (তেলরং, ১৯৮৩) ও দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে ইত্যাদির মতো উন্নত চিত্র যদি লিথোগ্রাফি মাধ্যমে অঙ্কিত হতো, তাহলে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি অবশ্যই সমৃদ্ধির পথে আরো অগ্রসর থাকত।

আবদুর রাজ্জাকের (১৯৩২–২০০৫ খ্রি.) কাজে সম্ভাবনা

শিল্পী আবদুর রাজ্জাকের ১৯৫৪ সালে আঁকা 'আত্মপ্রতিকৃতি-৪' নামক অয়েল মাধ্যমে করা শিল্পকর্মটি আমেরিকার পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী লেরয় নেইম্যানের (Leroy Neiman) লিথোগ্রাফি চিত্রের সঙ্গে বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যদি তিনি বা তারা লিথোগ্রাফিকে সেভাবে চর্চা করতেন, তাহলে তাদের কাছ থেকেও এ ধরনের লিথোগ্রাফি চিত্র পাওয়া অসম্ভব কিছু ছিল না।

তবে ১৯৮৮ সাল-পরবর্তী সময়ে ১৯৯২ সালে অঙ্কিত নদীদৃশ্য নামক অয়েল ও অ্যাক্রিলিক মাধ্যমে করা শিল্পকর্মটিতে ওপরের দিকের সফট এজ ফর্মের সঙ্গে এবং নিচের দিকের হার্ড এজ ফর্মের মধ্যে যে ধরনের সমন্বয় করেছেন তার সঙ্গে এই লিথোগ্রাফিটির সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু নব্বইয়ের দশকে তার শিল্পকর্মে যে পরিপক্বতার উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়, সে রকমটি লিথোগ্রাফি মাধ্যমে পাওয়া গেলে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির মান বিশ্ব দরবারে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থানে থাকত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অবদুর রাজ্জাকের অ্যাক্রিলিক কালারে করা কম্পোজিশন-৬ নামক পেইন্টিংটির সঙ্গে ফরাসি শিল্পী মোউরিস স্টিভ (Maurice Estève)[২৪৩]-এর ১৯৭১ সালে করা এরিজোভার্ট (Arizovert) নামক

---

[243] https://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Est%C3%A8ve
মাউরিস স্টিভ (Maurice Estève) ফ্রান্সের কুলান শহরে জন্ম নিয়েছিলেন ২ মে ১৯০৪ সালে। ১৯১৩ সালে তিনি পিতামাতার সঙ্গে প্যারিসে স্থানান্তরিত হন। আর এখানেই তিনি তার শিল্পশিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন। ১৯২৩ সালে একটি টেক্সটাইল ফ্যাক্টরিতে এক বছরের জন্য নকশাবিদ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯২০ সালে লুভর মিউজিয়াম ভ্রমণ করতে গিয়ে তিনি জিন ফকেট (Jean Fouquet) এবং পাওলো উসেলো (Paolo Uccello) নামক পেইন্টারদের কাজ দেখে বিস্মিত হয়েছেন। আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে পল সেঁজার শিল্পকর্ম তার ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। ১৯২৪ সালে তিনি একাডেমি কোলারোসি নামক ফ্রি স্টুডিওতে কাজ করে স্বশিক্ষিত শিল্পী হয়ে উঠেছেন। এখানেই তিনি তার মটিফগুলো ব্রাক ও ফার্নান্দ লেজারের মতো প্রয়োগ করেছিলেন। ফলে তখন তিনি কিউবিস্ট ফভইজম ধরনের শিল্প সৃষ্টি করেন।
১৯২৮ সালে তিনি (মোউরিস স্টিভ) রিয়ালিজম থেকে সরে আসতে শুরু করেছিলেন এবং লেজার, মাতিস ও বোনর্ড-এর শিল্পকর্ম দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৯৩০ সালে প্যারিসে তার প্রথম একক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল গ্যালারি ভ্যানগটে (Galerie

লিথোগ্রাফিটির একটি কালার কম্পোজিশন ও ক্ষেত্রবিভাজনের একটি বাহ্যিক সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এ কথাগুলো প্রসঙ্গত এই জন্য আনা হলো যে— এ ধরনের লিথোগ্রাফি আবদুর রাজ্জাকের কাছ থেকে পাওয়াও বাংলাদেশের জন্য অসম্ভব কিছু ছিল না।

Plate: 7.48 Abdur Razzaque, Composition-6, Acrylic, 50x36 cm, 1993.

Plate: 7.49 Maurice Esteve, litho, Arizovert, 24x31 cm, 1972.

সমস্ত মাধ্যমের শিল্পকর্মের মতো লিথোগ্রাফি মাধ্যমের ক্ষেত্রেও আরেকটি বিষয় হলো: তিনি প্রকৃতির খুব কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতি পরিবর্তনশীল ও অসীম শক্তিশালী। সেই প্রকৃতিকে জানার চেষ্টা করেছেন। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে জানার ও রূপ দেওয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন। অত্যন্ত মন্থর গতিতে তার কাজ গড়ে উঠত। রং, রূপ, রেখা, গড়ন ও স্পেসকে কেন্দ্র করে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করতেন। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার কাজ বিবর্তিত হয়েছে। কোনো কোনো পেইন্টিং তিনি কয়েক মাস, এমনকি বছর ধরেও করেছেন। কিছুদিন কাজ করার পর ফেলেও রেখেছেন। বারবার সামনে বসে সেটিকে দেখেছেন। আবার রংতুলি নিয়ে তার ওপর কাজ করেছেন। ছবির যে শুদ্ধতা, ব্যাকরণ, সেসব অত্যন্ত

Yvangot)। Robert Delaunay-এর ১৯৩৭ সালের Paris International Exhibition-এর বিশাল ডেকোরেটিভ প্যানেলগুলোর জন্য তিনি সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৪০ সালের দিকে শৈলীগত দিক থেকে তার অবয়বধর্মী, জড়-জীবন এবং ল্যান্ডস্কেপ কম্পোজিশন ও শক্তিশালী কালারগুলো ক্রমান্বয়ে অ্যাবস্ট্র্যাক্টশনে পরিণত হয়েছে । তার মধ্যে রয়েছে— শেপগুলোর মধ্যবর্তী রিচ, বোল্ড কালারের শক্ত বুনন। কিছু সংখ্যক জলরং ও কোলাজ করেছিলেন এবং ১৯৫৭ সালে বার্লিন কোর্টের চার্চে গ্লাসের নকশা করেছিলেন।

স্টিভের ব্যাপক (extensive) কাজগুলোকে পেইন্টিংয়ের ঘরানার মধ্যে সীমানা টানা যায় না। তা ছাড়া তিনি কোলাজ, টেক্সটাইল ডিজাইন ও ম্যুরাল শিল্পকর্ম সৃষ্টিতেও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছেন। স্টিভ এভানট-গ্রাডের বহিঃমুখীনতাকে এড়িয়ে চলেছেন। কিন্তু ১৯৪৫ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এখনো পর্যন্ত যারা ইকোল ডি প্যারিস (প্যারিস স্কুল) থেকে ভেঙে বেরিয়েছেন, সেই কয়েকজন অন্যতম শিল্পীর মধ্যে তিনিও একজন।

স্টিভ ১৯৫৪ সালে ভেনিস বিয়েনালে অংশগ্রহণ করেন। সহকর্মী শিল্পীদের মতো তাঁর শিল্পসম্ভারও একটি দৃশ্যশিল্পের ভাষায় পরিণত হয়েছিল: কবিতাসুলভ প্রবণতা (poetic attitude) সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ফর্ম এবং কালারকে ব্যবহার করে (গ্রহণ করে) লিরিক্যাল অ্যাবস্ট্র্যাকশনে পরিণত হয়েছে। তার শিল্পকর্ম বিশ্বের বিভিন্ন মূল্যবান জাদুঘরে সংগৃহীত রয়েছে। কুলান শহরে ৯৭ বছর বয়সে স্টিভ ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন, মাধ্যমের যে ভৌত গুণাগুণ সেদিকটায় খেয়াল রাখেন। কেননা পেইন্টিং সৃষ্টিশীল কাজ হলেও এর স্থায়িত্ব নিয়েও ভাবতে হয়।

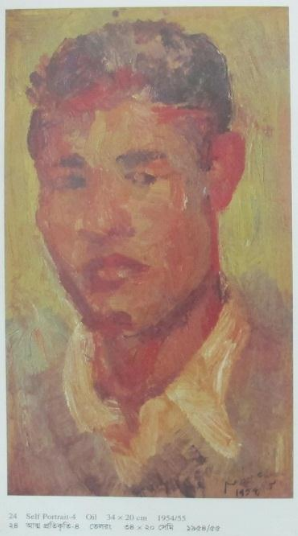

Plate: 7.50 Abdur Razzaque, Self Portrait, Acrylic, 1954

Plate: 7.51 Leroy Neiman. Lithograph, 1921, 24x36 inch

শিল্পী শহীদ কবির

শিল্পী শহীদ কবিরের এই লিথোচিত্রটির ওপর পরবর্তী সময়ে শিল্পী পেইন্টিং করে যে অভিব্যক্তি রচনা করেছেন, সেটি হয়তো পেইন্টিংয়ের সঙ্গে যুক্ত একটি নতুন মাত্রাগুণ তৈরি করেছে। কিন্তু এটি না করেও তিনি আরেক ধরনের ইমেজ তৈরি করতে পারতেন। তা হলো পেইন্টিং করে তার ওপর লিথো ইমেজ সৃষ্টি করা বা পুরোটাই লিথোগ্রাফি মাধ্যমে অঙ্কন করা। আর তা করার জন্য শিল্পীর সেই মাধ্যমের ওপর যতটা দখল থাকা প্রয়োজন শিল্পী হয়তো তার প্রয়োজন বোধ করেননি। যেমনটি পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট লেরয় নিউম্যানের কাজে মাধ্যমের দক্ষতাটি দেখতে পাওয়া যায়। ফলে সেই মাধ্যমটির শক্তিমত্তা সম্পর্কে যে একটি ধারণা পাওয়া যায় সেটি হয়তো বাংলাদেশ শহীদ কবিরের কাছ থেকেও পেত।

Plate: 7.52 Shahid Kabir, Painting, Lithography

Lithography

Lithography & Mixed media (Water colour, Acrylic, sand), 2017

Lithography & Mixed media (Water colour, Acrylic, sand), 2017

Plate: 7.53 Shahid Kabir, Plate Litho, 27x33 cm, 2015, Collection-F.F.A, D.U.

Plate:7.54 Shahid Kabir, Painting

৭.৪ বাংলাদেশের বর্তমান লিথোগ্রাফির সঙ্গে টেমারিন্ড লিথোগ্রাফিগুলোর চর্চাগত দিক আলোচনা

লিথোগ্রাফি চর্চার জন্য উৎসর্গ করা একটি অলাভজনক কেন্দ্র হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত টেমারিন্ড ইনস্টিটিউশন চারুশিল্পে শিক্ষা, গবেষণা, শৈল্পিক পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে ভূমিকা রেখেছে। এটি ইউনিভার্সিটি অব দ্য নিউ মেক্সিকোর ফাইন আর্ট কলেজের একটি বিভাগীয় অংশ, যেখানে লিথোগ্রাফিতে মাস্টার প্রিন্টার ও প্রফেশনালদের দ্বারা শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সারা বিশ্বে সাম্প্রতিক প্রিন্টমেকিংয়ের বিস্তার এবং শিল্পীদের প্রফেশনাল ট্রেনিং ও সৃষ্টিশীল সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার জন্য সুপরিচিত। মৃতপ্রায় (dying art) লিথোগ্রাফি মাধ্যমকে 'উদ্ধার করা বা বাঁচানো (rescue)' অর্থে এটি লস অ্যাঞ্জেলেসে ১৯৬০ সালে সংগঠিত হয় Tamarind Lithography Workshop, Inc. (TLW) নামে। ১৯৭০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির পূর্ব পর্যন্ত এটি পুরোটাই ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থে পরিচালিত হতো। পরিচালক ক্লিনটন এডামস ও টেকনিক্যাল পরিচালক গারো অ্যান্ট্রিয়াশিয়ান (Garo Antreasian)-এর সঙ্গে পরিচালক জুনে ওয়াইন (June Wayne) মিলিত হয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন বিভিন্নমুখী গন্তব্য:

(১) ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে ইউনাইটেড স্টেট থেকে মাস্টার শিল্পী-প্রিন্টার (artisan-printers) বের করে নিয়ে আসা।

(২) বিভিন্ন গ্রুপের আমেরিকান নানা শৈলীর মাস্টার শিল্পীরা এই মাধ্যমে শিল্প রচনা করে তাদের কাজের উত্তরণ ঘটাবেন।

(৩) প্রত্যেক কারুশিল্পী ও চারুশিল্পীকে তাদের নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদানে অভ্যস্ত করা এবং পাশাপাশি উভয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে মাধ্যমের অভিব্যক্তিক সম্ভাবনা তৈরি করে তাকে ছড়িয়ে দেওয়া।

(৪) লিথোগ্রাফির জন্য নতুন বাজার তৈরি করা।

(৫) কারুশিল্পীদের তাদের কাজের বাইরেও উপার্জনের একটি উপায় তৈরি করা অথবা শিল্পী তার উপার্জিত অর্থের ওপর নির্ভরশীল হয়ে যেন জীবন ধারণ করতে পারেন, সে ব্যবস্থা করা।

(৬) এক্সট্রা অর্ডিনারি প্রিন্টগুলোকে সংগ্রহ করে রাখা।

এই প্রতিষ্ঠানে একদিকে যেমন পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলো প্রদর্শন করা হয়, অন্যদিকে এখানে প্রিন্ট নেওয়া খ্যাতিমান শিল্পী, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লিথোগ্রাফি শিল্পী ও প্রিন্টমেকারদের শিল্পকর্মও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রয়েছে। বরাবরের মতো ১৫ জুন ২০১৬ সালে এই ইনস্টিটিউট একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে, যেখানে কিছু শিল্পী একসঙ্গে এই কর্মশালায় কাজ করেছেন। কালার নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কালারের সীমাকে অতিক্রম করতে চেষ্টা করেছেন। পরে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ এই ইনস্টিটিউট ও লস অ্যাঞ্জেলেসের কর্মশালায় করা Garo Antreasian-এর প্রিন্টমেকিংয়ের আবিষ্কারগুলো নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রিন্টার হিসেবে তিনি টেমারিন্ডের ট্রেনিং প্রোগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। শিল্পকলায় নিউ মেক্সিকোকে প্রিন্টের কেন্দ্রে পরিণত করার সাম্প্রতিক গল্পে তার অবদান রয়েছে।

বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের লিথোগ্রাফিগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে, দৃশ্যত বাংলাদেশের চর্চা শুধু টেমারিন্ড ইনস্টিটিউটের সঙ্গেই নয়, বিশ্বশিল্পকলার চর্চার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে। তবে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা এই ইনস্টিটিউটের মতো এগোতে না পারলেও নানা সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে খারাপ এগোয়নি। এর প্রমাণ মিলবে কয়েটি পুরস্কারপ্রাপ্ত ও প্রদর্শিত টেমারিন্ড লিথোগ্রাফির সঙ্গে তুলনা করলেই। তা সত্ত্বেও বলতে হয়, বাংলাদেশের শিল্পীরা বিচক্ষণতার সঙ্গে এগিয়ে গেলে ভবিষ্যতে আরো স্বতন্ত্র ভূমিকা রাখতে পারবেন।

এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিগুলোর নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা বিষয়ক আলোচনায় প্রথমত. ট্র্যাডিশনাল নন্দনতত্ত্বের মাধ্যমে এই কাজগুলোকে শিল্প হিসেবে প্রমাণ করা হয়েছে। সেখানে ইমিটেশন ও ফর্মের ভূমিকাতে এবং কবিতা, নাটক ও সংগীতের ক্ষেত্রে অনুকরণের (ইমিটেশনের) ভূমিকার সঙ্গে শিল্পের সামঞ্জস্যতা খোঁজার মধ্য দিয়ে যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে— এগুলো ইমিটেশন নয়। দ্বিতীয়ত. আধুনিক নন্দনতত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের

লিথোগ্রাফিগুলোতে আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট বলে দেখানো হয়েছে। এখানে আবার অভিব্যক্তিক তত্ত্বের আলোচনায় এ দেশের লিথোগ্রাফিগুলোর এ তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা নিরূপণ করা হয়েছে। তৃতীয়ত. আধুনিকতা একটি বৃহৎ পরিলেখ বলে আধুনিক নন্দনতত্ত্বের গভীরে গিয়ে শিল্পী ও দার্শনিকদের চিন্তার ক্ষেত্রটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। আধুনিক দর্শনের ব্যাপকতা ও চারুশিল্পে আধুনিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চেতনাসহ বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যকার অন্তর্নিহিত সংযোগ সূত্র প্রকাশে ভাববাদ ও বস্তুবাদ এখনো পর্যন্ত সামগ্রিকতার সমাধান দিতে এগিয়েছে বটে, কিন্তু পুরোপুরি সক্ষম হয়নি। সেখানে শিল্পীদের চিন্তাগত প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে গিয়ে বোঝানো হয়েছে যে—শিল্পী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের চিন্তাগত কিছু মিল থাকলেও অমিলও রয়েছে বটে। ফলে শিল্পীর সামগ্রিকতা শুধু কোনো কল্পনাপ্রসূত বিষয় নয় এবং কোনো কল্পনা আবার সামগ্রিকতার বাইরেও নয়—এমন বক্তব্য উঠে এসেছে। তার সঙ্গে যুক্তির যৌক্তিকতা থাকছেই। একজন বিজ্ঞানী বা ডাক্তারকে তার চিকিৎসার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতেই হয়। কিন্তু শিল্পী সেখানে অনেকটাই স্বাধীন। কারণ শিল্পীর একটি ভুল তুলির আঁচড়ে কারো জীবন চলে যাবে না, বরং সেখান থেকেই সৃষ্টি হতে পারে নতুন সম্ভাবনাময় শিল্প সৃষ্টির জগৎ। এ রকমভাবেই শিল্পী শিল্প সৃষ্টির আপন ভুবনে কাজ করে যাচ্ছেন। যার সঙ্গে কারো দ্বিমত হওয়ার কথা নয়। তাই বলা যায়, একজন আধুনিক শিল্পীর চিন্তা ও কাজ ভাববাদ ও বস্তুবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। চতুর্থত. পোস্টমডার্নিজম ও তার পরবর্তী পোস্ট-পোস্টমডার্নিজম এবং তার পরবর্তী ধারাগুলোকে মডার্নিজমের একেকটি উপধারা হিসেবে বিবেচনায় এনে বাংলাদেশের কিছু লিথোগ্রাফিকে পোস্টমডার্ন শিল্প বা এর অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরই মধ্যে ফেমিনিস্ট তত্ত্বকে পোস্টমডার্নিজমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ধরে নিয়ে এ দেশের কয়েকজন মহিলা শিল্পীর লিথোগ্রাফিকে পোস্টমডার্ন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রমাণ করা হয়েছে। তা ছাড়া 'ইন্টার মিডিয়া আর্ট'কেও পোস্টমডার্ন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিকে গ্রহণ করা সম্ভব। এরপর কিছু সিরিজ লিথোগ্রাফিকে পোস্টমডার্নিজম থেকে বের হয়ে আসা 'ট্রান্স অবজেক্টিভিটির' আওতাভুক্ত বলে প্রমাণ করা হয়েছে, যেখানে নতুনত্ব তৈরি ও অবিদ্রুপাত্মক (non-ironic) ধরনের শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পোস্টমডার্ন শিল্প পুরো কনভেনশনালও হতে পারে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। পঞ্চমত. বাংলাদেশের শিল্পে লিথোগ্রাফির সম্ভাবনামূলক দিকনির্দেশনা অতীত পর্যালোচনামূলক পেইন্টিং ও টেমারিন্ড ইনস্টিটিউটের চর্চাগত দিক নিয়ে আলোচনা করেই দেখানো হয়েছে।

উপসংহার

মুদ্রণযন্ত্র ও শিল্পকলার ইতিহাস বিষয়ে 'লিথোগ্রাফি' একটি বিশেষ নাম। ১৭৯৮ সালে লিথোগ্রাফি আবিষ্কারের পর সময়ের ভিন্নতায় ইউরোপ থেকে ভারতে এবং ভারত থেকে বাংলাদেশে এর চর্চা আরম্ভ হয়েছে। বাণিজ্যিক ও চারুশিল্প—এই দুটি দিকের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি সময় মাধ্যমটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রতিনিয়ত। বর্তমানে কিছু দেশে শুধু সৃজনশীল বা চারুশিল্পের চর্চাতেই মূলত ব্যবহৃত হচ্ছে। বিভিন্ন বিয়েনাল ও ট্রিয়েনালগুলোতে এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। সহজ পরিচিতির স্বার্থে 'বাংলাদেশে লিথোগ্রাফি চর্চার বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা' বিষয়ক গবেষণায় লিথোগ্রাফি বলতে প্লেনোগ্রাফি মাধ্যমের সমস্ত মাধ্যমকে লিথোগ্রাফির আওতাভুক্ত মনে করে আলোচনা শুরু করা হয়েছে। এটি প্লেনোগ্রাফি বা লিথোগ্রাফির প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো গবেষণা নয় বিধায় বিষয় পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ মনে করা যুক্তিসংগত। প্রিন্টিং এবং শিল্পতত্ত্বের উন্নতির এই সময়ে ট্র্যাডিশনাল এই লিথোগ্রাফি মাধ্যমের ব্যবহারটি বাণিজ্যিক দিকের চেয়ে চারুশিল্পের জন্য উপযোগী মাধ্যম বলে শুধু সেই দিকটিকে মুখ্য করেই আলোচনা করা হয়েছে।

মূলত বাংলাদেশে যেভাবে লিথোগ্রাফি চর্চা হওয়ার কথা ছিল সেভাবে হচ্ছে না। উপকরণগত সমস্ত সুযোগ-সুবিধাও এখানে অপ্রতুল। তার পরও যেভাবে যতটুকু চর্চা হয়েছে, তার ফলশ্রুতিতে এতটুকু অন্তত গবেষণার মধ্যে অনুধাবন করা যায় যে—অনেকটা পরিশীলিত বিকল্প পদ্ধতিতেই এ দেশে লিথোগ্রাফি চর্চা হয়ে এসেছে। প্রবীণ ও নবীন প্রজন্মের সমন্বিত ফলাফল হিসেবে এ দেশের লিথোগ্রাফিতে করণ-কৌশলগত দিক দিয়ে স্বতন্ত্রতার ছাপ সুস্পষ্ট। ক্রেয়নের পরিবর্তে নানা গ্রেডের (নরম থেকে শক্ত ধরনের) গ্লাস মার্কার ব্যবহারে তা যেমন ফুটে উঠেছে। তুষের ব্যবহারেও তেমনি রয়েছে নিজস্বতার ছাপ। লিথোগ্রাফি চর্চা করতে গিয়ে উদ্ভূত নানা ধরনের সমস্যা ও তার সমাধানকল্পে সৃষ্টি হয়েছে বলপয়েন্ট লিথোগ্রাফির মতো কৌশল। যেমন: ছোট লিথোচিত্রের ক্ষেত্রে ক্রেয়নের লাইন খুব মোটা হয়ে আসে। গ্লাস মার্কারের লাইন তার থেকে একটু সরু হয়, কিন্তু চুলের মতো সরু লাইন বা বলপয়েন্ট কলমের মতো লাইন সৃষ্টি করা যায় না। সে ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি আবিষ্কারের ফলে সূক্ষ্ম ইমেজ তৈরির আরেকটি বিশাল সম্ভাবনার জগৎ এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আবার উডকাটে দেখা যায় ইমেজের লাইন ও হাইলাইট একটু হার্ড ও মোটা হয়ে প্রিন্টে আসে। সেখানে উডকাটের সঙ্গে লিথোগ্রাফির মতো সফট ইমেজ ও লাইন আনার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উদ্ভব হলো এ দেশীয় নিজস্ব 'উড

লিথোগ্রাফি' নামক করণ-কৌশল। ফলে ইমেজে এসেছে আরেক ধরনের পরিবর্তন। শিল্পীর গভীর আত্মমগ্নতা ও সজ্ঞানে নিরীক্ষণের ফলে লিথোগ্রাফিক তুষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে অন্য ধরনের 'ওয়াটার বেইজ অয়েলি মিডিয়াম' নামক এক নতুন পেইন্টিং মাধ্যম। এই মাধ্যমে একদিকে যেমন স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ দুটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে কাজ করা সম্ভব, অন্যদিকে জলরং বা পোস্টার কালারের সঙ্গে মিশিয়েও রঙিন চিত্র রচনার সম্ভাবনাময় জগৎ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। দৃশ্যগতভাবে এটি প্রমাণিত যে, এর গুণগত মান ব্রিটিশ জলরং পদ্ধতি ও অ্যাক্রিলিক মাধ্যম থেকে ভিন্ন। ভবিষ্যতে এর থেকে আরো অনেক বেশি কিছু প্রমাণ করা বাকি রয়ে গেছে। সারা বিশ্বের শিল্পীরা যেমন ইন্ডিয়ান ইঙ্ক দিয়ে চিত্র রচনা করেন, ভবিষ্যতে এটি অবশ্যই সম্ভব যে, শিল্পীরা বলবেন—এটি 'বাংলাদেশি ওয়াটার বেইজ অয়েলি মাধ্যমে' করা। এভাবে নানা মাধ্যমের সমন্বয়ে চিত্রতল হয়ে উঠেছে অসম্ভব সম্ভাবনাময় ও আধুনিক। লিথোগ্রাফি মাধ্যমের নানা পদ্ধতি, বিবর্তন বিশ্লেষণ ও আবিষ্কৃত নতুন সব পদ্ধতি বিবেচনা করে এটি স্পষ্টত দৃশ্যমান যে, লিথোগ্রাফি প্রিন্টের চিত্রতলে একটি আলাদা চরিত্র উপস্থিত হয়েছে, যা পেইন্টিং এমনকি প্রিন্টের অন্য পদ্ধতিগুলো থেকেও ভিন্ন। ফলে সহজ পরিচিতির স্বার্থে আলাদা আলাদা নামকরণ যেমন স্পেশালাইজেশনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন, তেমনি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে এগুলোকে লিথোগ্রাফির অন্তর্ভুক্ত করে একসঙ্গে 'লিথোগ্রাফিক শিল্পভাষা' হিসেবে পরিচিতি দান করা শ্রেয় হবে। তা না হলে সাধারণ মানুষ এত রকম নামের মধ্যে গুণগত পার্থক্য বুঝতে পারলেও সে বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ হারাবে। যেমন: ক্রমোলিথোগ্রাফি, ওলিওগ্রাফি ও ক্রমো সিভিলাইজেশনের কথা লেখক ও গবেষকরা ছাড়া সাধারণ মানুষ খুব কমই জানেন। আর নানা ধরনের ইজমগুলোতে লিথোগ্রাফি বিভিন্ন ধারা বা শৈলীর শিল্পকর্মে ইমেজ (রূপকল্প) সৃষ্টিতে তার সামর্থ্যতা ও নীরব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে টিকে থাকার অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে পেরেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে পিকাসোর মতো বিখ্যাত শিল্পীরা সারা জীবন লিথোগ্রাফি চর্চা করলে ভাষাগত দিক থেকে যে উৎকর্ষ সাধন হতো—সে সম্ভাবনাটি এখনো বাকি রয়ে গেছে। পৃথবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা অধুনিক বা তার ধারাবাহিকতায় লিথোগ্রাফি চর্চাতে এক্সপেনসিভ (অনেক প্লেট ব্যবহার) ও চিপ (দু-তিনটি বেসিক কালারে প্রিন্ট নেওয়া) দুটি মাধ্যমই ব্যবহার করে এগিয়ে যাচ্ছেন। ফলে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একদিকে যেমন টেমারিন্ডের মতো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করা উচিত, তেমনি অতীত ও বর্তমান কৌশল এবং দর্শন পর্যালোচনা করে লিথোগ্রাফিকে সার্থকভাবে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার সম্ভাবনার জন্য কজ করে যাওয়া অবশ্যই যুক্তিযুক্ত।

রেনেসাঁসের (১৪০০ সাল) পর থেকে উনিশ শতক (১৮০০ সাল) পর্যন্ত প্রায় ৪০০ বছর সময় লেগে গেল জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ছড়িয়ে পড়তে। এর মূল কারণ ছিল মুদ্রণযন্ত্রের ঢিমেতেতালা অগ্রযাত্রা। রোমান রাজত্বকালে ১৪৪০ সালে গুটেনবার্গের লেটার প্রেস আবিষ্কার হয়, যার দ্বারা ঘণ্টায় ৩০ তা কাগজ ছাপানো সম্ভব হতো। বেশ কয়েক দশকের মধ্যেই ইউরোপের ডজনখানেক দেশের প্রায় ২০০ শহরে প্রেস চালু হয়ে যায়। ১৫০০ শতকে ইউরোপের সর্বত্র মিলে প্রায় ২০ লক্ষ বই ছাপা সম্ভব হয়েছে। ১৬০০ সালে আরো প্রেস ছড়িয়ে পড়ে। তখন ১৫০ মিলিয়ন থেকে ২০০ মিলয়ন কপি করতে পারা সম্ভব হয়েছে। এ সমস্ত বিষয়ের সম্মিলিত ফলাফল হিসেবে এটি—মিডিয়ার যেকোনো একটি শাখার সমার্থ নিয়ে ‘প্রেস’ নামে পরিচিত হতে থাকে।

রেনেসাঁসের সময় থেকে এই প্রেস বা মুদ্রণশিল্প আরো বেশি করে সমাজের গাঠনিক রূপকল্পের পেছনে বিকল্প হিসেবে কাজ করে গেছে। ফলে 'man, rather than God, is the measure of all things' এই দর্শনের বোধগম্যতা বিষয়ক গণযোগাযোগের উদ্দেশ্যটিকে চরিতার্থ করতে পরোপক্ষভাবে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচারের মাধ্যমে। তারই আরেকটি ধাপ এগিয়েছে লিথোগ্রাফি আবিষ্কারের (১৭৯৮ সাল) মধ্য দিয়ে। লিখিত বিষয়বস্তুর সাথে ছবি (Image) পূর্বের তুলনায় অল্প সময়ে আরো বেশি পরিমাণে ছাপানো যাচ্ছিল। কারণ ১৮০৪-১৮১৪ সাল নাগাদ লিথোগ্রাফি মাধ্যমে ভালো মানের সাদাকালো প্রিন্ট নেওয়া সম্ভব হয়ে গিয়েছিল। আমেরিকাতে ১৮১৯ সালের দিকে লিথোগ্রাফি প্রেসের আবির্ভাব দেখা যায় এবং ‘কুরিয়ার এবং ইভস’ নামক কম্পানি তার মধ্যে বেশি পরিচিত। লিথোগ্রাফির নানাবিধ প্রয়োজনের তাগিদে ১৮৭১ সালে সেখানে ন্যূনতম ৪৫০টি হ্যান্ড প্রেস এবং ৩০টি বাষ্পীয় ইঞ্জিন সমন্বিত প্রেস চালু ছিল। এরপর আরো দ্রুততম মুদ্রণযন্ত্র সৃষ্টির জন্য লিথোগ্রাফিকে মেশিনের সাথে যুক্ত করে অল্প সময়ে বেশি প্রিন্ট নেওয়া সম্ভব হলো। এই লিথো প্রেসই আবার ১৮৫৫ সালে রুবেলের হাত দিয়ে অফসেট প্রিন্টিংয়ের দিকে এগিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে বর্তমানে এরই ফলাফলস্বরূপ ডিজিটাল প্রিন্ট, সি প্রিন্ট (কম্পিউটার প্রিন্ট), গিসলি প্রিন্ট (ইঙ্ক জেট প্রিন্ট), পলিমার প্রিন্ট ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটে। এরই মধ্যে বিংশ শতকের শুরুর দিকে লেটার প্রেসের উন্নতির ধারাবাহিকতায় লিথোগ্রাফি প্রেস দ্রুতগামিতার দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে। রোটারি প্রেসে প্রিন্ট নিয়ে তার মধ্যবর্তী অংশে ইমেজ তৈরির জন্য লিথোগ্রাফি প্রসেসের প্লেট প্রয়োজন হলো, যেটা প্রেসর সিলিন্ডার আকৃতির রোলারের সাথে বেন্ট (bent) করা যায়। কিন্তু লিথো স্টোনকে বেন্ট বা বাঁকিয়ে রোলারের সাথে সংযুক্ত করা সম্ভব

নয়। তখন প্রথমে, লিথোগ্রাফি স্টোন থেকে রাবার শিটে প্রিন্টটি প্রতিস্থাপন করে সেখান থেকে কাগজে প্রিন্ট নিয়ে লিথো প্রেসকে দ্রুত পুনরোৎপাদনে সক্ষম করে তোলা হয়েছিল। তবে সেনেফেলডার এ বিষয়ে মেটাল প্লেটের ওপর লিথোগ্রাফি প্রসেস সম্পর্কে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিষয়টি আগেই দেখতে পেয়েছিলেন। ফলে বিংশ শতকের শেষের দিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বের হয়ে এলো যে—জিংক এবং অ্যালুমিনিয়াম প্লেট লিথোগ্রাফি প্রসেসের জন্য উপযুক্ত হিসেবে কাজ করতে পারে। তখনই প্রথম রোটারি প্রেসের সাথে এটিকে যুক্ত করে একসঙ্গে লেখা ও ইমেজ প্রিন্ট নেওয়া হলো।

লিথোগ্রাফি আবিষ্কারের পর এটি উডকাট, উড এনগ্রেভিং ও এচিংয়ের চেয়ে দ্রুততম মাধ্যম হওয়ায় কারিগররা ছাপাই কাজের জন্য এদিকেই ঝুঁকেছিল। আধুনিকতার এই সময়টিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পে এর ছোঁয়া লাগে। এই মাধমে শিল্পীরাও তাদের হাতের সরারসরি অভিব্যক্তি দিতে পারেন বলেই এটিকে অভিব্যক্তিক হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এটিকে আমরা চারুশিল্পে লিথোগ্রাফি চর্চা বলে ধরে নিতে পারি। ফলে দেখা যাচ্ছে, লিথোগ্রাফি একদিকে বাণিজ্যিক এবং অন্যদিকে শৈল্পিক ভাষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ‘এক্সপেনসিভ’ ও ‘চিপ’ মেথডে কয়েক ধরনের লিথোগ্রাফির শৈলীগত চর্চা সারা বিশ্বে হয়েছে। যেমন: বই অলংকরণের জন্য একধরনের লিথোগ্রাফি প্রিন্ট হতো। ক্রমোলিথোগ্রাফি, ওলিওগ্রাফি এবং জার্মান শৈলী হচ্ছে এর অন্যান্য প্রক্রিয়া। পেইন্টিংয়ের বা কোনো ছবির কালারের ক্রম অনুসারে প্রিন্ট নেওয়া হলে তাকে বলা হতো ক্রমোলিথোগ্রাফি। পেইন্টিংয়ের কপি করার জন্য যখন লিথোগ্রাফি করা হতো সেগুলোকে জার্মান শৈলী বলা হতো। পেইন্টিংয়ের মতো চকচকে দেখানোর জন্য তার ওপর যে ওয়াটার বেইজ ভার্নিশ দেওয়া হতো সেগুলোকে বলা হতো ওলিওগ্রাফি। আর লিথোগ্রাফিতে কয়েকটি বেসিক কালারে লুত্রেকের মতো শিল্পীরা যখন কাজ করেছেন তাকে ‘চিপ’ বা ‘সস্তা’ মেথড বলা হচ্ছে। যখন অনেক টোনাল ভেরিয়েশন রেখে লিথোচিত্র রচনা করা হয়েছে এবং অনেকগুলো ইম্প্রেশনে (১৫টি থেকে ৩৫টি প্লেট ব্যবহার করে) প্রিন্ট নেওয়া হয়েছে, তাকে ‘এক্সপেনসিভ’ বা ‘অনেক দামি’ মেথড বলা হয়েছে। তবে এই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ‘এক্সপেনসিভ’ ও ‘চিপ’ মেথড চারুশিল্পের ক্ষেত্রে এমনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যে, তা ওই কাজের মধ্য থেকে আলাদা করা খুবই কঠিন বিষয়। ইউরোপীয় শিল্পের ইতিহাস বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, সেখানে আধুনিক শিল্পীরা এই দুটি মেথড তাদের শিল্পে নির্দ্বিধায় ব্যবহার করছেন। এমনকি প্রিন্টের নানাবিধ বিয়েনাল, ট্রিয়েনাল দেখলেও সে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়

হয়ে উঠবে যে, প্রিন্টমেকিং এ দুটি মেথডের সাহায্যে নিজস্ব গতি নিয়ে প্রিন্টের সকল মাধ্যমের সমন্বয়ে পেইন্টিং বা অন্য মাধ্যমগুলো থেকে একটু আলাদাভাবেই এগোচ্ছে। আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে গেলে বলতে হয়, এটি প্রিন্টমেকিংয়ের আলাদা চরিত্র বা ধর্ম সৃষ্টি করেছে। সেই আলাদা চরিত্র বা ধর্মকে এই সময়ে সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে প্রিন্টমেকিং শিল্পভাষা বলা যেতে পারে। আর লিথোগ্রাফির ক্ষেত্রে আলাদা করে বলতে গেলে 'লিথোগ্রাফিক শিল্পভাষা' বলা যুক্তিসংগত। কারণ শিল্পীদের শিল্পকর্ম যখন দুর্বল ড্রাফটসম্যানরা কপি করেছেন তখন তা কমার্শিয়াল বা বাণিজ্যিক শিল্পে পরিণত হয়েছে মূলত এর গুণগত তারতম্যের জন্য। পরক্ষণে শিল্পী যখন নিজেই তার প্রিন্ট নিয়েছেন তখন তা শিল্পে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ নিজে ছবি আঁকা এবং প্রিন্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে শিল্পীর নিযুক্ত থাকার বিষয়টি সব সময় একটি গুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কথাগুলো নানা ধরনের গ্রন্থে অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হলেও স্পষ্টভাবে বলা হয়নি কোথাওই। বর্তমান গবেষণাটিতে এই মাধ্যমটিকে 'লিথোগ্রাফি শিল্পভাষা' হিসেবে স্পষ্টভাবে বলার জন্য যথোপযুক্ত যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ১৮২২ সালে লিথোগ্রাফির বাণিজ্যিক চর্চা শুরু হলেও গগনেন্দ্রনাথের প্রেসের (১৯১৭) নবহুল্লোড় লিথোচিত্রের মধ্য দিয়েই চারুশিল্পের চর্চা আরম্ভ বলে বিবেচিত হয়েছে। বাংলাদেশে ১৮৭০ সালে লিথোগ্রাফি প্রেসর আগমন ঘটে এবং বাণিজ্যিকভাবে এর চর্চা আরম্ভ হয় ১৮৭৮ সালে। চারুশিল্পে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয় ১৯৪৮ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত আর্ট স্কুলের মাধ্যমে। সে ক্ষেত্রে লিথোগ্রাফি চর্চা আরম্ভ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে ১৯৫২ সালের কিছু লিথোগ্রাফি নমুনা চিত্রকে। কিন্তু ষাটের দশকে চারুশিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের লিথোচিত্রের গুণাগুণ ভারতীয় লিথোচিত্রর মানের তুলনায় কোনো ক্রমেই কম ছিল না। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে ভারতে শিক্ষার্থীরা লিথোগ্রাফি শিক্ষার জন্য উচ্চপর্যায়ে পড়াশোনা করতে যান। অর্থাৎ স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে, এখানে একধরনের চর্চার অভাব ঘটেছে। ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে—ইউরোপে প্রথম যখন লিথোগ্রাফি আবিষ্কৃত হয়েছিল, তার প্রিন্টের মান ততটা ভালো গুণসম্পন্ন ছিল না। তবে ধীরে ধীরে পরিশীলনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে নেপোলিয়নের (Napoleon, ১৫ আগস্ট ১৭৬৯–৫ মে ১৮২১) রাজত্বকালে ১৮১৪–১৫ সালের মধ্যে সাদা-কালো রঙে গুণাগুণসম্পন্ন প্রিন্ট নেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল, যাকে ইতিহাসে লিথোগ্রাফি প্রিন্টর গোল্ডেন এজ (Golden age) বলা হয়। চাহিদা পূরণের নিমিত্তে ১৮১৬ সালে প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত কিছুসংখ্যক লিথো প্রেসের ছাপের গুণাগুণ দেখে সমসাময়িক শিল্পীরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৮১৮ সালেই সেনেফেলডার তার *A*

Complete Course of Lithography (Vollstaendiges Lehrbuch der Steindruckerey) বইয়ে রঙিন লিথোগ্রাফির প্রিন্ট নেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। রঙের টিনটিন মিডিয়ামও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। তার এই পরিলেখ দেখে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মতো বিভিন্ন দেশের প্রিন্টাররাও রঙিন লিথোগ্রাফি ছাপ তৈরির চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। ১৮৩০ সালে জর্জ বেক্সটারের (George Baxter, ১৮০৪–১৮৬৭, ইংরেজ শিল্পী ও লন্ডনের প্রিন্টার) ওলিওগ্রাফি আবিষ্কার এবং ১৮৩৭ সালে গডেফ্রয় অ্যাঞ্জেলম্যানের কালার তত্ত্বের মধ্য দিয়ে লিথোগ্রাফি আরেক ধাপ এগিয়ে গেল। এরই মধ্যবর্তী সময় ১৮৩০ সালে ওলিওগ্রাফ আবিষ্কৃত হলেও বাণিজ্যিকভাবে ব্যাপকতা পেতে সময় লেগে যায় ১৮৬০ সাল নাগাদ। তবে খুব জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে টিকে ছিল এই শতকের শেষ পর্যন্ত। ১৮৩৯ সালে হাতে টাচ করা ছাড়াও স্বয়ংসম্পূর্ণ কালার লিথোগ্রাফি প্রিন্ট নিতে পেরেছিলেন শুটার বয়েজ (Thomas Shotter Boys, ১৮০৩–১৮৭৪, ইংল্যান্ডের একজন ইংরেজ জলরং ও লিথোগ্রাফি শিল্পী ছিলেন) নামক একজন শিল্পী। এদিকে আলোকচিত্রকর Niepce-র লিথোগ্রাফি সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা ছিল বলে ১৮১৫ সালে লিথোপাথর ও জিংক প্লেটের ওপর আলোকচিত্র তৈরি করার চেষ্টা করেন। তার এই প্রসেসটি হেলিওগ্রাফি [heliographie (heliographie-1826, The Greek *helio*-means *sunlight* whereas the Greek *photo*-means *light*./ daguerreotype-1839/photography-1836)] নামে পরিচিতি লাভ করে, যার অর্থ হচ্ছে 'sun drawing'। ট্যালবোট (William Henry Fox Talbot ১১ ফেব্রু. ১৮০০–১৭ সেপ্টে. ১৮৭৭) ১৮৩৯ সালে তার ফটোগ্রাফি আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। পরে ১৮৫৫ সালে এল.এ. পয়েটভিন (L.A. Poitevin) স্টোনের ওপর পুনরুৎপাদনের জন্য ফটোলিথোগ্রাফি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ১৮৮০ সালে হ্যানস জ্যাকব স্মিথ (Hans Jakob Schmid, ১৮৫৬–১৯২৪) 'photochrome' পদ্ধতিতে ক্রমোলিথোগ্রাফিতে ফটোগ্রাফির ন্যায় ইমেজ আনার জন্য ফটোগ্রাফির নেগেটিভ থেকে কয়েকটি স্টোনে প্রতিস্থাপন করে কয়েকয়টি ইম্প্রেশনের সমন্বয়ে অনেকগুলো কালার ইম্প্রেশনের মাধ্যমে রঙিন ক্রমোলিথোগ্রাফির প্রিন্ট নেওয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করে বাণিজ্যিক ফটোগ্রাফির বিকল্প চাহিদা পূরণের সুযোগ করে দিয়েছেন।

উপরোক্ত আলোচনার মধ্যবর্তী সময়ে মুদ্রণশিল্পে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ঘটেছে। বাণিজ্যিকভাবে কারিগররা প্রথমে উডকাট ছেড়ে এচিংয়ের দিকে ঝোঁকেন। এরপর লিথোগ্রাফির আবির্ভাবে দ্রুততম মুদ্রণ উপযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় সেদিকে ঝোঁকেন। 'father of the American Christmas card'

বলে খ্যাত জার্মানিতে জন্ম লিথোগ্রাফার ও পাবলিশার লুইস প্রাং (Louis Prang, March 12, 1824–September 14, 1909) ক্রমোলিথোগ্রাফির উৎপাদনে বলিষ্ঠ সহায়তা (প্রোডাকশনে স্ট্রংলি সাপোর্ট) দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমেরিকার আর্ট এডুকেশনের উন্নতির ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রকাশনা ও আর্ট শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনিই প্রথম আমেরিকার বড়দিনের কার্ড (Christmas card) ছাপার উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি অনুভব করলেন যে, মূল পেইন্টিংয়ের (Real Painting) চেয়ে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও জনপ্রিয় (popular) পেইন্টিংয়ের বেশ কিছ ক্রমোলিথোগ্রাফি দেখতে মোটামুটি ভালো। আবার বেশি লাভের জন্য কিছুসংখ্যক শিল্পী পেইন্টিংয়ের ক্রমোলিথো প্রিন্ট নিচ্ছিলেন। ফলে সমাজে সাধারণ মানুষ পেইন্টারদের কাছে পরিচিত হতে থাকে এবং একসময় শিল্পীও সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত হতে থাকেন। অর্থাৎ শিল্পী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা যোগাযোগ ঘটতে শুরু করে। এ ধরনের শিল্পচর্চার বিরোধিতামূলক বক্তব্য হচ্ছেঃ সমাজের নানা কাজে ব্যবহৃত হওয়ার দিকটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হলেও এগুলো পেইন্টিংয়ের অনুকরণ হচ্ছে বলে অনেকে তাদের শিল্পকে মূল শিল্পকর্ম নয় বলে (lack of authenticity-এর কারণে) এই পরিকল্পনার (idea) বিরোধিতা করেছিলেন। অনুকরণ বা কপিমূলক (depictive, প্রতারণামূলক) গুণাগুণের কারণে নতুন শিল্পকলার পটভূমি থেকে (New Forms of Art) এগুলোকে কখনো কখনো ‘ব্যাড আর্ট’ (bad art) বলেও উল্লেখ (tagged) করা হতো। কেউ কেউ অবশ্য অনুভব করেছেন—খুব বেশি যান্ত্রিক কৌশলের (Mechanical Process) কারণে সব মিলিয়ে এটি আর্ট ফর্ম হয়ে উঠতে পারে না। একজন সত্যিকার শিল্পীর (true spirit of a painter) পক্ষে কখনোই এই ছাপ নেওয়ার পুরো প্রক্রিয়াটি (a printed version of a work) আয়ত্ত করে শিল্প রচনা করা অসম্ভব। একজন সত্যিকার শিল্পী (true spirit of a painter) কখনোই এই ছাপ নেওয়ার পুরো প্রক্রিয়াকে (a printed version of a work) আয়ত্ত করতে পারবেন না। যেমন এর এক্সপেনসিভ মেথডের কথা ভাবা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান সময়ে শিল্পীরা এ সমস্ত সীমাবদ্ধতা অতি সহজে দূর করে সঠিক ও বিকল্প উভয় ধরনের চর্চার মধ্য দিয়ে নানা অসম্ভব সম্ভাবনার কথা ইঙ্গিত পেয়ে যাচ্ছেন। ক্রমোলিথোগ্রাফির সমালোচনা (criticism) সত্ত্বেও লুইস প্রাং সেই সময়েই ক্রমোলিথোগ্রাফি ছাপ তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন—আর্ট শুধু সমাজের বিত্তবান মানুষের কাছে নয়, নিম্নবিত্তের সংগ্রহেও থাকা উচিত। নিম্নবিত্তের জন্য যখন ছাপা হতো। তাদর আর্থিক সক্ষমতাকে লক্ষ রেখে প্রিন্ট নেওয়ার কথা ভাবতে গিয়ে চিপ মেথডে প্রিন্ট করতে বাধ্য হয়েছে, যেগুলো গুণগত দিক থেকে কিছুটা নিম্নমানসম্পন্ন ছিল। কেউ কেউ এ ধরনের

শিল্পের সাথে মূল শিল্পকর্মের পার্থক্য বুঝে ওঠার পূর্বেই এই ক্রমোলিথোগ্রফিতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল। এদিকে পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশন হতে চলেছে এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের ফলশ্রুতিতে আমেরিকার একটি নির্দিষ্ট দশক 'chromo civilization' নামেও অবহিত হয়েছে। এসব আলোচনার মধ্য দিয়ে বর্তমান সময়ে এসে এটি অন্তত বলা যায় যে, একটি পেইন্টিংয়ের দামের তুলনায় একটি ক্রমোলিথোগ্রাফি সস্তা এবং এখনো পর্যন্ত এটি ছাপচিত্রের অন্য মেথডগুলোর থেকে এক্সপেনসিভ। সুবিধাটি হলো, এই কয়েক শ বছর পরেও একটি অরিজিনাল লিথোচিত্র মানুষ সংগ্রহ করতে পারছে।

কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, লিথোগ্রাফিকে এখানেও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং সেখান থেকে তাকে তার পথ তৈরি করে নিতে হয়েছে। ক্রমোলিথোগ্রাফি কালার লিথোগ্রাফির প্রথম দিককার অবস্থা বা প্রক্রিয়া। পরের দিকে কালার লিথোগ্রাফির প্রক্রিয়াতে স্ক্রিন ডট প্লেট ব্যবহার করে প্রিন্ট করা হয়েছে, (prepared from photo negatived) যেটা দেখতে আধুনিক অফসেট ছাপাইয়ের অনুরূপ। মধ্যবিত্তের ঘরে 'art' সাজাবার জন্য কম দামে জলরঙে অঙ্কিত চিত্রের কপি করার জন্য ক্রমোলিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে অনেকগুলো অনুলিপি ছাপা হতো। এমন ঘটনাও বিরল নয় যে, অনেকে মূল জলরং বা পেইন্টিং অঙ্কন করে যা আয় করতেন তার থেকে বেশি আয়ের আশায় এই পদ্ধতিতে ছাপ নিয়ে থাকতেন।

ফটোগ্রাফি আবিষ্কারের পর লিথোগ্রাফি তো দূরের কথা, শিল্পীদেরই আর ছবি আঁকার প্রয়োজন নেই বলে মনে করা হয়েছিল। তখনো লিথোগ্রাফি বাণিজ্যিক চাহিদা মেটানোর জন্য স্বল্প মূল্যে ফটোগ্রাফির বিকল্প হিসেবে ফটোক্রম লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে এর চর্চা অব্যাহত রেখেছে। মধ্যখান থেকে লিথোগ্রাফির আরেকটি গুণগত ক্ষমতার সন্ধান শিল্পজগৎ পেয়ে গেল।

অফসেট প্রিন্টিং আসার পর করিগররা আবার সেদিকে ঝোঁকেন। শিল্পীরা তখনো এই লিথোগ্রাফি মাধ্যম নিয়ে কাজ করেছেন। নিত্যনতুন ডিজিটাল মাধ্যম, পলিমার লিথোগ্রাফি ইত্যাদির দিকে ঝোঁকেন। শিল্পীরাও ডিজিটাল মাধ্যম, পলিমার লিথোগ্রাফি ইত্যাদির দিকে ঝোঁকেন কিন্তু অফসেট প্রিন্টিংয়ের দিকে খুব একটা নজর দিলেন না। তবে শিল্পীরা লিথোগ্রাফি মাধ্যমটিকে নিয়ে প্রথম থেকেই কাজ করে আসছেন। পঞ্চদশ শতকের মধ্যবর্তী (১৪৫০ সাল) সময় থেকেই ইউরোপের শিল্পী ও শিক্ষক সচেতনভাবেই গ্রাফিক মিডিয়াকে [লিথোগ্রাফি (তখনো আবিস্কৃত হয়নি), এচিং, উডকাট ইত্যাদি...] ব্যবহার করেছেন। কারিগররা যখন এটিকে ছেড়ে অফসেটের দিকে গেলেন, শিল্পীরা তখনো এটিকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

ফেলিক্স ব্রাকিউমন্ড (Felix Braquemond, ১৮৩৩–১৯১৪) 'Society of etchers' প্রতিষ্ঠা করে পেইন্টার ও ছাপচিত্রীদের পুনরুৎপাদন বন্ধ করে ছাপাই ছবির (printmaking) দিকে উদ্বুদ্ধ করেন। তারা 'painter-printmaker' নামকরণে একীভূত হয়েছিলেন। ১৮৫০–১৮৯০ সালের মধ্যে হুইসলারদের (J. M. Whistler, ১৮৩৪–১৯০৩) পেন্টার প্রিন্টমেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের মধ্য দিয়ে এই পুনর্জাগরণ ঘটল পুনরুৎপাদনের (Reproduction) চেয়ে ছাপাই (print) মাধ্যমে মৌলিক শিল্প রচনায় উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যই। তাই এ সময়টিকে ইউরোপে এচিংয়ের পুনর্জাগরণ (Etching revival) বলে ধরে নেওয়া হয়।

১৮৯০ সালের দিকে তুলজ লুত্রেকের (Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa, ২৪ নভেম্বর ১৮৬৪–৯ সেপ্টেম্বর ১৯০১) হাত দিয়েই রঙিন লিথোগ্রাফি শিল্পের নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়। কিন্তু যে এচিং বা কাঠখোদাই লিথোগ্রাফির মতো এত দ্রুততম মুদ্রণযন্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনি; তার দিক থেকে শিল্পীরা মুখ আবার ফিরিয়ে নিয়েছিল পোস্টার লিথোগ্রাফির প্রভাবের কারণে। বাণিজ্যিক সিনেমার রঙিন পোস্টার, খেলনার ছবি ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে ব্যবহারের কারণে ইউরোপে বিংশ শতকের প্রথমদিকে শিল্পীরা এই মাধ্যমে কাজ করার আগ্রহ হারিয়েছিলেন। পরে ১৯৫০ সালের দিকে জেপার জোনস ও রবার্ট রজেনবার্গের মতো শিল্পীরা এসে এই মাধ্যমকে পুনরায় চারুশিল্পের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। কারণ হিসেবে ১৯৭১ সালে মেল বোঁচারের (Mel Bochner) বক্তব্য অনুসারে বলা যায়—শিল্পে জেসপার জোনসের (Jasper Johns) সেন্স-ডাটা ও সিঙ্গুলার পয়েন্ট অব ভিউকে পরিত্যাগ ও শিল্পকে সমালোচনামূলক অনুসন্ধান (critical investigstion) হিসেবে গ্রহণ থেকেই প্রথম ‘পোস্টমডার্নিজম’ শুরু।

অফসেট এলেও শিল্পীরা এটিকে গ্রহণ না করে লিথোগ্রাফি চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। অফসেটের পর ডিজিটাল প্রিন্টের আগমনেও তারা লিথোগ্রাফিকে না ছেড়ে পাশাপাশি ডিজিটালপ্রিন্টকেও গ্রহণ করেছিলেন। সি-প্রিন্ট বা কম্পিউটার প্রিন্টকেও অকাতরে গ্রহণ করেছেন। এর কারণ হয়তো, শিল্পীর সরাসরি যুক্ত থাকার মতো সুযোগ অফসেট প্রিন্টে বা ফটোগ্রাফিতে নেই। যেমন: কিছু পেইন্টিংয়ের কপি করতে গিয়ে মূল শিল্পকর্মের তুলনায় এনগ্রেভিং মাধ্যমে করা কাজটি অধিকতর ভালো গুণাগুণসম্পন্ন চিত্রে পরিণত হয়েছে। আবার দুর্বল ডাফটসম্যানের অনুকরণকৃত কাজটি মূল পেইন্টিংয়ের থেকেও দুর্বল শিল্প বলে পরিগণিত হয়েছে। সেই সাথে ড্যুরারের মতো বিখ্যাত শিল্পীরা যখন সরাসরি যুক্ত থেকে প্রিন্টে কাজ

করেছেন, সেগুলো আবার উচ্চগুণসম্পন্ন চারুশিল্প বলে বিবেচিত হয়েছে। সে ধরনের কাজগুলোই ইতিহাসে বিভিন্ন ইজমের নানা চরিত্র ও শৈলীর মাধ্যমে বেশি পরিমাণে পাঠকের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। এই বর্তমান সময়ে এসে এগুলো বিবেচনায় এনে হিসাব করে দেখা যায় যে—শিল্পীর শতভাগ সরাসরি সংযুক্তিতা একটা বড় বিষয়। আরেক শ্রেণির শিল্পী ও প্রিন্টমেকাররা এই প্রিন্ট তথা লিথোগ্রাফি মাধ্যমে কাজ করে চললেও ইতিহাস কিন্তু হয়েছে মূলত বিখ্যাত শিল্পীদের কাজগুলো। র‍্যামব্রান্ট প্রিন্টমেকিংয়ের ধর্ম মেনে প্রিন্ট করেছিলেন, পেইন্টিংয়ের ধর্ম মেনে নয়। আবার হুইসলার ও জেসপার জোনস থেকে আরম্ভ হয় চারুশিল্পের ধর্ম অনুযায়ী চর্চা এবং এর সীমা-পরিসীমাকে ভেঙে নতুন সম্ভাবনার জগৎ সৃষ্টি করা। একদিকে মাধ্যমের এবং অন্যদিকে শিল্পীর ও শিল্পের নতুন দিগন্ত সৃষ্টির ক্রমাগত প্রয়াস লক্ষ করা যায়। হতে পারে, অয়েল পেইন্টিংকে এমনভাবে ব্যবহার করা হবে যেন তা দেখতে জলরং মনে হতে পারে। একটি সীমাহীন মাধ্যমের আর কত দিক আছে সেগুলো বের করাও লক্ষ্য হতে পারে। আবার কোনো একটি মাধ্যমের সীমা হয়তো খুব বেশি নয়, কিন্তু সেখানেও আরো নতুন কিছু খোঁজা যায় বা সেই সীমার মধ্যেই আর কী করা যেতে পারে—সে বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গবেষণার চেষ্টা বহমান। প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে নতুন স্বতন্ত্র মাধ্যম। তাই বোঝা যাচ্ছে, শিল্পী যখন প্রিন্টের মাধ্যমের ধর্ম মেনে এবং ধর্মকে উপেক্ষা করে গবেষণার মাধ্যমে সীমাহীন দিগন্ত সৃষ্টির নেশায় মত্ত, তখন শিল্পীর নিজস্ব ভাষা সৃষ্টির ক্ষমতাটি মাধ্যমের আরেকটি নতুন চরিত্র নির্মাণে সহযোগিতা করে। এই চরিত্রটি আবার পেইন্টিংয়ের চরিত্র থেকে একটু আলাদা, যাকে প্রিন্টমেকিংয়ের শিল্পভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চর্চাতেও সেদিকগুলো বর্তমান। যেমন: ক্রেয়নের বদলে বিকল্প পদ্ধতিতে গ্লাস মার্কারের ব্যবহার একটি ভিন্ন চরিত্রের উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ক্রেয়ন মোটা বলে তার মাধ্যমে সূক্ষ্ম টোন সৃষ্টি সম্ভব হয় না। আবার গ্লাস মার্কার চোখানো যায় এবং নানা গুণের (সফট, হার্ড) গ্লাস মার্কার ব্যবহারের ফলে সে বিষয়টি গবেষণার মধ্য দিয়ে এ দেশে স্পষ্ট হয়েছে দুটি কারণে। এক. এ দেশে একসময় ক্রেয়ন পাওয়া যেত, তা দিয়ে লিথোগ্রাফি চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত. বর্তমান সময়ে এই ক্রেয়ন পাওয়া যায় না। ফলে শিল্পীরা বাধ্য হয়ে গ্লাস মার্কার ব্যবহার করেন। তবে এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এ দেশে বেশ কয়েক ধরনের (আনুমানিক পাঁচ ছয় রকমের) নরম থেকে শক্ত গ্লাস মার্কার পাওয়া যায় বলে চিত্রতলে উদ্ভাসিত হয়েছে এর সমন্বিত অনন্য চিত্রগুণ, যা অন্যান্য দেশের থেকে ভিন্ন। এটি একজন সত্যিকার ধ্যানী লিথোগ্রাফারের দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়। তুষের ব্যবহারের বৈচিত্র্যময়তা যেমন মোহাম্মদ কিবরিয়ার দৃষ্টির সীমা খুলে দিয়েছে। তেমনি তুষকে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণে

আনতে না পেরেও তুষের খেলায় মত্ত হয়ে আরেক ধরনের নন-অবজেক্টিভ জগৎ উন্মোচনের দিকে ঝুঁকেছিলেন। অন্যদিকে এই তুষের সাবজেক্টিভ ব্যবহার সারা বিশ্বে হয়তো কম হলেও এ দেশের লিথোগ্রাফিতে এর সফলতা লক্ষ করা গেছে। তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ প্রতিষ্ঠানের লিথো চর্চায়ই বিদ্যমান।

মাধ্যমের সাথে গভীর সংযুক্তিতা ও অতৃপ্তির সমাধান কল্পে শিল্পী যখন নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, তখন তার মধ্য দিয়ে কখনো কখনো বেরিয়ে আসে নতুন কিছু মাধ্যম। যেমন: উড লিথোগ্রাফি ও 'ওয়াটার বেইজ অয়েলি মিডিয়াম'। এ দেশে সৃষ্ট উড লিথোগ্রাফির প্রক্রিয়া জাপানিজ উড লিথোগ্রাফির থেকে একটু ভিন্ন এবং চারিত্রিক গুণাগুণে ব্যাপক পার্থক্য দৃশ্যমান। আর 'ওয়াটার বেইজ অয়েলি মিডিয়াম' আবিষ্কারের ফলে স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ মাধ্যমের একত্র ব্যবহার এ দেশের ভবিষ্যৎ শিল্পসম্ভারকে সমৃদ্ধ করবে এটি নিশ্চিত, যদি শিল্পীরা এটিকে ব্যবহারে উদ্যোগী হন।

কারিগরি দিক থেকে, যদিও লিথোগ্রাফির মূল করণ-কৌশল একই। তবু বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাসায়নিক উপাদানের তারতম্যের কারণে বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ধরনের করণ-কৌশল পরিশীলনের মধ্য দিয়ে সে দেশের প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, শিল্পী ভেদেও দেখা যায় এর বিভিন্নতা। জাপান, ভারত ও বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

করণ-কৌশলগত দিক থেকে এ দেশের প্রবীণ ও নবীন শিল্পীরা লিথোগ্রাফি চর্চার ক্ষেত্রে কখনো দেশি, কখনো বা বিদেশি উপকরণ দিয়ে কাজ করেছেন। বাংলাদেশে লিথোগ্রাফির অতীত ও বর্তমান চর্চার করণ-কৌশলের চলমান ও নতুন প্রক্রিয়াগুলো গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এর প্রতিটি ধাপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্পষ্ট লিখিত আকারে তুলে ধরে এ দেশে লিথোচর্চার সঙ্গে অন্য দেশের পার্থক্য সহজেই নিরূপণ করা সম্ভবপর হয়েছে। বিকল্প উপাদান হিসেবে কন্টির বদলে গ্লাস মার্কার ব্যবহার করার ফলে কন্টি আর গ্লাস মার্কারের চরিত্র ভিন্ন রূপ দাঁড়িয়েছে বলে নিরূপণ করা সম্ভব হয়েছে। নিজেদের মতো করে তুষ ব্যবহার করেছেন। আবার নতুন সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজতে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সৃষ্টি হয়েছে নতুন কিছু মাধ্যম ও করণ-কৌশল। যেমন: করণ-কৌশলের মধ্যে রয়েছে (ক) ইমেজ তৈরিতে কন্টি বা ক্রেয়নের ব্যবহার, (খ) ইরেজ করে ইমেজ সৃষ্টি পদ্ধতি, (গ) ইমেজ তৈরিতে বলপয়েন্ট কলম ব্যবহার, (ঘ) ফ্লাট ইমেজ সৃষ্টিতে প্লেট-লিথোগ্রাফি ব্যবহার, (ঙ) ওয়াশ-আউট দ্রবণ (সলিউশন) সৃষ্টি,

(চ) ইন্টাগলিও পদ্ধতি প্রভৃতিতে ইমেজ সৃষ্টির উপায় বর্ণনা করা হয়েছে। মাধ্যম হিসেবে যে নতুন মাধ্যম পাওয়া গেল, সেগুলো যেমনঃ (ক) উড লিথোগ্রাফি পদ্ধতি (Planography on Wood surface), (খ) বলপয়েন্ট লিথোগ্রাফি, (গ) ওয়াটার বেইজ অয়েলি মিডিয়াম (Water base Oily Medium), (ঙ) প্লেট লিথোগ্রাফির সঙ্গে ওয়াটারলেস লিথোর সংমিশ্রণ পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যবহার করে ইমেজ সৃষ্টি পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

লিথোগ্রাফির করণ-কৌশল বিবর্তন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এ সমস্ত করণ-কৌশল ও নতুন মাধ্যম ব্যবহারের ফলে ভাষাগত স্বতন্ত্র রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর লিথোগ্রাফির ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে— মডার্ন সময়ে এসেও শিল্পীরা স্পষ্টত একে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে বলতে পারেননি। এই স্বতন্ত্র ভাষার কথাটিও এই গবেষণার সার্বিক ফলাফলের মধ্যে দিয়ে যৌক্তিকভাবে বের হয়ে এসেছে।

গবেষণাপত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে লিথোগ্রাফির সামগ্রিক উত্থান এবং পতন আলোচনায় আলংকারিক ও অনালংকারিক লিথোচর্চার গুণাগুণ নিয়ে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে এর সস্তা ও মূল্যবান (এক্সপেনসিভ মেথড) প্রক্রিয়াটির প্রতি গুরুত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে পরবর্তী অনুশীলকদের পুনরায় ব্যবহারে উদ্যোগী করে তোলা হয়েছে। এ দুটি পদ্ধতির গুণগত মিশ্রণের উপস্থিতি মডার্নিজমের ও পরবর্তী শিল্পধারায় বিদ্যমান বলে প্রাসঙ্গিক প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ইজমের দর্শনের উদ্দেশ্য চরিতার্থে লিথোগ্রাফি সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ইউরোপে লিথোগ্রাফি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে চারুশিল্পে এর চর্চা আরম্ভ হলেও ভারতে শান্তিনিকেতনেই (১৯১৭ সাল) শুরু বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে শুরু হয়েছে খসড়াকে অনুকরণের মধ্য দিয়ে। আর লিথোগ্রাফি চর্চা তার ধারাবাহিক অস্তিত্ব রক্ষায় সংগ্রামের বিষয়টিও স্পষ্ট করে আজকের এই পর্যায়ে পৌঁছেছে। সেই সাথে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি 'paint by heart' উপদেশটা থেকে প্রাচ্যশিল্পকলা দৃশ্যশিল্পের নতুন রাজপথ খুলে দিতে পেরেছিল বলে নন-ইউরোপিয়ান আর্ট ইতিহাসে গ্রহণযোগ্যতা পেল। তাই এত সব অভিজ্ঞতাকে আমলে নিয়েই বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির পথ চলাটা ভাষার দোরগোড়ায় যেতে পারবে বলে বিশ্বাস করা যায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির চর্চার করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত চর্চা নিয়ে বিশদ আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে—এ দেশে চর্চিত লিথোগ্রাফি কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। করণ-কৌশলগত ও ভাষাগত বিবর্তনের দিকটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে এ দেশের লিথোগ্রাফির চিহ্নিত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও ভাষাগত বিবর্তনটির মধ্য দিয়ে এর নতুনতর কৌশল ও মাধ্যম সৃষ্টির বিষয়টি সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ধারণা পাওয়া গেছে।

সপ্তম অধ্যায়ে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিগুলোর নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও লিথোর বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাব্যতা বিষয়ে আলোকপাত করে কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে:

প্রথমত. এ দেশের লিথোগ্রাফিগুলোকে ট্র্যাডিশনাল নন্দনতত্ত্বের আলোকে শিল্প হিসেবে প্রমাণ করা হয়েছে। এগুলো যেকোনো অনুকরণ (ইমিটেশন) নয় সে বিষয়ে যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। নাটকের মতো বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীরা ট্র্যাজিক ক্যারেক্টার বা দৃশ্য 'অনুকরণ' করেছেন—তারা যেমন আছে তেমন করে নয়, তারা যেমন 'হওয়া উচিত', (ought to be) তেমন করে। নাটকের মতো এই যে 'probable impossibilities to possible improbabilities'-এর কথা বলা হচ্ছে; সফিউদ্দীন-কিবরিয়ারা ও শিক্ষার্থীদের লিথোচিত্রের মধ্যে তার দার্শনিক রূপকল্পটি অনুরূপভাবে ফুটে উঠেছে। মিউজিকের মতো বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিগুলোর হারমোনিও হবে শিল্পীর আত্মার বহিঃপ্রকাশ, যা সময়কালকেও প্রকাশ করবে।

দ্বিতীয়ত. আধুনিক নন্দনতত্ত্বের আলোকে বংলাদেশের লিথোগ্রাফিগুলোতে আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট বলে বোঝানো হয়েছে। অভিব্যক্তিক তত্ত্বের অলোচনায় এ দেশের লিথোগ্রাফিগুলোর সামঞ্জস্যতা নিরূপণ করা হয়েছে।

এ দেশের শিল্পীরা সম্ভবত সন্দেহমুক্তভাবেই স্বীকার করেন যে, 'the artist present his *evaluative* interpretation of reality, and thereby is expressing his thought and feeling.' শিল্পী বাস্তবতা (রিয়ালিটি) সম্পর্কে তার মূল্যায়নকে উপস্থাপন করেন এবং সেই সূত্রে তিনি তার চিন্তা এবং অনুভূতিকে ব্যক্ত করেন। যা বাংলাদেশের শিল্পীদের লিথোগ্রাফির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

তৃতীয়ত. আধুনিকতা একটি বৃহৎ পরিলেখটিতে আধুনিক নন্দনতত্ত্বের গভীরে গিয়ে শিল্পী ও দার্শনিকদের চিন্তার ক্ষেত্রে আধুনিক দর্শনের ব্যাপকতা ও চারুশিল্পে আধুনিকতা নিয়ে আলোচনা করে দেখা গেছে যে—চেতনাসহ বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যকার অন্তর্নিহিত সংযোগ সূত্র প্রকাশে ভাববাদ ও বস্তুবাদ এখনো পর্যন্ত সামগ্রিকতার সমাধান দিতে এগিয়েছে বটে, কিন্তু পুরোপুরি সক্ষম হয়নি। শিল্পীদের চিন্তাগত প্রকৃতিটি হলো: শিল্পী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের চিন্তাগত কিছু মিল থাকলেও অমিলও রয়েছে অনেক। ফলে শিল্পীর সামগ্রিকতা শুধু কোনো কল্পনাপ্রসূত বিষয় নয় এবং কোনো কল্পনা আবার সামগ্রিকতার বাইরেও নয়—এমন বক্তব্য উঠে এসেছে। তার সঙ্গে যুক্তির যৌক্তিকতা থাকছেই। শিল্পীর

একটি ভুল তুলির আঁচড়েও সৃষ্টি হতে পারে নতুন সম্ভাবনাময় শিল্প সৃষ্টির জগৎ। এ রকমভাবেই শিল্পী শিল্প সৃষ্টির আপন ভুবনে কাজ করে যাচ্ছেন। যার সঙ্গে কারো দ্বিমত হওয়ার কথা নয়। তাই বলা যায়, একজন আধুনিক শিল্পীর চিন্তা ও কাজ ভাববাদ ও বস্তুবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত।

চতুর্থত. পোস্টমডার্নিজম, পোস্ট-পোস্টমডার্নিজম, মেটামডার্নিজম এবং তার পরবর্তী ধারাগুলোকে মডার্নিজমের একেকটি উপধারা হিসেবে বিবেচনায় এনে বাংলাদেশের কিছু লিথোগ্রাফিকে পোস্টমডার্ন শিল্প বা এর অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ফেমিনিস্ট তত্ত্বকে পোস্টমডার্নিজমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ধরে নিয়ে এ দেশের কয়েকজন মহিলা শিল্পীর লিথোগ্রাফিকে পোস্টমডার্ন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রমাণ করা হয়েছে। তা ছাড়া 'ইন্টারমিডিয়া আর্ট'কেও পোস্টমডার্ন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত ধরে নিয়ে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফিকে গ্রহণ করা সম্ভানার কথা বলা হয়েছে। এরপর কিছু সিরিজ লিথোগ্রাফিকে পোস্টমডার্নিজম থেকে বের হয়ে আসা 'ট্রান্স অবজেক্টিভিটি'-র আওতাভুক্ত বলে প্রমাণ করা হয়েছে, যেখানে নতুনত্ব তৈরি ও অবিদ্রুপাত্মক (non-ironic) ধরনের শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পোস্টমডার্ন শিল্প পুরো কনভেনশনালও হতে পারে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

পঞ্চমত. বাংলাদেশের শিল্পে লিথোগ্রাফির সম্ভাবনামূলক দিকনির্দেশনা অতীত পর্যালোচনামূলক পেইন্টিং ও টেমারিন্ড ইনস্টিটিউটের চর্চাগত দিক নিয়ে আলোচনা করেই দেখানো হয়েছে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ দেশে লিথোগ্রাফির মান উক্ত ইনস্টিটিউটের সাথে সমান্তরালে এগোচ্ছে ভাবা যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের লিথোগ্রাফির বর্তমান অবস্থাটি একটু ধীরগতিসম্পন্ন হলেও এর রয়েছে দীর্ঘ পথপরিক্রমা। সে পথ পর্যালোচনা ও বৈশ্বিক লিথোগ্রাফিক পরিস্থিতে বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি অনেকটা সমান্তরালেই চলছে। করণ-কৌশলগত দিক থেকে নানারূপ বৈচিত্র্যময়তার কারণে নিজস্ব কিছু চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। যেমনঃ গ্লাস মার্কারের ব্যবহারের ফলে সৃষ্টি হয়েছে দেশের আরেক ধরনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। নিজেদের মতো করে তুষ ব্যবহারের ফলে ভাষাগত দিক দিয়ে একদিকে যেমন নন-অবজেক্টিভট নিজস্ব চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সাবজেক্টিভ কাজে গ্লাসমার্কার ব্যবহারের পর তার ওপর তুষের বেশ কয়েকটি ইম্প্রেশনের ফলে সমন্বিত আরেক ধরনের চরিত্র পাওয়া গেল, যা বর্তমান টেমারিন্ড ইনস্টিটিউটের চর্চার মধ্যেও বিরল। আবার বলপয়েন্ট লিথোগ্রাফির ফলে সাবজেক্টিভ ও নন-অবজেক্টিভ কাজের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে নতুন শিল্পগুণ। বর্তমান বাংলাদেশের উড লিথোগ্রাফিগুলো ভিন্ন উপায়ে করার

ফলে যেমন কিছু সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে, তেমনি সৃষ্টি হয়েছে সীমাহীন ইমেজ সৃষ্টির জগৎ, যা জাপানিজ উডলিথোগ্রাফি থেকে স্মপূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের গুণাগুণসম্পন্ন।

বাংলাদেশের করণ-কৌশল বিবর্তন বিশ্লেষণ করে এতটুকু অন্তত প্রমাণিত যে, এর একটি বিবর্তন ইতিহাস রয়েছে, যা পূর্বে কোন গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখিত হয়নি। প্রথম থেকেই এ দেশের লিথোগ্রাফি আধুনিক শিল্পকলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এগিয়েছে। পাশাপাশি নবীন প্রজন্মের নিরীক্ষণশীলতা বর্তমান পর্যন্ত বহমান। তাই এর আলো ছাইচাপা আগুনের মতো মাঝেমধ্যেই জ্বলে ওঠে। করণ-কৌশলের দিক থেকে চল্লিশের দশকে প্রবীনদের কাজে তুষ ও ক্রেয়ন ব্যবহার লক্ষণীয়। পঞ্চাশের দশকেও তাই। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় প্রথম দিকে তুষ গুলিয়ে ক্রোকিল নিব দিয়ে অঙ্কিত চিত্রের সমাহার দেখা যায়। সেই সাথে ক্রেয়নের সাহায্যে বেশির ভাগ লিথোচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই সমস্ত মিলে বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বের লিথোগ্রাফিকে শিল্পভাষা হিসেবে গ্রহণ করা সময়ানুযায়ী যথার্থ যুক্তিযুক্ত।

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

সহায়ক উপকরণ

ক. গ্রন্থ

- Antreasian, Garo Z. and Adams, Clinton. *The Tamarind Book of Lithography: Art & Techniques*, Los Angeles. June 8, 1970.
- Abdul Hye, Hasnat. *Murtaja Baseer*. Art of Bangladesh *series-11*. Bagladesh Shilpakala Academy, 2004, pp. 30
- Ayres, Julia. *Printmaking Techniques*. New York, 1993.
- Elger, Dietmar. *Dadaism*, Koln: Taschen. pp. 80
- Gardner, Helen. *Art through the Ages*, The twentieth century. 8th edition. New York, 1976.
- Glanz, Dawn. '*The Democratic Art: Pictures for a Nineteenth-Century America*, Chromolithography 1840–1900 (Review).' Winterthur Portfolio 16(1981), pp. 96–97; 'Chromolithography: ~ Arrival in America' https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography, 3 June 2014, at 08:30
- Heller, Jules. *Printmaking Today*. 2nd edition. New York, 1972.
- Islam, Nazrul. '*Art of Bangladesh series-7: Abdur Razzaque*'. Bangladesh Shilpaka Academy. p. 10-20
- Manzoorul Islam, Syed. *Mohammad Kibria*.12 k*Art of Bangladesh series-9*, Bangladesh Shilpakala Academy, 2004, P. 23
- Moszynska, Anna. *Abstract art*. Singapor: Thames and Hudson, Reprinted-1995. page-8
- Mukhopadhyay, Amit. and Das, Nirmalendu. *Graphic Art in India (Abrief Background and History): 1850 to 1950.* 1st edition, New Delhi: Lalit Kala Akademi; Rabindra Bhavan, September 1985. p. 4

- Michel, Toby. *How Stone Lithography Works.*
- Mukhopadhyay, Amit. And Das, Nirmalendu.*Multiple Encounters 2012: Graphic Art in India (Abrief Background and History): 1850 to 1950,* 2nd addition, P. 7
- M. Destree, Thomas. *The Lithographers Manual.* 9th edition, Pennsylvania, 1994.
- Rader, Melvin. *A Modern book of Esthetics*: *The meaning of Art*. Third Edition, p.2
- Ross John. *The complete printmaker*. Revised and expanded edition, Roundtable press. New York, 1990. p.191
- Smith, Robert. *Concepts of Modern Art: Conceptual Art.* 3rd edition, Singapore, 2001. pp. 256–258–259.
- Shah, Kavita. *Multiple Encounters 2012: Jyoti Bhatt in conversation with Kavita Shah*. p. 19
- আব্দুল হালিম, মোহাম্মদ । 'দার্শনিক প্রবন্ধাবলি' । প্রথম সং, মে ২০০৩ । বাংলা একাডেমি, । পৃ.১০ ।
- আজিজুল হক, সৈয়দ । কামরুল হাসানঃ জীবন ও কর্ম (ঢাকা, ১৯৯৮) । বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী । পৃ. ৭
- ফজলুল করিম, সরদার । 'দর্শন কোষ' । প্রথম সং ২০০২, । পৃ. ১৩১
- রাব্বি, ফজলে ।'ছাপাখানার ইতিকথা'। দ্বিতীয় সং, মে ২০০২। বাংলা একাডেমি । পৃ. ৬৭।
- রঞ্জন সিংহ, ড. নিহার । অভিসন্দর্ভ । পৃ. ৫ ।
- রায়, অন্নদাশঙ্কর । 'আর্ট', । কলকাতা ১০, পুনশ্চ সংস্করণ, গ্রন্থমেলা ১৯৮৯, । প্রকাশক-সন্দীপ নায়ক, ১১৪ এন, ডা. এস.সি. ব্যানার্জী রোড । পৃ. ১১ ।

গ. সাময়িক পত্রিকা

- C.Danto. Arthur. *After the End of Art: Contemporary Art and the Pale of History*; Clement Greenberg: Modernism and Postmodernism, 1979. Retrieved June 26, 2007; 'Postmodern art', 'Wikipedia, the free encyclopedia', 21 January 2016, https://en.wikipedia.org/wiki/Postmodern_art
- Clapper, Michael. “I Was Once a Barefoot Boy!: Cultural Tensions in a Popular Chromo.” ‘American Art 16 (2002)’. p.16–39
- “Color printing in the nineteenth century-Lithography: Early Lithographic Processes”. ‘University of Delaware Library’. http://www.lib.udel.edu/ud/spec/exhibits/color/lithogr.htm, Last modified 12/21/10
- Das, Nirmalendu. “Brief History of Printmaking at Santiniketan”. ‘art etc (news & views-monthly art magazine)’. August 2011; http://www.artnewsnviews.com/view-article.php?article=a-brief-history-of-printmaking-at-santiniketan&iid=23
- Forrest, Nicholas. “Art Market Blog with Nic Forrest' In 2007”. http://www.artmarketblog.com/about-nick/
- Gurdjieff, G. I. “Objective and Subjective Art”. OSHO NEWS online magazine. http://www.oshonews.com/2011/05/objective-and-subjective-art/, 29 May 20011, 13/2/2015.
- Gombrich 1958, p. 419.

- Houbraken, Arnold. “Filip Roos Biography”. ‘De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen (1718)’. Digital library for Dutch literature, http://www.dbnl.org/tekst/houb005groo01_01/houb005groo01_01_0294.php
- Hggins, Dick. 'Intermedia'. re-published in Leonardo, vol 34, 2001, p49-54, with an Appendix by Hannah Higgins; Hannah B Higgins, 'The

Computational Word Works of Eric Andersen and Dick Higgins' in H. Higgins, & D. Kahn (Eds.), Mainframe experimentalism: Early digital computing in the experimental arts. p.283. https://en.wikipedia.org/wiki/Intermedia

- Islam, Sirajul. “Bat-tala”. 'National Encyclopedia of Bangladesh, Banglapedia in Bangla, ©Copyright Banglapedia 2012.' http://www.banglapedia.org/HT/B_0396.htm
- J. Schaaf, Larry. “Hill, David Octavius (1802–1870)”. ‘Oxford Dictionary of National Biography’. Oxford University Press, 2004; online edn, May 2013. http://www.oxforddnb.com/view/article/13270, accessed 15 May 2014
- Maiti, Sarmistha. “A Lowdown on the Print Market”. 'art etc'. 11August 2011, http://www.artnewsnviews.com/view-article.php?article=a-lowdown-on-the-print-market&iid=23&articleid=608&artorder=29#sthash. LHRmARjt.dpuf
- Malaviya, Nalini. “Raja Ravi Varma's Oleographs: Glimpses from the Past”. ‘Art Scene India’. http://www.artsceneindia.com/2014/10/raja-ravi-varmas-oleographs-glimpses.html
- Mukhopadhyay, Amit. And Das, Nirmalendu. *Graphic Art in India (Abrief Background and History): 1850 to 1950.* 1st edition, New Delhi: Lalit Kala Akademi; Rabindra Bhavan. September *1985.* p. 4
- Mikhail Epstein, Genis, Alexander; Vladiv-Glover, Slobodanka. *Russian Postmodernism. New Perspectives on Post-Soviet Culture*. Berghahn Books, New York, 1999. p. 467. https://en.wikipedia.org/wiki/Post-postmodernism, collected date from net is 11/12/2015
- 'Postmodern art'. ART AND WRITERS. 22nd March, 2014, http://literatureandwriters.info/2014/03/22/postmodern-art/
- “Premodernism, Modernism, & Postmodernism: (An Overview, ©2005-2008, Louis Hoffman, Ph.D.)”.

http://www.postmodernpsychology.com/philosophical_systems/overview.htm, 31.12.2015.

- Plant, S. (1992). “The most radical gesture: The Situationist International in a postmodern age.”. London and New York: Routledge, pp.44. https://en.wikipedia.org/wiki/Appropriation_(art)
- Ross, John. *The complete printmaker*. ‘Revised and expanded edition’, Roundtable press, New York,1990, p.191
- Shah, Kavita. “Printmaking practices in India: An historical sketch and contemporary printmakers”. Mohile Parekh Center, Presentation and Discussion. 20th Thursday, July. 2006. 6.30pm http://mohileparikhcenter.org/site/?q=node/232
- “The Etching Revival in Nineteenth-Century France”. ‘Heilbrunn Timeline of Art History’. Britany Salsbury, Department of Drawings and Prints New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000. http://www.metmuseum.org/toah/hd/etre/hd_etre.htm,September 2014.
- “The history of print from 1800 to 1899”. ‘Pressure.com’. http://www.prepressure.com/printing/history/1800-1899, 16 July 2015
- Zaman, Mustafa. "Performing the self". Depart Mag. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 8 March 2015

ঘ. কোষগন্থ

- “Artist Summary”. 'Artfact’. Retrieved 2014-06–30
- “Art and Writers”. 'Wikipedia, the free encyclopedia'. http://literatureandwriters.info/2014/03/22
- “Bird's-eye view”. 'London, Hull and York and of Melbourne: Oxford Art Online; Australia: Sanders of Oxford'. https://en.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Whittock, 16.5.2011

- “Chromolithography: Opposition to chromolithography”. 'Wikipedia, the free encyclopedia'. https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography, 3 June 2014, at 08:30
- “Chromolithography: Origins”, Wikipedia, the free encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography, 3 June 2014, at 08:30
- “Chromolithography Prints-Why they are considered 'originals”. *Free Clip Art, The Stoke Solution and Stock Photos*. http://www.tssphoto.com/index.php?p=693, Saturday, December 26, 2009
- “Chromolithography”. *Beautiful Birds Exhibit*.1999. Cornell University Library. 11 April 2007, <http://rmc.library.cornell.edu/ornithology/exhibit/exhibit5.htm>
- “Chromolithography and the Posters of World War I.” *The War on the Walls*. Temple University. 11 April 2007 <http://exhibitions.library.temple.edu/ww1/chromo_essay.htm>.
- “Chromolithography: Uses”. 'Wikipedia, the free encyclopedia'. https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography, 3 June 2014, at 08:30
- “Cyanotype”. ‘Wikipedia, the free encyclopedia’. 1 March 2017, at 09:51. https://en.wikipedia.org/wiki/Cyanotype
- “Daguerreotype”. 'Wikipedia, the free encyclopedia'. /daguerreotype-1839/photography-1836
- “first impression”. 'The early history of lithography–A comparative survey'. NGA, National Gallery of Australia. 3 May–24 August 2003. http://nga.gov.au/FirstImpressions
- Ferry, Kathryn. “Printing the Alhambra: Owen Jones and Chromolithography: Architectural History 46(2003)”. 'Wikipedia, the free encyclopedia'. pp. 175–188. https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography**,** 3 June 2014, at 08:30
- Gaffney, Dennis. “Tips of the Trade: Lithography 101”. 9.10.2001, http://www.pbs.org/wgbh/roadshow/tips/lithography.html

- Glanz, Dawn, “The Democratic Art: Pictures for a Nineteenth-Century America, Chromolithography 1840-1900 (Review)”. '*Winterthur Portfolio* 16(1981), P. 96–97'; https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography, 3 June 2014, at 08:30
- “Graphic Arts Technical Foundation”. 'Wikipedia, the free encyclopedia'. 10 October 2016, at 13:30, https://en.wikipedia.org/wiki/Graphic_Arts_Technical_Foundation
- “Honoré Daumier”. ‘Wikipedia, the free encyclopedia’. http://en.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_Daumier, 18 May 2015, at 04:33.
- ‘Hideo Hagiwara’. ‘Wikipedia, the free encyclopedia’. http://www.myjapanesehanga.com/home/artists/hideo-hagiwara-1913---2007
- “Hieronymus Bosch”. 'Wikipedia, the free encyclopedia'. https://en.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Bosch, published-19 November 2016, at 03:11, collected date, 28-11-2016
- “Jolly's artworks focus on garment workers". *‘Dhaka* Tribune. 21 August 2014*.”*. http://archive.dhakatribune.com/entertainment/2014/aug/21/jolly%E2%80%99s-artworks-focus-garment-workers,
- “The history of print from 1800 to 1899”. 'Pressure.com'. 'Wikipedia, the free encyclopedia'. http://www.prepressure.com/printing/history/1800-1899, 16 July 2015.
- Lane, Chris. “Chromolithography”. ‘Antique Prints Blog’. http://antiqueprintsblog.blogspot.com/2009/06/chromolithography.html, Friday, June 12, 2009.
- “Lithography (i) Definition and Historical outline”. 'A technical Dictionary of printmaking, Andre beguin.' (No Date), http://www.polymetaal.nl/beguin/mapl/lithography/lithodefinition.htm
- Lycett. p. 8. https://en.wikipedia.org/wiki/George_Baxter_%28printer%29
- “Lithography”. 'Wikipedia, the free encyclopedia'. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/343748/lithography

- Michel, Toby. *How Stone Lithography Works*. http://entertainment.howstuffworks.com/arts/artwork/stone-lithography.htm
- Norman, Jeremy. “Alois Senefelder Invents & Develops Lithography (1796 – 1819)”. ‘Hiistory of Information.co’. March 11, 2017. http://www.historyofinformation.com/expanded.php?id=503
- “Photochrom”, 'Wikipedia, the free encyclopedia', 26 December 2016, at 19:52, https://en.wikipedia.org/wiki/Photochrom,
- “Planographic Printing”. *Seeing is Believing*. 2001 The New York Public Library. 11 April 2007 <http://seeing.nypl.org/planographic.html>
- “Postmodernism”. 'Wikipedia, the free encyclopedia'. https://en.wikipedia.org/wiki/Postmodernism, 10 September 2015
- “Small Worlds V (Kleine Welten VI) from Small Worlds (Kleine Welten)”, '2016 The Museum of Modern Art', https://www.moma.org/collection/works/68435?locale=en (No Date)
- Stankiewicz, Mary Ann. “A Picture Age: Reproductions in Picture Study”. *Studies in Art Education* 26(1985). p. 86–92, https://en.wikipedia.org/wiki/Chromolithography, 3 June 2014, at 08:30
- Welchman, John C. *“art After Appropriation Essays on Art in the 1990s”*, (2013). Routledge. pp. 33, https://en.wikipedia.org/wiki/Appropriation_(art)
- Witcombe, Christopher L. C. E. “The Roots of Modernism”. 'Art history resources'. 24 October, 1995, http://arthistoryresources.net/modernism/roots.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Est%C3%A8ve
- https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker
- http://www.jaynereidjackson.com/techniques.html
- http://www.saffronart.com/sitepages/printmaking/history.aspx
- http://www.neuschwanstein.de/englisch/palace/

চিত্র নং **চিত্র বিবরণ** পৃষ্ঠা নং

১. প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

1.1 বাণিজ্যিক লিথোগ্রাফি, Prang Co. Boston, chromo litho, Sea Lion, 1885, 5x8 inch. -- ১

1.2 চারুশিল্পে লিথোগ্রাফি, Theodore Gericault, 'Mameluke defending a wounded trumpeter', chalk lithograph, 1818. ---------------------- ১

1.3 Honore Daumier, Litho-Rue Transnonain, April 15, 1834, L' association Mensuelle, 1834. -- ৪

1.4 Ernst Ludwig Kirchner, Lithograph, Women Wearing a Hat with Feathers, litho, 17x15 inch, 1910. ------------------------------------ ৪

1.5 Louis Prang co., chromolitho, Paradise Flycatchers, 1885, 5x8 inch. -- ১১

1.6 Whisler, litho, The Thames at Battersea, 1878, 6.75x10.75 inch - ১১

1.7 Henri de Toulouse Lautrec, Lithography. ---------------------------- ১১

1.8 Rauschenberg, Lithography, --- - ১১

২. দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহিত্য পর্যালোচনা

2.1 Partly detailed photograph --- ২৮

2.1 Plate: 2.2, Zainul Abedin (Jony), Lithography, 2014, 24x24, inch. ২৮

2.3 Partly detailed Photograph of Honoré Daumier`s Lithography ----- ২৮

2.4 The War Council, 10x8 inch, 1872 (part of the picture) ------------ ২৮

2.5	Rokonuzzaman, plate-lithography, 2011, 18x6 cm, (অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে দ্রুত ইমেজ অঙ্কন করে গ্লাস মার্কার দিয়ে প্রেশারের মাধ্যমে পাখির ইমেজ সৃষ্টি— 'ইরেজ করে ইমেজ সৃষ্টি') --	৩০
2.6	Rokonuzzaman, Lithography, Tusch Wash, 2010, 15x16cm. ------	৩১
2.7	Rafiqul islam, Plate-Lithography, (partly close up photo of an image) Tusch Wash, 6.5x 7.5 inch, 2013. ----------------------------	৩২
2.8	Rokonuzzaman, Lithography, Ball Point pen, Tusch, Glass marker, 2008, 30x26 cm. --	৩৩
2.9	Honore Daumier. Litho-Rue Transnonain, April 15, 1834, L' association Mensuell, 12 x 17 inch. -----------------------------------	৩৮
2.10	Paul Cézanne, litho, Large Bathers, 16x20 inch, 1896-1898 -------	৩৮
2.11	Paul Signac, litho, Buoy (Saint Tropez Harbor), 1894 -------------	৩৮
2.12	Odilon Redon, Yeux Clos, 1890, Transfer lithograph. (22×16) inch	৩৯
2.13	Rodolphe Breesdine, The Good Samaritan, 1861, lithograph, 29.8×23.7 inch--	৩৯
2.14	Edouard Vuillard, lithography, La Cuisiniere, 12x10 inch, 1950 --	৪০
2.15	Pierre Bonnard, litho woman with a parasol, Style –Japonism. ----	৪০
2.16	Kandinsky, Lithography, Orange, 1923, 15x15 inch ----------------	৪১
2.17	Kandinsky, Lithography , Small Worlds III, 1922, 10x 9 inch -----	৪১
2.18	Max Pechstein, litho, Compositio, 15x13cm. 1908 -----------------	৪৫
2.19	Jack Beal, Doyle's Glove, five-color lithograph on Rives BFK paper, 1969, 12x13 inch.---	৪৫
2.20	Richard Diebenkorn, Untitled Ocean Park Series, lithography, Untitled 1969, 24x18 inch. ---	৪৫
2.21	Kamruzzaman, Lithoraphy, Miniature, 4x4 cm, 2014. -------------	৪৫
2.22	Henry Pearson (1914-2006), Blue on Yellow, stone lithograph, 1964, 30 x22 inches ----------------------------------	৪৬

৩. তৃতীয় অধ্যায়

তত্ত্ব, শিল্প ধারণা ও কৌশলের আলোচনা

3.1 Uncle Sam Supplying the World with Berry Brothers Hard Oil Finish, 1880, This cheaply produced chromolithographic advertisement employs a technique called stippling, with heavy reliance on the initial black line ------------------------------------ ৫৭

3.2 ক্রেয়ন -- ৬২

3.3 গ্লাস মার্কার --- ৬৫

3.4 Rokonuzzaman, Stone lithography, Lithographic tusch wash, 2009, 25x23 cm. -- ৬৭

3.5 Rokonuzzaman, Plate Lithography, 12 x 11inch, 2012 ------------- ৭০

3.6 Plate: Hieronymus Bosch, Last judgement ---------------------------- ৭১

3.7 ফটোক্রম (লিথোগ্রাফি) পদ্ধতিতে নিউ ইয়র্ক শহরের Mulberry Street-র দৃশ্য, 1900 ৭২

৪. চতুর্থ অধ্যায়

লিথোগ্রাফির ইতিহাস ও বিবর্তন

4.1 Vollstandiges Lehrbuch der Steindruckerey ------------------------- ৮৫

4.2 Chromolithograph, Love or Duty, by Gabriele Castagnola, 1873 ৮৬

4.3 Painting, Castagnola Gabriele pittore ligure, Love or Duty, 1840, castagnola1.--- ৮৬

4.4 Chromolithography primarily as book illustrations or inexpensive 'art' --- ৮৭

4.5 জলরঙের ন্যায় স্বচ্ছ ক্রমোলিথোগ্রাফি (ফ্রেঞ্চশৈলী) ---------------------------- ৮৭

4.6	স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ মিশ্র পদ্ধতির ক্রমোলিথোগ্রাফি (ফ্রেঞ্চশৈলী), Chromolithograph by Armstrong & Co, Boston, Shooting Pictures, 1895, 13x20, (ফিলাডেলফিয়া প্রিন্ট শপ থেকে সংগ্রহ) ----------	৮৭
4.7	জার্মানশৈলী (অয়েল পেইন্টিংয়ের অনুকরণ) ----------------------------------	৮৭
4.8	Raja Ravi Varma, Usha's Dream, Oleography -----------------------	৮৮
4.9	Photochrom print (Hildesheim শহরের ফটোক্রম লিথোগ্রাফি), 1890 -----	৮৮
4.10	Uncle Sam Supplying the World with Berry Brothers Hard Oil Finish, c. 1880 স্টিপলিং এবং ইন্টারমিংলিং (একত্রে মেশানো) ডটসের ফলাফল (লিথোগ্রাফি মাধ্যম) ।---	৯০
4.11	Honse (1860-1939)-1896 Job, poster-----------------------------------	৯১
4.12	1950's Pin-Up-Sexy Redhead Girl in green swimsuit, arm up, Honey, 8x10 inch. --	৯১
4.13	Surendranath Kar, Lithography, Collected from Nandan Archive, Shantiniketan, (শান্তিনিকেতনের প্রথম দিককার চিত্র) ------------------------	৯৬
4.14	William Blake, litho, 1806, Job in Prosperrity, 8x12 inch, ---------	৯৭
4.15	Horace Vernet, Napoléon in 1815 Lithography, 64x52 cm. ?? ----	৯৭
4.16	George Baxter, oleograph, 12 x 7 inch --------------------------------	৯৮
4.17	Shotterboys, lithography --	৯৮
4.18	Edward Hull, litho, Sir Henry Dymoke, litho, printed by Charles Joseph Hullmande, 14 x 19 inch, 1821. --------------------------------	৯৯
4.19	Nathaniel Whittock, 1st water colortouch on litho-1832. -----------	৯৯
4.20	Heliographie-1-W-51St-NewYork-August-2014. -------------------	৯৯
4.21	Niépce,1825, Héliographie (photolitho) -------------------------------	৯৯
4.22	Plate:4.22, Cyanotype postcard, Racine, Wis, c. 1910, --------------	১০০
4.24	গডেফ্রয় এঞ্জেলম্যান, প্রথম রঙিন লিথোগ্রাফি (ক্রমোলিথোগ্রাফি) পদ্ধতির প্যাটেন্ট করেন ১৮৩৭ সালে।	১০০

In France, Godefroy Engelmann is awarded a patent on chromolithography, a method for printing in color using lithography. Chromolithographs or chromos are mainly used to reproduce paintings. ---

4.24 Whisler, litho, The Thames at Battersea, 1878, 6.75x10.75inch. -- ১০৩

4.25 photochrom Lithography, (Neuschwanstein Castle), arond 1886. - ১০৩

4.26 Henri de Toulouse Lautrec, Lithography. ---------------------------- ১০৩

4.27 Henri de toulouse-lautrec, Le matin, litho, 10x14 inch, 1966. ------ ১০৩

4.28 Edouard Vuillard, lithography, Sur le Pont de l'Europe (E.Vuillard Portfolio, 9x13 inch, 1950. -- ১০৪

4.29 Pierre Bonnard, woman-with-a-parasol, lithography, Style-Japonism, --- ১০৪

4.30 Jasper Jhons, Lithography, Figure 1, 1969. -------------------------- ১০৫

4.31 Rauscheberg, Lithography --- ১০৫

4.32 Sir Charles D'oyly, handcolored litho, View near the Circular Road (Calcutta), 34x28 inch, 1848. --- ১০৭

4.33 Raza Ravi Varma, Shakuntala Patralekhan, Oleograph, late 19th century, 20x27.5 inch. --- ১০৭

4.34 Bat-tala,s Lithography, ১০৮

4.36 Agamani, Chromolithograph, Calcutta Art Studio, Calcutta, 19th Century, Bengal Art Scene in the Colonial Period ১০৮

4.37 Colour lithograph, SETH STUDIOS (designer), Mother India 1957, (printed 1980s) 107x80 cm ১০৮

4.38 Ratna Brand of Medicine, product label, chromolithograph, published by Mashhoor, Davaghar (Chemist Shop), Kasauli, Punjab, mid 20th century ১০৮

4.39 East and West, product label for trading company, chromolithograph, mid 20th century. ১০৮

4.40 Gaganendranath Tagore, Naba Hullod-Reform Screams, 1921, book, lithography, ink on paper, 23 x 30 cm, 1921. ১১০

4.41 Suren Kar, litho ১১০

4.42 Raja ravi varma, gangawatan, oleograph, 1900, 27.2 x 19.5 inch ১১০

4.43 Ajit Seal, litho ১১০

4.44 Salvador dali, endloses raetsel, Art prints are created on paper similar to that of a postcard or greeting card using a digital or offset lithography press ১১০

4.45 Theodore Gericault, Litho, the boxer, 1818, 13.78x16.38 inch ১১৬

4.46 Delacroix, litho, Faust, 16x10 inch, 1828 ১১৬

4.48 Les Voyages pittoresques it romantiques dans l'ancienne France ১১৭

4.49 Honore Daumier, Litho-Rue Transnonain, April 15,1834, L' association Mensuelle, 1834 ১১৭

4.50 Francisco Goya, Bovo Toro, 1825, Litho, 12.25x16 inch. ১১৮

4.51 Edouard Manet litho, Execution of the Emperor Maximilian, 1867, 6x8 inch, details, lithograph. ১১৮

4.52 Édouard Manet The Races, first state, litho, 15x20 inch. ১১৮

4.53 Renoir, Lithograph, Femme au cep de vigne I, 1904. ১১৯

4.54 Paul Cézanne, litho, Large Bathers, 16x20 inch, 1896-c. 1898. ১১৯

4.55 Paul Signac, The Buoy (Saint Tropez Harbor), Lithograph, 1894 ১২০

4.56 Odilon Redon, Yeux Clos, 1890, Transfer lithograph, 22 × 16 inch. ১২০

4.57 Odilon, Eyes closed , [Les yeux clos] 1890, oil on canvas, laid on card ১২০

4.57 Rodolphe Bresdin, The Good Samaritan, 1861 lithograph. 29.8×23.7 inch. ১২১

4.58 Henri Fantin latour, Buuquet de Rose, Litho with chinecolle, 1879, 41.7x35.5 cm. ১২১

4.59 Henri Fantin latour, Buuquet de Rose, oil paintaing. ১২১

4.60 Pierre Bonnard, lithography, Les Boulevards, 11x14 inchBonnard, 1895 ১২২

4.61 Edouard Vuillard, Lithography, The Pastry Ship from the Series Landscapes and Interiors ১২২

4.62 Henri Matisse, Lithograph, 12x14 inch, 1929 ১২৪

4.63 Kandinsky, Litho, Composition, 1922, 38x33 cm ১২৪

4.64 Max Pechstein, litho, Compositio, 21 x 17 inch, 1909 ১২৭

4.65 Edvard Munch, The Cry, litho, 1893 ১২৭

4.66 Pablo Picasso, litho, Woman in Striped Blouse, 25x19inch, 1949 ১২৮

4.67 George Braque, litho, Helios v,1948, 42 x 50 cm ১২৮

4.68 Jack Beal, Doyle's Glove, five-color lithograph on Rives BFK paper, 1969, 12x13 inch. ১৩১

4.69 Richard Diebenkorn Untitled Ocean Park Series, lithography, Untitled, 1969, 24x18 inch. ১৩১

4.70 Henry Pearson, Gyros V, stone lithograph, 1965, 16x20.5 inch. ১৩৩

৫. পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের লিথোগ্রাফি চর্চা

5.1 Unknown Artist, Lithography, Drawing the image with tusch by Crow Quill nibs or pen, 9-11-1952, 10x13 inch, এখনো পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক প্রথম দিককার লিথোচিত্র, Collection- F.F.A, D.U ১৪৮

5.2 Rashid, Lithography (Drawing with Crayon), 9-12-1952, 26x36 cm, Collection- F.F.A, D.U ১৪৯

5.3 Quamrul Hasan, After Bath, litho,75x54cm, 1958, ১৫১

5.4 (Close Detail Picture) ১৫৪

5.5 Picasso, 1910, Portrait of Daniel-Henry Kahnweiler. ১৫৪

5.6 Wakita Kazu, Lithograph,People living in the Neighborhood, 1974, 50x35 cm

5.7 Mohammad kibria, lithography, Boy with flowers, 1959, 46x60 cm ১৫৫

5.8 Murtaja Baseer, Self Portrait, Lithography, 1959, 51x36 cm, Collection-F.F.A, D.U. ১৫৭

5.9 Mohammad Kibria, Lithography, Two flowers, 1960, 46 x 60 cm. ১৫৯

5.10 Paresh Kumar Maity, Lithography (Crayan), 1960, 36x50cm, Collection-F.F.A, D.U. ১৬১

5.11 Ashish Sen Gupta, Lithography (Crayan), 1969, 19x14inch, Collection-F.F.A, D.U. ১৬১

5.12 Ranjeet Neogy, Lithography (tusch and Crayon mix), Shitalaxha in rainy season, 1969, 46x61cm, Collection-F.F.A, D.U. ১৬২

5.13 Shudhir Kumar Shaha, Lithography (tusch and Crayon mix), 1966, 26x38cm, Collection-F.F.A, D.U. ১৬২

5.14 Debdas Roy, litho, 1963, Book cover, 25 x 19cm, 8-6-1963 (Flat image), Collection-F.F.A, D.U. ১৬৩

5.15 Aminul Islam, litho, River view, Media-litho, 28 x 51 cm, 1965, Collection-F.F.A, D.U. ১৬৩

5.16 Zainul abedin, Lithography, 1975,? এখানে ফ্লাটিং প্রিন্ট পরে নেওয়া হয়েছে। ১৬৩

5.17 Nasir Biswas, Lithography, Noor jahan, litho, 1965, 19x14inch, এখানে ফ্লাটিং প্রিন্ট আগে নেওয়া হয়েছে, Collection-F.F.A, D.U. ১৬৩

5.18 Abdur Razzak, Lithography, Composition-1, 46x 16cm, 1973. ১৬৯

5.19 Abdur Razzak, Acrylic, Composition-Red, 46x 110cm, 1976. ১৬৯

5.20 Abdus Sattar, Lithography, Untitled,? ১৭১

5.21 Abdus Sattar, Lithography, Face, 35x51 cm, 2008, Collection-F.F.A, D.U. ১৭১

5.22 Wakilur Rahman, Alugraphy, A tale of a Country2, 59x43 cm,1991 ১৭৩

5.23 Ashok Biswas, Lithography, Rater Pratinidhi, 1992, (collection-Chitark gallery) 12x18 inch (aprox) ১৭৫

5.24 Ashok Biswas, litho, 12x18 inch (aprox), 1992, (collection-Chitark gallery). ১৭৫

5.25 Ahmed Nazir, Dream of victory,mixed technique, Litho, 51X36cm, 1995 ১৭৬

5.26 The war file 201 , digital print , 65X95 cm , 2011 ১৭৬

5.27 Anisuzzaman, Lithography, The Moon, 17x17inch, 1997. ১৭৬

5.28 Anisuzzaman, Lithography, Joy of season, 17x17inch, 1998. ১৭৬

5.29 Fakrul Alm Tofa, Lithography, ? ১৭৮

5.30 Nihar Ranjan Shingha, Discover, Lithography, 2005, 26x38 cm ১৭৯

5.31 Rafiqun Nabi, Plate-Lithography, 15x21 inch, 2014. Collection-F.F.A, D.U. ১৮২

5.32 Shahid Kabir, Painting, painting, ? ১৮৩

5.33 Mohammad Eunus, Plate-Lithography, 27x 31inch, 2014, Collection-F.F.A, D.U. ১৮৬

5.34 Rokonuzzaman, Ballpoint Lithography, 12x14 cm (detailed photo), 2010. ১৮৭

5.35 Rokonuzzaman, Dry point, 2000, 7x4 inch. ১৮৮

5.36 Rokonuzzaman, Wood Lithography, Rickshaw, 47x53 cm, 2009. ১৮৯

5.37 Rokonuzzaman, Stone Lithography, 'A Journey From one reality to another', 330x 15 inch, 2004. ১৯০

5.38 Kamruzzaman, Lithography, Destroy, 2014, 70x45 cm. ১৯১

5.39 Rokeya Sultana, Lithography, ,60X45cm,1979, Collection-F.F.A, D.U. ১৯৩

5.40 Ashok Karmakar, Lithography, 36x32 cm, 1983, Collection-F.F.A, D.U. ১৯৩

5.41	Un Known Artist, Lithography,45x36 cm, 1976, Collection-F.F.A, D.U.	১৯৩
5.42	Ashok Biswas, Lithography, 25x19cm, 1980, Collection-F.F.A, D.U.	১৯৩
5.43	Md. Iqbal, Lithography, Composition, 1990, ?	১৯৪
5.44	Swarup Kumar Basak, lithography, Windows, 2005, 30x29 cm.	১৯৪
5.45	Juton Chandra Roy, Lithography, 2013, 8x16 inch	১৯৪

৬. ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে অনুসৃত লিথোগ্রাফি চর্চার করণ-কৌশল ও নতুনত্ব

6.1	রিলিফ পদ্ধতির সবচেয়ে পুরাতন নিদর্শনস্বরূপ হীরক সূত্রের ছবি	১৯৫
6.2	ইন্টাগলিও পদ্ধতির প্লেট, ইন্টাগলিওতে প্লেটের গর্তে ইঙ্ক, ইন্টাগলিও পদ্ধতিতে রোলিং করা	১৯৬
6.3	Stone carring machine	১৯৭
6.4	লেভিগেটর (Levigator) দিয়েও ‘s’ প্যাটার্নে ঘুরিয়ে গ্রেইন করা যায়	২০০
6.5	গ্রেইন শেষে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা	২০০
6.6	স্টোনের ওপর একটি স্কেল ধরে নিচে একটি কাগজ দিয়ে উঁচু-নিচু (ডিপ্রেশন) পরীক্ষা করে নেওয়া	২০১
6.7	Papri Baroi Ratri, Plate Lithograpghy, 8x12 inch, 2012. First impressiom draw by glass marker. 2nd and other impressions enriched by transfer process of 1st impression	২০৪
6.8	প্লেট পোকায় খেয়ে গেলে এরূপ হয়	২২০
6.9	Ashish Sen Gupto, Litho, 19x14 inch, may be 1960 -1965, Its grain were created by sand.	২৪৫
6.10	Rokonuzzaman, Imagination, Wood lithography, Wood cut, 26.5x20 cm, 2009.	২৪৯

Dhaka University Institutional Repository

6.11 Kamruzzaman, Ball point Lithograpgy, 2009, ? ২৫০

6.14 Rokonuzzaman, Plate lithography, 2011, 18x6 cm, অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে দ্রুত ইমেজ এঁকে গ্লাসমার্কার দিয়ে প্রেশারের মাধ্যমে পাখির ইমেজ সৃষ্টি– ‘ইরেজ করে ইমেজ সৃষ্টি’ ২৫৫

6.15 Rokonuzzaman, Plate lithography, 46x60 cm, (Detailed photo) ২৫৭

6.16 (Detailed photo) ২৫৭

6.17 Asmita Alam Shammi, Waterless lithography, 2016, ? ২৫৮

6.18 Rokonuzzaman, Non-objective World 2, Revers method lithography on stone lithography, 2008. 46x60 cm. ২৬১

6.19 Rokonuzzaman, Non-objective World-20, Re- Revers method lithography on stone lithography, 2017. 17x5 cm. ২৬৩

6.20 Rokonuzzaman, Water base oily medium, 2010, 19x16 cm. ২৭২

6.21 Rokonuzzaman, Water base oily medium, 2010, 41x27 cm. ২৭২

6.22 Rokonuzzaman, Water base oily medium, 2010, 2010, 41x27 cm. ২৭২

6.23 Rokonuzzaman, Water base oily medium, 2010, 2010, 41x27 cm. ২৭২

6.24 Rokonuzzaman, Water base oily medium, 2010, ২৭৩

6.25 Rokonuzzaman, Water base oily medium, (Study), 2010, 41x27 cm. ২৭৩

6.27 Rokonuzzaman, Water base oily medium, 2014 (dark to light image is possible), 41x27 cm. ২৭৩

6.28 Rokonuzzaman, Water base oily medium, 2014 (dark to light image is possible) 41x27 cm. ২৭৩

6.29 Rokonuzzaman, Water base oily medium, 2014 (Tusch velbetty effect image is possible) ২৭৩

6.30 Rokonuzzaman, Water base oily medium, 2014 (dar to light image is possible), 41x27 cm. ২৭৪

Dhaka University Institutional Repository

6.31	Rokonuzzaman, Water base oily medium, woocut , 2014 (Tusch tranceparency and close up photogrphy)	২৭৪
6.32	সায়ানোটাইপ প্রিন্ট, সায়ানোটাইপ প্রিন্ট (ড্রইং), ১৯৩৬	২৭৬
6.33	বাংলাদেশের বাজার থেকে সংগৃহীত গ্লাসমার্কার	২৮০
6.34	Rokonuzzaman, Stone lithography, Lithographic tusch wash,	২৮০
6.35	Softchoklate shape tusch.	২৮০
6.36	Shanchita Biswas, Plate lithography, 2016, গাম দিয়ে তুলির সাহায্যে লাইন বা ফর্ম অঙ্কন পদ্ধতি।	২৮২
6.37	Rokonuzzaman, Stone Lithography, Scraching process by razor blade. 2003,	২৮২

৭. সপ্তম অধ্যায়

লিথোর বর্তমান অবস্থা, সম্ভাব্যতা ও নান্দনিকতার ছাপ নিয়ে আলোচনা

7.1	Kamrul hasan, lithography, collected from Kolkata govt art college, Moinul Abedin, Moniruzzaman.	২৮৯
7.2	Nasir Biswas, Still life, 1964 (probabely), lithography, 24x18 inch, collected from Department of Printmaking, D.U.	২৮৯
7.3	Ashish Sen Gupto, Lithography, 19x14 inch, may be 1960 or 1961, collected from D.P.T, D.U.	২৮৯
7.4	Rashid, lithography, Size-26x36 cm, Year- 9-12-1952, collection from Department of Printmaking, D.U.	২৯০
7.5	Paresh Kumar Maiti, lithography, Bazar, 1960, collection from Department of Printmaking, D.U.	২৯০
7.6	Ranjit Neogi, Lithography, A road of Sherpur Town, Size-46x62 cm, Year-1963, collection from Department of Printmaking, D.U.	২৯০
7.7	K. Mahmud, lithography, Size-31x46 cm, Year-1982, collection from Department of Printmaking, D.U.	২৯০

Dhaka University Institutional Repository

7.8 Abdus Samad, lithograpgy, 3rd year, 1965, collection from Department of Printmaking, D.U. ২৯১

7.9 S.A.Q. Mainuddin, Media-litho, 1965, Size-26x38 cm, Year-1965, roll-3, collection from Department of Printmaking, D.U. ২৯১

7.10 Rasid Chowdhury, Collected from Mukti Judho Jadughar: Portfolio-1971. ২৯১

7.11 Md. Kibria, Lithography (Last work on Litho stone), Printed by Rokonuzzaman, Colllection from Cosmos Gallery, 15x 10.5 inch, 2008. ২৯২

7.12 Ashoke Karmaker, Lithography, 1994, Colllection from Department of Printmaking, D.U ২৯২

7.13 Md. Kikria, Lithography, Composition: Blue, Green and Red, 60x46 cm, 1976. ২৯২

7.14 Bijan Choudhury, Lithography, Railway life, 18x14 inch, 1954 or 1955, Department of Printmaking, D.U ২৯২

7.15 Zainul abedin, Portrait (from Shantiniketan), Lithography on thick paper, 1975, ২৯৩

7.16 HaamiduzzamanKhan, Lithography, Colllection from Department of Printmaking, D.U, ২৯৩

7.17 Abdus Sattar, litho, 2008, Colllection from Department of Printmaking, D.U ২৯৩

7.18 Abdus Shakur Shah, lithography, Face, 2008, 30x27 cm. Colllection from Dpt. D.U ২৯৩

7.19 Rafiqun Nabi, lithography, The Crows, 2014, 15.5x 21.25 inch, Colllection from Department of Printmaking, D.U ২৯৫

7.20 Shahabuddin, 27x22 inch, ? ২৯৫

7.21 Aritra (Children), Printed by Rokonuzzaman, 2008, 30x27 cm, Colllection from Department of Printmaking, D.U ২৯৫

Dhaka University Institutional Repository

7.22 Edouard Manet, Oil on canvas, Luncheon on the Grass, 1863, 81.9 × 104.5 inch. ২৯৮

7.23 Giorgione, The Tempest (c. 1508). Gallerie dell'Accademia, Venice, Italy. ২৯৯

7.24 The Pastoral Concert ca. 1510, by Giorgione or Titian, has been cited as an inspiration for Manet's painting. ২৯৯

7.25 Antoine Watteau, La Partie Carrée, c. 1713 ২৯৯

7.26 Claude Monet, Le Déjeuner sur l'herbe, 1865-1866, Musée d'Orsay, Paris. ২৯৯

7.27 James Tissot, La Partie Carrée, 1870. ২৯৯

7.28 Edouard Manet, Luncheon on the Grass, Oil on canvas-(81.9×104.5 in), 1863. ২৯৯

7.29 Paul Cézanne, Le Déjeuner sur l'herbe, 1876-1877, Musée de l'Orangerie ২৯৯

7.30 Paul Gauguin, Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?, 1897. (detail). ২৯৯

7.31 Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, 1907, MoMA ২৯৯

7.32 Shahid Kabir, Plate Litho, 27x33 cm, 2015, Collection-F.F.A, D.U. ৩০১

7.33 Jasper Johns, Graphite wash, metallic pigment, pencil, and pastel on paper, Watchman, 38x26 inch, ৩০৬

7.34 Jasper Johns, lithography, Watchman, 34x23 inch, 1967 ৩০৬

7.35 Palsh Baran Biswas, lithography & woodcut, 2013, 28x90 cm. ৩০৬

7.36 Kamruzzaman, Lithography, Restoration-3, 2016, 90x78 cm. ৩০৭

7.37 Rashida Akter (Boby), Lithography. ৩০৯

7.38 Papri baroi Ratri, litho, 15x12inch, 2016 ৩০৯

7.39 Rokeya Sultana, Lithography, Face, 2012, 16x11 inch ৩১৩

7.40 Dilara Begum Jolly, Lithography, Lal Shalu, Litho, 12x16 inch, 1991 ৩১৩

Dhaka University Institutional Repository

7.41 Rokonuzzaman, Planographic process on Acrylic sheet, 2014, 28x21 inch (aprox) ৩১৫
7.42 rokonuzzaman, Lithograph and Offset Print, Projection of the artist inspiration, 2006, 59x 11 inch ৩১৬
7.43 Quamrul Hasan, After Bath, litho1958. ৩১৮
7.44 Quamrul Hasan, Bathing, oil, 1966, 150x75 cm ৩১৮
7.45 Edgar Degas, Lithograph and crayon on stiff wove paper, 11x8 inch. ৩১৮
7.46 Kamrul Hasan, Roster-2, Oil, 61x61 cm, 1977. ৩১৮
7.47 Kamrul Hasan, Sketch, The country today is in the hands of global scoundrel, 1988. ৩১৮
7.48 Abdur Razzaque, Composition-6, Acrylic, 50x36 cm, 1993. ৩২০
7.49 Maurice Esteve, litho, Arizovert, 24x31 cm, 1972. ৩২০
7.50 Abdur Razzaque, Self Portrait, Acrylic, 1954 ৩২১
7.51 Leroy Neiman. Lithograph, 1921, 24x36 inch ৩২১
7.52 Shahid Kabir, Painting, Lithography ৩২১
7.53 Shahid Kabir, Plate Litho, 27x33 cm, 2015, Collection-F.F.A, D.U. ৩২২
7.54 Shahid Kabir, Painting ৩২২

Dhaka University Institutional Repository